শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ।

অর্থাৎ শ্রীমদাচার্য্য শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী জীউর দেহাশ্রিত অবস্থার কতক সময়ের দৈনন্দিন বৃত্তান্ত।

তদীয় কৃপাভাজন

শ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক যথাতথভাবে লিখিত।

লকাতা,—বড়বাজার, ৩নং ময়দাপটী হইতে

শ্রীনলিনাক্ষ তা কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩২১ সাল।

[বাঁধাই ১৸০ আনা।]

প্রিণ্টার—শ্রীকুলচন্দ্র দে,

শাস্ত্রপ্রচার প্রেস।

৫নং ছিদামমুদির লেন, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা।

নিবেদন।

আমার পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এদেশে সুপরিচিত। তিনি ১২৪৮ সালে শুভ ঝুলনপূর্ণিমাতে শ্রীধাম শান্তিপুরে বিশুদ্ধ অদ্বৈত বংশে, পরম ভাগবত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ-আনন্দকিশোর গোস্বামী প্রভুর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্যজীবনে তাঁহার যে সমস্ত স্বাভাবিক সদ্‌গুণ ও অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ দর্শন করিয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও শান্তিপুরবাসীরা এক সময়ে বিস্মিত হইয়াছিলেন, সে সকল সাধারণের শ্রুতিগোচর করা আমার এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নয়।

যৌবনকালে, সরল বিশ্বাসে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক, পরদুঃখে কাতর হইয়া, তাৎকালিক দুর্নীতিদুরাচারদূরীকরণার্থে এবং সত্যধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য, বিষম অত্যাচার উৎপীড়ন ভোগ করিয়াও যে ভাবে তিনি অদম্য উৎসাহে দেশের পুনরুত্থানের জন্য কার্য্য করিয়াছিলেন, ঠাকুরের সেই সময়ের জীবনী অনুসন্ধান করিয়া প্রচার করাও আমার এ পুস্তকের অভিপ্রায় নয়।

শুধু বিমল বিশুদ্ধ ধর্ম্মমতে এবং অনাদি অনন্ত সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের অস্তিত্বমাত্রধ্যানে পরিতুষ্ট না হইয়া, প্রত্যক্ষ ভাবে জীবনে পরম বস্তু লাভ করিবার জন্য যে ভাবে তিনি বিভিন্নধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপাসনাপ্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক তীব্র তপস্যা ও কঠোর সাধন ভজন করিয়াছিলেন, এবং তাহাতেও নিজ লক্ষ্য বস্তু ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ রূপে লাভ করিতে না পারিয়া, যে অবস্থায় দুর্গম পাহাড়-পর্ব্বতে ও বন-জঙ্গলে, অনাহারে অনিদ্রায় সদ্‌গুরুর অনুসন্ধানে উন্মত্তের মত ছুটাছুটি করিয়াছিলেন, সে সমস্ত বিবরণ তাঁহারই শ্রীমুখে শুনিয়া অবাক্ হইয়াছি ও লিখিয়া রাখিয়াছি।

অবশেষে তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থায় আকস্মিক প্রকারে গয়া-পাহাড়ে, মানসসরোবর-নিবাসী শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ পরমহংসজী, অকস্মাৎ স্থূলশরীরে আবির্ভূত হইয়া, তাঁহাকে শক্তি-সঞ্চার পূর্ব্বক দীক্ষা প্রদান করিয়া, মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। সেই সময় হইতে তিনি, তাঁহার চিরাভীপ্সিত-বস্তু সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানকে সাক্ষাৎরূপে প্রত্যক্ষ ভাবে লাভ করিয়া, যে অবস্থায় অবশিষ্ট দিন যাপন করিলেন, প্রায় তের চৌদ্দ বৎসর কাল তাঁহার মধুর সঙ্গ লাভে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, সময়ে সময়ে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়াছি। হায়, কিছুকাল হয়, সেই চিত্তবিমোহন পরমানন্দময় ব্যবহারের ছবিটিমাত্র আমাদের সম্মুখে রাখিয়া

১৩০৬ সালের দারুণ জ্যৈষ্ঠমাসে শ্রীশ্রীনীলাচলে নীলাম্বুধিকূলে আশ্রিত ভক্তগণের প্রাণারাম, আমাদের সেই স্নিগ্ধসুভাস্বর তত্ত্বদ্যুতিপ্রভাকর অকস্মাৎ অস্তমিত হইল। ঘোর কৃষ্ণা দ্বাদশীর প্রথম অন্ধকারে হতভাগ্য ভক্তগণের মস্তকোপরি অমনি আচম্বিতে অশনি পতিত হইল। সেই ভীষণ দুর্দ্দিনের হৃদয়বিদারক দৃশ্য অঙ্কিত করিয়াই, আমার ডায়েরীর শেষ পৃষ্ঠা চিরকালের মত শেষ করিয়া রাখিয়াছি।

ছেলেবেলা প্রায় দশ বৎসর বয়স হইতে আমার ডায়েরী লিখা অভ্যাস ছিল। সুতরাং ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার চিরসমাধিগ্রহণের দিন পর্য্যন্ত আমার ডায়েরী লিখা রহিয়াছে। ঠাকুরের নিকটে সর্ব্বদা একটি লোক থাকা আবশ্যক হইত বলিয়া, এই কার্য্যভার আমারই উপরে ছিল। আমি আমার নিদ্রার সময় ব্যতীত, প্রায় নিয়ত তাঁহারই সম্মুখে বসিয়া থাকিতাম। ঠাকুরের নিকটে সাধন লইয়া প্রায় তের চৌদ্দ বৎসর কাল অবিচ্ছেদে তাঁহার সঙ্গ করি। সেই সময়ে তাঁহার কথাবার্ত্তা, আচার ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ যেদিন যেমন দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, বিস্তারিতরূপে ডায়েরীতে সেই সেই তারিখে লিখিয়া রাখিয়াছি। আমার ডায়েরীতে বিশেষ ভাবে আমার জীবনের নানা প্রকার দুরবস্থায় ও আকস্মিক দুর্দ্দশায় ঠাকুরের শাসন, উপদেশ, দয়া ও সহানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার জীবনের আশ্চর্য্য ঘটনাবলীর বিবরণ, যাহা তিনি সময়ে সময়ে প্রকাশ করিয়াছেন, সরল ভাবে অকপটে যেমন যেমন পাইতাম, লিখিয়া রাখিতাম। তবে নিয়ত একত্র থাকার দরুণ ঠাকুরের সেই সেই সময়ের নিত্যসঙ্গী আমার শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতাদের তাৎকালিক কোন কোন ঘটনার সহিত আমার বিশেষ সম্বন্ধ থাকা হেতু, এবং সে সকলের সহিত ঠাকুরের আদেশ উপদেশ ও ব্যবহারের সংস্রব বিশেষ ভাবে থাকাবশতঃ, ঐ সমস্তও আমার ডায়েরীর অন্তর্গত হইয়া রহিয়াছে। আমরা যদি সকলে সাধু শান্ত জিতেন্দ্রিয় নিষ্কলঙ্ক জীবন লইয়াই ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাঁহার কৃপা ও মহিমার পূর্ণ নিদর্শন কিরূপে পাইব? তাঁহার পতিতপাবনতা ই বা কিরূপে সম্যক্ পরিস্ফুটিত হইবে? একদিকে উৎপীড়নের আধিক্য প্রকাশ না হইলে অপর দিকে ক্ষমার বিশেষত্ব বুঝা যায় না। একদিকে যেমন অত্যাচার অবাধ্যতা, অপর দিকে তেমনই ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, একদিকে হীনতা অধোগতি, অপরদিকে দয়া ও সহানুভূতি। এজন্য ঠাকুরের অসাধারণ কৃপা ও অদ্ভুত জীবনের বিন্দুমাত্র পরিচয় স্মৃতিতে রাখিবার জন্য, তৎসাময়িক নিত্যসঙ্গী গুরুভ্রাতাদের সাধারণ ব্যবহার, এবং বিশেষ ভাবে, আমার নিজ-জীবনের গলদ, যে দিনকার যেমন, ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিয়াছি।

আমার ডায়েরী লিখা অভ্যাস গুরুভ্রাতারা অনেকেই জানেন। সুতরাং শত শত গুরুভ্রাতা ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের পর হইতে এ পর্য্যন্ত এই পনর বৎসর, ঠাকুরের একখানি জীবনচরিত লিখিতে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে এই তের চৌদ্দ বৎসর থাকিয়া তাঁহার যে সকল ব্যাপার দেখিয়াছি, তাহাতে তাঁহার জীবনচরিত লিখা বা সেই বিষয়ে চেষ্টাও নিতান্ত অসম্ভব মনে হয়। নানা কারণে আমি তাহা অপরাধই মনে করি। আমার সরল বিশ্বাস তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনী হইতে পারে না, ভাষায় যাহা প্রকাশ করা যায় না—তাঁহার জীবনের সেই সকল অতীন্দ্রিয় তত্ত্বানুভূতির কথা ধরিয়া আমি ইহা বলিতেছিনা। অতি নিম্নস্তরের যোগৈশ্বর্য্যলব্ধ শক্তিপুঞ্জের যে সকল ক্রিয়া ও ফলানুভূতি তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহে সর্ব্বদা হইতে দেখিয়াছি এবং দেবতা ও সিদ্ধমহাপুরুষগণ-সম্বন্ধীয় সাধারণের বিশ্বাসের অতীত যে সকল অলৌকিক ঘটনাবলী নিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সে সমস্ত মনে করিয়াও আমি এই কথা বলিতেছি না। আমার ইহা পরিষ্কার ধারণা যে ঠাকুরের জীবনে এমন কতকগুলি সাধারণের বিশ্বাসযোগ্য এবং বোধগম্য ঘটনা, নানাস্থানে নানা অবস্থায়, সাধারণ লোকচক্ষুর অগোচরে সংঘটিত হইয়াছে যে, তাহা তিনি তাঁহার নিত্য-সঙ্গী শিষ্যগণের নিকটেও প্রকাশ করিতে অবসর পান নাই; আবার কখনও কোনও ঘটনা কথাপ্রসঙ্গে অপরের নিকটেও প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং, এ সকল জানিয়া শুনিয়া, তাঁহার একখানি স্থূল জীবনী প্রকাশ করিতে যাওয়া আমার পক্ষে কতদূর দুঃসাহসের কার্য্য, সকলেই বুঝিবেন। পূর্ব্বোক্ত এ সকল কারণে আমার এ প্রকার পরিষ্কার ধারণা ঠাকুরের কথা যতই লিখি না কেন, তাহাদ্বারা তাঁহার সম্যক্ পরিচয়-প্রদান অসম্ভব। এজন্য ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের পর এই চৌদ্দ পনর বৎসরকাল আমি এ বিষয়ে কোন চেষ্টাই করি নাই। কেননা তাঁহার প্রেরণা ভিন্ন তদীয়জীবনীসঙ্কলনে আমার সাহস হয় না। ভবিষ্যতে তাঁহার প্রেরণা ও সহায়তা লাভ করিলে সে বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারি।

গত বৎসর কলেরা রোগে যখন আমি একেবারে মরণাপন্ন হইয়াছিলাম, তখন আমার জীবনসম্বন্ধে সকলেই হতাশ হইয়াছিলেন। আমার ডায়েরীগুলি প্রকাশ হইল না ভাবিয়া, ঐ সময়ে অনেকে অত্যন্ত আক্ষেপ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের কৃপায় আমার আরোগ্য-লাভের পর, আমার শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতাদের সস্নেহ অনুরোধ ও নির্ব্বন্ধ আবার আমার উপরে পতিত হইল। আমি, তাহা অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া, আমার ঐ বিস্তৃত চৌদ্দ বৎসরের ডায়েরী প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিলাম। কিন্তু একবারে তাহা হওয়া অসম্ভব। এজন্য, ১২৯৮

নিবেদন।

সালের ডায়েরী খানা নিতান্ত জীর্ণ, অনেক স্থলে ফাসারা কাগজে পেন্সিলে লিখা বিলুপ্ত-প্রায়, অবস্থায় রহিয়াছে দেখিয়া, ক্রমবিরুদ্ধ হইলেও, সর্ব্বপ্রথমে সে খানাই উদ্ধার করিয়াছি। ঠাকুরের জীবনের আমি কিই বা জানি, কতটুকুই বা জানিতে পারি? শুধু নিজে যে টুকু প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং তাঁহারই শ্রীমুখে শুনিয়াছি, তাহারই স্মৃতি এ জীবনে রাখিয়া অবশিষ্ট দিন শেষ করিতে পারিলেই আমার আশাতীত ফল লাভ হইল মনে করি। আমার অভিন্নহৃদয় গুরুভ্রাতাদের জীবনের সেই সময়ের কোন কোন ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে আমার ঠাকুরের উজ্জ্বল স্নেহময় কৃপাপূর্ণ প্রভা বিকসিত হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া, তাঁহাদের সহানুভূতি ও আশীর্ব্বাদ ভরসা করিয়া, তাঁহাদের তাৎকালিক জীবনের কোন কোন ঘটনাও স্থানে স্থানে ডায়েরী হইতে বিবৃত করিয়াছি। এই পুস্তক খানা ঠাকুরের জীবনচরিত নহে, আমারই ডায়েরী। 'আমার মত অবাধ্য দুরাচার পাষণ্ডের প্রতি ঠাকুরের কৃপা'—ইহাতে ঠাকুরের মাহাত্ম্য লোকে যতটুকু বুঝে বুঝুক, অন্ততঃ আমি তাহা স্মরণ করিয়া কৃতার্থ। ১২৯৮ সালের ডায়েরী, ঠাকুরের কথা স্মরণ রাখিয়া, সাবধানতার সহিত এবং স্থলবিশেষে সংক্ষিপ্ত করিয়া, প্রকাশ করিলাম। এই কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে ঠাকুর অন্তর্দ্ধানের কএক দিন পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছিলেন—"ব্রহ্মচারি! প্রত্যক্ষ সত্যও যাকে তাকে বল্‌তে নাই! যদি বল্‌তে হয়, চোখে আঙ্গুল দিয়ে তাঁকে প্রমাণসহিত দেখাতে হবে, না হ'লে শ্রীমন্ত সওদাগরের দশা ঘট্‌বে, এটি মনে রেখো।" তাই সব কথা আমার লিখার যো নাই, বোবার স্বপ্ন দেখার মত। যদি এই ক্ষুদ্র, মাত্র এক বৎসরের, ডায়েরী প্রকাশ করাতে জনসাধারণের কোনপ্রকার উপকার বা একটুকু আনন্দ হয়, ভবিষ্যতে আমার অবশিষ্ট ১২। ১৩ খণ্ড ডায়েরী প্রকাশ করিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল।

ঠাকুরকে যখন আমি দেখিলাম, যে অবস্থায় থাকিয়া, যে ঘটনায় পড়িয়া, তাঁহার কৃপা লাভ করিলাম, এবং তাহার পর তাঁহার অবিচ্ছেদ-সঙ্গলাভের জন্য যে সকল শৃঙ্খলা-বদ্ধ আপদ বিপদ আমার সেই সময়ে ঘটিয়াছিল, সে সমস্ত শুধু তাঁহারই কৃপা মনে করি। এজন্য নিজ জীবনের তাৎকালিক ঘটনার অতি সংক্ষেপ দু তিনটি বিবরণ না দিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। আমার এই নির্লজ্জতা সকলে দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন, এই প্রার্থনা।

আমার প্রায় ছয় বৎসর বয়সে একদিন বাড়ীর ধারে ময়দানে সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে অপরাহ্নে খেলা করিতেছিলাম, কে আমাকে হঠাৎ ডাকিয়া বলিল 'ওরে, তোদের বাড়ী গোঁসাই এসেছেন, শীঘ্র যা।' আমি ঐ কথা শুনামাত্র, এক দৌড়ে বাড়ীতে আসিয়া দেখি,

ঠাকুরঘরের ধারে, শেফালিকা গাছের নীচে, আমাদের আত্মীয়, ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছেন। হাতে তাঁর মোটা লাঠী, পায়ে জুতা, গায়ে একটি জামা ও ময়ূরপাঙ্খী জামিয়ার; শরীরটি প্রকাণ্ড। লেংটা অবস্থায় দৌড়িয়া আমি তাঁহার সম্মুখে গিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইতেই, তিনি স্নেহ-দৃষ্টিতে ঈষৎ হাসিমুখে আমাকে খুব পরিচিতের মত বলিলেন 'কি, খেলা কর্‌ছিলে? বেশ! বেশ!! যাও খুব খেলা কর গিয়ে।' এই বলিয়া তিনি নবকান্ত বাবুর সহিত ময়দানের দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া তিনি এক এক বার আমার দিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই আকৃতি ও সস্নেহ চাহনী আজ পর্য্যন্ত আমি ভুলি নাই। কেহ গোঁসাই শব্দটি বলিলে আমি এই গোঁসাইকেই বুঝিতাম।

আমাদের পাড়ায় একটি বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ প্রত্যহ 'কৃত্তিবাসের রামায়ণ' সুর করিয়া পড়িতেন। শুনিতে বড় ভাল লাগিত। প্রতিদিন আমি গ্রামের অপর প্রান্তে আহারের পর যাইয়া সন্ধ্যাপর্য্যন্ত সেখানে থাকিতাম, তাঁহার মুখে রামের কথা শুনিতাম। রামকে বড় ভাল লাগিত। রাম যেন আমাদের পরিবারেরই কেহ—আমাদের ছাড়িয়া বনে বনে ঘুরিতেছেন মনে করিয়া রামের জন্য কান্দিতাম। ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতে বন জঙ্গলে গেলে—সেখানে রাম আছেন কিনা চারিদিকে দেখিতাম। রামের বর্ণ দুর্ব্বার মত, তাই আগ্রহের সহিত দুর্ব্বার দিকে চাহিয়া থাকিতাম। দুর্ব্বায় পা পড়িলে রামের গায়ে লাগিল ভাবিয়া, সেখানে লুটাইয়া পড়িতাম, রামকে নমস্কার করিতাম। তীরধনু সর্ব্বদা হাতে রাখিতাম। একখানা ছেঁড়া রামায়ণ পাইয়া সারাদিন উহা সঙ্গে রাখিতাম, রাত্রিতে উহা মাথার নীচে রাখিয়া শুইতাম। এ সময়ে আমি শিশুশিক্ষাও পড়ি নাই। পরে পাঠশালায় ও ছাত্রবৃত্তি স্কুলে বোধোদয় পর্য্যন্ত পড়া হইলে, মেজদাদা (শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়) আমাকে লেখাপড়ার জন্য ঢাকা লইয়া গেলেন। এ সময়ে আমার বয়স দশ বৎসর। মেজদাদা যত্ন করিয়া আমাকে ডায়েরী লিখিতে শিক্ষা দিলেন। সারাদিনে কয়টি মিথ্যাকথা বলিতাম, কার সঙ্গে ঝগড়া করিতাম, কি কি দোষ করিতাম, প্রত্যহ ঠিক ঠিক এই ডায়েরীতে লিখা হইত। এই সময় হইতে ডায়েরী লিখা আমার অভ্যাস।

আমার আত্মীয় স্বজন অনেকেই ব্রাহ্ম। আমার জ্যেষ্ঠ-সহোদরেরাও সকলেই ব্রাহ্ম-মতাবলম্বী ছিলেন। মেজদাদা প্রতি রবিবারে আমাকে ব্রাহ্মসমাজে লইয়া যাইতেন। ব্রাহ্মদের উপাসনাপ্রণালীতে অল্প দিনের মধ্যেই আমি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম।

প্রতিদিন দুবেলা নিয়মিত রূপে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। প্রার্থনা করিয়া যে দিন না কান্দিতাম, উপাসনা হইল না ভাবিয়া সারাদিন উদ্বেগে কাটাইতাম। কপটতা ও অসত্য ব্যবহার মহা অপরাধ জানিয়া, প্রকাশ্য ভাবে উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিব স্থির করিলাম। আত্মীয় স্বজনের ভিতরে ইহা লইয়া মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। এই সময়ে ঢাকা-ব্রাহ্মসমাজে গোস্বামী মহাশয় আচার্য্য ছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের অসম্প্রদায়িক ভাবে হৃদয়স্পর্শী প্রার্থনা ও উপাসনাতে এবং প্রত্যহ সংকীর্ত্তনে তাঁহার মহাভাবে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মার্থিগণও আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিতে লাগিলেন। প্রতিদিন ব্রাহ্মসমাজে লোকে লোকারণ্য। প্রতি রবিবারেই মহা উৎসব হইতে লাগিল। জীবন্তধর্ম্মের জাগ্রত ভাব সম্প্রদায় ও জাতিনির্ব্বিশেষে সকলকেই অভিভূত করিতে লাগিল, জীবনে এমনটি আর দেখি নাই।

এই সময়ে, ১২৯৩ সালে, আশ্বিন মাসে শারদীয় উৎসবে আমি দীক্ষাগ্রহণ করিব প্রত্যাশায় ঐ দিনের প্রতীক্ষায় অস্থির হইয়া সময় কাটাইতে লাগিলাম। অকস্মাৎ ২০শা ভাদ্র রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম—সমাজের বাগানে শেফালিকা গাছের নীচে গোঁসাই দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিয়া বলিতেছেন—'শীঘ্র এসো। তুমি যে বস্তু চাও, আমি তোমাকে তাই দিব।' রাত্রি সাড়ে তিনটার সময়ে স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া পড়িলাম। 'স্বপ্ন মিথ্যা-কল্পনারই ফল' এরূপ সংস্কার আমার থাকিলেও, ঐ স্বপ্নটি দেখাতে প্রাণ আমার এত অস্থির হইয়া পড়িল যে উঠিয়া বসিলাম। হাত মুখ ধুইয়া কতক্ষণ প্রার্থনা করিয়া, শেষ রাত্রিতে বাসা হইতে বাহির হইলাম। ঐ বাগানে প্রবেশ করিয়া সেই গাছটির দিকে চলিলাম। যাইয়া দেখি গোস্বামী মহাশয়, খড়ম পায়ে, আলখিল্লা গায়ে, দণ্ড হাতে, ঐ গাছের তলায়, স্বপ্নে যেমন দেখিয়াছিলাম ঠিক সেই ভাবে, দাঁড়াইয়া আছেন। আমি অমনি গিয়া তাঁর পায়ে পড়িলাম। তিনি শিউলিফুল দেখাইয়া বলিলেন—'দেখ, যেন খই ফুটে রয়েছে।' আমি বলিলাম—'আপনি আমাকে দয়া করুন্।' তিনি বলিলেন—'আরও পূর্ব্বে তোমার আসা উচিত ছিল; এখন হবে না, কিছুদিন অপেক্ষা কর।' আমি কিছুক্ষণ ওখানে থাকিয়া বাসায় আসিলাম। কি বস্তু গোঁসাই দিবেন দিনরাত তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে দীক্ষা নেওয়ার ঝোঁক আমার কমিয়া গেল। গোঁসাইয়ের নিকট দীক্ষা পাইতে বারংবার ঘুরাঘুরি করিতে লাগিলাম। কিন্তু অভিভাবকদের সম্মতি না হ'লে তিনি আমাকে দীক্ষা দিবেন না বলিয়া ফিরাইয়া দিতে লাগিলেন। আমি বিষম সঙ্কটে পড়িলাম। পরে, অনেক কাণ্ড করিয়া অভিভাবকদের অনুমতি লইয়া, দীক্ষা গ্রহণ করিলাম।

সনাতন যোগধর্ম্মে দীক্ষিত হইলাম। সুতরাং যোগী ঋষিদের মত নির্জ্জন পাহাড় পর্ব্বতে থাকিয়া তীব্র সাধন ভজন করিব এই প্রকার ঝোঁক তখন আমার আবার চাপিল। জিতেন্দ্রিয় ও আহারত্যাগী না হইলে তাহা হওয়া দুষ্কর বুঝিয়া, আমি তান্ত্রিক কৌলিক গুরুর নিকটে এই জন্ম ব্যবস্থা লইয়া পঞ্চ-নিম্ববটিকা, বিষ-বটিকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া গোপনে খাইতে লাগিলাম। আহার মুষ্টিপরিমাণ দাঁড়াইল। নিজের অতিরিক্ত হঠকারিতার ফলে, কফাশ্রিত বায়ু এবং ভয়ানক পিত্তশূল বেদনা আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া পড়িল। এন্‌ট্রেন্স ক্লাশে পড়িতে পড়িতেই লেখাপড়া ছাড়িয়া চিকিৎসার্থে বাড়ী গেলাম। দেশের প্রসিদ্ধ কবিরাজদের ব্যবস্থামত বহু অর্থব্যয়ে ঔষধাদি প্রস্তুত করাইয়া, প্রায় দেড় বৎসর কাল চিকিৎসা হইল। কিন্তু রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইল বই কমিল না। আমার রোগের অবস্থা জানিয়া কবিরাজেরাও একবাক্যে বলিলেন 'রোগ যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আর অব্যাহতি নাই। নূতন ঔষধ পত্র করিলেও সাময়িক উপশম মাত্রই হইতে পারে।' চব্বিশ ঘণ্টা অবিচ্ছেদে একটানা বেদনা চলিতে লাগিল। সময়ে সময়ে একেবারে শয্যাগত হইতে লাগিলাম। আমার জীবনে হতাশ হইয়া দাদারা আমাকে হাওয়াপরিবর্ত্তনের জন্য, বৎসরাধিককাল মুঙ্গের ও ভাগলপুরে রাখিলেন। উপকার কিছুই হইল না। বরং রোগ বাড়িতে লাগিল। আগুনের হল্‌কার মত একটানা বেদনার যন্ত্রণা, শেষরাত্রি হইতে আবার নিদ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া, একেবারে নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। সাধনভজনব্যতীত আমার যদিও কোন কাজই ছিল না, এ সময়ে যন্ত্রণার আধিক্যে তাহাতে বাধা পড়িতে লাগিল। তখন 'এ জীবনে আর কিছুই হইবে না, বাঁচিয়া থাকা বৃথা' ভাবিয়া, আত্মহত্যা করিতে পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি হইতে লাগিল। ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনে আছেন জানিয়া, একবার মাত্র তাঁহাকে দর্শন করিয়া, যমুনায় ডুবিয়া মরিব, স্থিরসঙ্কল্প করিলাম। অমনি শ্রীবৃন্দাবনে চলিলাম।

শ্রীবৃন্দাবনে ঠাকুর কোথায় ছিলেন আমার পরিষ্কার জানা ছিল না। বেলা প্রায় একটার সময়ে শ্রীবৃন্দাবন ষ্টেশনে নামিতেই, একটি বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে বলিলেন—'তুমি গোঁসাইয়ের কাছে যাবে? চল, আমিও সেখানেই যাব।' আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। দাউজীর মন্দিরের সাম্‌নে গলিটির মুখে দাঁড়াইয়া, তিনি আমাকে একখানা বাড়ী দেখাইয়া বলিলেন—'যাও, ঐ কুঞ্জে গোঁসাই আছেন।' আমি বাড়ীর দরজায় পঁহুছিয়া দেখি গোঁসাই সেখানে দাঁড়ান, আমাকে দেখিয়াই খুব স্নেহের সহিত

বলিলেন—'এসেছ ? বেশ হ'য়েছে। চল, উপরে যাই।' এই বলিয়া আমাকে উপরে নিয়া গেলেন। একটু বিশ্রামের পর আমাকে বলিলেন—'আমরা অনেকক্ষণ হয় প্রসাদ পেয়েছি, তোমার জন্যও প্রসাদ রেখে দিয়েছি; যমুনায় যেয়ে স্নান ক'রে এসো।' আমি স্নান করিয়া আসিয়া প্রসাদ পাইলাম। ঠাকুর আমার থাকার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

প্রত্যূষে স্নান করিয়া আসিয়া নীরবে ঠাকুরের পাশে বসিয়া বেদনার যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম। ঠাকুরকে বা অন্য কাহাকেও আমার রোগের বিন্দুমাত্রও জানাইলাম না। তৃতীয় দিন বেলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময়ে ভাবাবেশে ঠাকুর মগ্ন আছেন—অকস্মাৎ দু তিন বার গা ঝাড়া দিয়া চমকিয়া আমার পানে চাহিয়া ছলছল চক্ষে বলিলেন—'উঃ, তুমি এত ক্লেশ পাচ্ছ! আচ্ছা, আর তোমায় ভুগ্‌তে হবে না।' ঠাকুর এই মাত্র বলিয়া আবার ভাবাবেশে ঢলিয়া পড়িলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম—'ঠাকুর একি বলিলেন?' ঐ দিন বেলা সাড়ে তিনটার সময়ে কিছুক্ষণ আমি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলাম। একটু পরে উঠিয়া দেখি বেদনা আমার আর নাই। ঠাকুরের সকাল বেলার কথা তখন ঐ চমকে পড়িয়া আমি একেবারে ভুলিয়া গেলাম। কেবল ভাবিতে লাগিলাম, 'বেদনা আমার কোথায় গেল?' মনের ব্যস্ততাবশতঃ দাউজীর মন্দিরে যাইয়া বসিয়া রহিলাম। যথার্থ ই বেদনা সারিয়া গেল কিনা পরিষ্কার বুঝিতে রাত্রিতে লঙ্কা টক ও অরহরের ডাল প্রচুর পরিমাণে খাইলাম। সমস্ত রাত্রি আরামে নিদ্রা হইল। আর বেদনা হইল না। সকালে যমুনায় স্নান করিয়া আসিয়া দেখি—ঠাকুর নিজ আসনে স্থিরভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, কিন্তু চেহারাটি একেবারে কাল হইয়া গিয়াছে।

ঠাকুরের মুখশ্রী দেখিয়া বুক যেন আমার ফাটিয়া গেল, হাতের বস্ত্র ছুড়িয়া ফেলিয়া চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেলাম। ঠাকুরের পা জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলাম 'আমার ভোগ নিয়া আপনি কাল হইয়া গেলেন? আমার রোগ আমাকেই দিন, আমিই ভুগিব।' ঠাকুর আমার হাত ছাড়াইয়া বলিলেন—'ওসব কিছু না, কার ভোগ কে নেয়? এখন গিয়ে স্থির হ'য়ে ব'সে নাম কর।' আমি আর কি করিব? বেদনার যন্ত্রণা অপেক্ষাও মনের জ্বালা আমার অধিক হইল। ইহার পর ঠাকুরের অবিচ্ছেদ-সঙ্গলাভ আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া কুমারব্রত চাহিলাম। ঠাকুর আমাকে সময়মত ব্রহ্মচর্য্য দিয়া বলিলেন—'দাদাদের ও মায়ের সেবা গিয়ে এখন কর; তাঁরা সন্তুষ্ট হ'য়ে অনুমতি দিলে আমার সঙ্গে থাক্‌তে পার্‌বে।' আমি কিছুকাল শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া বড় দাদা

ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সেবা করিতে ফয়জাবাদে গেলাম। দাদা আমার রোগশান্তির বৃত্তান্ত শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—'তোমার গুরু যাহা বলিয়াছেন—তাহাই কর। বাড়ী যাইয়া মা'র সেবা কর।' দাদার অনুমতিমতে বাড়ী গেলাম।

বাড়ী পঁহুছিতেই মা আমার শরীরের চমৎকার পরিবর্ত্তন দেখিয়া, বিস্মিত হইয়া বলিলেন—'তোর শরীর এরকম কিসে হ'লো?' ঠাকুরের কৃপা ও যে ভাবে একদিনেই আমার ঐ উৎকট রোগ সারিয়া গেল তাহা মাকে বলিলাম। মা শুনিয়া কান্দিয়া ফেলিলেন—আর আমাকে বলিলেন—'তুই তো বড় বোকা? এমন গুরু পেয়ে কি আর ছেড়ে আস্‌তে হয়?' আমি বলিলাম—'তোমার সেবার জন্যই ঠাকুর আমাকে পাঠাইয়া দিলেন।' বাড়ীতে থাকিয়া আমি মা'র সেবা আর কি করিব? প্রতিদিন সকালে বিকালে মাকে গীতা, রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাইতে লাগিলাম। শাক্ত ঘরে জন্ম হইলেও মাছ মাংসের গন্ধ কখনও সহ্য করিতে পারি নাই, এখন আবার, ব্রহ্মচর্য্য নেওয়াতে, স্বপাকের ব্যবস্থা হওয়ায় বেশ সুবিধাই হইয়াছে। মা-ঠাকুরুণের রান্নাটি আমিই করিয়া প্রত্যহ তাঁহার প্রসাদ পাইতে লাগিলাম। কয়েক মাস এই ভাবে চলিয়া গেল। মা আমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিয়া একদিন বলিলেন—'শরীর ভাল হ'য়েছে; এখন বিয়ে কর্, চাকরী কর্।' আমি বলিলাম 'তাহ'লেই আমার আবার সেই রোগ হবে।' মা বলিলেন—'তবে থাক্। শুধু ধর্ম্ম কর্ম্ম কর্‌তে হ'লে, তা কি আর বাড়ীতে থেকে হবে?' আমি বলিলাম—'তুমি যদি আমাকে ধর্ম্মার্থে ঠাকুরের চরণে উৎসর্গ কর, তবেই তিনি আমাকে সঙ্গে রাখেন।' মা তখন আমার অভিপ্রায় বুঝিয়া ঠাকুরকে এই মর্ম্মে পত্র দিলেন—'আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রকে ধর্ম্মার্থে আপনার শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম। শ্রীমান্ যাহাতে জীবনে ধর্ম্ম লাভ করে, দয়া করিয়া আপনি তাহা করিবেন।' ইত্যাদি।—ঠাকুর, শ্রীবৃন্দাবনে মাতাঠাকুরাণীর পত্র পাইয়া, আমাকে কিছুদিন পরে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে যাইয়া থাকিতে লিখিলেন। ঠাকুর অবিলম্বে গেণ্ডারিয়া পঁহুছিবেন সংবাদ পাইয়া, তাঁহার প্রত্যাশায় বাড়ীতেই কিছুকাল রহিলাম। পরে একদিন অস্থির হইয়া গেণ্ডারিয়া উপস্থিত হইয়া দেখি, তৎপূর্ব্বদিনেই ঠাকুর ঐ আশ্রমে আসিয়াছেন। এই সময় হইতে আমার যে ডায়েরী চলিল, তাহারই এক বৎসরের সংগৃহীত অংশ 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ' নামে প্রকাশ করিলাম। ইহা আমার সম্পূর্ণ ডায়েরীর একটি ভাগমাত্র।

এই মুদ্রিত গ্রন্থে বর্ণশুদ্ধি ও ভাষাশুদ্ধি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত হইয়াছে মনে করিতে পারি না;

কিন্তু আশাকরি পাঠক মহাশয়েরা নিজগুণে অনায়াসে অশুদ্ধি সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন।

শ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী
২১৬নং সোনারপুরা, বাঙ্গালিটোলা, ৺কাশীধাম।

সূচীপত্র।

গেণ্ডারিয়া আশ্রম বৈশাখ মাস।

গেণ্ডারিয়া-আশ্রম ।

শ্রীশ্রীগুরবেনমঃ।

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ।

ঠাকুরের শ্রীবৃন্দাবন হইতে গেণ্ডারিয়া আগমন ও আশ্রমের তদানীন্তন অবস্থা।

শ্রীশ্রীগুরুদেব (প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়) ১২৯৬ সনের পৌষমাস হইতে শ্রীবৃন্দাবনধামে বৎসরাধিক কাল বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানে মাঠাকুরুণ (যোগমায়া দেবী) ১২৯৭ সনের ১০ই ফাল্গুন তারিখে দেহত্যাগ করেন। ইহার অব্যবহিত কাল পরেই ঠাকুর, তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী (শ্রীযুক্তা মুক্তকেশী দেবী), তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত যোগজীবন গোস্বামী, কন্যা কুতুবুড়ী এবং আমাদিগের অন্যান্য কয়েকটি গুরুভ্রাতাভগিনীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবৃন্দাবন হইতে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভমেলায় উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে যাইয়া তিনি অল্প কয়েক দিন মাত্র অবস্থান করেন এবং যোগজীবনের দ্বারা মাঠাকুরুণের অস্থি ব্রহ্মকুণ্ডে গঙ্গাগর্ভে সমাহিত করিয়া, ঢাকার দিকে গেণ্ডারিয়া যাত্রা করেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে ঠাকুর আমাকে জানাইয়াছিলেন, "শীঘ্রই আমি গেণ্ডারিয়া যাইতেছি। সুবিধা বোধ করিলে, এখন হইতেই তুমি সেখানে যাইয়া থাকিতে পার।" কোন্ দিন কোন্ সময়ে ঠাকুর গেণ্ডারিয়া আসিবেন, আমার কিছুই জানা ছিল না। আমি অতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত বাড়ীতে থাকিয়াই, ঠাকুরের ঢাকা আসিবার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আশ্চর্য্য এই যে, অকস্মাৎ ১৩ই চৈত্র, ঠাকুরের জন্য আমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমি অমনি এক মাসের মত আহারের সামগ্রী সংগ্রহ

করিয়া, ছোটদাদার (শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের) সঙ্গে ১৪ই চৈত্র গেণ্ডারিয়া আসিয়া পঁহুছিলাম। শুনিলাম, ঠাকুর গত কল্যই এখানে আসিয়াছেন।

প্রায় দুই বৎসর পরে, ঠাকুর ঢাকা পঁহুছিতেছেন, সর্ব্বত্রই এ কথা ইতিপূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং নানাস্থান হইতে গুরুভ্রাতাভগিনীগণ ঠাকুরের দর্শন-আকাঙ্খায় গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ঠাকুরের গেণ্ডারিয়া পঁহুছিবার পরদিন হইতেই, দীক্ষাস্রোত চলিয়াছে। চৈত্রমাসের বাকী কয়দিনে কত লোক যে ঠাকুরের নিকট হইতে দীক্ষালাভ করিলেন বলিতে পারি না। বরিশাল, ফরিদপুর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের গুরুভ্রাতাদিগের সমাগমে, এখন আশ্রমে আর স্থান সঙ্কুলন হইতেছে না। আশ্রমসংলগ্ন আমাদিগের সতীর্থ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত রাধারমণ গুহ, শশিবাবু ও সতীশবাবু প্রভৃতির বাড়ীও লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আশ্রমের দক্ষিণের চৌচালা ঘরে ঢালা বিছানা করিয়া এবং ঐ ঘরের দু'দিকের বারান্দায় চাটাই মাত্র বিছাইয়া, বহু অবস্থাপন্ন এবং সম্ভ্রান্ত গুরুভ্রাতৃগণ রাত্রি যাপন করিতেছেন। ঠাকুর পূবের ঘরে আসন করিয়াছেন। সেখানেও কয়েকজন গুরুভ্রাতা রাত্রিতে থাকেন। ছোটদাদা, কুঞ্জবিহারী গুহ, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও আমি কোথাও স্থান না পাইয়া অগত্যা ভাণ্ডার ঘরের এক কোণে কোনও মতে রাত্রি কাটাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছি।

রাত্রি শেষ হইতে না হইতেই, খোল করতাল বাজিয়া উঠে। গুরুভ্রাতারা সকলে মিলিত হইয়া, ভোর সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে তিন চারিজন গুরুভাই ঝাঁটা লইয়া সমস্ত আশ্রম ঝাড়ু দিতে থাকেন। কেহ কেহ গোবর জল লইয়া আমতলা, ঠাকুরের আসনকুটীর, আশ্রমের উঠান ও ঘরের চারিদিকের পিড়া ও বারান্দা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই লেপিয়া রাখেন। গুরুভ্রাতৃগণের মধ্যে অনেকেই আপন আপন রুচি-অনুযায়ী ঠাকুর-সেবার কোনও না কোনও কার্য্য লইয়া পরমানন্দে দিন কাটাইতেছেন। মহাসমারোহের পূজা বা মহোৎসবাদি ব্যাপারে দিনটি যে ভাবে আনন্দ উৎসাহে চলিয়া যায়, আমাদেরও সকলের সেইভাবে প্রতিদিন অতিবাহিত হইতেছে। কিন্তু ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শান্তিসুধা, কয়েকমাস পূর্ব্বে তাঁহার পুত্র (দাউজী) জন্মগ্রহণ করিবার সময় হইতেই অত্যন্ত পীড়িতা ছিলেন, এখন মাতৃবিয়োগ-সংবাদ পাইয়া, একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। দিদিমা কন্যা-বিয়োগে অতিশয় শোকাতুরা হইলেও, গুরুভগিনীদের সহিত সকাল বেলা এগারোটা পর্য্যন্ত আশ্রমস্থ সকলের

আহারের বন্দোবস্ত লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন। যোগজীবনের স্ত্রী পঞ্চাশ ষাটজন লোকের রান্না প্রতিদিন অবাধে দু'বেলা প্রফুল্লমনে সুচারুরূপে করিয়া যাইতেছেন দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইতেছি।

সকালে ৭টার সময়ে ঠাকুরের চা সেবা হয়, পরে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শিখগুরুদিগের উপদেশ ও ভজন প্রভৃতি-সম্বলিত "গ্রন্থসাহেব" প্রভৃতি পাঠ হইয়া থাকে। বেলা প্রায় এগারোটা পর্য্যন্ত ঠাকুরের ঘর লোকে পরিপূর্ণ থাকে। আহারের পরে মধ্যাহ্নে ঠাকুরের আসন আমতলায় লইয়া যাওয়া হয়। অপরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত ঠাকুর কাহারও সহিত বড় কথাবার্ত্তা বলেন না,—ধ্যানস্থই থাকেন। সুতরাং অধিকাংশ গুরুভ্রাতারাই এই সময়ে আপন আপন স্থানে যাইয়া বিশ্রাম করেন। নিয়ত একটী লোক ঠাকুরের নিকটে থাকা আবশ্যক বলিয়া, আমিই পাঁচটা পর্য্যন্ত ঠাকুরের কাছে বসিয়া থাকি। ১লা বৈশাখ (১২৯৮ সন) হইতে আহারান্তে ঠাকুর আমাকে প্রত্যহ তাঁহার নিকটে ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত পাঠ করিতে বলিয়াছেন। পাঠের সময়ে গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ আমতলায় উপস্থিত হইয়া থাকেন; কিন্তু পাঠান্তে সকলেই চলিয়া যান। সুতরাং অপরাহ্ণ পাঁচটা পর্য্যন্ত আমতলা প্রায় নির্জ্জনই থাকে। পাঁচটার পর ধীরে ধীরে আমতলা লোকে পরিপূর্ণ হয়। আমিও ঐ সময়ে ঠাকুরের আদেশানুযায়ী আমার আহারীয় প্রস্তুত করিবার জন্য চলিয়া আসি। পাঁচটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঠাকুর স্বচ্ছন্দভাবে সকলের সঙ্গে শাস্ত্র, সদাচার, ধর্ম্ম, সাধন প্রভৃতি বিষয়ে আলাপাদি করিয়া থাকেন; সন্ধ্যার কিঞ্চিৎকাল পরে সমস্ত গুরুভ্রাতারা একত্রিত হইয়া বহু খোল করতাল সংযোগে উচ্চ সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন। এই সংকীর্ত্তনের চিত্র প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। খোলকরতালের ধ্বনি, সংকীর্ত্তনের রবে মিলিত হইয়া, আশ্রমটীকে কাঁপাইয়া তোলে। মহাভাবের তরঙ্গ প্রবল বেগে ঘন ঘন উঠিয়া আশ্রমস্থ সকলকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল কি ভাবে যে চলিয়া যায়, কিছুই আমাদিগের লক্ষ্য থাকে না। সংকীর্ত্তনান্তে ঠাকুর, সন্দেশ, বাতাসা, পেঁড়া, বরফি প্রভৃতি মিষ্টান্ন, স্বয়ং নিবেদন করিয়া হরিরলুট দিয়া থাকেন। তৎপরে সকলে স্ব স্ব আবাসে চলিয়া গেলে, ঠাকুর আহারান্তে দুই এক ঘণ্টাকাল উপস্থিত শিষ্যগণের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া অবশিষ্ট রাত্রি প্রায় চারিটা পর্য্যন্ত একভাবে ধ্যানস্থ অবস্থায় কাটাইয়া দেন; অতঃপর অর্দ্ধঘণ্টাকাল বিশ্রাম করেন। আশ্রমস্থ সকলের এই ভাবে দিন রাত্রি অতিবাহিত হইতেছে।

বৈশাখ, ১২৯৮ সাল।

গঙ্গার প্রস্তর—গৌরীশঙ্কর।

৫ই বৈশাখ, শুক্রবার। আজ মহাভারত পাঠান্তে অপরাহ্ণে আমতলায় ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আছি, এমন সময়ে গুরুভগিনী শ্রীযুক্তা মনোহরা দিদি আসিয়া তাঁহার একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা ঠাকুরকে বলিলেন, শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। মা ঠাকুরুণের দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্ব্বে মনোহরা দিদি ৺ শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। গত চৈত্রমাসের প্রারম্ভে ঠাকুর যখন হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ মেলায় যান, অন্যান্য গুরুভ্রাতা-ভগিনীদিগের সঙ্গে মনোহরা দিদিও তথায় গিয়াছিলেন। হরিদ্বারে গঙ্গাগর্ভে ও বালি চড়ায় সুন্দর সুন্দর অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড দেখা যায়। সুগোল শুভ্রবর্ণ প্রস্তরকঙ্করে লাল, নীল, সবুজ ও কাল রংয়ের চক্র, মালার মত অতি পরিপাটীরূপে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। স্নানের সময়ে মনোহরা দিদি এক দিন নানা রংয়ের চক্রবিশিষ্ট একখানা গোলাকার শিলা তুলিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি গেণ্ডারিয়াতে আসিয়া, ঐ প্রস্তরখণ্ড শয়নের ঘরে টেবিলের উপরে কাগজ চাপা দিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু সম্প্রতি ঐ প্রস্তরখণ্ড লইয়া বিষম বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। ঠাকুরের নিকটে আসিয়া তিনি বলিলেন, "হরিদ্বার হইতে আসিবার সময়ে সুন্দর একখানা সাদা সুগোল চক্রধারী পাথর আনিয়াছিলাম, এত দিন উহা টেবিলের উপরে কাগজ চাপা দিয়া রাখিয়াছি, জানি না, কেন উহাতে সময়ে সময়ে মহাদেব ও ভগবতী দেখিতে পাই। গত রাত্রে আবার শুনিলাম, প্রস্তরখানি আমাকে বলিতেছেন, 'গঙ্গাতে বড় আনন্দে ছিলাম, এ অবস্থায় আমাকে এখানে আনিয়া রাখিলে কেন? আমার ক্লেশ হইতেছে'—এরূপ দেখি শুনি কেন, বুঝিতেছি না।" ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন:—"হরিদ্বারের গঙ্গাগর্ভের প্রস্তরকে গৌরীশঙ্কর বলে। মহাদেব ও পার্ব্বতী উহাতে অবস্থান করেন; পূজা না ক'রে এ শিলা রাখ্‌তে নাই।"

দিদি প্রস্তরখণ্ড আনিয়া আমাকে দিয়া বসিলেন, "ভাই, এই পাথর আমি আর রাখ্‌তে পারব না, তুমি এটি নিয়ে যা হয় কর।" আমি প্রস্তরখণ্ড রাখিয়া দিলাম। বাড়ীতে গোপাল ঠাকুর আছেন, এই প্রস্তরখণ্ডও সেই সঙ্গেই পূজিত হইবেন।

গোবর্দ্ধনের শিলা—গিরিধারী গোপাল।

হরিদ্বারের গঙ্গাগর্ভের প্রস্তরে মহাদেব ও ভগবতীর প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা শুনিয়া, ৺শ্রীবৃন্দাবনধামের আর একটি আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় মনে হইল। ঠাকুরের সঙ্গে যখন আমরা শ্রীবৃন্দাবনে ছিলাম, তখন একদিন গুরুভ্রাতা স্বামিজী * গোবর্দ্ধনে গিয়াছিলেন। ইনি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গিরিধারী গোপালরূপে ঐ পাহাড়ের প্রত্যেক খণ্ড শিলাতেই জাগ্রতরূপে অবস্থান করিতেছেন। তাই তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিবার সময়ে বারো খণ্ড ছোট ছোট সুন্দর শিলা তাঁহার ঝোলাতে ভরিয়া আনিয়াছিলেন। ব্রজবাসীরা গোবর্দ্ধনের শিলা অন্যত্র নিতে দেন না, এই জন্য স্বামিজী শিলা কয়টি গোপনে সংগ্রহ করিয়া ঝোলার ভিতরে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। ঠাকুরের পার্শ্বের ঘরেই গুরুভ্রাতা শ্রীধরের শয়নঘর ছিল; স্বামিজীও শ্রীধরেরই এক পাশে আসন রাখিয়াছিলেন। তিনি প্রায় সর্ব্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইতেন, ঝোলা-ঝুলি সর্ব্বদা ঐ আসনের উপরেই পড়িয়া থাকিত। একদিন স্বামিজী খুব প্রত্যুষেই কুঞ্জ হইতে পরিক্রমায় বাহির হইলেন। শ্রীধর মধ্যাহ্নে আহারান্তে আপন আসনে বসিয়া আছেন, হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, স্বামিজীর আসনের উপরে কয়েকটি বালক খেলা করিতেছেন। তাঁহারা শ্রীধরকে বলিতে লাগিলেন, "গোবর্দ্ধনে আমরা বেশ আনন্দে ছিলাম, আমাদের এখানে এনে কেন অনর্থক কষ্ট দিচ্ছ? স্নান করাও না, খাবার দেও না, এ ভাবে আর কতকাল আমাদের এখানে রাখ্‌বে?" এই কথা কয়টি বলিয়া বালকগণ অকস্মাৎ অদৃশ্য হইলেন। শ্রীধর জাগ্রত অবস্থায় এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া চম-

* [illegible]ী—[illegible]রিমোহন চৌধুরী—বাড়ী ধামরাই, জেলা ঢাকা। ইনি বি, এ, পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াই কিছুকাল ঢাকা গবর্ণমেণ্ট কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্য করিয়াছিলেন। ছেলেবেলা হইতে ইঁহার ধর্ম্মোন্মত্ততা ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। অল্প বয়স হইতে বহুচেষ্টা করিয়াও প্রকৃতধর্ম্ম,জীবনে লাভ করিতে পারিলেন না দেখিয়া,তিনি একবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। স্বামিজীর মুখে শুনিয়াছি,ঐ সময়ে তিনি মানসিক ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন নিভৃতকালে অতি নির্জ্জন স্থলে আত্মহত্যার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই অকস্মাৎ ঠাকুর উঁহাকে দর্শন দিয়া আশ্বাসিত করিলেন। ঠাকুরের নিকটে দীক্ষা গ্রহণের কিছুকাল পরেই, স্বামিজী সরকারী চাকরিটী বিসর্জ্জন দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। অতঃপর ঠাকুরের নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া উদাস ভাবে নানা স্থান পর্য্যটন করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবনধামে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি বহুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ইঁহার অসাধারণ বৈরাগ্যপূর্ণ জীবনের অদ্ভুত ঘটনাসকল যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা আমার পূর্ব্ব তিন বৎসরের ডায়েরীতে বিবৃত রহিয়াছে। ঠাকুরের ইচ্ছা হইলে প্রকাশিত হইবে।

কিয়া গেলেন। কারণ কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ ঠাকুরের নিকটে আসিয়া সমস্ত বিবরণ বলিলেন।

ঠাকুর শ্রীধরকে বলিলেন ঃ—"**খাবার কিছু মিষ্টি, আর পরিষ্কার এক ঘটী জল এক্ষনি এনে গিরিধারী গোপালদের নিবেদন ক'রে দাও। হরিমোহনের ঝোলার ভিতরে গোবর্দ্ধনের শিলা আছেন, অনুসন্ধান কর্‌লেই দেখ্‌তে পাবে।**"

শ্রীধর তখনই স্বামিজীর ঝোলা খুলিয়া বারোখণ্ড শিলা দেখিয়া অবাক হইলেন; অবিলম্বে খাবার আনিয়া গিরিধারী গোপালদিগকে নিবেদন করিয়া দিলেন। স্বামিজী সন্ধ্যার সময় কুঞ্জে আসিলে, ঠাকুর ঘটনাটীর উল্লেখ করিয়া, তাঁহাকে বলিলেন— "**রীতিমত সেবা কর্‌তে না পার্‌লে, এ সব শিলা আন্‌তে নাই; কালই ভোরে গোবর্দ্ধনে গিয়ে রেখে এসো।**"

স্বামিজীও পরদিন প্রত্যুষেই ঝোলা লইয়া গোবর্দ্ধনে চলিয়া গেলেন। শিলার মাহাত্ম্য ভাবিয়া তিনি সমস্ত রাস্তা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিলেন। সমস্ত গুলি শিলা কিছুতেই তিনি রাখিয়া আসিতে পারিলেন না। দশখণ্ড গোবর্দ্ধনে রাখিয়া, অবশিষ্ট দুই খণ্ড কণ্ঠে ধারণ করিবার জন্য সঙ্গে লইয়া আসিলেন এবং কিছুকাল উহাদের সেবা পূজা করিয়া, একখণ্ড সতীশকে দিলেন। সতীশ প্রতিদিন খুব শ্রদ্ধার সহিত উহা পূজা করিয়া আসিতেছেন। স্বামিজী অবশিষ্ট শিলাখণ্ড সোণার মাদুলীতে ভরিয়া, দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিতেছেন এবং জল ও তুলসীর দ্বারা প্রত্যহ তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন।

* সতীশের প্রতি মায়াচক্রীর উৎপীড়ন।

৭ই বৈশাখ, ১৯শে এপ্রিল, রবিবার।

আহারান্তে ঠাকুর আমতলায় বসিলে, আমিও তাঁহার নিকট আর আর দিনের মত দুই ঘণ্টাকাল মহাভারত পাঠ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরেই শ্রীধর ও সতীশ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

* সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় :—বাড়ী ঢাকা, বাঘিয়াগ্রামে :—ইঁহার সাংসারিক অবস্থা তেমন সচ্ছল না থাকায়, পাঠ্যাবস্থায় অনেক ক্লেশ পাইয়াছিলেন। নানা দুরবস্থা ভোগ করিয়াও নিজ অধ্যবসায়-গুণে ইনি এণ্ট্রেন্স্‌ ও এফ্‌, এ, পরীক্ষায় গবর্ণমেণ্ট শ্রেষ্ঠবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আকস্মিক কোন কারণে পরীক্ষা দিতে বিঘ্ন ঘটিল। ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার সুন্দর দখল ছিল। পাঠ্যাবস্থার প্রারম্ভেই সতীশের ধর্ম্মলাভের আকাঙ্ক্ষা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। উপাসনাশীল, নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মদের সঙ্গলাভ করিয়া ইঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগ জন্মে, এবং উপবীত পরিত্যাগ করিয়া

ঠাকুর ধ্যানমগ্ন ছিলেন ; একটু পরে ধ্যানভঙ্গ হইলে, উহাদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা আরম্ভ করিলেন।

ঠাকুর সতীশকে বলিলেন ঃ—"সতীশ, শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার সময় রাস্তায় নাকি তুমি মায়াচক্র দেখেছিলে ? ঘটনাটি তোমার মুখে শুনি নাই, বল না শুনি।"

ঠাকুর কোন কথা সতীশকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই, সতীশ আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়েন। ঠাকুরের আদেশ পাইয়া, সতীশ আজ খুব উৎসাহের সহিত হাত মুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন,—"পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া আমার মন অতিশয় খারাপ হইয়া গেল। আমি চারিদিক যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। সকলই অসার ভাবিয়া তখনই চাকরিটী ছাড়িয়া দিলাম ও পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলাম। আপনি শ্রীবৃন্দা-বনে আছেন জানিয়া, আপনার সঙ্গে থাকিব, সংকল্প করিয়া চলিলাম। আমি সমস্তিপুর হইতে রওয়ানা হইয়া পথে এলাহাবাদের নিকটে একস্থানে অনেকগুলি সাধু সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলাম। তাদের সঙ্গে কিছু সময় আমার থাকিতে ইচ্ছা হইল। একটি খুব তেজস্বী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া, তাঁর নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে খুব আদর যত্ন করিয়া বসাইলেন এবং আলাপাদি করিয়া আমার সমস্ত অবস্থা জানিয়া নিলেন। ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়াও উদাসভাবে বাহির হইয়াছি জানিয়া, সাধু বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। সাধু আমাকে বলিলেন,—"তোম্‌রা মন হোয় তো কয় রোজ হিঁহাই রহো।" রাস্তার

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এ সময়ে সতীশের সত্যনিষ্ঠা, সরলতা, উপাসনার ভাব, ও অসাধারণ উৎসাহ উদ্যম দেখিয়া, অনেক সময় আমরা অবাক হইয়া গিয়াছি। ইনি যাহা সত্য বুঝিতেন, লঘু গুরু অপেক্ষা না করিয়া এবং কোনও দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, তাহাই বলিতেন ও করিতেন। এজন্য আমরা উঁহাকে পাগ্‌লা সতীশ বলিয়া ডাকিতাম। ১২৯৪ সনে অগ্রহায়ণ মাসে ইনি ঠাকুরের নিকটে দীক্ষালাভ করেন। ঠাকুরের সঙ্গে ইনি পুরী গিয়াছিলেন।

অচিরে ঠাকুর কলেবর পরিত্যাগ করিবেন জানিতে পারিয়া, সতীশ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চরণে করযোড়ে অশ্রুপূর্ণনয়নে প্রার্থনা করিলেন, যেন তৎপূর্ব্বেই উঁহার দেহত্যাগ ঘটে। ঐ সময়ে ঠাকুরের নিকটেও নিজের প্রবল আকাঙ্ক্ষা অতি কাতরপ্রাণে পুনঃপুনঃ নিবেদন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর একদিন সতীশকে বলিলেন,ঃ—"জগন্নাথদেব তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন।" ইহার কয়েক দিন পরেই, মাত্র দুই দিনের জ্বর ভোগ করিয়া, ৭ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজার দিনে, রাত্রি প্রায় ১॥০ টার সময়, সতীশ নিজ অভিলষিত শ্রীধাম প্রাপ্ত হইলেন। ইঁহার জীবনের অতি অদ্ভুত ঘটনা-সমূহ, আমার পূর্ব্বাপর ডায়েরীতে রহিয়াছে। ঠাকুরের কৃপা হইলে, ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

ক্লেশে শরীর আমার খুব কাতর হইয়া পড়িয়াছিল; সাধুও আমাকে খুব আদর যত্ন করিলেন। ইহা ভগবানেরই কৃপা ভাবিয়া, দুই চার দিন সাধুর নিকটেই থাকিব স্থির করিলাম। কয়েকদিন থাকিয়া আমি একদিন শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। তখন সাধু আমাকে বলিলেন, "আরে, কাঁহা যাওগে? হামারা সাথ্ ই রহো, থোড়া রোজ্ মে সিদ্ধ্ বন্ যাওগে।" আমি সাধুকে বলিলাম, "মহারাজ, আপ্ সিদ্ধ্ হ্যাঁয়?" সাধু খুব তেজের সহিত আমাকে বলিলেন, "তব্ ক্যা! তোম্ হাম্‌কো ক্যা সম্‌ঝা?" আমি বলিলাম, "আচ্ছা, আপ্ হাম্‌কো কুছ্ সিদ্ধাই দেখ্‌লানে সেক্‌তে?" সাধু বলিলেন "হাঁ, দেখোগে?" এই বলিয়া সাধু আমার কপালে তাঁর কয়েকটী অঙ্গুলি স্পর্শ করাইয়া, হাত ঘুরাইতে ঘুরাইতে তিনটী তুড়ি দিয়া বলিলেন, "আব্ মায়াচক্র দেখো।" ঐ সময়ে আমি কেমন যেন হইয়া গেলাম; আমার এক অদ্ভুত অবস্থা হইল; আমি এক অলৌকিক দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম,—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ সহিত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চক্রাকারে ঘুরিতেছে, শত শত গ্রহ উপগ্রহের উৎপত্তি হইতেছে,—তাহারা বৃদ্ধি পাইতেছে, আবার ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, অসংখ্য জীব জন্তু মায়াচক্রে পড়িয়া স্বর্গে যাইতেছে, আনন্দ করিতেছে, আবার ক্রমে ক্রমে তাহারাই ঘুরিতে ঘুরিতে শত শত ভীষণ নরককুণ্ডে আসিয়া পড়িতেছে;—চীৎকার করিতেছে, দগ্ধ হইতেছে। তিন দিন তিন রাত্রি এই মায়াচক্রে কত কি যে দেখিলাম, বলিতে পারি না। এই সমস্ত দেখিয়া কখনও বা আনন্দে মুগ্ধ হইয়াছি, কখনও বা ভয়ে জড়সড় হইয়াছি। যতক্ষণ মায়াচক্র দেখিলাম, ততক্ষণ ইষ্টমন্ত্র একবারের জন্যও আমার স্মরণ হয় নাই, কিন্তু অকস্মাৎ চতুর্থ দিনে যেমনই আমার ইষ্টনাম মনে পড়িল, মায়াচক্র অমনি অদৃশ্য হইয়া গেল। এই অদ্ভুত ঘটনায় সাধুকে আমি একটী অসামান্য সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া স্থির করিলাম, এবং সন্ন্যাসীর অনুগ্রহ হইলে আমার বিশেষ কল্যাণ হইবে মনে করিয়া, তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলাম। তিনিও আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাঁহারই সঙ্গে থাকিতে বারংবার বলিতে লাগিলেন। ইচ্ছামাত্রেই সন্ন্যাসী আমাকে অনায়াসে সিদ্ধ করিয়া দিতে পারেন, এই বিশ্বাসে আমি তাঁহার নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কয়েকদিন সেখানেই রহিলাম।

একদিন সকালে সন্ন্যাসী আমাকে বলিলেন,—"চলো, হিঁয়া আউর নেহি রহেঙ্গে।" বলিবা মাত্র আমিও সন্ন্যাসীর সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। সন্ন্যাসী নিজের আসন গুটাইয়া, অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে প্রকাণ্ড একটী বোঝা সাজাইয়া, আমার ঘাড়ে তুলিয়া দিয়া চলিলেন। আমিও তাহা লইয়া সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। কতকক্ষণ পরে

আমরা একটী প্রকাণ্ড ময়দানের নিকটে উপস্থিত হইলাম। ময়দানটি এত বড় যে, তার অপর পার ধূ ধূ দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ন্যাসী বলিলেন যে, ময়দানটি পার হইয়া যাইতে হইবে। বেলা তখন প্রায় দশটা, সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ময়দানের উপর দিয়া চলিলাম। সঙ্গে আমাদের আর একটী লোকও নাই, ময়দানও জনমানবশূন্য, ধূ ধূ করিতেছে। সন্ন্যাসী খুব দ্রুত বেগে চলিতে লাগিলেন। বিষম ভারী বোঝা ঘাড়ে লইয়া ভয়ঙ্কর রৌদ্রে আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলাম। দুর্ব্বল শরীরে ঐরূপ পরিশ্রমে আমি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। সন্ন্যাসীকে একটু ধীরে ধীরে চলিতে বলায়, তিনি বিরক্ত হইয়া খুব কর্কশস্বরে বলিলেন,—"আরে চল্"। আমি তখন ভাবিলাম, এ আবার কেমন সাধু! ক্লেশে আমার প্রাণ যায়, একটু দয়া হতেছে না। আবার ভাবিলাম,—ইনি তো সিদ্ধ পুরুষ। বোধ হয় আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন। ইহা ভাবিয়া মনে উৎসাহ আসিল, কিছুক্ষণ আবার খুব চলিলাম, পরে একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। তখন বোঝাটি কত ভারী, তাহা স্মরণ করাইয়া দিতে সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মহারাজ, যব্ হাম্ নেহি থে তব্ কোন্ এত্না বোঝা লে যাতে রহে?" সাধু বলিলেন—"আরে হামারা ভূত সিদ্ধ্ হ্যায়, হামারা সব্ চিজ্ ওহি লে যাতে।" সাধুর কথা শুনিয়া আমার মাথা গরম হইল, বিষম রাগও হইল, অমনি মাথার বোঝাটি দুড়ুম্ করিয়া ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া বলিলাম, "শালা, ভূতের বোঝা আমার ঘাড়ে?" সাধুর অনেক জিনিস পত্র ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। সাধু দেখিয়া লাফাইয়া উঠিলেন এবং কুৎসিত গালি দিতে দিতে চিম্‌টা তুলিয়া আমাকে মারিতে দৌড়িয়া আসিলেন। আমার তখন আবার মনে হইল, ইনিতো মহাপুরুষ, ইঁহার প্রহারে আমার কল্যাণই হইবে। সুতরাং না দৌড়াইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সাধুও প্রকাণ্ড লোহার চিম্‌টাদ্বারা সজোরে আমাকে পটাপট্ আঘাত করিতে লাগিলেন। আমার তখন মনে হইতেছিল, ভিতরে আমার বিষম রিপুর উত্তেজনা, সাধু দয়া করিয়া সেই রিপুগুলিকেই তাড়াইয়া দিতেছেন; সুতরাং সাধু যেমন পটাপট্ আঘাত করিতে লাগিলেন, আমিও তেমনি এক, দুই, তিন, চার, করিয়া গণিতে লাগিলাম। ক্রমে ছয়টী ঘা মারিয়া সাধু যখন সপ্তম ঘা আমাকে হাঁকিলেন, তখন আমি, "দূর শালা! রিপুতো ছয়টা," এই বলিয়া দৌড় মারিলাম। সাধু গালি শুনিয়া আরও রাগিয়া গেলেন; চিম্‌টা তুলিয়া বিষম যমদূতের মত আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। এবার আমাকে পাইলে সাধু খুনই করিবেন নিশ্চয় বুঝিয়া, আমি প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিলাম। সাধু আমাকে ধরে ধরে অবস্থা দেখিয়া প্রাণ বাঁচাইবার

অন্য উপায় না পাইয়া, সম্মুখে একটা জঙ্গলাকীর্ণ পুরাতন কূপ দেখিয়া তাহাতেই লাফাইয়া পড়িলাম। সাধু আর কি করিবেন! চলিয়া গেলেন। কূপে জল খুব অল্প ছিল, কিন্তু উঠিবার কোন উপায় করিতে না পারিয়া উহার মধ্যেই পড়িয়া রহিলাম। চিম্‌টার আঘাতে নানাস্থান ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। তখন এত কষ্ট হইতেছিল যে, মনে হ'লো বুঝি মারা পড়িলাম। এবার নিশ্চয়ই মৃত্যু ভাবিয়া, একান্ত মনে ঠাকুরের নাম করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার কিছুকাল পূর্ব্বে, কয়েকটী রাখাল ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। উহারা কাপড়ে কাপড় বান্ধিয়া নীচে নামিয়া অনেক চেষ্টায় আমাকে উপরে তুলিল। আমার চলিবার সামর্থ্য ছিল না বুঝিয়া, সকলে আমাকে কান্ধে তুলিয়া ময়দানের একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচে রাখিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে তাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আমার খবর তাহারা কোথায় পাইল? এক জন বলিল, "সাধুর তাড়াতে যখন তুমি দৌড়িয়া কুয়াতে লাফাইয়া পড়িলে, তখনই আমরা বহু দূর হ'তে দেখিতে পাইয়াছিলাম।" এই বলিয়া উহারা চলিয়া গেল। আমি গাছতলায় পড়িয়া রহিলাম। সাধুর প্রহারে শরীর আমার এত খারাপ হইয়াছিল যে, বিষম জ্বর হইল। দুইদিন পর্য্যন্ত আমার পাশ ফিরিবার সামর্থ্য ছিল না। সমস্ত শরীরে ভয়ানক বেদনা হইয়াছিল। তৃতীয় দিনে ক্ষুধা পিপাসায় ও শরীরের যন্ত্রণায় এত অসহ্য ক্লেশ হইতে লাগিল যে, মনে হইল, এবার বুঝি প্রাণই যায়। মাথা ঘুরিতে লাগিল, চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। কি করিব স্থির করিতে না পারিয়া, সম্মুখের গাছটিকেই জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলাম,— "হে বৃক্ষ, আমার প্রাণ যায়, এ সময়ে একটি ফল দিয়া আমাকে বাঁচাও।" এই প্রার্থনা করিয়া বারংবার বৃক্ষটিকে নমস্কার করিতে লাগিলাম। ভগবানের কি অদ্ভুত দয়া! হঠাৎ ঐ সময়ে টপ্ করিয়া একটী ফল আমার সম্মুখে পড়িল। ফলটি লাল, গোল, শ্রীফলের মত বড়, দেখিতে ঠিক মাকাল ফলের ন্যায়। আমি উহা পাইয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। একটু স্থির হইয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া উহা খাইলাম। ঐরূপ ঠাণ্ডা সুমিষ্ট ফল, জীবনে আর কখনও আমি খাই নাই। ফলটি খাওয়া মাত্র পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে, আমার শরীরের সমস্ত গ্লানি দূর হইল। শরীরটি নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ঐ সময়ে ফলটি কোথা হইতে আসিল অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। আমি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, একটী ফল বা ফুলও বৃক্ষে নাই। গাছটি ঝাপ্‌রা, বট গাছের মত। ফলটী খাইয়া এত সুস্থ হইলাম যে, অনায়াসে তিন ক্রোশ পথ চলিয়া একটী গ্রামে পহুঁ-

ছিলাম, কোন কষ্টই আমার বোধ হইল না। তার পর সেই সাধুকে আর আমি দেখিতে পাই নাই। ঠাকুর বলিলেন ঃ—"তাকে আর দেখ্‌বে কি! সে ঐ দিনেই সমস্ত হারায়েছে। তার সিদ্ধি-শুদ্ধি সমস্ত ছুটে গেছে, এখন পাগলের মত সে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে, দিন রাত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে, এখন আর তার কিছুই নাই, সমস্ত নষ্ট হ'য়ে গেছে।"

এ সব শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সিদ্ধ হ'য়েও, মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় নাকি?" ঠাকুর বলিলেন ঃ—"তা হয় না? সিদ্ধ হলেই কি সে ধার্ম্মিক হলো নাকি? সিদ্ধ ব'ল্‌তে তোমরা কি মনে কর? ভূতসিদ্ধ, প্রেতসিদ্ধ, ঐশ্বর্য্যসিদ্ধ, সিদ্ধ তো কতই আছে! ধর্ম্মের সহিত কোন প্রকার সংস্রব না রেখেও, লোকে কত বিষয়ে সিদ্ধ হচ্ছে। সিদ্ধ হ'লেই সে ধার্ম্মিক হ'বে, ইহা কখনও মনে ক'রো না। আজ-কাল সিদ্ধ লোকের অভাব নাই।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"ভূতপ্রেতসিদ্ধ লোকদিগের মধ্যে ধার্ম্মিক লোক নাই কি?" ঠাকুর ঃ—"এ সব সিদ্ধদের যথার্থ ধর্ম্মলাভ হয় না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"যাঁহারা ভূতপ্রেতসিদ্ধ, তাঁহারা কি দেবদেবীর রূপও দর্শন করাইতে পারেন?" ঠাকুর ঃ—"সকলেই যে পারেন তা নয়, তবে কেহ কেহ পারেন। এবার শ্রীবৃন্দাবনে একটী সাধু এসেছিলেন, তিনি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করাতে পার্‌তেন। তিনি ভাল লোক ছিলেন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"সে কি রকম বিষ্ণুমূর্ত্তি?"

প্রেতের বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণ—তৎসম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর।

ঠাকুর ঃ—"একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে তিনি আমাকে বল্লেন, 'কাল সকালে একা আপনি আসবেন, আপনাকে বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করাবো।' আমি পর-দিন প্রত্যুষে সাধুর কাছে গেলাম, তিনি আমাকে বস্‌তে দিয়ে সম্মুখের ঘরে দৃষ্টি রাখ্‌তে বল্লেন। আমি সেই ঘরের দিকে দৃষ্টি রেখে ব'সে রইলাম। সাধু আমার কাছে ব'সে জপ কর্‌তে লাগ্‌লেন। কিছুক্ষণ পরেই দেখি, সুন্দর পরি-

ক্কার চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। কিন্তু বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন হ'লেও তেমন একটা ভাব ভক্তির উদয় হ'লো না দেখে, সন্দেহ হলো। আমি বিশেষরূপে লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, শ্রীবৎসচিহ্ন বা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মাদি ওতে কিছুই নাই। আমি একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে নাম করতে লাগ্‌লাম। তখন ঐ মূর্ত্তি থরথর কাঁপতে লাগ্‌লো এবং বাবাজীকে বল্লে, 'তুই আমাকে কার কাছে এনেছিস্, আমি যে টিক্‌তে পারি না ;' এই ব'লে অল্পক্ষণের মধ্যেই মাটিতে প'ড়ে গিয়ে চিঁ চিঁ ক'রে চীৎকার ক'র্‌তে লাগ্‌লো। সাধু তখন অত্যন্ত অস্থির হ'য়ে বল্লেন,—'ছোড়্ দিজিয়ে মহারাজ। ছোড়্ দিজিয়ে।' আমি বল্লাম—"আমি তো ধ'রে রাখি নি ?" সাধু বল্লেন, 'আপ্ যো নাম করতে হ্যায়, ওহিসে বান্ধা গিয়া।' ঐ সময় দেখ্‌লাম বিষ্ণুমূর্ত্তি আর নাই, বিকটাকার এক প্রেত মাটিতে প'ড়ে ছট্‌ফট্ করতেছে। আমি তখন ঐ সাধুকে খুব ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—'তোমারা কাণমে বিষ্ঠা কাঁহে রাখা হ্যায় ? তোম্ প্রেতসিদ্ধ হো ?' সাধু বলিলেন,—'হাঁ মহারাজ! আপ্ ভগবদ্ভক্ত হ্যায়, হামারা মালুম নেহি থে। হামারা প্রেত ভগবদ্ভক্তকী সাম্‌নেমে ঠাহার্‌নে নেহি সেক্‌তে।' আমি তাকে বল্লাম—"বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখাও ব'লে লোকের নিকট হ'তে প্রতারণা ক'রে তুমি টাকা পয়সা আদায় কর কেন ?' সাধু বল্লেন,—'আপনি অনুসন্ধান ক'র্‌লে জান্‌তে পারবেন যে, সকলকে আমি এ মূর্ত্তি দেখাই না। যে সকল লোকের অর্থ মদ, বেশ্যা ও নানাপ্রকার বিলাসিতায় নষ্ট হয়, এই মূর্ত্তি দেখা'য়ে কেবল তাদের নিকট হ'তে প্রচুর অর্থ আদায় ক'রে থাকি ; কিন্তু ঐ অর্থ হ'তে একটী পয়সাও আমি নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করি না। আমার যাহা কিছু আবশ্যক, ভিক্ষা দ্বারাই সংগ্রহ করি। যে সকল স্থানে জলাভাব, ঐ অর্থ দ্বারা সেখানে পুকুর বা ইন্দারা কাটা'য়ে দিই, দুর্গমস্থলে রাস্তা প্রস্তুত করাই ও দুঃখী দরিদ্রদের যথা-সাধ্য সাহায্য করি। আপনি আর একে কষ্ট দেবেন না, ছেড়ে দিন্।' আমি তখন চ'লে এলাম। আস্‌বার সময় সাঁধু খুব কাতর হ'য়ে আমাকে বল্লেন, 'যতদিন আপনি শ্রীবৃন্দাবনে থাক্‌বেন কাহাকেও আমার প্রেতসিদ্ধির

কথা বল্‌বেন না।' সাধুর কথামত যত কাল শ্রীবৃন্দাবনে ছিলাম কাকেও এ বিষয় বলি নাই, আজই তোমাদের নিকট বল্লাম। এই সাধু ভাল লোক ছিলেন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—ভূত প্রেতও যখন বিষ্ণুমূর্ত্তি বা দেব-দেবীর রূপ ধারণ করিয়া দর্শন দিতে পারে, তখন প্রকৃতরূপ এবং কপটরূপ বুঝিতে পারিব কি উপায়ে?

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"ঐ রূপের প্রতি দৃষ্টি স্থির রেখে, খুব তেজের সহিত নাম ক'র্‌তে থাক্‌লেই, কপট রূপ কখনও টিঁক্‌বে না, অদৃশ্য হ'য়ে যাবে। যথার্থ কোনও দেব-দেবীর দর্শনমাত্রেই ঐ দেব দেবীর ভাব প্রাণে উদয় হবে। নাম কর্‌তে কর্‌তে ঐ রূপটি আরো উজ্জ্বল ও পরিষ্কার হবে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—উজ্জ্বল পরিষ্কাররূপ তো প্রথম প্রথম প্রেতেরও দর্শন হয়েছিল, বলিলেন। যথার্থ রূপ ও কপট রূপের আকৃতিতে কি কোন রূপ বৈলক্ষণ্য থাকে না?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"হাঁ, তাও থাকে। ভূত প্রেতাদি দেব-দেবীর আকার ধারণ ক'রতে পারলেও, ঐ সকল দেব দেবীর চিহ্ন ধারণ করতে পারে না। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এ সকল যেমন বিষ্ণুর চিহ্ন, সেইরূপ সকল দেব-দেবীরই বিশেষ বিশেষ চিহ্ন আছে। যখনই যে দেব-দেবী দর্শন হবে লক্ষণগুলি তখনই মিলায়ে নিতে হয়। ঐ সময় খুব নাম ক'র্‌তে হয়, নাম ক'র্‌লে সমস্তই ধরা পড়ে। সতীশ নাম না ক'রেই তো গোলে প'ড়েছিল। নাম ক'র্‌তেই, মায়াচক্র অদৃশ্য হ'লো, শুন্‌লে তো?"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—শঙ্খ, চক্র বা এরূপ কোন বিশেষ চিহ্নতো সদ্‌গুরুর নাই; সুতরাং ভূত প্রেত সদ্‌গুরুর রূপ ধরিয়া আসিলে, কি প্রকারে তাহা বুঝিতে পারিব?

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"ভূত প্রেত কি, দেব দেবী ঋষি মুনিরাও সদ্‌গুরুর রূপ ধারণ কর্‌তে পারেন না। সদ্‌গুরুর রূপ দর্শন হ'লে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ক'রো না।"

গৈরিক ত্যাগ করিতে বলায়, ঠাকুরের সহিত সতীশের ঝগড়া।

১০ই বৈশাখ, ২৩শে এপ্রিল, বুধবার।

সতীশ মায়াচক্রীর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া অচিরে শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সে সময়ে পাগ্‌লা সতীশের সঙ্গে ঠাকুরের যেরূপ কথা-বার্ত্তা হইয়াছিল, আজ ঠাকুর তাহা উঠাইয়া শ্রীধরের সঙ্গে

আমোদ করিতে লাগিলেন। পরিধানে ছেঁড়া গৈরিক বসন,—হাতে লম্বা বাঁশের দণ্ড, চেহারা অতিশয় জীর্ণ-শীর্ণ, সতীশ ঠাকুরের নিকট দাউজীর মন্দিরে অকস্মাৎ উপস্থিত হইলেন। বিশ্রামান্তে একটু সুস্থ হইলে ঠাকুর সতীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—"সতীশ! তুমি গৈরিক নিয়েছ কেন? বীর্য্যধারণ না হ'লে গৈরিক নিতে নাই; শাস্ত্রে নিষেধ আছে; তুমি গৈরিক ছাড়।"

সতীশ বলিল,—"আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি, গৈরিক ও দণ্ড আমার সন্ন্যাসের চিহ্ন, ইহা ছাড়িব কেন?" শ্রীধর তখন বলিলেন, "সতীশ! গুরুবাক্য অগ্রাহ্য করিস্‌ না, ভয়ানক অপরাধ।"

সতীশ মাথা ঝাড়া দিয়া হাত নাড়িয়া খুব তেজের সহিত বলিল, "যাঃ যাঃ যাঃ বেটা! গুরু! গুরু কে? গুরু তো পরমহংসজী; দীক্ষার সময় উনি তো বলেছিলেন,—পরমহংসজী দীক্ষা দিচ্ছেন? উনিও পরমহংসের শিষ্য, আমিও পরমহংসের শিষ্য। উনি তো আমার গুরুভাই। সাধু-সঙ্গ কর্‌তে এসেছি।"

ঠাকুর বলিলেন :—"তুমি গৈরিক নিয়ে আমার কাছে তো থাক্‌তে পাবে না, অন্যত্র গিয়ে থাক।"

সতীশ বলিল, —"আজ তো আমি আপনার অতিথি।"

ঠাকুর বলিলেন :—"অতিথিরূপে এসেছ? তাহ'লে তোমাকে আর কিছুই বল্‌বার নাই—আজ তবে এখানেই থাক।"—এই বলিয়া ঠাকুর সতীশের আদর যত্ন করিতে আমাদিগকে আদেশ করিলেন। দিন রাত সতীশ আমাদের উপর হুকুম চালাইয়া ও খুব স্ফূর্ত্তি করিয়া কাটাইলেন। পরদিন সকালে ঠাকুর সতীশকে ডাকিয়া বলিলেন,—"সতীশ! এক তিথির অধিক সময় অতিথির তো থাক্‌বার নিয়ম নাই, এখন তুমি অন্যত্র যাও।" পাগ্‌লা সতীশ খুব চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—"তা কেন? শাস্ত্রে আছে, এক রাত্রি কারো সঙ্গে বাস কর্‌লেই, সে বান্ধব হয়। সুতরাং আপনি এখন তো আমার বান্ধব হইয়াছেন, বান্ধবশূন্য হইয়া কারো কোথাও থাকা উচিত নয়। এখন আর অন্যত্র যাইব না।" এই বলিয়া সতীশ আপন আসনে আরো আঁটিয়া বসিলেন। সতীশকে গৈরিক ত্যাগ করিতে ঠাকুর বিস্তর বলিলেন। কিন্তু সতীশ কিছুতেই উহা ত্যাগ করিল না। শ্রীবৃন্দাবনে পাগ্‌লা সতীশকে লইয়া এবং শ্রীধরের পাগ্‌লামী লইয়া ঠাকুর অনেক সময় আনন্দ করিতেন। ঠাকুর যাহাদের সঙ্গে,

এবং দশজনার নিকটে যাহাদের কথা প্রসঙ্গে এরূপ আমোদ করেন, সেই সতীশ ও শ্রীধরই ধন্য।

ঠাকুরের প্রতি শ্রীধরের * আকর্ষণ।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীধর মাথাগরম হইলে সময় সময় বিষম পাগলামী করিতেন। এক দিন সামান্য বিষয় লইয়া গুরুভ্রাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কামিনী বাবুর সহিত ভয়ানক ঝগড়া বাধিল।

---

* শ্রীধরচন্দ্র ঘোষ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ভাঙ্গার সন্নিকট সদরদি গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। সামান্য লেখা পড়া শিখিয়া কিছুকাল ইনি পুলিশের চাকরি করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ন্যায়পরতা ও কার্য্য-দক্ষতাগুণে ইনি সাধারণের নিকট বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। শৈশবকাল হইতেই জীবনে ধর্ম্মলাভ করিবার জন্য শ্রীধরের অসাধারণ উৎকণ্ঠা ছিল। ক্রমে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মদের সঙ্গলাভ করিয়া ইঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবল অনুরাগ জন্মে। অচিরে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যহ নিয়মিত রূপে আকুলপ্রাণে প্রার্থনা করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিছুকালের মধ্যেই ভগবৎকৃপায়, শ্রীধরের কয়েকটি অলৌকিক উপলব্ধিও প্রত্যক্ষদর্শন লাভ হইল। শ্রীধর তাহাতে একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। মহৎ আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত কোন অবস্থাই স্থায়ী হইবে না বুঝিয়া, শ্রীধর সদ্গুরুর অনুসন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলেন; এবং অল্প সময়ের মধ্যে ৺শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—"আমি সদ্গুরুর আশ্রয় লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষায় এখানে এসেছি—আপনি দয়া ক'রে আমাকে দীক্ষা দিন্।" পরমহংসজী বলিলেন—"সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা নিতে হ'লে, সেই বিজয়ের কাছে যা। * * *।" শ্রীধর আর ওখানে অপেক্ষা না করিয়া; ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রচারকনিবাসে, ঠাকুরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং কালবিলম্ব না করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

দীক্ষাগ্রহণের পর শ্রীধর ঠাকুরের সঙ্গছাড়া প্রায় কখনও হন নাই, শ্রীধরের সোজা চাল চলন, ও স্বাভাবিক সরলতার দৃষ্টান্ত লোক সমাজে অতি বিরল। উহার প্রাগাঢ় ভজনানুরাগ এবং অসাধারণ গুরুনিষ্ঠা দেখিয়া অবাক হইয়াছি। ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীধরের আনন্দ উৎসাহ একেবারেই নিবিয়া গেল। যে কয় বৎসর জীবিত ছিলেন, দীর্ঘ নিশ্বাসই উহার নিত্য-সহচর ছিল। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম—"শ্রীধর, দিন কিভাবে কাটাও?" শ্রীধর বলিলেন, "ভাই! সকাল বেলা থে'কে ভাব্‌তে থাকি কতক্ষণে সন্ধ্যা হ'বে, আবার সন্ধ্যা হ'লে ভাবি কতক্ষণে সকাল হ'বে—এই ভাবেই দিন যাইতেছে।"

১৩০৯ সালে, শ্রীধর কিছুকাল কলিকাতা বাদুড় বাগানে শ্রীযুক্ত জগবন্ধু মৈত্র মহাশয়ের বাসায় ছিলেন। ১২ই অগ্রহায়ণ শনিবার ত্রয়োদশী তিথিতে অকস্মাৎ জ্বরে পড়িয়া রাত্রি দশটার পর শ্রীধর কয়েকটি গুরু-ভ্রাতাকে ডাকিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন—"ওহে, তোমরা আমার নিকটে এসো, আজ আমি দেহত্যাগ কর্ব্বো।" জ্বরের জ্বালায় মাথাগরম হইয়া শ্রীধর ঐ সব বলিতেছেন ভাবিয়া, গুরুভ্রাতারা কেহ উঁহার কথা গ্রাহ্য করিলেন না। ভোর বেলা সকলে শ্রীধরের অসুখের খবর লইতে গিয়া দেখিলেন, শ্রীধর বিছানা হইতে

শ্রীধর মাথা গরমে কোনও কোনও বার পনেরো দিন পর্য্যন্ত কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানশূন্য থাকিতেন। কামিনীবাবু শ্রীধরকে ঐ সময়ে ভয় দেখাইয়া বলিলেন,—'সাবধান হও, ঝগড়া করিলে মার খাবে।' শ্রীধর ঐ কথা শুনিয়াই উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া বড় রাস্তায় যাইয়া এক পুলিশের লোকের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং খুব ব্যস্ততার সহিত চীৎকার করিয়া পুলিশকে বলিলেন,—"বাঙ্গালামুল্লুক হ'তে এক ভয়ঙ্কর ডাকাত আসিয়া আমাদের কুঞ্জে রহিয়াছে, সে আমাকে খুন কর্ত্তে চায়,—শীঘ্র তাকে ধর, না হ'লে এখনই আমাদের মে'রে কে'টে একাকার কর্ব্বে।" পুলিশ শ্রীধরের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কুঞ্জে আসিল। কামিনী বাবুকে দেখাইয়া তখন শ্রীধর বলিল,—"ইস্কো পাক্‌ড়ো।" এই সময় আর আর যাঁহারা ছিলেন —শ্রীধরকে পাগল বুঝাইয়া পুলিশকে বিদায় করিলেন। ঠাকুর এই ব্যাপার শুনিয়া শ্রীধরকে খুব ধম্‌কাইয়া বলিলেন :—"শ্রীধর! এখনই যেয়ে কামিনীবাবুর পায়ে পড়ে ক্ষমা চাও,—না হ'লে এ স্থান হ'তে এ মুহূর্ত্তেই চলে যাও।"

শ্রীধর বলিল,—"মার্‌তে যে চায় তার দোষ হলো না! সে ডাকাত নয়! ডাকাতকে পুলিশের হাতে দেওয়াই অপরাধ হ'লো! এজন্য আবার ক্ষমা! আমি ডাকাতের নিকট কিছুতেই ক্ষমা চাইব না।"

ঠাকুর শ্রীধরকে শাসন করিয়া বলিলেন :—"এখনি তুমি আমার কাছ থে'কে চলে যাও—এক্ষণি যাও।"

শ্রীধরও,—'এমন সঙ্গে আর কখনও থাক্‌বো না—এখনি যাইতেছি' বলিয়া তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া শ্রীধর কান্দিতে কান্দিতে কাতর হইয়া ফিরিলেন ও ঠাকুরের পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া পড়িলেন।

কিঞ্চিৎ সরিয়া উল্টাভাবে, মাথার দিকে পা, এবং পায়ের দিকে মাথা রাখিয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া রহিয়াছেন। পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া কোন সাড়া না পাওয়াতে সকলেরই মনে সন্দেহ জন্মিল এবং স্পর্শ দ্বারা জানা গেল শ্রীধর চিরকালের মত চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সরল ভাবে ভূমি সংলগ্ন ললাট এবং অঞ্জলিবদ্ধ হস্তদ্বয় সম্মুখের দিকে সুপ্রসারিত দেখিয়া ঐ সময় সকলেরই এরূপ ধারণা হইল যে, তিনি কাহারও দর্শন পাইয়া তাঁহাকে যথারীতি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গুরুভ্রাতারা তাঁহার পবিত্র দেহ নিমতলার ঘাটে লইয়া গিয়া অগ্নিসংস্কার করিলেন। শ্রীধর অপুত্রক ছিলেন, নানা স্থানের গণ্য মান্য গুরুভ্রাতারা সমবেত হইয়া, সংকীর্ত্তন মহোৎসবে ১১ই মাঘ রবিবার শ্রীধরের পারলৌকিক ক্রিয়া, সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিলেন। শ্রীধরের জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলি আমার পূর্ব্বাপর ডায়েরীতে যাহা আছে, ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে, আশা করি।

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"শ্রীধর ! গিয়েছিলে তো আবার এলে কেন ?"

শ্রীধর হাউ হাউ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন,—"কি কর্ব্বো ! ছেড়ে যে থাকৃতে পারি না।" ঠাকুর শ্রীধরের কথা শুনিয়া ছল ছল চক্ষে শ্রীধরের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন ঃ—

"তবে যাও, গিয়ে ক্ষমা চাও।" শ্রীধর যাইয়া অমনি কামিনী বাবুর পায়ে পড়িলেন ও ক্ষমা চাহিলেন। ধন্য শ্রীধর ! অদ্ভুত তোমার গুরুপ্রেম ! অদ্ভুত তোমার ভালবাসা !

ঠাকুরের উপর সতীশ ও শ্রীধর উভয়েরই অসাধারণ ভালবাসা, প্রগাঢ় ভক্তি ও অটল বিশ্বাস ছিল ; তাই ইহারা সময়ে সময়ে ঠাকুরের সহিত ঝগড়া করিত এবং মনোমত না হইলে ঠাকুরের কথায় প্রতিবাদ বা বিপরীত কার্য্য করিতেও কিছুমাত্র দৃক্‌পাত করিত না। বহু স্থলেই এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। শ্রীধর ও সতীশের এইরূপ বাহ্যিক অবাধ্যতা, যে ঠাকুরের প্রতি উহাদের অসামান্য অনুরাগেরই নিদর্শন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

দুর্দ্দশাগ্রস্ত পরশুরামের প্রতি মাধবের কৃপা ।

বৈশাখ, ১১ই—১৫ই
এপ্রিল, ২৩শে-২৭শে

সম্প্রতি গেণ্ডারিয়া আশ্রমে পরশুরাম আসিয়াছেন। ঠাকুর অনেক সময়ে পরশুরামের কথা বলিয়া থাকেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে এই পরশুরামের কথা যেমন শুনিলাম, লিখিয়া রাখিতেছি—পরশুরাম ধামরাই গ্রামেরই এক জন বেশ অবস্থাপন্ন তাঁতি ছিলেন। তেজারতী কারবারাদি করায়, গ্রামে দশজনের উপরে বেশ আধিপত্য করিয়া আসিতেছিলেন। আটটী পুত্রসন্তান,—সকলেই উপযুক্ত, বিষয়-কার্য্যে খুব দক্ষ এবং উপার্জ্জনক্ষম ছিলেন। ছয়টী কন্যাও ভাল ঘরে সৎপাত্রে পরিণীতা হইয়াছিলেন। সুখে স্বচ্ছন্দে পরশুরাম দিন কাটাইতেছিলেন। অকস্মাৎ দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। অল্প সময়ের মধ্যে দেখিতে দেখিতে আটটী পুত্রই একে একে দেহত্যাগ করিলেন। কিয়ৎ কাল পরে পাঁচটী কন্যারও মৃত্যু হইল। একটীমাত্র যুবতী কন্যা বাঁচিয়া রহিলেন ; তিনিও দুরদৃষ্টক্রমে বিধবা হইলেন। পরশুরাম কান্দিতে কান্দিতে অন্ধ হইলেন। অতি বৃদ্ধ পতিকে ত্যাগ করিয়া, শোকসন্তপ্তা স্ত্রীও ইহলোক হইতে বিদায় নিলেন। বিধবা একটী মাত্র কন্যা ব্যতীত, পরশুরামের সংসারে আর কেহই রহিল না।

পিতার দুরবস্থা দেখিয়া বিধবা কন্যাটি পরশুরামের নিকট আসিলেন এবং প্রাণপণে সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এই সময় গ্রামের দশটী লোক, যাহারা পরশুরামের নিকট ঋণগ্রস্ত ছিলেন,—সকলেই অনুমান করিলেন, পরশুরাম অবিলম্বে সমস্ত টাকা আদায় করিয়া কন্যাকে দিয়া যাইবেন। পাপিষ্ঠ দুর্ব্বৃত্ত দেনাদারেরা একজোট হইয়া অসহায়া কন্যাটির উপর নানা প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিল এবং বিষম কৌশল সৃষ্টি করিয়া, অকালে বৃদ্ধ অন্ধের একমাত্র অবলম্বন বাল-বিধবাটির প্রাণনষ্ট করিল। কন্যার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, পাষণ্ডগণ, এক দিন রাত্রিতে পরশুরামের গৃহে প্রবেশ করিয়া, সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া কাগজপত্র যাহা কিছু ছিল, লুট্‌পাট্ করিয়া লইয়া গেল। বৃদ্ধ অন্ধ শূন্য ঘরে পড়িয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। গ্রামের একটী সামান্য অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ, পরশুরামের দুর্দ্দশা দেখিয়া দয়া করিয়া, তাহাকে নিজ বাড়ীতে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু গ্রামের ঐ দুর্বৃত্তদের তাহা সহ্য হইল না। তাহারা সকলে মিলিয়া ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া বলিল,—'নির্ব্বংশে লোককে বাড়ীতে নিয়ে স্থান দিয়েছ, শীঘ্রই তুমিও নির্ব্বংশ হ'বে—তোমার সঙ্গে কোন প্রকার সংশ্রব রাখিলে আমাদেরও বংশ থাকিবে না। এখনই তোমার বাড়ী থেকে ওকে তাড়ায়ে দেও, না হ'লে সবাই মিলে তোমাকে একঘ'রে কর্‌বো।' ব্রাহ্মণ বাড়ী আসিয়া পরশুরামকে সকল অবস্থা জানাইলেন—পরশু-রাম শুনিয়া বলিলেন,—'আমাকে স্থান দিলে আপনি বিপন্ন হইবেন; শীঘ্র আমাকে মাধবের মন্দিরে রাখিয়া আসুন।' পরশুরামের জেদ দেখিয়া, ব্রাহ্মণ অগত্যা তাহাকে প্রত্যক্ষ দেবতা শ্রীশ্রীমাধবের বাড়ীতেই রাখিয়া আসিলেন। মাধবজীকে যিনি যাহা ভোগ দিতেন—দয়া করিয়া পরশুরামকে প্রসাদের কিছু অংশ প্রদান করিতেন। পরশু-রাম তাহাই মাত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। পরশুরামের সকল দিকই শূন্য হইল। এখন আর কি লইয়া থাকিবেন! দিবারাত্র কেবল 'মাধব মাধব' নামই জপ করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই অন্ধ পরশুরামের প্রতি দয়াল মাধবের কৃপাদৃষ্টি পড়িল। এক দিন মাধব পরশুরামকে বলিলেন,—"পরশুরাম! আমাকে তুমি দেখ্‌বে?" পরশুরাম বলিলেন,—"ঠাকুর! আমি যে অন্ধ!" মাধব বলিলেন,—"আচ্ছা, তুমি একবার আমার দিকে তাকাওনা!" পরশুরাম মাথা তুলিয়া মাধবের দিকে চাহিতেই দয়াল মাধবের অদ্ভুত রূপ দর্শন করিয়া অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই দিন হইতেই আশ্চর্য্যভাবে উহার বাহ্য দৃষ্টিশক্তিও খুলিয়া গেল। পরশুরাম আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া দিনরাত দয়াল মাধবের নামে বিভোর! পরশুরাম

এখন প্রায় সর্ব্বদাই মাধবের দর্শন পা'ন। সকালে বিকালে প্রত্যহ প্রতি ঘরে যাইয়া মাধবের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। গ্রামের সকলেই এখন উঁহাকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া সম্মান করেন। এখন আর পরশুরামের কেহই শত্রু নাই, পূর্ব্ব শত্রুগণও এখন পরশুরামের কৃপা-ভিখারী এবং একান্ত অনুগত হইয়া পড়িল। এই পরশুরাম এখন আমাদের গেণ্ডারিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি আমাদের ঠাকুরকে 'মাধব' বলিয়াই ডাকেন; যখন তখন 'মাধব,' 'আমার দয়াল মাধব' বলিয়া স্তব স্তুতি করেন। পরশুরামের অবস্থা দেখিয়া আশ্রমস্থ সকলেই অবাক্ হইয়া যাইতেছেন।

এক সময়ে পরশুরামকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"পরশুরাম! এখানে এলে কেন?" পরশুরাম বলিলেন,—"আজ্ঞা, জান্‌তে পার্‌লাম, মাধব গেণ্ডারিয়ায় আছেন।"

প্রশ্ন।—"তুমি বুড়ো মানুষ, রাস্তা চিনে এলে কিরূপে?"

পরশুরাম বলিলেন,—"আমিতো আশ্রম চিনি না—ঢাকাতে আস্‌লাম। একটী কালো মেয়ে, ১৪।১৫ বৎসর বয়স, আমাকে বলিল—'তুমি গেণ্ডারিয়া আশ্রমে যাও তো আমার সঙ্গে এস।' আশ্রমের কাছে এসে আমাকে বলিল, 'এই আশ্রম, যাও'। তারপর আর সেই মেয়েটীকে দেখ্‌তে পেলাম না। তখন সকলই বুঝ্‌লাম। সে তো আর মেয়ে নয়! আমি আশ্রমে এসে দেখি—আমার 'মাধব' এখানে।"

পরশুরামের বয়স আশীর উপরে। সর্ব্বদাই মাধবের নামে দিশাহারা। গুরুভাই শ্রীযুক্ত নবকুমার বিশ্বাস মহাশয় আহারের সময়ে পরশুরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পরশু-রাম! ডাল কেমন লাগে?"

পরশুরাম চম্‌কিয়া অমনি বলিলেন,—"আজ্ঞা হ! যা কইলেন, কিষ্টনাম বড় মিঠা।" পরশুরামের অনেক কথায়ই এই প্রকার আত্মহারা ভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

পরশুরাম সর্ব্বদাই সকলের নিকট বলিয়া থাকেন,—"মাধব আমার বড় দয়াল! তিনি আমার ছেলে মেয়ে সমস্ত জঞ্জাল নিয়া তাঁর দুর্লভ চরণ আমাকে দিয়াছেন। এত দয়া মাধব না কর্‌লে আমার কি সাধ্য ছিল মাধবের নাম নেই।" পরশুরাম এসব কথা বলিতে বলিতে কান্দিয়া অস্থির হন্, তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া যায়। 'মাধব আমার বড় দয়াল,' পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলিতে থাকেন।

পরশুরামের সম্বন্ধে ঠাকুরের প্রশংসাবাদে আমাদের একটী গুরুভ্রাতা কুঞ্জবিহারী গুহ মহাশয়ের কিঞ্চিৎ সংশয় জন্মিয়াছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ঠাকুর তো প্রায় সক-লেরই এইরূপ প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইঁহার সম্বন্ধেও বোধ হয় তাহাই হইবে। সন্ধ্যা-

কীর্ত্তনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গুরুভাইটী আম্‌তলায় ঠাকুরের নিকট বসিয়া আছেন,—কীর্ত্তন হইতেছে—ইতিমধ্যে পরশুরাম সেই গুরুভাইটীর কাণে তিনবার "গুরু সত্য," "গুরু সত্য," "গুরু সত্য" এই কথা বলিয়া পিঠে কয়েকটি চাপড় মারিলেন। ঐ সময় গুরুভাইটী অকস্মাৎ কেমন হইয়া গেলেন। তাঁহার ভিতরে এক অদ্ভুত শক্তির খেলা হইতে লাগিল। তিনি হাত পা আছড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ঠাকুর যখন ধামরাই গিয়াছিলেন, তখন পরশুরামের সহিত মাধবের মন্দিরে তাঁহার দেখা হয়। পরশুরাম ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করেন যে, "আমি যেন মাধবের দর্শন পাই"। ঠাকুর তখন বলিলেন, "আপনি ত মাধবের দর্শন পেয়ে থাকেন, তিনি ত আপনার নিকটেই রয়েছেন।" তাহাতে পরশুরাম বলিলেন,—"এই মাধব নয়, ইহার ভিতরে যে আর এক মাধব আছেন, তাঁকে নিয়ত দেখ্‌তে চাই, তিনি মধ্যে মধ্যে উঁকি দিয়ে থাকেন।"

স্বপ্ন, প্রারব্ধ এবং বিশুদ্ধ-সাত্ত্বিক-দেহ-বিষয়ে প্রশ্নোত্তর।

বৈশাখ, ১৬ই—৩১শে

আজ কাল অরুণোদয়ে স্নান করিয়া আসি। আসনে বসিয়া স্থিরভাবে একশত আটবার গায়ত্রী জপ করিয়া হোম করিয়া থাকি। পরে প্রাণায়াম কুম্ভকের সহিত কিছু ক্ষণ নাম জপ করিয়া গীতা এক অধ্যায় পাঠ করি। তৎপরে ১১টা পর্য্যন্ত ঠাকুরের নিকট যাইয়া বসিয়া থাকি। ঠাকুর এগারোটার সময় শৌচে যান্। শ্রীধর ঐ সময়ে কুয়া হইতে জল তুলিয়া, লেঙ্গটী ও বহির্ব্বাস লইয়া ঠাকুরের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকেন। ঠাকুর পায়খানা হইতে আসিয়া গা ধুইয়া আসনে গিয়া বসেন। আহার বারোটার মধ্যেই শেষ হয়। আহারের পর আসন আমতলায় লইয়া যাই। ঠাকুর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমতলায়ই বসিয়া থাকেন। ঠাকুর আমতলায় বসিলে পর, দুই ঘণ্টা ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত পাঠ করি; পাঠ শেষ হইলে পাঁচটা পর্য্যন্ত ঠাকুরের নিকটেই বসিয়া থাকি এবং অবসর বুঝিয়া সময় সময় নানা-সংশয়-যুক্ত বিষয়ে প্রশ্ন করি। এক দিন কথায় কথায় ঠাকুরকে আমার কয়েকটী স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাইলাম।

ঠাকুর শুনিয়া কহিলেন,—"সকল স্বপ্নই অলীক নয়। অতীত জীবনের চিত্র অনেক সময়ে স্বপ্নে দেখা যায়। ভবিষ্যৎ জীবনের ঘটনারও কখনও কখনও স্বপ্নে আভাস পাওয়া যায়। মাথা বা পেট গরম হ'লেও অনেক সময় এলো মেলো স্বপ্ন দেখা যায়। যে সকল স্বপ্ন দেখেছ, তার কতকগুলি জীবনে পরিণত হ'চ্ছে, আর কয়েকটী

ভবিষ্যতে বু'ঝ্‌বে।" এই বলিয়া ঠাকুর একটু থামিলেন এবং ভাগলপুরে ১২৯৬,২১ শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবারে অর্দ্ধতন্দ্রাবস্থায় যে দৃশ্য বা স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধে ঠাকুর বলিতে লাগিলেন :—"প্রকৃতিকে তৃপ্ত ক'রতে হবে। প্রকৃতিই এসে তোমাকে ঐরূপ বলেছিলেন। দুই উপায়েই প্রকৃতির তৃপ্তি সাধন করা যায়। এক বৈধ ভোগ দ্বারা, আর এক সাধন দ্বারা। সাধন দ্বারাই তোমাকে প্রকৃতির তৃপ্তিসাধন ক'রতে হবে। তোমার পক্ষে সাধনই একমাত্র উপায়।"

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবার পর মানুষ যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহা কি শুধু পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রারব্ধ-প্রভাবে,—না স্বাধীন ইচ্ছায়? আর এইরূপ আশ্রিত ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়া নূতন কর্ম্মফলের সৃষ্টি করিতে পারেন কি না?"

ঠাকুর বলিলেন :—"বাস্তবিক সদ্‌গুরুর আশ্রয় একবার নিলে মানুষ কখনই আর নূতন কর্ম্মের সৃষ্টি কর্‌তে পারে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মের ভোগই মাত্র কর্‌তে থাকে। সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিয়ে মানুষ দুষ্কর্ম্ম করতে পারে বটে, কিন্তু ঐ সকল দুষ্কর্ম্মে কখনই আবদ্ধ থাকতে পারে না। দুষ্কর্ম্ম কর্‌বার সময়ে, সেটা দুষ্কর্ম্ম ব'লে বুঝ্‌তে পারে এবং তা থে'কে বিরত থাকতে একটা চেষ্টাও ভিতরে ভিতরে থাকে। শুধু প্রারব্ধেই যেন বাধ্য করিয়া ঐ সব কর্ম্ম করায়ে নেয়। সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিয়ে যে নূতন কর্ম্ম কর্‌তে পারে না,—এও তার একটী প্রমাণ।"

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ভোগ কার হয়? আর এই ভোগের শেষই বা কোন্ সময়ে, কিসে হ'য়ে থাকে?"

ঠাকুর বলিলেন :—"সংস্কারবশতঃ ভোগটি দেহেরই হ'য়ে থাকে। শরীরটি যখন মানুষের একেবারে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক হয়, তখনই ভোগের শেষ হয়ে থাকে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক দেহ মানুষ কি উপায়ে লাভ করিতে পারে?"

ঠাকুর বলিলেন :—"বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক দেহ একমাত্র নাম-সাধন দ্বারাই লাভ হ'য়ে থাকে। শ্বাসেপ্রশ্বাসে নাম কর্‌লেই দেহটি সাত্ত্বিক হয়ে যাবে। দেখ, শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারাই দেহ রক্ষিত হচ্ছে, শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য দেহের প্রতি পরমাণুতে হচ্ছে। রক্ত শ্বাসপ্রশ্বাসেই বিশুদ্ধ হচ্ছে, এবং দেহের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হচ্ছে। এক কথায় দেহের ক্ষয়, বৃদ্ধি ও স্থিতি শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারাই চল্‌ছে। এই শ্বাস

প্রশ্বাসের সঙ্গে নামটি যখন গেঁথে যা'বে—প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসেই যখন আপনা আপনি নাম চ'ল্‌তে থাকিবে, তখন যেমনি শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য সমস্ত দেহে হবে, তেমনি নামের কার্য্যও প্রতি পরমাণুতে হ'বে। নামটি শ্বাসপ্রশ্বাসে মিলিত হ'য়ে গেলে, ক্রমে দেহটিও নামময় হ'য়ে যা'বে। দেহ নামময় হলে উহা দ্বারা আর অন্য কার্য্য হওয়া সম্ভব হ'বে না। শুধু সাত্ত্বিক কর্ম্মই হ'বে। প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাস লক্ষ্য রে'খে নাম কর, চেষ্টা কর্‌তে কর্‌তে সমস্তই সহজ হ'য়ে আসে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"শ্বাসপ্রশ্বাসে যাহাদের নাম অভ্যস্ত হইয়া যায়, তাহাদের শরীরে কি বিশেষ কোন চিহ্ন প্রকাশ পায়? যদি কেহ বলে যে, আমার শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম হয়—তাহ'লে তার বাহিরের কোন্ লক্ষণ দ্বারা উহা সত্য বলিয়া বুঝিব?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"মুখে বল্‌লেইত আর হ'বে না! শরীরেও যে তাদের বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পা'বে। শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম গেঁথে গেলে শরীরের চর্ম্মের উপরে এই প্রকার চিহ্ন পড়্‌বে। লক্ষ্য কর্‌লেই দেখ্‌তে পা'বে।"

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের অঙ্গুলির পৃষ্ঠভাগে একপ্রকার চক্রাকার চিহ্ন দেখাইলেন। দুই হাতেরই সমস্ত অঙ্গুলির পৃষ্ঠে ঐ প্রকার কোঁকড়া কোঁকড়া ওঙ্কারবৎ চিহ্ন দেখিয়া অবাক হইলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"অস্থি মাংস রক্তে যখন নাম হইতে থাকে—তখন ঐ সকলে কি নামের ছাপ পড়ে?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"বৃক্ষের শিরায় নামের স্বাভাবিক ছাপ তো শ্রীবৃন্দাবনে চক্ষে দে'খে এসেছ। মানুষের শরীরের প্রতি পরমাণুতে যখন নাম হ'তে থাকে, তখন অস্থি, মাংস, রক্তেও নামের ছাপ প'ড়ে যায়। মুসলমান্‌দের ধর্ম্মগ্রন্থে একটী ফকির সম্বন্ধে লেখা আছে যে, যখন তাঁহার রক্তপাত হ'ল, প্রত্যেক ফোঁটা রক্তে "আয়েনুল্ হক্" এই শব্দ অঙ্কিত র'য়েছে দেখ্‌তে পাওয়া গেল! এবার অর্দ্ধকুম্ভ সময়ে ৺শ্রীবৃন্দাবনে, যমুনার চড়াতে এক দিন সাধুদের দর্শন কর্‌তে গিয়েছিলাম, বালির উপরে একখানা হাড় দে'খে তুলে নিলাম, দেখ্‌লাম, সমস্ত হাড়খানিতে দেবনাগর অক্ষরে "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ" লেখা র'য়েছে। হাড়খানা আমি সাধুদের দেখালাম, তাঁহারা খুব আশ্চর্য্যান্বিত হ'লেন। কোন

বৈষ্ণব মহাপুরুষের অস্থি স্থির করে তাঁরা সেখানি নিলেন এবং খুব সমারোহের সহিত মহোৎসব ক'রে যমুনার চড়াতেই উহা সমাধিস্থ কর্‌লেন।"

এই কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ পরে শ্রীধর ও সতীশের নিকটে বিষয়টির আগাগোড়া জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা বলিলেন, ৺শ্রীবৃন্দাবনে অর্দ্ধকুম্ভ মেলায় যমুনার চড়ায় বহুসংখ্যক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ও সাধুরা আসন করিয়াছিলেন। একদিন সকালে ঠাকুর অকস্মাৎ আসন হইতে উঠিয়া আর কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া, যমুনার চড়ায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সাধুদের নিকটে না যাইয়া—না বসিয়া, সোজা চড়ার উপর দিয়া চলিতে লাগিলেন। একস্থানে পঁহুছিয়া অল্প বালির ভিতর হইতে একখানা অস্থি বাহির করিয়া লইয়া বলিলেন,—"দেখ, কোন মহাপুরুষের অস্থি, 'হরে কৃষ্ণ' নাম লেখা রহিয়াছে।" ঠাকুর অস্থিখানি আনিয়া সাধুদের দেখাইলেন। সাধু সন্ন্যাসীরা অস্থিখানি "হরে কৃষ্ণ" নামে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ-নমস্কার করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের নিকট হইতে ঐ অস্থিখানি চাহিয়া লইয়া, খুব আনন্দের সহিত সমস্ত সাধুরা মিলিয়া, সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব করিয়া মহা সমারোহে কেশীঘাটের সন্নিকটে যমুনার চড়ায় সমাধিস্থ করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে আমি শেষ পর্য্যন্ত ঠাকুরের সঙ্গে থাকিতে না পারায় তাৎসাময়িক অনেক ঘটনাই আমার জানা নাই। ঠাকুর সময়ে সময়ে কথাপ্রসঙ্গে কোনও ঘটনার উল্লেখ করিলে তাহা যেমন শুনি লিখিয়া রাখি। অতি সংক্ষেপে ঠাকুর যাহা বলিয়া যান তাহা পরিষ্কার রূপে জানিতে শ্রীধর, সতীশ প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি। ঠাকুরের শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান সময়ের অনেক অদ্ভুত ব্যাপার এখন শুনিতেছি।

ধার্ম্মিকেরা সর্ব্বদাই বিনয়ী।

আজ ঠাকুর কতকগুলি উপদেশ দিয়াছেন। আমি ঐ সময়ে অনুপস্থিত থাকাতে ছোট দাদা (শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়) আমার ডায়রীতে উহা তুলিয়া রাখিয়াছেন। কোন্ প্রশ্নের উপরে এই সকল উপদেশ, তাহা আমি জানি না।—লেখা যেমন পাইলাম তেমনই তুলিয়া রাখিলাম।

ঠাকুর:—"ঋষি প্রণীত শাস্ত্রপথ ধ'রে সর্ব্বদাই চল্‌তে হবে। যদি কোন সাধুবাক্য ঋষিবাক্য থেকে অন্য প্রকার হয়, তবে ঋষিবাক্যই গ্রহণ কর্‌তে হবে।

লোভ-মোহ-ইন্দ্রিয়-দমনাদি নিয়মগুলির উপরে সর্ব্বত্রই দৃষ্টি রাখ্‌বে। না হ'লে সাধনে বিস্তর অনিষ্ট হ'বে। যে সকল নিয়ম পদ্ধতির উপরে মনুষ্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত র'য়েছে, তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম কখনও করা উচিত নয়। কোনও প্রাণীর, এমন কি উদ্ভিদেরও কষ্টের কারণ হবে না। হরিদাসকে একত্র সকলের সঙ্গে ভোজন করতে মহাপ্রভু কত অনুরোধ ক'রেছেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই তা করেন নাই। বরং নিজকে অত্যন্ত নীচু মনে ক'রে সর্ব্বদা তফাৎ তফাৎ থাক্‌তেন। রূপ, সনাতন যদিও ব্রাহ্মণের ছেলে ছিলেন, তথাপি সমাজের ও সকলের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে চল্‌তেন। কখনও সাধারণের সঙ্গে একত্র ভোজনাদি করেন নাই। প্রকৃত ধার্ম্মিক কি না স্বভাব দিয়েই ধরা যায়। ধার্ম্মিকেরা সর্ব্বদাই বিনয়ী।"

দৃষ্টান্ত দেখাইতে ঠাকুর একটি গল্প বলিলেন,—"একদিন পোপ্‌ দেখ্‌লেন বহুলোক একটি স্ত্রীলোকের কাছে যাচ্ছেন। ঐ স্ত্রীলোকটির উপর খৃষ্ট আবির্ভূত হ'য়েছেন এইরূপ প্রচার। পোপ্‌ বড়ই ব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌লেন। পোপ্‌কে তাঁহার কার্ডিনেল্‌ ব'ল্‌লেন,—'আপনি একটু অপেক্ষা করুন—আমি একবার দেখে আসি।' স্ত্রীলোকটির নিকটে কার্ডিনেল্‌ উপস্থিত হ'য়ে বল্‌লেন,—'ওরে! আমার জুতোটা খু'লে দেতো?' কার্ডিনেলের এইরূপ অবজ্ঞাসূচক কথা শু'নে স্ত্রীলোকটি গ্রাহ্যই কর্‌লেন না। দর্শকমণ্ডলীও ঐ প্রকার ব্যবহার দে'খে অবাক্‌ হ'লেন। কার্ডিনেল্‌ স্ত্রীলোকটির অগ্রাহ্যভাব দে'খে অমনি চ'লে এলেন, এবং আনুপূর্ব্বিক পোপের নিকটে জ্ঞাপন ক'রে বল্‌লেন—'ঐ স্ত্রীলোকটি ভণ্ড, কখনই খৃষ্ট উহাতে আবির্ভূত নন্‌। যদি খৃষ্টই আবির্ভূত হ'তেন—তা হ'লে নিশ্চয় তিনি বিনয়ী হ'তেন এবং যা বলেছিলাম, কর্‌তেন।............"

ঠাকুর বলিলেন,—"জ্ঞানের সম্যক্‌ ব্যবহার কর্‌বে। কাকেও সহজে বিশ্বাস কর্‌বে না। আবার বিশ্বাস ক'রেও সহজে তাকে অবিশ্বাস কর্‌বে না। জ্ঞান ও ভক্তি এ সকলই প্রকৃতির। দেখ, রামকৃষ্ণ পরমহংস নিজে নিরক্ষর ছিলেন। অথচ মহা মহা জ্ঞানী লোকে তাঁর নিকটে ব'সে জ্ঞানলাভ কর্‌তেন। আবার

মহাভক্তলোকেরাও তাঁর চরণতলে ব'সে কত ভক্তির উপদেশ শুন্‌তেন। তাঁকে জ্ঞানীরা মহাজ্ঞানী এবং ভক্তেরা মহাভক্ত মনে কর্‌তেন।”

আসন ও হোম বিষয়ে প্রশ্নোত্তর।

১লা বৈশাখ হইতে নিত্য হোম করিতে ঠাকুর আদেশ করিয়াছিলেন। প্রত্যহ সকালে স্নানান্তর নাম প্রাণায়াম করিয়া আমি হোম করিয়া থাকি। ১০৮টি ত্রিপত্র বিল্বপত্র এক ছটাক ঘৃতের সহিত মিলাইয়া মন্ত্র মনে মনে জপ করিয়া—“অগ্নয়ে স্বাহা” বলিয়া আহুতি দেই। ঠাকুর বলিয়াছেন ঃ—“বেল, বট, অশ্বত্থ বা যজ্ঞডুম্বুর কাষ্ঠে হোম কর্‌বে। এই মন্ত্র প'ড়ে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে “অগ্নয়ে স্বাহা” ব'লে আহুতি দিবে।” এই বলিয়া হোমের মন্ত্রটি বলিয়া দিলেন। ১লা বৈশাখ হইতে নিত্য হোম করিয়া আসিতেছি। গেণ্ডারিয়া আশ্রমের পুকুরের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয় বনের মধ্যে একখানা ঘর করিয়াছেন। ঐ ঘরে কেহই কোন সময় থাকে না। নির্জ্জন পাইয়া কুঞ্জবাবুর সম্মতি অনুসারে ঐ ঘরেই আমার আসন করিয়াছিলাম। উপস্থিত সেই স্থানে বড়ই বিঘ্ন দেখিতেছি, আশ্রম হ'তেও একটু তফাৎ, কি করিব জানি না।

আজ ঠাকুর আহারান্তর আমতলায় যাইয়া বসিয়াই নিজ হইতে বলিতে লাগিলেন ঃ—“উত্তরমুখ বা পূর্ব্বমুখ হ'য়ে আসন ক'রে হোম কর্‌বে। ভগবৎপ্রীতি-ইচ্ছায় বা নিষ্কাম হ'য়ে যা কিছু কর্‌বে তা উত্তরমুখ হয়ে ক'রো, আর সকাম বা সঙ্কল্পিত কার্য্য পূর্ব্বমুখ হ'য়ে করা ব্যবস্থা। হোম কর্‌বার সময়ে হোমধূম শরীরে লাগাতে হয়। না হ'লে দেহেতে হোমের ক্রিয়া তেমন হয় না।

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—“এই হোমের উপকারিতা কি ?”

ঠাকুর বলিলেন ঃ—“হোমের উপকারিতা অনেক আছে,—তাহা এখন জেনে প্রয়োজন নাই। ঠিক্‌মত হোম ক'রে যাও, উপকারিতা নিজেই অনুভব কর্‌তে পার্‌বে। হোম ক'রে হোমের ফোঁটা কপালে দিও। হোমের বিভূতি দিয়ে ত্রিপুণ্ড্র কর্‌তে হয়। মধ্যে ঊর্দ্ধ পুণ্ড্রও ব্রাহ্মণের করা ব্যবস্থা।”

আমি হোম-বিভূতি দ্বারা সকালেই ত্রিপুণ্ড্র ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিয়া হোমান্তে হোমের ফোঁটা ধারণ করি। স্কন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া উভয় হস্তে পাঁচটি স্থানে এবং উভয় পার্শ্বে, দুইটী

স্তনে, নাভি, বক্ষ, কণ্ঠ, কণ্ঠের বিপরীত মেরুদণ্ডের উপরে ও পৃষ্ঠে—নাভিমূলের বিপরীত স্থলে, সর্ব্বত্রই ত্রিরেখা দিয়া থাকি।

জ্যৈষ্ঠ।

মহাপ্রভুর ধর্ম্ম ও আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম্মে স্ত্রীলোকের সংস্রব।

জ্যৈষ্ঠ, ৪ঠা—১৩ই

আমাদের দেশে হীন জাতি ছোট লোকদের ভিতরে, মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের নামে, স্ত্রীলোকসংস্রবে যে সকল বিভৎস কাণ্ড অহরহঃ সংঘটিত হইতেছে, তাহাতে বৈরাগী বৈষ্ণব কথাটার উপরেই যেন সাধারণ লোকের একটা অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গিয়াছে। উপস্থিত ভদ্রসমাজেরও দুই এক জন লোক এ সকল সম্প্রদায়ে প্রবেশ করাতে—সাধারণ লোকসমাজের যে কি বিষম ক্ষতি হইতেছে, বলা যায় না। আজ কয়েকটি ভদ্রলোক আসিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়, ইতর শ্রেণীর বাউল বৈষ্ণবদের ভিতরে স্ত্রীলোক লইয়া যে সাধন ভজনের ব্যবস্থা আছে শুনিতে পাই—তাহা কি মহাপ্রভুর ধর্ম্ম?"

ঠাকুর শুনিয়া কাণে হাত দিয়া বলিলেন:—"রাম! রাম!! মহাপ্রভু শাস্ত্র-সদাচারবিরুদ্ধ কোন অনুষ্ঠানই করেন নাই, বলেনও নাই। হরের্ণাম, হরের্ণাম, হরের্ণামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥—মহাপ্রভু মাত্র ইহাই প্রচার ক'রেছেন। নাম কি ভাবে করতে হ'বে তাও ব'লেছেন—তৃণাদপি সুনিচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ স্ত্রীলোক হ'তে মহাপ্রভু কত তফাৎ থাক্‌তেন—এবং তাঁর নিত্য সঙ্গীদের ঐ সংস্রব থেকে কত সাবধানে রাখ্‌তেন—চরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ কর্‌লেই তা বেশ বুঝা যায়। শুধু এদিকে কেন, প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়, স্ত্রীলোকের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা রে'খে, বৈষ্ণবসমাজে ধর্ম্মবিষয়ে বিষম অধোগতি হয়েছে। শ্রীবৃন্দাবনেও দেখ্‌লাম—সংযোগী না হ'লে কারো ওখানে থাকা সহজ নয়।"

এই বলিয়া ঠাকুর একটি ঘটনার কথা বলিলেন ঃ—ঠাকুরের শ্রীবৃন্দাবনে বাস-সময়ে আমিও তথায় ছিলাম। এই ঘটনাটি আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানা আছে ; সুতরাং তৎকালীন ডায়েরী হইতে এই স্থলে বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—(শ্রীবৃন্দাবনে একদিন) একটি ভদ্র ঘরের যুবতী ব্রাহ্মণরমণী ব্যস্ততার সহিত আসিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিলেন ঃ—

"প্রভো ! আমি এ সময়ে কি করিব বলুন।" ঠাকুর তাঁহাকে বিষয়টি কি জিজ্ঞাসা করায়, স্ত্রীলোকটি বলিতে লাগিলেন।—"অল্প বয়সে বিধবা হইয়া আমি তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইলাম, চারি ধাম পরিক্রমা করিয়া কিছু কাল হইল শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিতেছি। এতকাল বেশ ছিলাম, কিছুদিন হইতে কতকগুলি বৈষ্ণব আমার পিছনে বড়ই লাগিয়াছে। তাহারা দিনরাত আমাকে জ্বালাতন ক রিতেছে। ভেক গ্রহণ করিয়া, বৈষ্ণব নিয়া, সংযোগী হইয়া, নাকি যুগল উপাসনা করিতে হয়, না হ'লে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করা নাকি মহা অপরাধ !—সকলে আমাকে এইরূপ বলিতেছেন। অনেক বৈষ্ণবই নিয়ত আমার নিকট আসিতেছেন, আর ভেক্ দিতে চাহিতেছেন। আমি ব্রাহ্মণের কন্যা, কিছু কাল হইল বিধবা হইয়াছি। এখন কি বৈষ্ণব গ্রহণ করিয়া যুগল উপাসনা করিতে আপনি আমাকে বলেন ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"**দুষ্ট লোকেরা আপনার সর্ব্বনাশ কর্‌তেই এ সকল পরামর্শ দিতেছে। শাস্ত্রে বরং ইহার বিরুদ্ধেই আছে, যাহারা এরূপ করেন তাহাদের অধোগতি হয়। সংযোগী না হ'লে যুগল উপাসনা করা যায় না, এরূপ কোন ব্যবস্থাই নাই। যুগল উপাসনা বরং নাই হ'বে,—এ সব দুষ্ট লোকের পাল্লায় প'ড়ে, স্ত্রীলোকের সার সতীত্ব ধর্ম্মে কিছুতেই জলাঞ্জলি দিবেন না।**"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটি খুব সন্তুষ্টা হইলেন। বৈষ্ণবদের সঙ্গে কোন প্রকার সংশ্রব না রাখিয়া আপন মনে সাধন ভজন করিবেন সঙ্কল্প করিলেন।

সতীর রক্ষাকর্ত্তা স্বয়ং ভগবান্।

যৌবনাবস্থায় এই স্ত্রীলোকটি যখন একাকিনী চারিধাম পর্য্যটন করিয়াছিলেন, তখন কোনও প্রকার দুষ্ট লোকের উপদ্রবে পড়িয়াছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করায়, স্ত্রীলোকটি তাঁহার এক দিনের অদ্ভুত একটী ঘটনার বিষয় বলিয়াছিলেন। ঠাকুর অনেক সময়ে এই

ঘটনাটি বলিয়া থাকেন। যথার্থ সতীর সহায় ভগবান্। তিনিই তাহাকে রক্ষা করেন। এই ভদ্রমহিলা বাংলা দেশের কোন গ্রামের একটী বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের কুলবধূ। স্বামী পুত্রাদি বর্ত্তমানেই ধর্ম্মের আকর্ষণে ইনি একেবারে অস্থির হইয়া পড়েন। পদব্রজে তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইবার প্রত্যাশায়, স্বামীর চরণে পড়িয়া কিছুদিন অনুমতি প্রার্থনা করেন। স্বামী তাঁহাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিয়া কিছুকাল ঘরে রাখিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে একদিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময়ে, তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে পাগলের মত ছুটিয়া, শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমের পথে চলিতে লাগিলেন। সমস্ত তীর্থ দর্শন মানসে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় ও মনের আবেগে, তিনি একমাত্র পরিধেয় বস্ত্র অবলম্বন করিয়া, একাকী ছুটিতে লাগিলেন। এই ভাবে চলিতে চলিতে ভগবৎকৃপায় নীলাচলে উপস্থিত হইয়া, তিনি শ্রীশ্রীনীলাচল-চন্দ্রের দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলেন এবং কিছুকাল তথায় অবস্থান করিয়া পরে সেতুবন্ধ রামেশ্বরের দিকে চলিলেন। সেতুবন্ধের পথে তাঁহাকে যে আকস্মিক বিপদে পড়িতে হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে ঠাকুরের নিকটে যে কথোপকথন হয়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।—

শ্রীধর স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "একাকী যৌবনাবস্থায় নানা স্থানে ভ্রমণকালে কোথাও কোন প্রকার বিপদ ঘটে নাই তো ?" স্ত্রীলোকটি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভগবান্ যাহার সহায়, তাহার আবার বিপদ কি! তবে এক দিনের একটি ঘটনার কথা আপনাদিগের শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি।—শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবকে দর্শন করিয়া রামেশ্বর সেতুবন্ধে যাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। ভাল সঙ্গী না জোটাতে, একাকীই দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলাম। একদিন সমস্ত রাস্তা চলিয়া বিশ্রামের কোন নিরাপদ স্থান না পাইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। পথ অতিশয় দুর্গম, একান্ত নির্জ্জন ; একটানা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলিলাম। সন্ধ্যার একটু পরেই কোনও নির্জ্জন স্থানে সাধুদের এক-খানি কুটীর দেখিতে পাইলাম। নিকটে যাইয়া দেখি, কয়েকটি শান্তমূর্ত্তি সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। উহাদিগকে দেখিয়া ভরসা হইল। তাই ঐ স্থানে আশ্রয় নিলাম। কিন্তু রাত্রি একটু অধিক হইতেই সন্ন্যাসীরা কিঞ্চিৎ ব্যবধানে, অন্য একটী আড্ডায় চলিয়া গেলেন। একটী মাত্র বলিষ্ঠ যুবক সন্ন্যাসী ঐ স্থানেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গভীর নিশীথে যখন চারিদিক অন্ধকারময়, নিস্তব্ধ, তখন সাধুটী নিকটে আসিয়া বসিলেন এবং নানাপ্রকার কথা বলিতে বলিতে ভিতরের দুষ্টাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। আমি তখন বড়ই সঙ্কটে পড়িলাম। কিছুক্ষণ আমি অবাক হইয়া রহিলাম। অবলা নারী নির্জ্জন স্থলে নিশাকালে

অতিবলিষ্ঠ কামুকের হাতে পড়িয়া কি উপায়ে রক্ষা পাইব, ভাবিতে লাগিলাম। সাধুকে দু চার্ বার হাত যোড় করিয়া নমস্কার করিয়া তাহার চেষ্টা থামাইতে প্রয়াস পাইলাম, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইল। সাধু মাটিতে ফেলিয়া দিয়া, আমাকে টানাটানি করিতে লাগিলেন। আমি তখন আর কি করিব। "মা জগদম্বে! মা জগদম্বে!!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম। সাধু মহাবলিষ্ঠ, বিষম উত্তেজনার অবস্থায় সজোরে আমাকে যেমনি মাটিতে টানিয়া ফেলিল, অকস্মাৎ একটি প্রকাণ্ড বাঘ আসিয়া লাফাইয়া উহার ঘাড়ে পড়িল এবং মুখে করিয়া পলকের মধ্যে অদৃশ্য হইল। পরদিন নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরা আসিয়া দেখিলেন, কিছু তফাতে এক স্থানে সাধুর মৃত দেহ ঘাড়-মট্‌কান অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। গ্রামবাসীরা বলিলেন, আর কখনও তাঁহারা এই গ্রামে বাঘ আসিতে দেখেন নাই, অথবা বৃদ্ধদের মুখেও কখনও এই গ্রামে কোন কালে বাঘ আসিয়াছিল, এমন কথা শুনেন নাই। ঐ সাধু বহুকাল ঐ কুটীরেই বাস করিতেছিলেন। জগদম্বার কৃপা অতি অদ্ভুত!

স্ত্রীলোকটি যখন এই কথা ঠাকুরের কাছে বলিয়াছিলেন—আমি তখন সেখানেই থাকিয়া ঐ সমস্ত কথা শুনিয়াছিলাম। ঐ প্রকারের আরও একটি ঘটনা ঠাকুর সেই সময়ে বলিয়াছিলেন; তাহা সেই সময়ের ডায়েরী হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।—

যথার্থ সতী বিপন্না হইলে—ভগবান্ তাহাকে রক্ষা করেন, ইহার প্রমাণ দেখাইতে ঠাকুর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে,—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কোনও এক গ্রামে একটি ভদ্রলোকের বাস ছিল। যৌবনাবস্থায়ই রোগগ্রস্ত হইয়া তিনি আফিং ধরিয়াছিলেন। এক দিন স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন হইলে, তিনি নিজ যুবতী স্ত্রীকে মাত্র সঙ্গে লইয়া, পদব্রজে রওয়ানা হইলেন। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পথিমধ্যে আফিমের অভাব হইল, ব্রাহ্মণ অস্থির হইয়া পড়িলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ধরাশায়ী হইয়া ঘন ঘন হাই তুলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে দুঃসহ ক্লেশ প্রকাশপূর্ব্বক স্ত্রীকে বলিলেন,—"ওগো! আর আমি সইতে পারি না—শীঘ্র আফিং আনিয়া দিয়া প্রাণ বাঁচাও"। স্বামীর ঐ অবস্থা দেখিয়া বিষম বিপদ আশঙ্কা করিয়া, স্ত্রী তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামে প্রবেশ করিলেন, এবং কোথায় আফিং পাওয়া যাইবে অনুসন্ধান করিয়া অস্থিরচিত্তে বাড়ী বাড়ী ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন্। অবশেষে জানিতে পারিলেন, ঐ গ্রামে এক ব্যক্তির নিকট আফিং আছে; কিন্তু তিনি ভয়ঙ্কর মাতাল। যুবতী অগত্যা মাতালের দ্বারেই গিয়া উপস্থিত হইলেন। আফিমের অভাবে স্বামীর জীবন সংশয়াপন্ন জানাইয়া, অতিরিক্ত মূল্য দিতে প্রস্তুত হইয়া, করযোড়ে অতি-

কাতরভাবে মাতালের নিকট আফিং প্রার্থনা করিলেন। মাতাল বলিল,—"ওগো স্বামীর জন্য যদি যথার্থই দরদ থাকে, তবে আফিং নিতে পার; মদ, গাঁজা যাহা চাহিবে দিতে পারি, কিন্তু মূল্য নিয়া দিব না; কিছুক্ষণের জন্য তোমার দেহটি আমাকে দান করিতে হইবে, না হ'লে দিব না নিশ্চয় জানিও।" স্ত্রীলোকটি বহু অনুনয়-বিনয় করিলেও মাতাল কিছুতেই তাহার কথা গ্রাহ্য করিল না। যুবতী নিরুপায় হইয়া স্বামীর নিকটে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ব্যাপার স্বামীকে জানাইলেন। স্বামী তখন আফিমের অভাবে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন; সুতরাং কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, "ওগো! আমার প্রাণ যায়, যেখান থে'কে যে ভাবে পার, আফিং আনিয়া দিয়া আমাকে বাঁচাও।" যুবতী বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। একদিকে স্ত্রীলোকের সার ধর্ম্ম সতীত্ব নাশ, আর একদিকে স্ত্রীর আরাধ্য দেবতা পতির অপমৃত্যু। সতী ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে করিতে মাতালের নিকট উপস্থিত হইয়া, মাতালের চরণ ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "আপনি আমার এই দেহ গ্রহণ করিয়া, ইহার বিনিময়ে আমার স্বামীর জীবন দান করুন। আমাকে এই পাপে নরকে যাইতে হয় আপত্তি নাই, আপনার যাহা ইচ্ছা করুন, কিন্তু শীঘ্র আফিং দিয়া আমার মরণাপন্ন স্বামীকে রক্ষা করুন।"

ভগবানের কি অদ্ভুত দয়া! সতীর কি অদ্ভুত শক্তি! যুবতীর করস্পর্শে মাতালের কি এক অবস্থা হইল, মাতাল চম্‌কিয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ যুবতীর চরণে মস্তক রাখিয়া, লুটাইয়া পড়িয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিল, "মা, আমায় ক্ষমা কর; তোমার কৃপায় আজ আমার পুনর্জ্জন্ম লাভ হইল। আমি অত্যন্ত দুরাচার, মদ, গাঁজা, আফিং সমস্ত নেশাই করিয়া থাকি, কিন্তু আজ হইতে আমি সমস্ত নেশা ত্যাগ করিলাম, তোমার যত ইচ্ছা আফিং লইয়া যাও। মা, তোমার মত দুর্দ্দশা আমার স্ত্রীরও তো ঘটিতে পারে। জীবনে আর নেশাবস্তু স্পর্শ করিব না।" যুবতী আফিং নিয়া স্বামীর নিকটে পঁহুছিলেন। দেখিলেন, স্বামী বসিয়া খুব কান্দিতেছেন। স্বামীর হাতে আফিং দিতেই তিনি উহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, "আহা! আমার জন্য তোমার সার সতীত্ব-ধর্ম্ম তুমি অনায়াসে বিসর্জ্জন দিলে! ধিক্ আমার জীবনে! এ জীবন যাওয়াইতো ভাল। আর কখনও আফিং স্পর্শ করিব না, প্রাণ যায় যাক্। তুমিই ধন্যা, তুমিই যথার্থ সতী।" স্ত্রী তখন কান্দিতে কান্দিতে স্বামীর চরণে ধরিয়া, ভগবানের অদ্ভুত কৃপায় তিনি যে ভাবে এই বিষম সঙ্কটে রক্ষা পাইয়াছেন, তাহা জানাইয়া স্বামীকে শান্ত করিলেন।

হোমের উপকারিতা ও প্রার্থনায় অনুতাপ।

আজ মাসাধিক কাল হইল, নিয়মিতরূপে অনুদয়ে বুড়ীগঙ্গায় স্নান তর্পণ করিয়া আশ্রমে আসি এবং বেলা নয়টা পর্য্যন্ত আসনে স্থিরভাবে বসিয়া থাকি। বাড়ী হইতে যজ্ঞডুম্বুরের কাষ্ঠ ও বিশুদ্ধ গব্যঘৃত আনিয়া রাখিয়াছি। সকালে কিছুক্ষণ গায়ত্রী জপান্তে, অখণ্ডিত বিল্বপত্র দ্বারা ঠাকুরের আদেশ অনুসারে প্রজ্বলিত অগ্নিতে ১০৮টি আহুতি দেই। আহুতি দিয়াই হোমধূম শরীরে পাখা করিয়া লাগাইয়া থাকি, এবং খুব উদ্যমের সহিত প্রাণায়াম ও নাম করি। কিছুদিন যাবৎ পবিত্র হোমগন্ধ, আসন ছাড়িয়াও সময়ে সময়ে অনুভব করিয়া আসিতেছিলাম ; কিন্তু আজকাল আর হোমগন্ধ আমাকে ছাড়িতেছে না। প্রায় সর্ব্বদাই যেখানে সেখানে এই অদ্ভুত হোমগন্ধ পাইয়া, আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছি। নিয়ত হোমগন্ধ আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। এই পবিত্র হোমগন্ধের প্রভাবে চিত্তের প্রফুল্লতা, মনের উৎসাহ উদ্যম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। নাম সুস্পষ্টভাবে, খুব তেজের সহিত, রসাল হইয়া প্রতি নিয়ত ফুটিয়া উঠিতেছে। গন্ধ নামের, এবং নাম গন্ধের, প্রভাব বৃদ্ধি করিতেছে। মন আর অন্য দিকে যায় না, গন্ধে মাতাইয়া নামেতে নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। অনুদয়ে স্নান করিয়া অপরাহ্ণ ছয়টা পর্য্যন্ত অনাহারে থাকি ; অবসন্নতা, ক্ষুধা তৃষ্ণা বুঝি না। পূর্ব্বে যাঁহারা আমার গায়ে ঘর্ম্মের দুর্গন্ধ পাইয়া সময়ে সময়ে বিরক্ত হইয়া তফাৎ থাকিতেন, আজকাল তাঁহারাও এই হোমগন্ধ পাইয়া আমার গা ঘেঁসিয়া বসেন, গায়ে হোমগন্ধ হইয়াছে বলিয়া পরস্পর আলোচনা করেন। আমি কিন্তু গায়ের গন্ধ কিছুই বুঝি না, সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র হোমগন্ধ পাইয়া দিশাহারা হইয়া যাইতেছি, ইহাই মাত্র বুঝিতেছি। বিশুদ্ধ গব্যঘৃত খাইতে না বলিয়া, ঠাকুর আমাকে কেন অনর্থক আগুনে পোড়াইয়া ফেলিতে বলিলেন,—সময়ে সময়ে আমার এই খট্‌কা উঠিত। আশ্চর্য্য ঠাকুরের দয়া! এই ভাবে না বুঝাইলে আমার কিছুতেই শান্তি হইত না। ঠাকুর! দয়া কর। এই ভাবেই প্রতি সংশয়ের হাত হইতে রক্ষা করিও। জয় ঠাকুর !!

আশ্রমের পশ্চিম দিকে শ্রীযুক্ত রাধারমণ গুহ মহাশয়ের বাড়ীর দক্ষিণাংশে পণ্ডিত মহাশয় ও শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নবকুমার বিশ্বাস মহাশয়ের রান্নার ও থাকিবার দুখানা ঘর আছে। যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু নিজেরাই সংগ্রহ করিয়া আহারাদি ব্যাপারে আশ্রম হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া উহাঁরা আনন্দে ভজন সাধন করিতে করিতে দিন কাটাইতেছিলেন। সম্প্রতি ঠাকুরের আদেশক্রমে তাঁহাদের আহারাদির বন্দোবস্ত আশ্রমেই হইয়াছে।

তাঁহাদের রান্নাঘরটি শূন্য পাইয়া আমার আসন ঐ ঘরে আনিবার সুযোগ পাইলাম। জঙ্গলের ভিতরে দরজা-শূন্য ফাঁকা ঘরে আসন, বস্ত্র ও হোমের ঘৃতাদি সমস্ত আয়োজন রাখিয়া, ঠাকুরের নিকটে সারা দিন থাকায় উদ্বেগশূন্য হইতে পারিতেছি না। গেণ্ডারিয়া জঙ্গলে বাঘের অভাব নাই, সাপও বিস্তর; রাত্রিতে ঐ ঘরে যাইয়া একাকী আমাকে থাকিতে অনেকে নিষেধ করিতেছেন। একটু তফাৎ থাকি বলিয়া রাত্রিতে যে আনন্দ সকলে ঠাকুরকে নিয়া ভোগ করেন, আমি তাহাতে বঞ্চিত।

আর একটি ঘটনায় আমার চিত্তকে বিষম অস্থির করিয়া ফেলিয়াছে। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একদিন আমি আশ্রমে রান্নায় নিযুক্ত আছি, ভয়ঙ্কর মেঘ গর্জ্জন করিয়া অকস্মাৎ ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমার হোমের কাঠগুলি একটু ভিজা ছিল বলিয়া, ভালরূপে শুকাইয়া লইবার মানসে উহা আসন-ঘরের উত্তর দিকের একটা অনাবৃত স্থানে রৌদ্র পাইবার জন্য রাখিয়া আসিয়াছিলাম। বৃষ্টি আরম্ভ হইতেই, 'হায় ঠাকুর কি হইল! কাঠগুলি ভিজিয়া গেল,—ভাবিয়া অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কল্য ভিজা কাঠে কি প্রকারে হোম করিব চিন্তায় অস্থির হইয়া মনে মনে ঠাকুরকে জানাইলাম; তাঁর দয়া হ'লে সবই সম্ভব—না হ'লে আর উপায় নাই, বুঝিয়া অগত্যা স্থির হইলাম। আহারান্তে রাত্রে বৃষ্টি থামিলে আসনে যাইয়া দেখি, সমস্তগুলি কাঠ ঘরের মধ্যস্থলে সাজান রহিয়াছে! আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রাত্রির অধিকাংশ সময় ভাবিতে লাগিলাম, কাঠগুলি কে ঘরে আনিয়া রাখিল! পরে ২।৩ দিন সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়া কাটাইলাম, কে উহা ঘরে নিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু সকলেই বলিলেন, "জানিনা"। পণ্ডিত দাদা বলিলেন, "এ বিষয়ে আর অনুসন্ধান কেন? অন্য দ্বারা হ'লেও উহাতো ঠাকুরই করাইয়াছেন।" সাধারণের নিকটে ঘটনাটি সামান্য বোধ হইলেও এই ব্যাপারে আমার চিত্তটিকে অত্যন্ত আলোড়িত করিয়া ফেলিয়াছে। হায়! হায়! আমার ব্যস্ততা দেখিয়া ঠাকুরেরই এই কর্ম্ম!

পণ্ডিত দাদাদের রান্নাঘরেই আমার আসন করিলাম। বেশ সুবিধা হইল। আশ্রমের অন্তর্গত হওয়ায় আর কোন প্রকার অসুবিধাই রহিল না।

কর্ম্ম কিসে শেষ হয়?

আজ নির্জ্জন পাইয়া পাঠান্তে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"শুনিতে পাই, কর্ম্মই মানুষের বন্ধন। এই কর্ম্ম কিসে শেষ হয়? কর্ম্ম করিয়াই কি কর্ম্মকে শেষ করিতে হয়?" ঠাকুর বলিলেন ঃ—"তা কি কখনও হ'য়ে থাকে! **কর্ম্ম ক'রে কেহই কর্ম্মকে শেষ**

কর্‌তে পারে না। কর্ম্ম কর্‌তে কর্‌তে মানুষ আরও কর্ম্মে জড়িত হ'য়ে পড়ে। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্ম শেষ করা যায় বটে, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। উহা অভ্যাস করা সহজ নয়। সাধন দ্বারা কর্ম্ম শেষ করাই সহজ।"

জিজ্ঞাসা করিলাম:—"সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিলেও কর্ম্ম শেষ হইতে এত বিলম্ব হয় কেন? সদ্‌গুরুর আশ্রয়াদি নিয়াও কি আবার সাধনভজন করিয়া প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ করিতে হইবে!"

প্রশ্নটি শুনিয়া ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিতে লাগিলেন:—"সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেলে কর্ম্ম আপনা আপনি শেষ হ'য়ে আসে। আগুণের উপরে রাশীকৃত কাঠ চাপায়ে রাখ্‌লে ধুনিয়ে ধুনিয়ে ধীরে ধীরে যেমন উহা দগ্ধ হ'তে থাকে, পরে একটু বাতাস পেলেই একবারে দপ্‌ ক'রে জ্ব'লে উঠে, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত কাঠ জ্বালায়ে দিয়ে একেবারে ভস্ম ক'রে ফেলে, সেইরূপ গুরুপ্রদত্ত শক্তিও, বহুজন্মের কর্ম্মরূপ আবর্জ্জনার নীচে থেকে, ধীরে ধীরে কার্য্য কর্‌তেছে এবং ঐ সমস্ত আবর্জ্জনা ধীরে ধীরে নষ্ট কর্‌তে কর্‌তে গুরুকৃপায় যখন উহা একবার দপ্‌ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌বে তখনই সমস্ত কর্ম্মরাশি মুহূর্ত্ত মধ্যে নষ্ট ক'রে, প্রকৃত শান্তির অবস্থাতে নিয়ে যাবে। গুরুশক্তি আপনা আপনি কার্য্য করে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম:—"যে সকল দুষ্কার্য্য প্রারব্ধহেতু করা হয়, তাহা যে প্রারব্ধেরই কার্য্য, তাহা কি প্রকারে জানা যায়?"

ঠাকুর বলিলেন:—"একটী কার্য্যে নিতান্ত অনিচ্ছা থাক্‌লেও এবং পুনঃ পুনঃ বিরত হ'তে চেষ্টা ক'রেও যখন অবশ হ'য়ে তা ক'রে ফেলে, তখন উহা প্রারব্ধ বশতঃই হ'ল জান্‌বে। ঐ প্রকার কার্য্য হওয়ার পরে, যথার্থ অনুতাপ এলেই ঐ প্রারব্ধ শেষ হ'য়ে যায়। প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে লক্ষ্য রেখে নাম কর্‌তে পার্‌লে সমস্ত প্রারব্ধই খুব শীঘ্র নষ্ট হয়। এত সহজে আর কিছুতেই হয় না।"

জীবন্মুক্তের কর্ম্ম; প্রারব্ধক্ষয়ের উপদেশ।

জ্যৈষ্ঠ ১৩ই—৩১শে, জুন ১৮৯১। আজ জিজ্ঞাসা করিলাম:—"মানুষ যখন একেবারে নিঃস্বার্থ হইয়া যায়, জীবন্মুক্ত হইয়া যায়, তখনও কি তার কর্ম্ম থাকে?"

ঠাকুর বলিলেনঃ—“মানুষের যতদিন স্বার্থ আছে, ততদিন আর তার কর্ম্ম কোথায়! মানুষ যখন মুক্ত হয়, তখনই তার যথার্থ কর্ম্ম আরম্ভ হয়। স্বার্থ নষ্ট হ'য়ে মুক্তাবস্থা লাভ কর্‌লে, সমস্ত সংসারের জন্য অবিশ্রান্ত খাট্‌তে হয়। নিঃস্বার্থ না হ'লে প্রকৃত কর্ম্মের আরম্ভই হয় না। জীবন্মুক্ত হ'লেই যথার্থ কর্ম্মের আরম্ভ।”

জিজ্ঞাসা করিলামঃ—“প্রারব্ধে যাহা আছে, তাহা ভোগ না করিয়া কি উপায় নাই? সমস্ত প্রারব্ধই কি ভুগিয়া শেষ করিতে হইবে?”

ঠাকুর বলিলেনঃ—“ভগবান্ যেটুকু প্রারব্ধ ভোগ করাবেন, তাহা কোন প্রকারেই ছাড়াতে পার্‌বে না। তবে যাহারা প্রফুল্লমনে কর্ম্ম ক'রে যায়, ঝাঁ ক'রে তাদের কর্ম্মশেষ হ'য়ে যায়। আর বেগারের মত কর্ম্ম কর্‌লে, ক্রমে অনেক কর্ম্মে জড়িয়ে ধরে। কর্ম্মকে কখনও উপেক্ষা কর্‌তে নাই। কর্ত্তব্যবোধে প্রফুল্লমনে কর্ম্ম ক'রে যাও, তা হ'লেই খুব শীঘ্র প্রারব্ধ শেষ হ'য়ে যাবে।”

কিছু দিন হইল ঠাকুর বলিয়াছিলেনঃ—“কর্ম্ম করিয়া কর্ম্ম শেষ করা যায় না, সাধন দ্বারাই কর্ম্ম শেষ করা সহজ।” আবার এখন বলিলেন,—“ভগবান্ যেটুকু প্রারব্ধ ভোগাইবেন, কিছুতেই ছাড়াইতে পারিবে না। প্রফুল্লমনে কর্ম্ম করিয়া যাও, শীঘ্র প্রারব্ধশেষ হ'য়ে যাবে।” এই দুই প্রকার কথার সামঞ্জস্য করিতে গিয়া আমি এই বুঝিলাম যে, ভগবান্‌ই সকলের কর্ত্তা, তাঁরই ইচ্ছায় প্রারব্ধভোগ। সাধন ভজন করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইতে পারিলে, তাঁহার কৃপায় মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত প্রারব্ধও শেষ হইতে পারে। সুতরাং একান্তপ্রাণে তাঁকেই ডাকি। কিন্তু ভগবান্ যে কি, তাহাতো কিছুই জানি না। অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী ভগবান্‌কে কি ভাবে ডাকিতে হয় —পূজা করিতে হয়, তাহাতো বুঝিতেছি না। শূন্যে ঢিল্ মারিবার মত, লক্ষ্য স্থির না করিয়া, নাম করিতেছি মাত্র। মনে এই খট্‌কা উপস্থিত হইলে নির্জ্জন পাইয়া ঠাকুরকে প্রাণ খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলামঃ—“অনাদি অনন্ত সর্ব্বব্যাপী ভগবান্‌কে কিছুতেই তো ধারণা করিতে পারিতেছি না। তাঁর পূজা আর কিরূপে করিব? শূন্যে যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয়রান্ হইতেছি। গুরুর ধ্যানে ও পূজায় ভগবানের পূজা হয় না কি?—আমাকে পরিষ্কাররূপে ইহা বুঝাইয়া দিন্।”

গুরুই ভগবান্।

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"অগ্নিতো সকল স্থানেই আছে; কিন্তু সেই অগ্নি কি কেউ ধর্‌তে পারে ?—না তাহা দ্বারা কোনও কায হয় ? আগুনের আবশ্যক হ'লে,সর্ব্বত্র যে আগুন আছে, শূন্যে যে আগুন র'য়েছে, তা হ'তে কেহ উহা নিতে পারে না। প্রদীপ, ধুনী, চুল্লী ইত্যাদি যে সকল স্থানে ঐ অগ্নি জ্বলন্তভাবে বিশেষরূপে প্রকাশিত রয়েছে, সেখানেই যেয়ে আগুন নিয়ে থাকে। সেরকম ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হ'লেও, কেউ তাঁকে ধর্‌তে পারে না। গুরুতে ঈশ্বরের চিৎশক্তির প্রকাশ দেখে, তথায়ই পূজা কর্‌তে হয়। গুরুতো আর মানুষ নন। গুরুই ভগবান্, গুরুর পূজাই ঈশ্বরের পূজা।"

সাধকজীবনে শুষ্কতার আবশ্যকতা।

অনেক সময় নাম করিতে করিতে অত্যন্ত নিরাশা, উদ্বেগ ও শুষ্কতা আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন নাম করিতে জ্বালা হয়। তাই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,ঃ—"সাধনের সময় কখনও কখনও বড়ই নিরাশ হই, শুষ্কতা ও জ্বালা আসিয়া অস্থির করে, সাধন ভজন এই সময়ে ভাল লাগে না। কতকাল এই শুষ্কতা ভোগ হইবে ? এইরূপ হয় কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"দেখ, এই বর্ত্তমান গ্রীষ্মকাল কেমন ভয়ানক ! পুকুর, খাল, বিল, সমস্ত শুখায়ে গেছে। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে সবাই অস্থির হতেছে,সকল প্রাণীই হাহাকার কর্‌তেছে। গাছপালাও পূর্ব্বের মত নাই, দেখ্‌লেই মনে হয় যে, কি এক বিষম অবস্থা ! বাস্তবিক প্রকৃতির পক্ষে এমন দারুণ অবস্থা আর কখনও হয় না। কিন্তু ভেবে দেখ, এই গ্রীষ্মকাল না হ'লে বর্ষা আসে না, প্রকৃতি আবার নূতন সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হয় না। এই গ্রীষ্মকালই প্রকৃতির নূতন সৌন্দর্য্যের কারণ। গ্রীষ্ম হয় ব'লেই আমরা বর্ষার এত সুখ, এত সৌন্দর্য্য অনুভব করি। সাধনের অবস্থাও ঠিক এই প্রকার। সাধনের সময়ে শুষ্কতা, নিরাশা, জ্বালা, ইত্যাদি বিবিধ প্রকার দুঃখের অবস্থা ভোগ কর্‌তে হয় ব'লেই, ধর্ম্মের এত সৌন্দর্য্য। নিরাশা বা শুষ্কতা না এলে ধর্ম্মের আনন্দই থাক্‌ত না। এই সকল

অবস্থার ভিতর দিয়ে মানুষ যখন ধর্ম্মের উচ্চতম শৃঙ্গে উপনীত হয়, তখনই যথার্থ শান্তি লাভ করে। তা না হওয়া পর্য্যন্ত এ সকল অবস্থা হ'তে মানুষ কিছুতেই নিষ্কৃতিলাভ কর্‌তে পারে না। এখন এ সকলই প্রয়োজন। যদি শান্তির অবস্থা একবার লাভ হয়, তাহ'লে আর কিছুতেই তা নষ্ট হয় না।"

অসময়ে শাস্ত্রপাঠের ও সাধুসঙ্গের অপকারিতা।

জিজ্ঞাসা করিলাম:—"অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করাতে এবং অনেক সাধুর সঙ্গ করাতে ধর্ম্মজীবনের কল্যাণ হয়, না অনিষ্ট হয়?"

ঠাকুর বলিলেন:—"সমস্ত কার্য্যেরইতো একটা প্রণালী আছে। অসময়ে অনিয়মে কোন কার্য্যেরই সুফল লাভ হয় না, বরং ক্ষতিই হয়। শাস্ত্রপাঠ ও সাধুসঙ্গ করারও একটা সময় আছে, অবস্থা আছে। অসময়ে এলো মেলো ওসব কর্‌লে কোন উপকারই হয় না, বরং অনিষ্টই হয়। শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি-অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন পন্থা এবং অবস্থা-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ আছে। প্রকৃতি-অনুযায়ী পন্থা ধ'রে কিছু দূর অগ্রসর হ'লে, অবস্থানুরূপ শাস্ত্র পাঠ কর্‌তে হয়। নিজের সাধন-পথে একটা নিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও শাস্ত্রপাঠ বা কোনও সাধুসঙ্গ করাই ঠিক নয়। অনেক সময়ে দেখা যায়, ওরকম করায় লোকের বিষম ক্ষতি হয়। আপন সাধন ভজনের পথে নিষ্ঠা, একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়।"

গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে নিত্য সংকীর্ত্তন ও ভাবাবেশ।

গ্রীষ্মের ছুটির সময় নানা দিক হইতে গণ্য মান্য বহু গুরুভ্রাতারা ঠাকুরদর্শনে গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আসিয়াছেন। আজকাল সাধু সন্ন্যাসী, বাউল, উদাসী এবং মুসলমান ফকিরেরাও আশ্রমে আসিতেছেন, যাইতেছেন, কেহ বা থাকিতেছেন। গুরুভ্রাতারা আপন আপন রুচি-অনুযায়ী গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া, পৃথক্ পৃথক্ দলে, স্থানে স্থানে বসিয়া, কোথাও স্থির ভাবে নাম প্রাণায়াম করিতেছেন, কোথাও উৎসাহের সহিত ধর্ম্মালোচনায় ব্যস্ত আছেন, কোথাও বা কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া সময় কাটাইতেছেন। ঠাকুরের সেবার কার্য্য লইয়া কাহারও কাহারও ভিতরে প্রতিযোগিতা এবং ঝগড়া বিবাদও চলিতেছে। সকলেই

একই ভাবে মত্ত ; উদয়াস্ত যে কি ভাবে যাইতেছে কাহারও লক্ষ্য নাই ; কেমন যেন একটা নেশাতে দিনরাত চলিয়া যাইতেছে। প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময় সকলে একত্র মিলিত হইয়া, ঠাকুরের নিকট কখনও আশ্রমের পূবের ঘরে, কখনও বা আমতলায় খুব উৎসাহের সহিত সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই সংকীর্ত্তন এক মহাব্যাপার। বরিশাল বানরিপাড়া, ঢাকা ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গুরুভ্রাতারা একত্র হইয়া, খোল করতাল লইয়া যখন উচ্চ সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন, তখন সকলেরই দৃষ্টি একমাত্র ঠাকুরের উপরে। ঠাকুর আসনে উপবিষ্ট অবস্থায়ই ঘন ঘন কম্পিত হইতে থাকেন, পুনঃ পুনঃ চাপিতে চেষ্টা করিয়াও স্থির থাকিতে না পারিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠেন ; উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া "হরিবোল হরিবোল" ধ্বনি করিতে থাকেন। ঠাকুরের হুঙ্কারে, হরিবোল ধ্বনিতে, চারিদিকে স্ত্রীলোক পুরুষের ভিতরে যেন কি এক অদ্ভুত শক্তি প্রবেশ করে। দেখিতে দেখিতে দুই চারি মিনিটের মধ্যেই মহা হুলস্থুল ব্যাপার আরম্ভ হয়, সকলে যেন কেমন এক প্রকার হইয়া যান। কেহ কেহ "জয় রাধে, জয় রাধে" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন, কেহ কেহ "হরিবোল হরিবোল" ভীষণ রব ছাড়িয়া নির্ণিমেষে ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বহির্ব্বাস উড়াইয়া ঠাকুরকে পরিক্রমা করিতে থাকেন, কেহ বা "নিতাই নিতাই" বলিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া হুঙ্কার করিতে করিতে মল্লবেশে ঠাকুরের সম্মুখীন হইতে থাকেন, আবার কেহ কেহ বা কিঞ্চিৎ কাল নিস্পন্দ অবস্থায় দাঁড়ান থাকিয়া ঠাকুরের দিকে একটানা দৃষ্টি রাখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া যান। সকলেই কোনও না কোনও ভাবে মাতোয়ারা, ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া দিশাহারা ! খোলের ধ্বনি ও সঙ্কীর্ত্তনের রব, গুরুভ্রাতাদের হুঙ্কার ও গর্জ্জনে মিলিত হইয়া অদ্ভুত তাড়িৎ-প্রবাহে দর্শকমণ্ডলীকেও কাঁপাইয়া তোলে। এই সময়ে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে পর্দ্দার আড়ালে স্ত্রীমহলেও বিষম কান্নার রোল উঠিয়া পড়ে। বাহ্যজ্ঞান-শূন্যাবস্থায় কেহ কেহ নৃত্য করিতে করিতে ঠাকুরের দিকে ছুটিয়া আসিতে থাকেন, কেহ কেহ মূর্চ্ছিতাবস্থায় ধরাশায়ী হইয়াও গড়াইয়া গড়াইয়া ঠাকুরের চরণসমীপে আসিয়া লুটাইতে থাকেন, আবার কেহ বা পাগলের মত ছুটিতে ছুটিতে ঠাকুরকে ধরিতে যাইয়া বাধা পাইয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন ও ছট্‌ফট্ করিতে থাকেন। আমরা কয়েকটি গুরুভাই সাধারণের স্পর্শ হইতে ঠাকুরকে বাঁচাইয়া রাখিতে ঠাকুরের চারিদিকে বেরিয়া দাঁড়াইয়া থাকি ; এবং ভাবাবেশে উন্মত্ত, মুগ্ধ, মূর্চ্ছিত ও ঠাকুরের দিকে ধাবিত, স্ত্রীলোক পুরুষদিগের অবস্থা বুঝিয়া সরাইয়া দেই। আশ্রমে আজ কাল প্রত্যহই এইরূপ মহা আনন্দ, মহা উৎসব ! ধন্য ঠাকুর ! ধন্য ঠাকুর !! তোমার সঙ্গলাভে আমরাও ধন্য !

সাধন কি ? সাধকের ও সিদ্ধের কর্ত্তব্য কি ?
ধর্ম্ম হইল কিনা কিসে বুঝিব ?

আহারান্তে ঠাকুর যখন আমতলায় বসেন, কিছুক্ষণ লোকের ভিড় তেমন থাকে না। পাঠান্তে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মানুষের অশান্তির মূল কি ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"মানুষের সমস্ত অশান্তিই ধৈর্য্যের অভাবে। ধৈর্য্যই মানুষের মনুষ্যত্ব। চঞ্চলতাই অশান্তির একমাত্র কারণ।"

একটু থামিয়া ঠাকুর নিজ হইতেই আবার বলিতে লাগিলেন ঃ—"মানুষের কোন বিষয়েই চঞ্চল হওয়া ঠিক নয়। মানুষ যখনই যা ক'র্‌বে, স্থির ভাবে বিচার ক'রে করা উচিত। হঠাৎ কোনও কাযই করা সঙ্গত নয়। সকল বিষয়েই খুব ধৈর্য্য ধ'রে কার্য্য কর্‌তে হয়। ধৈর্য্যই ধর্ম্ম, ধৈর্য্যই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"আমাদের সাধন কি ? নামজপ করাই কি সাধন ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"সদ্‌গুরু-প্রদত্ত নামজপ করাকে সাধন বলে না। সদ্‌গুরু-প্রদত্ত নাম গুরুশক্তি-প্রভাবে, আপনা আপনি অনন্ত কাল চল্‌বে। সকল বিষয়েই চঞ্চলতা পরিত্যাগ ক'রে অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত বিচার ক'রে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই যথার্থ সাধন। সকল বিষয়ে ধৈর্য্য অবলম্বন করাই সাধন।"

বিচারপূর্ব্বক কার্য্যের কথা শুনিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সাধক সাধনের অবস্থায় তো সমস্ত কার্য্যই বিচারপূর্ব্বক করিবে। সিদ্ধ হইলে কি আর বিচার করিয়া কার্য্য করিবে না ?"

ঠাকুর বলিলেনঃ—"সিদ্ধ পুরুষের কাছে যে সকল বিষয় আস্‌বে, তিনি তা ভগবানের সম্মুখে নিয়ে ধর্‌বেন। যে সব বিষয়ে ভগবানের জ্যোতিঃ সুস্পষ্টরূপে প'ড়েছে দেখ্‌তে পাবেন, তাহাই কর্ত্তব্য ব'লে স্বীকার কর্‌বেন। সিদ্ধ মহাপুরুষেরা সমস্ত কাযই ভগবানের ইঙ্গিত-অনুসারে করেন। সিদ্ধ মহাপুরুষেরা নিজ ইচ্ছায় কিছুই করেন না। তাঁরা ভগবানের ইচ্ছার পশ্চাতে দাঁড়ায়ে নিশান ধরেন মাত্র।"

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ধর্ম্ম যথার্থই প্রকৃতিগত হইয়াছে কি না কিসে বুঝিব ?"

ঠাকুর বলিলেনঃ—আগুন যেমন সকল অবস্থাতেই একপ্রকার থাকে, কোন অবস্থায়ই উহার উত্তাপ নষ্ট হয় না, সেই প্রকার আপদে বিপদে, আনন্দে উল্লাসে, কোন অবস্থায়ই যাহার ধৈর্য্য নষ্ট না হয়, সত্য ও ধর্ম্ম একই রকম থাকে, বিনয় ও সমতার কিছুমাত্র ভাবান্তর না হয়, তাহারই ঐ সকল ধর্ম্ম প্রকৃতিগত হ'য়েছে জান্‌বে। সকল অবস্থাতেই, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, বিনয় ও মিত্রতা ঠিক থাক্‌লে যথার্থ ধর্ম্মলাভ হ'য়েছে বুঝ্‌বে। বিপদে, সম্পদে, নিন্দাতে ও প্রশংসাতেই মানুষের যথার্থ ধর্ম্মলাভ হ'য়েছে কি না পরীক্ষা হয়।"

এই সকল উপদেশের সময় ঠাকুর অনেক গল্প ও দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেন। ধর্ম্ম সহজ জিনিস নয়,--এ জীবনে কি আর তাহা লাভ হইবে !

ভাব-বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্য-উপদেশ।

নিষ্ঠাবান হিন্দু, শাস্ত্র-সদাচার-ভ্রষ্ট ব্রাহ্ম, এমন কি মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের গণ্য মান্য অবস্থাপন্ন লোকসকলও ইতি-মধ্যেই সাধন গ্রহণ করিয়া ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলে কিছুকাল একস্থানে বাস করায়, সময়ে সময়ে আচার ব্যবহারের পার্থক্যবশতঃ ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে তর্ক, কলহ, বাদ, বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়া থাকে ও নানা বিষয়ে মতের অনৈক্য উপস্থিত হয়। এই সমস্ত মতামতের ও আচার ব্যবহারের বিরোধ-মীমাংসার জন্য, সময়ে সময়ে উভয় পক্ষই স্পর্দ্ধার সহিত ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হন। সাধারণের সাধারণ অনুষ্ঠানের উপরে কেহ কিছু করিলেই, তাহা অসার প্রতিপন্ন করিতেও ঠাকুরের নিকটে কত সময়ে কত প্রশ্ন করা হয়, কিন্তু সমস্যার ভিতরে উভয় পক্ষকেই সন্তুষ্ট রাখিয়া ঠাকুর আশ্চর্য্য ভাবে প্রতি প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দেন।

আজ ঠাকুর সকলকে বলিলেনঃ—"সকলেরই অবস্থার সহানুভূতি কর্‌তে হয়। অন্যের মতের সঙ্গে অনৈক্য, বা অবস্থার সঙ্গে অমিল হ'লেই, তাহা একেবারে উড়ায়ে দিতে নাই। অন্যের অবস্থার বিচার কর্‌তে হ'লে, ঐ অবস্থা নিজের ব'লে অনুভব কর্‌তে হয়, এক ইঞ্চি তফাৎ থাক্‌লেও এক জনের অবস্থার প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব, দোষ বা গুণ অন্য জনে ঠিক বুঝ্‌তে পারে না। মতের

অনৈক্য, অবস্থার পার্থক্য, এ সমস্ত তো সংসারে চিরকালই থা'ক্‌বে। ভগবানের রাজ্যে কোনও দুটি বস্তুই ঠিক একমত নয়। কোন না কোন অংশে কিছু পার্থক্য থা'ক্‌বেই। এই নানা বিচিত্রতার মধ্যেও একটী সুন্দর শৃঙ্খলা আছে। যতদিন মানুষ তাহা দেখ্‌তে না পায়, ততদিনই গোলমাল করে। বাস্তবিক সকলেই একপ্রকার হ'লে প্রকৃতির একটা সৌন্দর্য্যই থাকে না। নানাপ্রকারের ফুলগাছে বাগানের যেমন একটা চমৎকার শোভা হয়, শুধু এক রকমের গাছে সেই রকমটি কখনও হয় না। এসংসারও সেইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির সমাবেশে এক সুন্দর শোভা ধারণ ক'রেছে। মানুষ যখন তা দেখ্‌তে পায়, তখন সমস্ত বিরোধই ছুটে যায়, প্রকৃতির বিচিত্রতার ভিতরে ভগবানের আশ্চর্য্য সৃষ্টিশৃঙ্খলা ও অদ্ভুত কৌশল দে'খে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে যায় ও পরমানন্দ লাভ করে। কিছুতেই তারা আর বিচলিত হয় না; অশান্তি ভোগ করে না। নিজের স্থানে নিজে ঠিক থেকে অন্যের অবস্থা মাত্র দে'খে যেতে হয়। তবেই ক্রমে শান্তি।—

"সব্‌ছে রসিয়ে, সব্‌ছে বসিয়ে, সব্‌ছে লীজিয়ে কাম্‌,
হাঁজি, হাঁজি কর্‌তে রহিয়ে, বৈঠিয়ে আপন্‌ ঠাম্‌।"

দুর্গাচরণ বাবুর প্রতি ফকিরের অত্যাচার।
সম্পূর্ণ ক্ষমাতে ভগবানের দণ্ড।

আমাদের গুরুভ্রাতা গেণ্ডারিয়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাহা মহাশয় ফকিরদের সঙ্গে কিছুদিন মিশিয়া কতগুলি বুজ্‌রুকী শিখিয়াছেন। সময়ে সময়ে দুর্গাচরণ ঠাকুরের নিকটেও ঐ সকল বুজ্‌রুকী দেখাইয়া খুব আমোদ করেন। আমরাও খুব আমোদ পাই, তামাসা করি। গাঁজা খাইতে আমাদের সকলের নিষেধ থাকিলেও ফকিরদের চক্রে পড়িয়া দুর্গাচরণ গাঁজা খাইতে বেশ অভ্যাস করিয়াছেন। শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় একদিন দুর্গাচরণকে বলিলেন, "দুর্গা-চরণ, গাঁজাটা কেন খাও?" দুর্গাচরণ একটু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "আপনারা সাধারণতঃ যে সব স্থলে বিচরণ করিতেছেন, তাহা হইতে একটু উপরে উঠিতে হইলেই, গাঁজায় একটু দম্‌ দিয়া নিতে হয়।" গাঁজা খাইলেও দুর্গাচরণ অতিশয় বিনীত ও নিরীহ প্রকৃতির ভাল মানুষ। গেণ্ডারিয়ার একটী প্রভাবশালী ফকিরকে দুর্গাচরণ প্রত্যহ

দু-চার পয়সার গাঁজা দিয়া থাকেন। দিন দুই হইল দুর্গাচরণের হাতে পয়সা না থাকায় তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে ফকির সাহেবকে গাঁজা দিতে না পারিয়া ভীত হইলেন, এবং আশ্রমে আসিয়া আমতলায় ঠাকুরের নিকটে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ফকির সাহেব সময়ে গাঁজা না পাইয়া দুর্গাচরণকে তালাস করিতে করিতে অপরাহ্নে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুরের নিকটে দুর্গাচরণকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকতে দেখিয়া, ক্রোধে অগ্নি-মূর্ত্তি হইয়া পড়িলেন। হাতে একখানা বেত ছিল, তাহা দ্বারা অতি নিষ্ঠুরের ন্যায় সজোরে দুর্গাচরণের পৃষ্ঠে আঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "আরে শালা! গুরুকা সাম্‌নে আয়্‌কে বৈঠা হায়! তুঝ্‌কো মার্‌নেছে তেরা গুরু হামারা ক্যা করেগা?" দুর্গাচরণ ইচ্ছা করিলে অনায়াসে ফকির সাহেবকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে পারিতেন, কিন্তু কোনও প্রকার চঞ্চলতা প্রকাশ না করিয়া মার খাইয়া ঠাকুরের মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া কান্দিতে লাগিলেন। ঠাকুর দুই একবার মাত্র ফকিরের দিকে তাকাইয়া স্থির হইয়া রহিলেন। ফকির সাহেবও খুব দম্ভের সহিত হাতের বেত্‌ ঘুরাইতে ঘুরাইতে আশ্রম হইতে বাহির হইয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া দুর্গাচরণকে বলিলেন ঃ—"**দুর্গাচরণ, ফকিরসাহেব অন্যায়রূপে তোমাকে এত প্রহার কর্‌লেন, আর তুমি চুপ ক'রে র'লে? একেবারে কিছুই বল্‌লে না?**"

দুর্গাচরণ বলিলেন,—"প্রভো! আপনার সাক্ষাতে আমি কিরূপে উহাকে বল্‌ব! আমিতো ঠাকুরের-ই উপরে সব ছে'ড়ে দিয়েছিলাম।"

ঠাকুর বলিলেনঃ—"**আহা! ওরূপ কর্‌তে নাই। প্রতিফল দিতে সমর্থ হ'য়েও অত্যাচার ভোগ ক'রে যাঁরা ভগবানের হাতে একেবারে ছেড়ে দেন, তাঁরা অত্যাচারীর দফা শেষ করেন। আশ্রম হ'তে বা'র হ'য়েই ফকিরসাহেব কি বিষম বিপদে প'ড়েছেন, অনুসন্ধান নিলেই সমস্ত জান্‌তে পার্‌বে।**"

দুর্গাচরণ আশ্রম হইতে বাহির হইয়া, ফকির সাহেবের অনুসন্ধান নিলেন ও আসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন, "ঐদিন ফকির সাহেব বেত ঘুরাইতে ঘুরাইতে লোহার পুলের নিকটে উপস্থিত হইয়া এক ব্যক্তিকে অনর্থক গালাগালি করিতে থাকেন। নিকটে পাহারাওয়ালা ছিল, সে ফকির সাহেবকে গালাগালি করিতে নিষেধ করায় ফকির সাহেব কাণ্ডাকাণ্ড-শূন্য হইয়া হস্তস্থিত বেতদ্বারা পুলিশকে কয়েক ঘা আঘাত করেন, পরে দু চার জন পাহারা-

ওয়ালা একত্র হইয়া উহাকে ধরিয়া নিয়া গিয়াছে। আজ শুনিলাম, ফকির সাহেব পাগল হইয়াছে অনুমানে তাহাকে ঐ দিন পাগ্‌লাগারদে দেওয়া হয়। জেলের দারোগা এবং ডাক্তারের নিকট নীত হইলে, ফকির সাহেব নানা প্রকার অশ্লীল ভাষায় তাহাদিগকে গালি দেন। এই অপরাধে সেই দিন হইতে তাঁহার উপর প্রত্যহ সকালে ও বিকালে পাঁচ পাঁচটি করিয়া দশ ঘা বেতের আদেশ হইয়াছে। প্রতিদিন ফকির সাহেব বেত্রাঘাত ভোগ করিতেছেন।" ঠাকুর এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। এবং ফকির সাহেবের মুক্তির জন্য কয়েকটি ভদ্র লোককে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন। সম্ভবতঃ এই সকল পদস্থ লোকের চেষ্টায় অচিরেই ফকির সাহেব কারামুক্ত হইবেন।

দুর্গাচরণ ফকির সাহেবের প্রতিশোধ নিলে, তাহার আর এই বিষম দুর্দ্দশা ঘটিত না —অনুমানে, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেহ অন্যায়রূপে অত্যাচার করিলেই কি তার প্রতিহিংসা নেওয়া উচিত ?"

ঠাকুর প্রশ্ন শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেনঃ—"রাম ! রাম !! প্রতিহিংসা কি আর মানুষে নেয় ! অত্যাচারীকে সর্ব্বদাই ক্ষমা কর্‌বে। অত্যাচারীর মঙ্গল অকাঙ্ক্ষা কর্‌বে। তবে যিনি অত্যাচার করেন, তাঁরই কল্যাণের জন্য, ভিতরে সম্পূর্ণ ক্ষমা ও শান্তি রেখে, বাইরে একটু কৃত্রিম ক্রোধ দেখায়ে দু চার কথায় কিছু শাসন ক'রে দিতে হয়। ইহাতে প্রতিফলও দেওয়া হ'ল, অত্যাচারীকে বিষম দণ্ড হ'তে রক্ষাও করা হ'ল। সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা ক'রে ভগবানের হাতে একেবারে ছেড়ে দিলে, অত্যাচারীকে অত্যন্ত দণ্ড পে'তে হয়। গয়াতে এরূপ একটী ঘটনা হ'য়েছিল। গয়াতে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে যখন আমি ছিলাম, তখন কিছুদিন একটি পরমহংসও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। একদিন, পরমহংসের একটী শিষ্য, একাদশীতে নিরম্বু উপবাস ক'রে, দ্বাদশীর দিনে সকালে উ'ঠে ফল্গুতে যেয়ে স্নান কর্‌লেন, বিষ্ণুপদ দর্শন কর্‌তে একটু বিলম্ব হ'ল। সঙ্গে তিনি একটি গোপাল ঠাকুর সর্ব্বদাই রাখ্‌তেন। দ্বাদশীর পারণের সময় অতীত হ'য়ে যেতেছে দে'খে ব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌লেন, এবং তাড়াতাড়ি একটা ময়রা-দোকানে উপস্থিত হ'য়ে দোকানদারকে বল্‌লেন,—'পারণের সময় চলে যেতেছে, আমাকে একটু মিষ্টি দেও, গোপাল ঠাকুরকে ভোগ চড়ায়ে আমি একটু জল

খা'ব।' দোকানদার তাঁর কথায় কর্ণপাতই কর্‌লে না। সাধু তিন চারবার চেয়েও, 'হাঁ, না' কোন উত্তর না পেয়ে ব্যস্ত হ'য়ে একখণ্ড বাতাসা নিতে যেম্‌নি হাত বাড়া'লেন,অম্‌নি দোকানদার ও তার ছেলে, দোকান থেকে লাফায়ে রাস্তায় প'ড়ে, সাধুকে ধ'রে দারুণ প্রহার কর্‌তে লাগ্‌ল। পূর্ব্বদিন নিরম্বু উপবাস ক'রে সাধু কাতর ছিলেন, তার উপরে এইরূপ প্রহার, একেবারে প'ড়ে গেলেন। রাস্তার লোকেরা বহু চেষ্টায় সাধুকে ছাড়া'য়ে দিলেন। সাধু দোকানদারদের একটী কথাও না ব'লে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি ক'রে একটু হেসে নমস্কার ক'রে বল্‌লেন,—"ভালারে দয়াল গুরুজী তেরা লীলা।" এই মাত্র ব'লে সাধুটি পাহাড়ের দিকে চ'লে গেলেন। পরমহংসজী পাহাড়ে একটী চটানের উপর স্থিরভাবে বসেছিলেন, হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌লেন, এবং চটান হ'তে লাফায়ে নীচে প'ড়ে খুব দ্রুতবেগে গোদাবরী (নামক) রাস্তার দিকে ছুটে চল্‌লেন। রাস্তার ধারে শিষ্যকে দে'খে পরমহংসজী বল্‌লেন, "ক্যারে বাচ্চা! ক্যা কিয়া?" শিষ্য বল্‌লেন,—'মৈঁ তো কুছ্ নেহি কিয়া, গুরুজি!' পরমহংসজী বল্‌লেন,—'বহুৎ কিয়া! বড়া বুরা কাম্ কিয়া! রামজিকা উপর বিল্‌কুল্ ছোড়্ দিয়া? আ'কে দেখ্, রামজী উস্কা ক্যায়সা হাল্ কিয়া।' এই বলে শিষ্যটিকে নিয়ে পরমহংসজী ময়রা-দোকানের ধারে যে'য়ে উপস্থিত হলেন। দেখলেন,—ময়রার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। সাধুকে মে'রে ময়রার ছেলে জ্বালানি কাঠ আন্‌তে যেম্‌নি কাঠের ঘরে ঢুকেছিল, অম্‌নি একটী কেউটে সাপ উহাকে দংশন করে। ময়রা ঘি জ্বাল দিতেছিল, সর্পাঘাতে ছেলে মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়েছে শুনেই, উননের উপর ঘি রেখে দৌড়িয়ে যেয়ে ছেলেকে ধর্‌ল, আর টানাটানি ক'রে ছেলেকে রাস্তায় এনে ফেল্‌ল। এদিকে উননের ঘি জ্ব'লে ময়রার ঘরের চালা ধর্‌ল। পরমহংসজী যেয়ে দেখ্‌লেন, রাস্তায় ছেলেটি মড়ার মত প'ড়ে আছে, ঘরগুলি হু হু ক'রে জ্ব'লে যেতেছে, রাস্তায় লোক দাঁড়ায়ে হাহাকার কর্‌ছে। বিষম ব্যাপার! পরমহংসজী শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে এলেন, শিষ্যকে খুব গাল্ দিয়ে ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন,—'বিনা অপরাধে কেহ অত্যাচার

করলে, ক্রোধ না হ'লেও মুখে অন্ততঃ একটা গালি দিয়ে আসতে হয়। মানুষে সামান্য প্রতিফল দিলেও অত্যাচারী রক্ষা পায়, রামজীর উপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিলে, রামজী গুরুতর শাস্তি দেন। ভগবানের দণ্ড বড়ই বিষম।”

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে আশ্রমের অবস্থা।

বৈশাখ মাসের মধ্যভাগে নানাদেশ হইতে দীক্ষাপ্রার্থী বহু লোক দলে দলে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে শত শত স্ত্রীলোক পুরুষের দীক্ষা হইয়া গেল। দীক্ষার সময়ে গুরুভ্রাতা-ভগ্নিদের উপরে পরলোকগত বিবিধ অবস্থার আত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঐ সময় উহাদের নানা প্রকারের ভাব-উচ্ছ্বাস ও অদ্ভুত কথাবার্ত্তা, স্তবস্তুতি, কান্না, অনুতাপ, এবং অবস্থার বিচিত্রতা দেখিয়া, একেবারে অবাক হইয়া যাই। নিয়ত নবাগত লোকের সমাগমে, প্রায় দেড়মাস যাবৎ এই আশ্রম সর্ব্বদাই যেন সর-গরম হইয়া রহিয়াছে। দিনে রাত্রে লোকের উৎসাহ উদ্যমের বিরাম নাই, আনন্দের একটা স্রোত যেন একটানা চলিতেছে। আহার নিদ্রা বাদে অবশিষ্ট সময়, গুরুভ্রাতারা উল্লসিত প্রাণে ঠাকুরেরই সঙ্গ করিতেছেন, এমনটি আর দেখি নাই। ঠাকুরের নিকটে বসিয়াই সকলের আনন্দ, তাঁর কথাতেই সকলে পরিতৃপ্ত, তাঁর দর্শনেই সকলে মুগ্ধ এবং ঝগড়া বিবাদেও দেখিতেছি, মাত্র তাঁহারই প্রসঙ্গ।

এসময়ে ঠাকুরের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ।

প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে কিছুদিন যাবৎ এখন আর ঘরের বাহিরে টেঁকা যায় না। আহারান্তে মধ্যাহ্নে ঠাকুর পূবের ঘরেই বসিয়া থাকেন। এক্রামপুর হইতে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আসিয়াই, ঠাকুর পূবের ঘরের উত্তর দিকে দক্ষিণমুখ হইয়া আসন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের শ্রীবৃন্দাবন-বাসকালে গেণ্ডারিয়ার গুরুভ্রাতারা, ঠাকুরের আসনের স্থানটি পাকা গাঁথাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন হইতে আসিয়া পাকা গাঁথুনির উপর আর বসেন নাই, ঐ ঘরের দক্ষিণ দিকে উত্তরমুখ হইয়া আসন করিয়াছেন।

ঠাকুর অতি প্রত্যূষে আসন ত্যাগ করিয়া শৌচে য'ান। শৌচান্তে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল আশ্রমেরই ভিতরে, আমতলার দিকে পা-চালি করেন। পরে কখনও সাধনকুটীরে, কখনও বা পূবের ঘরে আসনে আসিয়া বসেন। প্রায় সাতটার সময়ে চা-সেবা হয়। তৎপরে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কুঞ্জ ঘোষ মহাশয়, ভাবে গদগদ হইয়া, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন।

শ্রীমৎ-আচার্য্য শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
(গেণ্ডারিয়া থাকাকালীন প্রতিমূর্ত্তি।)

U. RAY & SONS.

এই পাঠ শুনিতে বহু স্ত্রীলোক পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হ'ন। আমি কিন্তু শুধু ঠাকুরকে দেখিতে এবং ঘোষমহাশয়ের অবস্থা লক্ষ্য করিতেই ঘরে গিয়ে বসি। কুঞ্জবাবু চরিতামৃত গ্রন্থ নমস্কার করিয়া গৌরচন্দ্রিকা পাঠ করিতে করিতেই, কণ্ঠরোধ হইয়া পড়েন। কিছু কিছু পাঠ করিয়াই পুলকাশ্রুকম্পনে অবসন্ন হইতে থাকেন। চরিতামৃতের কোন শ্লোকই পরিষ্কার-রূপে উচ্চারণ করিবার তাহার আর ক্ষমতা থাকে না। ঠাকুর, ঘোষ মহাশয়ের অস্পষ্ট ভাব-বিহ্বল গদগদ স্বর শুনিয়াই যেন ডুবিয়া যা'ন। এই পাঠ শেষ হইতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে। পরে ঠাকুর নিজেই গ্রন্থসাহেব এবং আরো কয়েক খানা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করেন। বেলা প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত এই ভাবে কাটিয়া যায়। এগারটার পরেই ঠাকুর আসন হইতে উঠিয়া শৌচে যা'ন। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই গা ধুইয়া আসনে আসেন। তিলক-সেবা ও ঔষধ সেবনাদিতে প্রায় বারোটা হয়।

মধ্যাহ্নে প্রায় বারোটার সময় ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হয়। তাঁহার ভোজনের পরেই মহাভারত পাঠ আরম্ভ করি। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল মহাভারত পাঠ হয়। পরে ঠাকুর সিদ্ধাসনে স্থির ভাবে বসিয়া থাকেন। এ সময়ে বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে ঘরে কেহ প্রবেশ করেন না, কথাবার্ত্তাও বন্ধ থাকে। ঠাকুর একখানা পুস্তক হাতে মাত্র রাখিয়া চোখ বুজিয়া থাকেন। অবিশ্রান্ত এক ধারায় অশ্রু বর্ষিত হইয়া, পরিধেয় বহির্ব্বাস পর্য্যন্ত ভিজিয়া যায়। ঠাকুর আবেশে দেহ স্থির রাখিতে না পারিয়া, ধীরে ধীরে সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া পড়িতে থাকেন। পনের বিশ মিনিট কাল এক একবার সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকেন, আবার ধীরে ধীরে উঠিয়া বসেন। প্রত্যহই প্রায় পাঁচটা পর্য্যন্ত এই ভাবে কাটিয়া যায়। তৎপরে ঠাকুর আসন হইতে উঠিলে আসন আমতলায় নিয়া পাতিয়া দেই।

অপরাহ্নে সহরের অনেক গণ্য-মান্য লোক দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। আম-তলা লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। ঠাকুর সকলের সঙ্গে কথা বার্ত্তায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটাইয়া দেন। আমি এই সময়ে আহারের চেষ্টায় থাকি ; সুতরাং এই সময়ের কোন ঘটনাই বিশেষ রূপে সাক্ষাৎভাবে জানি না। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে হরিসংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। রাত্রি প্রায় নয়টা পর্য্যন্ত মহা আনন্দ উৎসব হইয়া থাকে। প্রায় দশটার সময়ে, ঠাকুরের রুটি তরকারি হালুয়া প্রভৃতি ভোগ হয়। আহারান্তে রাত্রি চারিটা পর্য্যন্ত ঠাকুর এক ভাবে একাসনে বসিয়া থাকেন। চারিটার পর অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল শয়ন করেন। যোগজীবন প্রভৃতি তিন চারিটি গুরুভ্রাতা রাত্রিকালে ঠাকুরের ঘরে থাকেন। প্রায় পাঁচটার সময়ে ঠাকুর নিজে করতাল বাজাইয়া ভোর কীর্ত্তন করেন। দিন রাত্রি ঠাকুর এইভাবে অতিবাহিত করিতেছেন।

আষাঢ়।

পরমহংস গৌর শিরোমণির দৃষ্টান্ত—দোষে গুণ দর্শন।

আষাঢ়—
১লা—১৫ই

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"পরমহংস কাহাকে বলে ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"দুধে জলে মিশায়ে হংসের নিকটে ধর্‌লে, হংস জলের অংশ ত্যাগ ক'রে, শুধু দুধের অংশই গ্রহণ করে। সেইরূপ এই অনিত্য মিথ্যা সংসারে যাঁহারা কেবল সার সত্যই গ্রহণ করেন, তাঁহারাই পরমহংস। পরমহংসেরা কেবল সারই গ্রহণ করেন,গুণই দেখেন ; দোষ কখনই তাঁহারা দেখেন না। পরমহংসেরা সর্ব্বদাই গুণগ্রাহী হ'ন।"

পরমহংসদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইতে ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের গৌরশিরোমণি মহাশয়ের কথা বলিলেন ঃ—শ্রীবৃন্দাবনে একটী বিষয়-বিরক্ত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বহুকাল নির্জ্জনে ভজন সাধন ক'রে পরমানন্দে ছিলেন। ভগবানের চক্র ! একবার তাঁর স্ত্রীসঙ্গ হ'লো। বৈষ্ণব সমাজে এই কথা প্রচার হ'য়ে পড়ায়, সর্ব্বত্র তাঁর নিন্দা আলোচনা হ'তে লাগ্‌ল। পতিত হয়েছেন বলে, বৈষ্ণব সমাজ ঘৃণার সহিত তাঁর সংশ্রব ত্যাগ কর্‌লেন। গৌরশিরোমণি মহাশয় এই কথা শুন্‌তে পেলেন। একদিন শিরোমণি মহাশয়ের কুঞ্জে মহোৎসব। সমস্ত বৈষ্ণব নিমন্ত্রিত হ'লেন। সেই সময়ে তিনি ঐ বৈষ্ণব সাধুটিকেও নিমন্ত্রণ কর্‌লেন। সেবার সময়ে আর আর বৈষ্ণবদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বস্‌তে ঐ সাধুটিকেও তিনি অনুরোধ কর্‌লেন। তখন সমস্ত বৈষ্ণবেরা শিরোমণি মশায়কে বল্‌লেন, "প্রভো ! আপনি যা বল্‌বেন বা কর্‌বেন তাই আমাদের শিরোধার্য্য। তবে আমাদের প্রার্থনা যে, এর্ সঙ্গে আমাদের এক পংক্তিতে বস্‌তে আদেশ কর্‌বেন না। ইনি বিষম কুকর্ম্ম ক'রে পতিত হ'য়েছেন।" শিরোমণি মশায় করযোড়ে সকলকে নমস্কার ক'রে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লেন, "আপনারা এরূপ কথা আর বল্‌বেন না। ইনি মহাত্মা। আমাদের প্রতি ইঁহার বড়ই দয়া। এইরূপ একজন মহাত্মা পুরুষও যদি ঐরূপ একটা

গর্হিত আচরণ করেন, সমাজে তা'কেও যে কত লাঞ্ছনা, নিন্দা অপমান, ও ঘৃণা ভোগ কর্‌তে হয়, তাহা দেখাইবার জন্য আমাদের প্রতি দয়া করেই, ইনি এই বিষম ভোগ স্বীকার ক'রেছেন।" এই ব'লে সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে ঐ দীনভাবাপন্ন কাতর বিরক্ত সাধুকে নমস্কার কর্‌লেন এবং সকল বৈষ্ণবদের বল্‌তে লাগলেন, "আমা-কেও আপনারা ত্যাগ করুন, সত্যি সত্যি বলছি, আমি এঁর চেয়েও অনেক অপ-রাধের কার্য্য ক'রেছি।" এই ব'লে তিনি নিজ জীবনের অতীত ঘটনা সকল বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। তখন সকল বৈষ্ণবেরা কাণে হাত দিয়া "প্রভো! থামুন্ থামুন্" —বল্‌তে বল্‌তে সাধুকে নিয়ে এক পংক্তিতে সেবা কর্‌তে বস্‌লেন। কেহ গুণেও দোষ দেখে, কেহবা গুণকে গুণ আর দোষকে দোষ দেখেন, কারও চক্ষে আবার দোষই পড়ে না; দোষেও গুণই দেখেন। সকলই অবস্থাতে হয়।

সাধক-জীবনে দুর্দ্দশা। অসারত্ববোধই নির্ভরতার হেতু।

একদিন পাঠান্তে ছোট্‌দাদা ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন :—"রাধা কৃষ্ণ সংবাদে রাধা কি জীবাত্মা, না অন্য কিছু ?"

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন :—এ সকল বিষয় অত্যন্ত দুরূহ এখন বল্‌লে এ সব বিষয় কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌বে না। অসময়ে বল্‌লে, অবস্থা না হ'লে, ভাবার্থ কেহ হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পারে না, কথার বিকৃত অর্থ ধ'রে নিয়ে, আত্মার অনিষ্ট করে, আর বর্ণিত বিষয়ও দূষিত করে। দেখ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় চৈতন্যচরিতামৃত লিখে জীবগোস্বামীকে নিয়ে দিলেন। জীবগোস্বামী মহাশয় ঐ গ্রন্থ পাঠ ক'রে, উহা প্রচার কর্‌তে নিষেধ ক'রে বল্‌লেন,—যদিও এ গ্রন্থদ্বারা ভক্ত বৈষ্ণবদের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হ'বে, তথাপি ইহাদ্বারা সাধারণ জনসমাজের অনিষ্ট বই ইষ্ট কিছুই হবে না।

সর্ব্বদা নাম কর্‌তে থাক, ভাব, লীলা প্রভৃতি সমস্তই খু'লে যা'বে। তখন চৈতন্য কে, খৃষ্ট কে, লীলা কি, আপনা আপনি প্রকাশ হ'বে। সাধন কর্‌তে করতে ধীরে ধীরে পাঁচটি অবস্থা লাভ হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

এই সকল অবস্থা লাভ করতে হ'লে প্রথম কর্ম্ম করতে হয়। খুব সাধন করতে হয়। এ সময়ে লোভ মোহাদি রিপুসকল দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে সাধক পুনঃ পুনঃ বিষম পরীক্ষায় পড়তে থাকেন, কখনও পরীক্ষায় পরাজিত হন, আবার কখনও বা জয়লাভ করেন। সমুদ্রমধ্যে নাবিক একখানি নৌকা নিয়ে অগ্রসর হ'তে থাক্‌লে, সে যেমন কখন ঊর্দ্ধে কখন বা নীচে তরঙ্গের সঙ্গে উ'ঠে নেবে চল্‌তে থাকে,—সাধকও সেইরূপ নানা অবস্থার পরীক্ষাতে উ'ঠে প'ড়ে চল্‌তে থাকেন। এই পরীক্ষার সময়ে অনেক সাধকই সাধন ভজন একেবারে ছেড়ে দেন। নানাপ্রকার ক্লেশ, অশান্তি, শুষ্কতা ও নিরাশায় প'ড়ে একেবারে হতবুদ্ধি হ'য়ে যান, কিন্তু সারাদিনে যদি এই সময়ে অন্ততঃ চার পাঁচটি বারও নাম করতে পারেন, কোন-না কোন-প্রকারে উদ্ধার পান। এই বিষম দুঃসময়ে নামস্মরণই উদ্ধারের একমাত্র উপায়। এই রূপ পরীক্ষা প্রলোভনে পতিত হওয়াও উন্নতির একটি লক্ষণ। অনেকের দুই-তিন জন্ম পর্য্যন্ত এ সমস্ত পরীক্ষাই জীবনে আসে না। দীক্ষাগ্রহণের পরে সাধনের অবস্থাতে এ সকল প্রলোভন পরীক্ষায় না পড়লে, নিজকে শোচনীয় অবস্থাপন্ন মনে করতে হয়। এই সকল পরীক্ষায় প'ড়েই মানুষের উন্নতির অবস্থা আরম্ভ হয়। ক্রমে এই সব দুরবস্থায় প'ড়ে নিজকে যখন একেবারে অপদার্থ জ্ঞান হয়, নিজের কোন ক্ষমতাই নাই, নিজ শক্তিতে একটা সামান্য তৃণও তুল্‌তে পারে না—মানুষে বুঝে, ভক্তি তখন হ'তেই বিকসিত হ'তে থাকে। "আত্মশক্তি" অসার হতেও অসার, একমাত্র "ভগবৎশক্তিই সার" বুঝলে, তখন সে ভগবানের উপরই নির্ভর করে, এবং ভগবানের কৃপায় তখন ত'ার হৃদয়ে ভগবৎতত্ত্বও প্রকাশিত হ'তে থাকে।" কিছুকাল পরে নিজ হইতেই আবার বলিতে লাগিলেন,—"অহংকারটি নষ্ট হ'লে শীত, গ্রীষ্ম, মান, অপমানাদি আর কিছুই বোধ থাকে না। কারণ, আমিত্ব থাক্‌লেই এই সব থাকে। মানুষ যখন ভগবানে যুক্ত হ'য়ে যায়, তখন সুখ দুঃখ যা কিছু তা'দের উপস্থিত হয়, সে সমস্ত ভগবানই গ্রহণ ক'রে থাকেন। ভগবানের কৃপায় ভক্তদের সে সব কিছুই ভোগ করতে হয় না। এই নিয়মেই প্রহ্লাদ অগ্নি, জল, হস্তী প্রভৃতি হ'তে অনায়াসে রক্ষা পে'য়েছিলেন।

ভগবৎভক্তেরা ইচ্ছা কর্‌লে অনায়াসেই সমস্ত ভোগ হ'তে মুক্ত থাক্‌তে পারেন, কিন্তু তাঁরা কখনও তা করেন না। ভক্তেরা সমস্ত ভোগ নিজেরাই করেন। প্রকৃতির মধ্যেও এই একটী সাধারণ নিয়ম দেখা যায় যে, যদি পরস্পর এক জনে অন্য জনকে যথার্থ ভাল বাসে, তবে একের কষ্ট হ'লে অন্যেও তা ভোগ করে। একের শরীরে বেত মার্‌লে অপরের শরীরেও তার চিহ্ন পড়ে।"

ঐকান্তিক ভালবাসার পরিণাম শুভ—দুইটি দৃষ্টান্ত।

"একদিন মহাভারত পাঠের সময়, অনেক লোক উপস্থিত হইলেন। পাঠান্তে অনেক কথা বার্ত্তা হইতে লাগিল। সরলপ্রাণে একান্তভাবে সমস্ত চিত্ত, একটী স্থানে বসাইতে পারিলে, তাহা হইতেই ক্রমে পরম বস্তু লাভের উপায় হয়। এমন কি, একটী স্ত্রীলোককে ধরিয়াও, জীবনের যথার্থ কল্যাণ লাভ হইয়াছে, দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝাইতে ঠাকুর দুটি গল্প বলিয়াছিলেন। যথা ঃ—

কলিকাতা তালতলায়, কোন ষ্টুডেণ্টস্‌ মেসের পাশে, একটী সাহেবের বাসা ছিল। সাহেবের একটী অবিবাহিতা যুবতী কন্যা ছিল। মেসের কোনও ছেলের নজর তাহার উপরে পড়িল। কিছুদিন উভয়েই পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, একে অন্যের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িল। একদিন ছেলেটি স্থির থাকিতে না পারিয়া, সাহেবের বাড়ীতেই প্রবেশ করিল। সে দিন সাহেব টের পাইয়া উহাকে খুব ধম্‌কাইয়া দিলেন। কয়েকদিন পরে আবার একদিন ছেলেটী সাহেবের বাড়িতে প্রবেশ করায়, ধরা পড়িল। সেই দিন সাহেব দ্বারওয়ান্‌ দ্বারা কিছু অপমান করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। মেয়েটীরও ভাব-গতিক দেখিয়া সাহেব বুঝিলেন, অবস্থা সহজ নয়। মেয়েটীকে অবিলম্বে তফাৎ করা আবশ্যক মনে করিয়া, সাহেব একদিন মেয়েটীকে লইয়া অন্যত্র যাওয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ছেলেটীও তাহা বুঝিতে পারিয়া রাস্তায় যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সাহেব গাড়ী আনাইয়া মেয়েটীকে লইয়া যেমন তাহাতে চাপিতে চেষ্টা করিলেন, অমনি ছেলেটী দৌড়িয়া গিয়া মেয়েটীকে জড়াইয়া ধরিল। সাহেব তখন ক্রোধোন্মত্ত হইয়া হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা ছেলেটীকে দারুণ প্রহার করিতে লাগিলেন। মেয়েটী তখন সাহেবের লাঠি ধরিয়া মার থামাইয়া দিয়া, পিতাকে বলিল, "তোমার ব্যবহার তো ভয়ানক কসাইয়ের মতন দেখিতেছি। কি দোষ পাইয়া উহাকে এরূপ দারুণ প্রহার করিলে! বহুকাল উনি আমাকে ভালবাসিয়া আসি-

তেছেন, আমিও উঁহাকে মনে প্রাণে ভালবাসি। ওঁর কোন অপরাধই নাই।"—ইত্যাদি বলিয়া মেয়েটী সাহেবের সঙ্গে খুব ঝগড়া করিতে লাগিল। সাহেব আর অপেক্ষা না করিয়া কন্যাটীকে লইয়া ভাইয়ের বাড়ী চলিয়া গেলেন। এবং সেখানেই কন্যাটীকে রাখিয়া আসিলেন।

এদিকে ছেলেটী সাহেবের প্রহারে মূর্চ্ছিত হইয়া রাস্তায় অনেক্ষণ পড়িয়া রহিল। পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া 'সে কোথায় গেল, সে কোথায় গেল।' বলিতে বলিতে চারিদিকে উন্মাদের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ঐ সময়ে একটী ভাল ফকির, ঐ অবস্থায় উহাকে দেখিতে পাইয়া, উহার পিছন ধরিলেন। অবসর বুঝিয়া ছেলেটীকে জিজ্ঞাসা করিয়া, সমস্ত ব্যাপার জানিয়া লইলেন। ছেলেটী কাঁদিতে কাঁদিতে ফকির সাহেবকে বলিল, 'ফকির সাহেব! আমাকে দয়া করুন। তাকে পাই, আর না হারাই, এমন উপায় বলিয়া দিন্।' ফকির সাহেব ঐ সময়ে ছেলেটীর কাণে একটী মন্ত্র দিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, এই মন্ত্র তুমি অবিশ্রান্ত জপ কর, আর মনে মনে সেই মেয়েটীর চেহারা ধ্যান কর।' এই বলিয়া ছেলেটীকে বাজারের মধ্যে একটী বটগাছের তলায় বসাইয়া দিলেন। ছেলেটী, তিন দিন তিন রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় একাসনে থাকিয়া, নয়ন মুদ্রিত করিয়া, মেয়েটীর রূপ ধ্যান ও মন্ত্রজপ করিতে লাগিল। ওদিকে মেয়েটীও ছেলেটির বিষয় ভাবিতে ভাবিতে উন্মাদের মত হইয়া, একদিন বাহির হইয়া পড়িল। এবং খোঁজ করিতে করিতে অনুসন্ধান পাইয়া ছেলেটীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। মেয়েটী তখন ছেলেটীকে ডাকিয়া বলিল, "ওহে! যার জন্যে এত ক্লেশ পাইয়াছ, সে যে আসিয়াছে, এখন চোখ্ মেল।" ছেলেটী কণ্ঠস্বর শুনিয়া একপাশে তাকাইয়া তাহাকে দেখিল, আবার সম্মুখের দিকে চাহিয়া, একবার এদিকে, একবার ওদিকে ব্যস্ততার সহিত দেখিতে দেখিতে বলিতে লাগিল, "এ আবার কি! তুমি? না তুমি? (সম্মুখে চাহিয়া) আমিত দুটী একই আকৃতি দেখিতেছি। কাল থেকে সর্ব্বদাই তো তুমি আমার নিকট রহিয়াছ। (পার্শ্বে তাকাইয়া) আবার তুমি কে?" সাহেবের মেয়েটী কিছুক্ষণ উহার ভাব-গতিক দেখিয়া, অবশেষ ছেলেটী পাগল হইয়াছে স্থির করিয়া চলিয়া গেল। ফকির সাহেবের মন্ত্রপ্রভাবে এবং ছেলেটী একান্তচিত্তে ধ্যান ও মন্ত্রজপ করাতে ভগবানই তাহার নিকট মেয়ের রূপে প্রকাশ হইয়াছিলেন।"

এই গল্পটীর পরে ঠাকুর বলিতে লাগিলেন ঃ—"**স্ত্রীলোকেই হউক, আর যাতেই হউক, সমস্তটী প্রাণ একটা স্থানে ঢে'লে দিয়ে, একান্তপ্রাণে একচিত্তে বস্‌তে পার্‌লেই তো হয়। তা কি আর সহজ কথা! তা আর হয় কই! প্রকৃত**

সৌহার্দ্দ আজকাল বড়ই দুর্ল্লভ। এক জনে অন্য জনকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভাল বাসে, এ বড় দেখা যায় না। অনেক দিন হ'ল, শান্তিপুরের একটী ঘটনা দেখেছিলাম। সেরূপ ঘটনা এখন আর শোনা যায় না।”

ঠাকুর এই বলিয়া ঘটনাটী এইরূপ বলিতে লাগিলেনঃ—শান্তিপুরের একপাড়ার ভিতরে অল্পবয়সে একটী ছেলে ও মেয়েতে ভালবাসা হয়। যেমন উহাদের বয়স হইতে লাগিল, ভালবাসাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পাড়ার সকলে উহাদের অসাধারণ ভালবাসা দেখিয়া নানা কুকথা বলিতে লাগিল। মেয়েটী একদিন ছেলেটীকে বলিল, ‘দশজনে নানা কথা বলিতেছে, আর তুমি আমার নিকট এরূপ এস না।’ ছেলেটী ঐ কথা শুনিয়া উন্মত্তের মত হইয়া গেল। দিনরাত বিষম যন্ত্রণা পাইতে লাগিল। অবিলম্বেই মেয়েটীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরে মেয়েটী যখন শ্বশুরবাড়ী চলিল, ছেলেটীও কাঁদিতে কাঁদিতে তার পিছনে পিছনে চলিল। সকলে উহাকে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিল। ঐ সময়ে একটী সন্ন্যাসী ছেলেটীকে দেখিয়া বলিলেনঃ—‘আহা! তুমি যদি কোন দেবতাকে ঐরূপ ভালবাস্‌তে, তা হ'লে এতদিনে উদ্ধার হ'য়ে যেতে! তুমি কোনও দেবতাকে ভালবাস?’ ছেলেটী বলিল ‘হাঁ, আমি রামকে বড় ভালবাসি।’ সন্ন্যাসী তাহাকে দীক্ষা দিয়া রামনাম জপ করিতে বলিয়া গেলেন। পাড়ায় এক বাড়ীতে রাম-মূর্ত্তি আছেন; ছেলেটী প্রত্যহ সেখানে গিয়া ঠাকুরের নিকট বসিয়া বসিয়া জপ করিত। জপের সময় ছেলেটীর দর দর ধারে অশ্রুবর্ষণ হইত। রামজীকে ভোগ লাগাইয়া সে প্রত্যহ প্রসাদ পাইত। এমন দেখা গিয়াছে, খাবার নিয়া দুই তিন দিন রামজীর সম্মুখে বসিয়া কান্দিতেছে, তথাপি রামজী প্রসাদ করিয়া না দিলে আহার করে নাই। ঐ ছেলেটী বেশী দিন আর টিকিল না, কিছুকাল পরেই মরিয়া গেল।

প্রকৃতিতে আসক্তির ছাপ্।

আমাদের গুরুভাই বিক্রমপুরের শ্রীযুক্ত রাজকুমার বাবু শ্রীবৃন্দাবন হইতে আসিবার সময় একটী পিতলের কমণ্ডলু লইয়া আসিয়াছেন। মধ্যাহ্নে ঠাকুরের আহারান্তে ঠাকুর আসন-কুটীরে আসিয়া বসিবার পরে, রাজকুমার বাবু কমণ্ডলুটী লইয়া ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, “এটী আপনার জন্য আনিয়াছি, আপনি এটী দয়া করিয়া গ্রহণ করুন।”

ঠাকুর খুব সন্তুষ্ট হইয়া সেটী হাতে নিলেন,—এবং এদিক ওদিক দেখিয়া উহা মাটিতে রাখিয়া বলিলেন ঃ—"আমার একটী কমণ্ডলু র'য়েছে, এটী নিয়ে অশ্বিনীকে দিন্। অশ্বিনীর বোধ হয় জলপাত্র নাই। আমার আর আবশ্যক নাই।"

রাজকুমার বাবু আর জেদ্ না করিয়া কমণ্ডলুটী লইয়া গেলেন। আমার বড় কষ্ট হইতে লাগিল। আমি ঠাকুরকে বলিলাম,—"গ্রহণ করিলেন এই ভাব দেখাইয়া, হাতে লইয়া আবার ফিরাইয়া দিলেন কেন ? অশ্বিনীর বোধ হয় জলপাত্র আছে।"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"থাক্‌লেও ওটী অশ্বিনীকে দেওয়া ভাল। অশ্বিনীর ওটী নিতে ইচ্ছা হ'য়েছিল।"

আমি বলিলাম ঃ—"নেওয়ার ইচ্ছা শুধু অশ্বিনীর কেন ! আরো লোকেরও ত হইয়া থাকিতে পারে ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"হাঁ, তা হ'তে পারে। তবে একটী জিনিস্ দেখে, সাধারণ ভাবে নেওয়ার ইচ্ছা এক, আর তা'তে আসক্তি হওয়া স্বতন্ত্র কথা।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"কোনও বস্তুতে কারো একটা আসক্তি হইলে বস্তুটী মাত্র দেখিয়া তাহা কি প্রকারে জানা যায় ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"যার যে বস্তুতে আসক্তি হয়, ঐ বস্তুতে তার একটা আকৃতির ছাপ্ পড়ে। বস্তুটির দিকে তাকা'লেই ঐ আকৃতিটী বেশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"আপনি যে কি বলিলেন, কিছু বুঝিলাম না। স্বচ্ছ বস্তুর উপরে শুধু মানুষের কেন, সকল বস্তুরইতো প্রতিবিম্ব পড়ে। বস্তুটী সরাইয়া নিলে আরতো প্রতিবিম্ব থাকে না। খুব স্বচ্ছ নির্ম্মল না হ'লে প্রতিবিম্বওতো পড়ে না। আর প্রতিবিম্ব পড়্‌লেও তাহা স্থায়ী হয় কই ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"স্বচ্ছ বস্তুতে শুধু নয়। মানুষ যে কোনও বস্তু দেখে, তা'তেই তার একটা আকৃতি পড়ে। স্বচ্ছ বস্তুতে যে আকৃতি পড়ে, তাহা সাধারণে চক্ষে দেখ্‌তে পায় মাত্র। আয়নার কাছে দাঁড়ালে চেহারা পড়ে—আর স'রে গেলে তা থাকে না সত্য ; কিন্তু ফটো তোল্‌বার সময়ে, কাঁচে যে ফটো পড়ে, তাহা বদ্ধ হ'য়ে যায় ; আর ওঠে না। তা'র কারণ, কাঁচে যে আরক থাকে, তাতেই আকৃতি বদ্ধ

হ'য়ে পড়ে। সেই প্রকার সাধারণ ভাবে সকল বস্তুতে যে আকৃতি পড়ে, তাহা স্থায়ী হয় না। আসক্তি-রূপ আরক যে বস্তুতে লাগান থাকে, তা'তে চেহারা পড়্‌লে আর ওঠে না, থেকে যায়। চোখ্‌ যাঁদের একটু পরিষ্কার হ'য়েছে, দৃষ্টি মাত্রেই তাঁরা তা দেখ্‌তে পান। এ সকল তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হ'লেই মাত্র জানা যায়, না হ'লে শুনে কিছুই বোঝা যায় না। যে কোনও বস্তুতে লোভ হবে, তাতেই আকৃতি বদ্ধ হয়ে প'ড়্‌বে জেনো।"

আমি এসকল কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম। একটু পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "আসক্তিতে ক'রে বিষয়েতে যে চেহারা পড়ে, তাহা কতকাল স্থায়ী হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"যতকাল যে বিষয়েতে আসক্তি থাকবে, ততকালই তাতে আকৃতি স্থায়ী হবে। আসক্তি নষ্ট হ'লে আকৃতিও আর থাকে না। ফটোর আরক নষ্ট হ'য়ে গেলে, যেমন আকৃতিও আর থাকে না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"শাস্ত্রে নাকি আছে যে, বিষয়ে আসক্তিই সংসারাবৃত্তির কারণ ? বিষয়ে আসক্তি হেতু যে আকৃতি পড়ে, তাহাতেই কি পরলোকগত জীবকে সংসারে টানিয়া আনে ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"হাঁ, তাও বটে। সংসারে আস্‌বার আরো সব গুরুতর কারণ থাকে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"যে বিষয়ের সম্বন্ধে মনের যে প্রকার ভাব হয়, ঐ বিষয়েতে যে আকৃতি পড়ে, তাহা কি সেই ভাবেরই অনুরূপ ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"হাঁ, ঠিক সেইরূপ।"

আমি বলিলাম ঃ—"তবেতো বড় বিষম ! গোপনতো কিছু করা যায় না !"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"সাধ্য কি যে গোপন কর্‌বে। প্রকৃতিতে যে চেহারা আপনা আপনি নিয়ত পড়্‌ছে, তাতে আর কার কি হাত আছে ! যার চোখ্‌ আছে, প্রকৃতির দিকে তাকালেই তো মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত নাড়ী নক্ষত্র দেখে নিবে। গোপন কি আর কেউ কিছু কর্‌তে পারে !"

সাধনের অবস্থায় ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য ।

অবসর পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"যথাসাধ্য সাবধানে থাকিয়া নিয়মমত সাধন করিয়া যাইতেছি,—অথচ রিপুর উত্তেজনার ক্রমশঃ বৃদ্ধিইতো দেখিতেছি, এইরূপ হইতেছে কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"তা হয়। যখন যে রিপু একেবারে নষ্ট হবার উপক্রম হয়, তখন তাহা খুব প্রবল হ'য়ে ওঠে। নির্ব্বাণের পূর্ব্বে প্রদীপের মত। ঐ সময়ে রিপুর উত্তেজনা এতই বৃদ্ধি হয় যে, অনেকের সাধন-ভজনেও অবিশ্বাস এসে পড়ে। এই সময়টি বড়ই বিষম। সর্ব্বদাই প্রায় উন্মত্তের মত থাকে। এই সময়ে গুরুদত্ত নাম যদি একেবারে ত্যাগ না করে, তা হ'লে কিছু কালের মধ্যেই সাধক নিরাপদে উত্তীর্ণ হ'য়ে উৎকৃষ্ট অবস্থা লাভ করে। না হ'লে বিষম দুরবস্থায় প'ড়ে যায়। নাম সর্ব্বদা কর্‌লে আর কোন ভয়ই থাকে না। কত অবস্থাতেই পড়্‌তে হ'বে, তখন নামই একমাত্র অবলম্বন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"মানসিক কোন প্রকার উত্তেজনাই যখন থাকে না, কোন প্রকার কল্পনাও যখন মনে একেবারে আসে না, তখনও অকস্মাৎ ইন্দ্রিয় বিষম উত্তেজিত হ'য়ে পড়ে কেন ? এরূপ অবস্থায় কি করা যাইবে ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"স্নায়ুগুলি খুব দুর্ব্বল হ'লে অনেক সময়ে ঐ রকম হ'য়ে থাকে। ঐ সময়ে কখনও একস্থানে ব'সে থাক্‌তে নাই, বেড়াইও। না হয় কারও কাছে যে'য়ে গল্প ক'রো। আমার যখন ঐ রকম হ'ত, আমি কয়েক ঘড়া জল অম্‌নি মাথায় ঢেলে দিতাম। কখনও বা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ায়ে হয়রান্ হ'লেই ব'সে পড়্‌তাম্। তোমার ঐ সময় স্নান বা দৌড়ান সহ্য হ'বে না, আসন হ'তে উঠে বেড়া'য়ো, তাহ'লেই তোমার আর কোন ক্ষতি হবে না।"

গুরুদক্ষিণা, গুরুর আনুগত্য ও গুরুর সঙ্গবিষয়ে প্রশ্ন।

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"পূর্ব্বকালে উপনয়নের পরে গুরুগৃহে থাকিয়া আপন আপন সঙ্কল্প বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া যখন শিষ্য, গৃহে ফিরিতেন, গুরুদক্ষিণা দিয়া যাইতেন। আমাদেরও কি কোন সময়ে গুরুদক্ষিণা দিতে হইবে ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"মোক্ষার্থীদের আর গুরুদক্ষিণা নাই। যাঁরা গুরুগৃহে থেকে অধ্যয়ন করতেন, তাঁরাই অধ্যয়ন শেষ ক'রে গুরুদক্ষিণা দিয়ে যেতেন। সদ্‌গুরু দীক্ষা দিয়ে সম্পূর্ণরূপে আপনার ক'রে নেন্। তাঁকে আর গুরুদক্ষিণা দিবে কি! আমাদের ওসব নাই।"

দীক্ষাদান মাত্রেই সদ্‌গুরুতো শিষ্যকে আপনার করিয়া নেন্—কিন্তু শিষ্য যদি গুরুর সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখেন, তা হ'লে আর বিশেষ লাভ কি হইল! গুরুর অনুগত হইলেই গুরুর সঙ্গে সম্বন্ধ। তা না হ'লে আর গুরুর সঙ্গে শিষ্যের যোগ কি? নানা প্রকার সংশয়ে সর্ব্বদাইতো গুরুতে মতি চঞ্চল করিয়া দিতেছে; সুতরাং এখন আর উপায় কি? এইরূপ চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"গুরুর অনুগত কি উপায়ে হওয়া যায়?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"গুরুর অনুগত কি প্রকারে হওয়া যায়, তা বলা যায় না। বৃক্ষ কি উপায়ে বড় হয়, ফুল ফলে শোভিত হয়, তা কি কেউ বল্‌তে পারে? জল, উত্তাপাদি এসব পেয়ে বৃক্ষ যেমন বড় হয়, ফল ফুলে শোভিত হয়, এ পর্য্যন্তই বলা যায়, সেরূপ যথামত গুরুর আদেশ প্রতিপালন করতে করতে মানুষও তেমনি শ্রদ্ধাভক্তি আনুগত্য লাভ করে, এই মাত্র বলা যায়। ঠিক আদেশমত চল্‌তে চেষ্টা করলেই অনুগত যে কিরূপে হয়, বুঝবে।"

গুরুর নিকটে থাকিয়া গুরুতে নিয়ত ভগবদ্‌বুদ্ধি রাখা অতিশয় কঠিন। সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় গুরুতেও অনেক সময়ে চেষ্টা, কার্য্য ও ভুল ভ্রান্তি দেখা যায়। বরং তফাৎ থাকিয়া গুরুতে ভগবদ্‌জ্ঞান সহজ। এই সংশয়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"গুরুর সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিয়া তাঁর সেবা শুশ্রূষা করাতে বেশী উপকার, না তফাৎ থাকিয়া তাঁর আদেশমত সাধন ভজন করাতে জীবনের বেশী কল্যাণ হয়?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"সকলের পক্ষে একরূপ নয়। এক প্রকৃতির লোক আছে, গুরুর নিকটে থাক্‌লে ক্রমশঃ গুরুর প্রতি তাদের সন্দেহ বৃদ্ধি হয়; সুতরাং তেমন উপকার হয় না। আবার কারো গুরুর নিকটে থাকাতেই বেশী উপকার হয়। প্রকৃতি বু'ঝে। সকলের একরকম নয়। তবে গুরুর নিকটে থাক্‌লে ক্ষতি কারোই হয় না, সেবা শুশ্রূষায় থাক্‌লে বাৎসল্য ভাবই কিছু বেশী হ'তে দেখা যায়।"

ঠাকুরের কথায় এই বুঝিলাম যে, নিকটে থাকিয়া গুরুতে সন্দেহাদি হ'লেও বাৎসল্য

ভাবে যে মমতা ও আকর্ষণ জন্মে, তাহা বড়ই দুর্লভ। গুরুতে মমতা ও ভালবাসাই, তাঁহাতে সমস্ত সদ্ভাব আরোপের হেতু হয়।

বিধিমার্গ ও চঞ্চলতা বিষয়ে উপদেশ।

একদিন নির্জ্জন পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম :—"আমার কি আবার সংসারে আস্‌তে হ'বে ?"

ঠাকুর বলিলেন :—"দেখ, খুব চেষ্টা ক'রে এবার সব সেরে নিতে পার্‌লে আর আস্‌বে কেন ? বাসনাটি জয় কর্‌তে পার্‌লে আর আস্‌তে হবে না। বাসনা থেকে গেলেই আবার আস্‌তে হবে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম :—"মোক্ষই যখন আমাদের লক্ষ্য, তখন বিধিপথে আর চল্‌বার আবশ্যক কি ?"

ঠাকুর বলিলেন :—"যতকাল ইন্দ্রিয়দমন না হয়, বিধিমার্গ ধ'রে চল্‌তেই হবে। কিন্তু ঐ সাধনের উদ্দেশ্য একমাত্র মোক্ষই থাক্‌বে। ইন্দ্রিয়দমনের জন্যই বিধিমার্গে চলা প্রয়োজন। অবস্থাটি হ'য়ে গেলে আর নিজের জন্য বিধির আবশ্যক হয় না। ওটি না হওয়া পর্য্যন্ত বিধি মেনে চল্‌তেই হবে।"

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম :—" পূর্ব্বকালে সমস্ত যোগী-ঋষিরাই কি মোক্ষের সাধক ছিলেন, না অন্য ভাবেরও ছিলেন ?"

ঠাকুর বলিলেন :—"হাঁ, অনেকে মোক্ষের সাধক ছিলেন, আবার অনেকে ত্রিবর্গের সাধকও ছিলেন। সকলে এক প্রকারের ছিলেন না, কত প্রকারের ছিলেন।"

একদিন ছোটদাদা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—"নাম করিবার সময়ে মন তো স্থির কিছুতেই হয় না, কি করিব ?"

ঠাকুর বলিলেন :—"মন কি সহজেই স্থির হয়, মন স্থির হ'লে ত হ'য়েই গেল। প্রথম প্রথম মন খুব অস্থিরই থাকে, নাম কর্‌তে বিষম বিরক্তি বোধ হয়। কিন্তু এ সময় নাম ছেড়ে দিতে নাই। ঔষধ গেলার মত অনিচ্ছাতেও নাম কর্‌তে হয়। জোর ক'রে এ সময়ে নাম না কর্‌লে হয় না। নাম কর্‌তে কর্‌তে এক

বার যদি উহা বেশ অভ্যস্ত হ'য়ে যায়, তা হ'লে আর কোন মুস্কিলই থাকে না। নাম খুব অভ্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই ছাড়্‌তে নাই, সর্ব্বদাই খুব চেষ্টা রাখ্‌তে হয়। চেষ্টা খুব করে যাও, ভগবানের কৃপায় সময়ে সবই হবে।"

আসনের মর্য্যাদা।

আষাঢ় ১৬ই—৩২শে

আহারান্তে পূবের ঘরে বসিয়া আজ ঠাকুর আমাকে একটি আসন দেখাইয়া বলিলেন:—"এই প্রকার আসন ক'রে সর্ব্বদা বস্‌তে চেষ্টা ক'র। এটি এমন অভ্যাস কর্‌বে যে, যেখানে সেখানে বস্‌তে হ'লেই এ আসন ক'রে বস্‌তে পার।"

জিজ্ঞাসা করিলাম:—"আসন কত প্রকার আছে? এই আসন কি সব চেয়ে ভাল?"

ঠাকুর বলিলেন:—"চৌরাশী লক্ষ জীব, আসনও চৌরাশী লক্ষ। তন্মধ্যে চৌরাশীটি প্রধান বলিয়াছেন, এই চৌরাশী আসনের মধ্যে আবার পদ্মাসন ও সিদ্ধাসন শ্রেষ্ঠ। সিদ্ধাসন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহার উপকারিতা অসাধারণ। সমস্ত আসনেরই একটা একটা প্রয়োজন আছে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম:—"সাধু সন্ন্যাসীরা যেমন বসিবার স্বতন্ত্র আসন রাখেন,আমরাও কি সাধন-ভজনের জন্য সেরূপ আসন রাখ্‌তে পারি?"

ঠাকুর বলিলেন:—"এই সাধন যাঁরা পেয়েছেন, ইচ্ছা কর্‌লে তাঁরা সকলেই স্বতন্ত্র আসন রাখ্‌তে পারেন। তবে আসনের মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে না পার্‌লে তা না নেওয়াই ভাল।"

জিজ্ঞাসা করিলাম:—"আসনের মর্য্যাদা কি প্রকারে রক্ষা করিতে হয়?"

ঠাকুর বলিলেন:—"আসন নিয়ম মত একটা স্থানে পেতে রেখে, প্রতিদিন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে অন্ততঃ কিছুক্ষণ তা'তে ব'সে সাধন-ভজন কর্‌তে হয়। ধর্ম্মবিষয়ে যাহা কিছু অনুষ্ঠান, ঐ আসনে ব'সেই কর্‌তে হয়। অন্য কা'কেও ওতে বস্‌তে দিতে নাই।' অন্যে বস্‌লেই আসনের গুণ নষ্ট হ'য়ে যায়। আসনের পবিত্রতা-রক্ষাই আসনের মর্য্যাদা-রক্ষা। আসন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখাতেই বেশী উপকার। আসন অল্প সময়ের জন্যও তুল্‌তে হ'লে, অন্ততঃ

একটী তৃণও ঐ স্থানে ফেলে রাখ্‌তে হয়, আসনের স্থানটি কখনও একেবারে শূন্য রাখ্‌তে নাই।''

জীবন্মুক্তের কথা—মৃত্যু ও অপমৃত্যু।

আজ মহাভারতপাঠের পরে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"যাঁহারা জীবন্মুক্ত হইয়া যান, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে আবার কি সংসারে আসিতে পারেন ?''

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"হাঁ, ইচ্ছা কর্‌লে আর পার্‌বেন না কেন ?''

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সংসারে আসিলে সংসারের পাপস্রোতে পড়িয়া, তাঁহাদের কোনও অনিষ্ট হয় না ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"অনিষ্ট কি তা'দের আর হ'তে পারে ? তাঁ'রা সংসারে এ'সে কিছুকাল সংসারের জন্য কার্য্য ক'রে চ'লে যা'ন, সঙ্গদোষে প'ড়ে তাঁ'দের ভোগের ইচ্ছা হ'লেও, ওতে তাঁরা একেবারে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েন না, উপর হ'তেই নানাপ্রকার বাধা আসে। তেমন দেখ্‌লে মহাপুরুষেরাই তা'কে সরায়ে নিয়ে যা'ন, যেমন লালের হ'য়েছিল।"

আমি বলিলাম ঃ—"লাল তো বিষ খেয়ে ম'রেছিল। অপমৃত্যু ঘটাতে কি তা'কে দণ্ড পে'তে হয় নাই ?''

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"লাল বিষ খেয়েছিল বটে, কিন্তু উহার দেহত্যাগের মুহূর্ত্তেই মহাপুরুষেরা মৃত্যুকে আহ্বান ক'রে, ওর জীবাত্মাকে গ্রহণ কর্‌তে বলেন, তাতেই ওর অপমৃত্যু ঘটে নাই। কোন অপরাধেও পড়ে নাই, দণ্ডও হয় নাই।"

এই বিষয়টি আরও পরিষ্কার বুঝিবার জন্য প্রশ্ন করাতে ঠাকুর বলিলেন ঃ—"প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে মৃত্যু এসে জীবাত্মাকে গ্রহণ কর্‌লেই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়, আর অকস্মাৎ কোন দুর্ঘটনায় জীবাত্মা দেহে থাকা সত্ত্বেও প্রাণবায়ু বহির্গত হ'য়ে গেলে, ঐ মৃত্যু অস্বাভাবিক হয়। উহাই অপমৃত্যু, ওরূপ হ'লেই অসদ্গতি হয়ে থাকে।"

রুদ্রাক্ষধারণের আদেশ, ব্রহ্মচর্য্যের জন্য উৎকণ্ঠা ।

সকাল বেলা আমার নিত্যকর্ম্ম শেষ করিয়া এগারোটা পর্য্যন্ত ঠাকুরের নিকটে বসিয়া থাকি। আজ দেবীভাগবত পাঠ করিতে করিতে ঠাকুর আমাকে বলিলেন ঃ—"তুমি রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ কর্‌লে বিশেষ উপকার পা'বে। ভাল পাকাদানা বড় বড় রুদ্রাক্ষ একশ আটটি আনায়ে নেও। কাশীতে ভাল রুদ্রাক্ষ পাওয়া যায়, খাঁটি রুদ্রাক্ষ পরীক্ষা ক'রে নিতে হয়। নিত্যহোম যাঁহারা করেন, যোগপাটও তাঁ'দের ধারণ কর্‌তে হয়। একটি যোগপাটও আনিয়ে নেও।"

ঠাকুরের আদেশ পাইয়া কাশীতে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ ভারতী (তারাকান্ত গাঙ্গুলি) মহাশয়কে একশত আটটি বড় বড় খাঁটি রুদ্রাক্ষ এবং একটি যোগপাট পাঠাইতে লিখিলাম। খুব শীঘ্রই তিনি উহা পাঠাইয়া দিবেন, আশা করি।

ঠাকুর আমাকে এক বৎসরের জন্য ব্রহ্মচর্য্য দিয়াছিলেন। তাহা তো প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এই এক বৎসর কতপ্রকার বিষম প্রলোভন-পরীক্ষাতে পড়িয়া, ঠাকুরকে ডাকিয়া, তাঁরই অসাধারণ কৃপায় মরিতে মরিতে রক্ষা পাইয়াছি। উহা মনে হইলে ভয়ে প্রাণ জড়সড় হয়, আতঙ্কে অস্থির হই। ঠাকুরের দুর্লভ সঙ্গলাভে সম্পূর্ণ নিরাপদে পরমানন্দে দিন যাইতেছে বটে, কিন্তু ইহাতো জানি না, এই সৌভাগ্য আমার আর কতদিন ! যদি কর্ম্ম বিপাকে সঙ্গচ্যুতই হই !—এ বৎসর আবার কোন্ মুখে, কি সাহসে ঠাকুরের নিকটে ব্রহ্মচর্য্য লইতে যাইব ! ব্রতদানকালে তাঁরই কৃপায় এই ব্রতে অটল থাকিতে পারিব; এরূপ অভয় তিনিই দয়া করিয়া দিয়াছিলেন। এখন একান্তপ্রাণে অহর্নিশি নাম করিতে করিতে এই প্রার্থনাই করিতেছি, ঠাকুর সন্তুষ্টচিত্তে আমার প্রতি প্রসন্ন হ'য়ে, এবারও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত দিয়ে চিরকালের জন্য আমাকে তাঁর শান্তিপ্রদ শ্রীচরণের অনুগত সেবক করিয়া রাখুন। আমার নিজের আর কোন ক্ষমতা নাই।

ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম বৎসর শেষ।

৩২শে আষাঢ়, বুধবার। আজ প্রত্যুষে স্নানান্তে জপ, হোম, প্রাণায়াম ও পাঠ সমাপন করিয়া বেলা প্রায় নয়টার সময়ে ঠাকুরের নিকটে যাইয়া বসিলাম। নির্জ্জন পাইয়া ঠাকুরকে বলিলাম ঃ—"আজ আমার ব্রহ্মচর্য্য এক বৎসর পূর্ণ হইবে।"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"কাল থেকে আবার এক বৎসরের জন্য নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য নিও। নিয়ম যা ছিল তাই থাক্‌বে, বিশেষ কিছু আর কর্‌তে হবে না। ও সব নিয়মই, আরো দৃঢ়তার সহিত প্রতিপালন ক'রে চল্‌তে চেষ্টা করবে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"আগামী বৎসরেও কি হোম কর্‌তে হবে ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"হাঁ, হোমটি কর্‌তেই হ'বে। ব্রাহ্মণের জন্য তো নিত্য-হোমের ব্যবস্থা। গায়ত্রী হোম, কি ত্যাগ কর্‌তে আছে ?"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"তর্পণ যেমন করিতেছি, এখনও কি তেমনি করিব ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"হাঁ, তর্পণটি প্রতিদিনই কর্‌বে। ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, ও নৃ-যজ্ঞ, এসব নিত্যকর্ম্ম ; এর একটীও বাদ দিতে নাই। যথাসাধ্য এ সকল প্রতিদিনই কর্‌তে হয়।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"এসব যজ্ঞ কি প্রকারে কর্‌তে হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—

"ব্রহ্মযজ্ঞ ঃ—ঋষি-প্রণিত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন, সন্ধ্যাগায়ত্রী জপ ইত্যাদি।

পিতৃযজ্ঞ ঃ—শ্রাদ্ধতর্পণাদি, অন্ততঃ প্রতিদিনই তর্পণটি কর্‌তে হয়।

দেবযজ্ঞ ঃ—হোম, পূজা, যা ক'রে থাক।

ভূতযজ্ঞ ঃ—জীব-সেবা, মনুষ্য, পশু, পক্ষি, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতা ইত্যাদি সর্ব্বজীবের সেবা, প্রতিদিনই কর্‌তে হয়।

নৃ-যজ্ঞ ঃ—অতিথিসেবা।

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥

ঐ সকল প্রতিদিন কেহ নিয়ম মত ক'রে গেলে, কিছুদিনেই বুঝ্‌তে পারে, এর কি উপকারিতা।"

শ্রাবণ।

দ্বিতীয় বৎসরের ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ।

১লা শ্রাবণ   সকাল বেলা ঠাকুরের নিকটে যাইয়া বসিতেই ঠাকুর আমাকে বলিলেন :—"এবার আবার এক বৎসরের জন্য তোমাকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত দেওয়া হ'লো। এ বৎসরে বিশেষ নিয়ম, পৃষ্ট না হ'য়ে, কথা বল্‌বে না। জিজ্ঞাসিত বিষয়েও, প্রয়োজন বোধ হ'লেই উত্তর দিবে। উত্তরটি যত সংক্ষেপে হয়, ততই ভাল। খুব প্রয়োজনীয় বিষয়ই মাত্র জিজ্ঞাসা করবে। এই মত চল্‌তে পার্‌লে খুব উপকার পা'বে। পদাঙ্গুষ্ঠের দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখ্‌বে। অন্ধকারেও ঐদিকে লক্ষ্য রাখ্‌বে। তারপর নিত্য হোম করবে এবং অধিক পরিমাণে গায়ত্রী জপ কর্‌বে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম :—"যে সব গ্রন্থ পাঠ ও যে ভাবে হোম এতদিন করেছি, ঠিক তেমনই কি কর্‌বো ?"

ঠাকুর বলিলেন :—"প্রত্যহ ভোরবেলা স্নান ক'রে এ'সে চণ্ডী ও গীতা এক অধ্যায় ক'রে নিত্য পাঠ কর্‌বে। পরে কিছুকাল ইষ্টনাম জপ ক'রে, অন্ততঃ একশত আটবার গায়ত্রী জপ করবে। তারপর একটু হোম ক'রো। কাঠের বিশেষ নিয়ম রাখ্‌বার আর আবশ্যক নাই। ঘৃতেরও একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ না রাখ্‌লেও চল্‌বে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম :—"ব্রহ্মচর্য্য কি এক বৎসর করিয়াই নিতে হয় ?"

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন :—"তা কিছু নয়। বারো বৎসর ব্রহ্মচর্য্য কর্‌তে হয়। তবে তোমাকে এবারও এক বৎসরের জন্যই দিলাম। একবারে বেশী-কালের জন্য দিতে ভরসা হয় না। যদি নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে ফে'ল ! একবার ব্রত ভঙ্গ হ'য়ে গেলে, বড় দোষ। নিয়মটি ঠিক মত রক্ষা ক'রে চল্‌লে, আগামী বৎসরে আবার পাবে। এ-ই ভাল।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"শ্রীবৃন্দাবনে যে দিয়াছিলেন, এবারও কি তা-ই, না কিছু বিশেষ আছে ? আগামী বৎসরে যদি আমি আপনার সঙ্গে না থাকি, তাহ'লে কি ক'র্ব্বো ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"**শ্রীবৃন্দাবনে যা পেয়েছিলে তাই। নূতন কিছু নয়। তবে বছর বছর ব্রত নিয়ে পাঠ বৃদ্ধি করতে হ'বে। আগামী বৎসরে আমাকে না পে'লেও নিজেই টের পাবে। সেজন্য ব্যস্ত হ'তে হ'বে না। এর্‌পর একাদশস্কন্ধ ভাগবত ও যোগবাশিষ্ট পড়্‌তে হ'বে।**"

আমি আর বেশী কথা না তুলিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সরিয়া পড়িলাম।

ক্রোধে স্বপ্নদোষ।

শ্রাবণ, ৫ই—৯ই

দ্বিতীয় বৎসর ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের পরে, মাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করিতে ইচ্ছা হইল। আহারের চাউলও ফুরাইয়া গিয়াছে। এক এক বারে চারি পাঁচ সের চাউল আনিলে আমার মাসাধিক কাল চলিয়া যায়। বাড়ী যাইয়া কয়দিন নিজেই মাতঠাকুরাণীর রান্না করিয়া তাঁহার প্রসাদ পাইলাম। আহারের নিয়ম বাড়ীতে কখনও ঠিক রাখিতে পারি না। মাতাঠাকুরাণীর আগ্রহে অসময়ে, এবং তাঁহার প্রসাদ বলিয়া, মিষ্টি টক্ ইত্যাদি তিন চারিটী তরকারীও খাইতে হয়। ঠাকুরকে এ সব বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলাতে ঠাকুর বলিয়াছিলেন ঃ—"**মা'র প্রসাদ খুব খাবে,—ওতে কোন ক্ষতি হ'বে না, উপকারই হয়।**" আমারও বেশ সুবিধা হইয়াছে ; যখন যাহা খাইতে ইচ্ছা হয়, মাতাঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেই বলি,—তিনিও খুব আদর করিয়া সেই সকল আমাকে প্রসাদ করিয়া দেন। আশ্রমে যখন থাকি, তখন একমাত্র খিঁচুড়ী ব্যতীত সারা দিনরাত্রিতে আর কিছু খাবার পাই না ; ঠাকুরের প্রসাদ ভাগাভাগি এক গ্রাস মাত্র পাইয়া থাকি। এবার নূতন ব্রহ্মচর্য্য লইয়া খুব কড়াকড়ি চলিব স্থির করিয়া মাতাঠাকুরাণীর মিষ্টান্ন প্রসাদও গ্রহণ করিলাম না। মাতাঠাকুরাণীর জেদ দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধ হইল, খুব ঝগড়া করিলাম, এবং চারি পাঁচ সের চাউল লইয়া আশ্রমে চলিয়া আসিলাম।

আশ্রমে আসিবার পরে ক্রমাগত তিনরাত্রি স্বপ্নদোষ হইল। মাথা গরম হইয়া গেল। এত নিয়মে থাকিয়াও স্বপ্নদোষের উৎপাত কমিল না। ঠাকুরের উপরে অভিমান

আসিল। ঠাকুরকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"এখন তো আমি ঠিক নিয়ম ধরিয়া চলিতেছি, তবে আবার স্বপ্নদোষ হয় কেন ?"

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন ঃ—"শুধু আহারের নিয়মই কি নিয়ম ? ব্যবহারের নিয়ম, নিয়ম নয় ! তা কতটা প্রতিপালন কর ? বাড়ী যেয়ে কারো উপর রাগ ক'রেছিলে ? রাগ করলে শরীরের রক্ত বিকৃত হয়, তাতেও খুব স্বপ্নদোষ হয়। শরীরের রক্ত সর্ব্বদা শীতল রাখ্‌তে হয়।"

রাগ করিলে স্বপ্নদোষ হয়, আজ এই এক নূতন কথা শুনিলাম এবং লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

ঠাকুরের জীবন-বৃত্তান্ত লিখিবার উৎসাহ ও বাধা।

১০ই শ্রাবণ, শনিবার। শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয়ের কথাগত মহাভারতপাঠের পর ঠাকুরকে বলিলাম ঃ—"আপনার জীবনের কতকটা ঘটনা 'আশাবতীর উপাখ্যানে' বহুকাল হয় লিখিয়াছিলেন শুনিয়াছি, ঐ পুস্তকে যে পর্য্যন্ত লেখা আছে, তার পরের ঘটনাগুলি জানিতে অনেকের খুব আকাঙ্খা। আপনি যদি অবসরমত একটু একটু করিয়া বলেন, আমি লিখিয়া যাইতে পারি।"

ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন ঃ—"তা বেশ। একটা নিয়ম ক'রে নেও, প্রত্যহ পাঠের পর মধ্যাহ্নে, একঘণ্টা ক'রে লিখ্‌লেই হ'বে। আমি ব'লে ব'লে যাব ; কাগজ পেন্সিল নিয়ে ব'সো। ইচ্ছা হ'লে কাল থেকেই লিখ্‌তে পার।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল। অপরাহ্নে পণ্ডিতদাদা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঠাকুরের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইলেন। গুরুভ্রাতারা অনেকেই খুব আনন্দিত হইলেন।

১১ই রবিবার। আজ মধ্যাহ্নে মহাভারতপাঠান্তে কাগজ পেন্সিল হাতে লইয়া ঠাকুরকে বলিলাম ঃ—"আপনি এখন বলিলেই আমি লিখিয়া যাইতে পারি।"

ঠাকুর একটু সময় স্থিরভাবে থাকিয়া বলিলেন ঃ—"ওসব থাক্। আশাবতীর উপাখ্যান বামাবোধিনী পত্রিকায় যখন আমি লিখ্‌তে আরম্ভ করলাম, সামান্য একটু লিখ্‌তেই চারিদিকে বিষম হৈ চৈ প'ড়ে গেল। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক হ'য়ে ঐ প্রকার সব লিখ্‌চি, সাধারণ ব্রাহ্মদের ভিতরে এই নিয়ে তুমুল আন্দো-

লন চল্‌লো। প্রাণের সত্য ঘটনার উপরে লোকের অনাদর অশ্রদ্ধা দে'খে, বড়ই দুঃখ হ'লো। অমনি লেখা বন্ধ ক'রে দিলাম। আশাবতীতে যাহা লেখা হ'য়েছে তাতো কিছুই নয়, অতি সামান্য। তার পরের সব ঘটনা আরও অদ্ভুত। সে সব কেহ বিশ্বাস ক'র্বে না। গুলিখোরের গল্প মনে কর্‌বে। তাই ও সকল আর প্রচারিত না হওয়াই ভাল।"

ঠাকুরের এ কথা শুনিয়া আমার মাথা যেন ঘুরিয়া গেল। আমি একটু সময় অবাক হইয়া বসিয়া রহিলাম। ঠাকুর পুনঃ পুনঃ আমার পানে চাহিতে লাগিলেন। আমি ঠাকুরকে বলিলাম ঃ—"আমরা প্রচার করিব না; শুধু আমাদেরই মধ্যে রাখিব। জীবনের ওরূপ আশ্চর্য্য ঘটনাগুলি, চিরকালের জন্য একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে,—কেহ কিছু জানিবে না!"

ঠাকুর আমার প্রাণের ক্লেশ বুঝিয়া খুব স্নেহভাবে বলিলেন ঃ—"আমার জীবনের সমস্ত ঘটনাই সময়ে তোমাদের নিকটে প্রকাশ পাবে। সে জন্য এখন এত ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন? এখন থেমে যাও, সময়ে সবই হ'বে।"

ঠাকুরের এই কথার পর আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হইল। ভাবিলাম, ঠাকুর যখন পরিষ্কার বলিলেন, 'সময়ে সবই প্রকাশ পাবে' তখন আর চিন্তা কি? না হয় দুদিন পরে হইবে।

ঠাকুরের ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসের কথা।

১৩ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার। মধ্যাহ্নে পাঠের পর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইলে, সকলকেই কি আগে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিয়া নিতে হয়?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"ব্রহ্মচর্য্য না করলে কখনও বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার হয় না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"কত কাল এই ব্রহ্মচর্য্য করিলে বৈদিক সন্ন্যাসগ্রহণের অধিকার হয়? ব্রহ্মচর্য্য কি সকলকেই নির্দ্দিষ্ট একটা কালের জন্য করিতে হয়?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"সকলের পক্ষে এক রকম নয়। কারো ছত্রিশ বৎসর, কারো চব্বিশ বৎসর, কারো বা বারো বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করা আবশ্যক হয়। আবার কেহ নয় বৎসর, কেহ ছয় বৎসর, কেহ বা তিন বৎসর ক'রেই সন্ন্যাস নেবার অধিকারী হ'ন। আমাকে তিন দিন ব্রহ্মচর্য্য করতে হয়েছিল।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"আপনি আবার ব্রহ্মচর্য্য কবে ক'রেছিলেন ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"দীক্ষাগ্রহণের পরেই আমি সন্ন্যাস নিতে চেয়েছিলাম। পরমহংসজী বল্‌লেন,—'এমনি তো হবে না ! যথাশাস্ত্র সমস্ত কর্‌তে হ'বে। তুমি কাশীতে চ'লে যাও, তোমাকে সন্ন্যাস দিতে হরিহরানন্দ সরস্বতী সেখানে র'য়েছেন।' আমি গয়া হ'তে হেঁ'টে হেঁ'টে কাশী পৌঁছিলাম। হরিহরানন্দ সরস্বতীর দর্শন পেলাম। তিনি আমাকে বল্লেন, 'তোমাকে সন্ন্যাস দেবার জন্যই আমি এখানে এসেছি, সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে তোমার আরো কর্‌বার আছে। অনেক অনাচার ক'রেছ, এখন মস্তক মুণ্ডন ক'রে প্রায়শ্চিত্ত কর। পরে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ ক'র, তারপরে সন্ন্যাস। আমিও অমনি মস্তক-মুণ্ডন ক'রে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌লাম। পরে উপবীত ধারণ ক'রে, ব্রহ্মচর্য্য নিলাম। তিন দিন ব্রহ্মচর্য্য করার পরই তিনি আমাকে সন্ন্যাস দিলেন।"

আমি বলিলাম ঃ—"সন্ন্যাস নেওয়ার পরেওতো আপনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ক'রেছেন ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"হাঁ, সন্ন্যাস নিয়ে আমি আর ফির্‌ব না,মনে ক'রেছিলাম। পরমহংসজীকে বলাতে, তিনি বল্লেন, তা হবে না। সংসারে তোমার অনেক কায কর্‌তে হ'বে,—যেমন ছিলে তেমনি গিয়ে থাক, সংসারেই সব হ'বে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"আপনার গৈরিক বসন কি তখন থেকে ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"না। গৈরিক আরও পূর্ব্বে। গয়াতে যখন ছিলাম, পাহাড়ে একটি পরমহংস তাঁর গৈরিক বসন আমাকে দিয়ে বল্লেন, আমার এই গৈরিক বস্ত্র তুমি গ্রহণ কর,আর তোমার নামটি আমাকে দেও। সেই থেকে আমার গৈরিক।"

ঠাকুরের আরও এরূপ অনেক কথা শুনিলাম।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণের দৃশ্য।

১৪ই শ্রাবণ, বুধবার। আজ আমার শরীর অসুস্থ। মধ্যাহ্নে ঠাকুরের নিকট নামমাত্র মহাভারত পাঠ করিলাম। ঠাকুর ধ্যানস্থ হইলেন, আমিও একপাশে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম। ঠাকুর ভাবাবেশে পুনঃপুনঃ ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। প্রায় একটার সময়ে ঠাকুর অকস্মাৎ যেন চমকিয়া উঠিলেন,এবং খুব ব্যস্ততার সহিত

ঘরের পশ্চিম দিকের দরজার ভিতর দিয়া পশ্চিম-উত্তরে আকাশ পানে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ—"আহা ! কি সুন্দর ! কি সুন্দর !! কি সুন্দর !!! সোণার রথ, কি শোভা ! ধন্য ! ধন্য !! ধন্য !!! হলুদ রংয়ের কত পতাকা উড়্‌ছে, আহা ! সমস্ত আকাশ, আজ হলুদ রংয়ের উজ্জ্বল ছটায় একেবারে ঝল্‌মল্ কর্‌ছে। চারিদিকে কত সুন্দরী সুন্দরী দেবকন্যাগণ ! দেবকন্যারা চামর নিয়ে বীজন কর্‌ছেন, অপ্সরা সকল নৃত্য-গান কর্‌ছেন। আহা কত আনন্দ ! আজ গুণের সাগর বিদ্যাসাগরকে নিয়া আকাশপথে সকলে আনন্দ কর্‌তে কর্‌তে যাচ্ছেন। মহাপুরুষ আজ পৃথিবী ছে'ড়ে স্বর্গে চ'ল্লেন। হরিবোল ! হরিবোল !!"

ঠাকুর আর কথাবার্ত্তা না বলিয়া চোখ বুজিলেন। সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুমূত্র রোগে শয্যাগত, এরূপ একটা কথা কিছু দিন হয় সংবাদ-পত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় এ রটনার বিরুদ্ধে তখনই প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছিলেন,—'আমার চোদ্দপুরুষেও বহুমূত্র রোগ নাই' ইত্যাদি। উহা পড়িয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় বেশ সুস্থ আছেন,—এ পর্য্যন্ত এইরূপ সংস্কারই আমার ছিল। সুতরাং ঠাকুরের ভাবাবেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে ঐ সকল কথা শুনিয়া মনে করিলাম—হয়ত ঠাকুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভবিষ্যৎ জীবনেরই একটা চিত্র দর্শন করিয়া ঐ সব কথা বলিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই খবর পাইলাম, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর দেহত্যাগ করিয়া-ছেন। স্কুল কলেজাদি সমস্ত বন্ধ হইল। জয় বিদ্যাসাগর—ধন্য বিদ্যাসাগর !!

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে ঠাকুর আজ অনেক কথা বলিলেন—দুই একটি মাত্র লিখি-তেছি।

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"বিদ্যাসাগর ম'শায়ের বোধোদয় পুস্তকখানা প্রকাশ হ'তেই সর্ব্বত্র ছেলেদের পাঠ্য হ'লো। আমি ঐ পুস্তকখানা প'ড়ে দেখ্‌লাম, ওতে ভগবানের নাম গন্ধও নাই। আমার মনে বড়ই দুঃখ হ'লো ; আমি অম্‌নি বিদ্যাসাগর ম'শায়ের কাছে গিয়ে বল্লাম, সাধারণ প্রয়োজনীয় সকল বস্তুরই খুব সহজে যাহাতে একটা বোধ জন্মে, বোধোদয় খানা সে ভাবেই লিখেছেন। কিন্তু মানুষের সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা যে বিষয়ের বোধ থাকা বেশী আবশ্যক, সেই ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি কথাও বোধোদয়ে নাই। বিদ্যাসাগর ম'শায় আমার কথা শুনে একটু

লজ্জিত হ'য়ে বল্লেন, 'হাঁ, গোঁসাই, ঠিকই ব'লেছ। আচ্ছা, আগামী সংস্করণে, গোড়াতেই আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে লিখ্‌বো।' পরে দেখ্‌লাম, বোধোদয়ের দ্বিতীয় সংস্করণেই ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রবন্ধটি লেখা হ'য়েছে। সকলের কথাই তিনি মন দিয়ে নিরপেক্ষ ভাবে শুন্‌তেন।"

তারপর মেডিকেল কলেজের গোলমাল সম্বন্ধে ঠাকুর বিদ্যাসাগরের দয়া ও সৎসাহসের কথা বলিলেন। এ সময়ে আমি দু একবার আসন হইতে উঠিয়া যাওয়াতে সমস্ত কথা আগা গোড়া শুনিতে পাইলাম না। সুতরাং গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ মহাশয় ঠাকুরের নিকটে শুনিয়া এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্ব্বে সেই কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ, বাঙ্গলা বিভাগের একটি ছাত্রকে চোর সন্দেহ করিয়া, পুলিশের হস্তে অর্পণ করেন এবং 'ঐ বিভাগের ছাত্রেরা প্রায় সকলেই ছোট লোক, অসভ্য' বলিয়া প্রকাশ্যভাবে দোষারোপ করিয়া গালাগালি দেন। ইহাতে ছাত্রেরা সকলেই অতিশয় অপমান বোধ করেন, তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়কে নেতা করিয়া অনেকেই এককালে কলেজ ত্যাগ করিলেন। সর্ব্বত্র হৈ চৈ পড়িয়া গেল। চারিদিকে এই ব্যাপার লইয়া খুব আলোচনা চলিল। ইহার একটা প্রতিকারের প্রত্যাশায় গোস্বামী মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে বহুসংখ্যক সহাধ্যায়ীকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। দু চারটি কথা বলিতেই বিদ্যাসাগর মহাশয় ধমক দিয়া ছাত্রদিগকে বলিলেন, "যাও, যাও, আমি ও সব কিছু শুন্‌তে চাই না। ছেলেরা অনেক সময়ে মিছামিছি ওরূপ অনর্থক গোল করে।" এই বলিয়া তিনি কোন কথা শুনিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে গোস্বামী মহাশয় খুব তেজের সহিত বলিলেন ঃ—"আপনি আমাদের কোন কথা না শু'নেই একটা স্থির ক'রে নিচ্ছেন কেন? আমাদের দুটা কথা শু'নে, পরে যা ইচ্ছা বলুন। বাঙ্গলা বিভাগে যাঁরা পড়েন, তাঁদের কি একটা বংশের—জাতির মর্য্যাদা নাই? ইহারা সকলে কি ইতর ছোট লোক, চোর বদমাইস, আপ্‌নিও একথা বলেন?" বিদ্যাসাগর একথা শুনিয়া অম্‌নি চমকিয়া বলিলেন, "কি বল্‌ছ গোঁসাই? এরূপ! কি ব্যাপার বলতো?" তখন গোস্বামী মহাশয় সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—"বটে, এ রকম ঘটনা? তবে আর তোমরা কলেজে যে'ও না। দেখি, আমি ইহার কিছু প্রতিকার করিতে পারি কি না।" এই বলিয়া তিনি তদানীন্তন ছোটলাট বীডন সাহেবের নিকট সমস্ত বিষয়

পরিষ্কার রূপে লিখিয়া জানাইলেন,এবং গোস্বামী মহাশয়ের নিকট যখন শুনিলেন যে, অনেক ছাত্রের বৃত্তি বন্ধ হইয়াছে, ঐ বৃত্তির দ্বারাই তাহাদের আহার ও বাস চলিতেছিল, উপস্থিত তাহাদের অতিশয় ক্লেশ, অনেক ছেলে আবার এই বৃত্তির টাকা হইতেই অসহায় বৃদ্ধ পিতামাতারও কিছু কিছু সাহায্য মাসে মাসে করেন। তখন তিনি সকলের বৃত্তির টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়া তিন চারি মাস কাল সকলের প্রায় সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করিলেন। বীডন সাহেবের আদেশে এই বিষয়ের অনুসন্ধান হইল। কলেজের অধ্যক্ষের দোষেই যে এইরূপ ঘটিয়াছে, তাহা প্রমাণিত হইল। এইজন্য অধ্যক্ষকে ক্রটি স্বীকার করিতে হইল। এই ঘটনায় কলেজের অধ্যাপকগণ গোস্বামী মহাশয়কে দলের নেতা জানিতে পারিয়া কোন প্রকারে তাঁহাকে জব্দ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের আর কলেজে যাওয়ার প্রবৃত্তি হইল না; সুতরাং তাঁহাদের আশা ব্যর্থ হইল। কিছুদিন পরে অন্যতম অধ্যাপক তামিজ খাঁ মহাশয়ের সহিত গোল-দিঘীর ধারে গোস্বামী মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়। তখন তামিজ খাঁ গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন,—"গোঁসাই, তুমি কলেজে না যাইয়া বড়ই ভাল করিয়াছ, নচেৎ তোমাকে বিষম বিপদে পড়িতে হইত।"

রুদ্রাক্ষধারণ,—নীলকণ্ঠ-বেশ।

১৬ই শ্রাবণ, শুক্রবার। কাশী হইতে রুদ্রাক্ষের মালা আসিয়াছে, উহা ঠাকুরকে দেখাইলাম। ঠাকুর মালাগুলি হাতে লইয়া দেখিয়া বলিলেন ঃ—**"চমৎকার দানা। সমস্ত গুলিই ভাল, বেশ পাকা। এসব ঠিক মত গেঁথে নেও।"**

আমি কয়েক দিন পরিশ্রম করিয়া ছুঁচ ও শণের দ্বারা, রুদ্রাক্ষের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে সকল শিকড় ছিল, তুলিয়া ফেলিলাম। পরে ঠাকুরের নিকটে লইয়া গেলাম। ঠাকুর দেবীভাগবত খুলিয়া উহা যে প্রণালীতে ধারণ করিতে হইবে, শ্লোক পড়িয়া উহা বুঝাইয়া দিলেন ঃ-

> রুদ্রাক্ষান্ কণ্ঠদেশে দশনপরিমিতান্ মস্তকে বিংশতি দ্বে
> ষট্ ষট্ কর্ণপ্রদেশে করযুগলকৃতে দ্বাদশ দ্বাদশৈব।
> বাহ্বোরিন্দোঃ কলাভির্নয়নযুগকৃতে ত্বেকমেকং শিখায়াং
> বক্ষস্যষ্টাধিকং যঃ কলয়তি শতকং স স্বয়ং নীলকণ্ঠঃ॥

আমি ঠাকুরের আদেশমত কণ্ঠে ৩২ টি, মস্তকে ২২টি, কর্ণদ্বয়ে ৬টি করিয়া ১২টি, কর-যুগলে ১২টি করিয়া ২৪ টি, বাহুদ্বয়ে ৮টি করিয়া ১৬ টি, শিখাতে ১টি, এবং বক্ষে অবশিষ্ট ১টি, মোট ১০৮টি মালা পৃথক পৃথক করিয়া গাঁথিয়া রাখিলাম।

আজ ১৬ই শ্রাবণ একাদশী তিথিতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে পূবের ঘরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া, গ্রন্থি দেওয়া নূতন উপবীত, যোগপাট এবং রুদ্রাক্ষের মালা ঠাকুরের সম্মুখে রাখিলাম। ঠাকুর উপবীত হাতে লইয়া দ্বাদশবার গায়ত্রী জপ করিয়া আমার গলায় ফেলিয়া দিলেন। পরে যোগপাট স্পর্শ করিয়া আমার হাতে দিলেন। তৎপরে রুদ্রাক্ষের মালাগুলি হাতে রাখিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; অনন্তর উহা আমাকে পরাইয়া দিয়া বলিলেনঃ—"**ইহাই নীলকণ্ঠ-বেশ।**"

আমি ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ঠাকুরের পাশে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। ঠাকুর আজ আমাকে নীলকণ্ঠ মহাদেবের বেশ দিলেন মনে করিয়া, আমার শরীর মন পুল-কিত হইয়া উঠিল; কান্দিতে কান্দিতে আমি মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম,— "ঠাকুর! দয়া করিয়া আমাকে যেমন এই বেশ দিলে, তোমার দয়াতেই যেন এই বেশের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। নিয়ত যেন অনুগত থাকি।" এগারোটা পর্য্যন্ত ঠাকুরের নিকটে বসিয়া রহিলাম। কি ভাবে যে এই সময়টি আমার চলিয়া গেল বলিতে পারি না। ঠাকুর শৌচে গেলেন, আমিও আসন হইতে উঠিয়া আশ্রমস্থ সকল গুরুভ্রাতাদের নমস্কার করিলাম। সকলেই প্রসন্নমনে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মধ্যাহ্নে মহাভারত পাঠের পরে পাঁচটা পর্য্যন্ত পরমানন্দে, নামে মগ্ন থাকিয়া কাটাইলাম।

সাধনে দৈহিক উপসর্গ।

২০শা—৩১শা. শ্রাবণ।

দ্বিতীয় বৎসর ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের পর নূতন নিয়ম প্রতিপালনের উৎসাহ উদ্যম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিয়া সমস্ত নিয়মের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লাগিলাম। এখন দিন দিন শরীরের যন্ত্রণা আমার এতই অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে যে, কি করিব বুঝিতেছি না। পদাঙ্গুষ্ঠে সর্ব্বদা দৃষ্টি স্থির রাখিতে অনবরত একভাবে মাথা হেঁট্ করিয়া থাকিয়া, আজ কয়দিন যাবৎ ঘাড়ে ভয়ানক বেদনা হই-য়াছে। সমস্ত ঘাড় যেন পাকিয়া গিয়াছে। এই যাতনা সময়ে সময়ে এতই তীব্র হ'য়ে পড়ে যে, কান্দিতে ইচ্ছা হয়। জিজ্ঞাসিত না হইলে কথা বলিতে পারিব না, এবং জিজ্ঞাসিত বিষয়েও প্রয়োজন বোধ না হইলে উত্তর দিতে পারিব না, এই প্রকার আদেশ করিয়া ঠাকুর আমাকে প্রকারান্তরে মৌনীই করিয়া রাখিয়াছেন। সারা দিনে রাত্রে দুই চারিটি কথাও বলিতে

পাই না। প্রাণ সর্ব্বদা আই-ঢাই করে। মনে হয়, নির্জ্জনে কোথাও যাইয়া চীৎকার করিয়া আসি। ঘন ঘন হাই তুলিয়া সময় কাটাইতেছি। গুরুভ্রাতারা আমাকে একবার একটি মাত্র প্রশ্ন করিলেই আমি দশটি কথা বলিয়া উত্তর দিব প্রত্যাশায় যেমনই কারো হাতখানা ধরিয়া টান দেই, সে অমনি কথাটি মাত্র না বলিয়া আমার টিকিটী টানিয়া দু এক পাক ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দেয়। প্রশ্ন পাইবার আকাঙ্খায় কোনও গুরুভ্রাতার গা ঘেঁষিয়া বসিলে, সে উঠিয়া নীরবে আমাকে সজোরে ঠাসিয়া ধরে। আমার তখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, কখনও বা গুঁতা মারিয়া সরাইয়া দেয়। হায় কপাল! আহা উহুঃ শব্দ মাত্র করিয়া ভাগিয়া পড়ি। ঠাকুর আমার অবস্থা বুঝিয়াই দয়া করিয়া সময়ে সময়ে কোন কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাই উত্তর দিয়া প্রাণ বাঁচে। আজ ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম, "আপনার সঙ্গেও কি ইচ্ছামত কথা বলিতে পারিব না?"

ঠাকুর আমার দিকে একটু হাসিয়া বলিলেন :—"আচ্ছা, তা ব'লো।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম :—"শুধু আপনার দিকে চাহিতে পারিব তো?"

ঠাকুর বলিলেন :—"মাথাটি না তু'লে, যদি চাইতে পার, চাইবে।"

স্বপ্নদোষ,—তার হেতু ও প্রতিকারের উপদেশ।

এবার ব্রহ্মচর্য্য লইয়া বীর্য্যধারণের চেষ্টা প্রাণপণে করিতেছি; কিন্তু কিছুতেই বীর্য্য স্থির রাখিতে পারিতেছি না। ঘন ঘন স্বপ্নদোষ হওয়াতে চিত্ত অতিশয় চঞ্চল ও অশান্তিপূর্ণ হইয়া পড়ে, কিছুই ভাল লাগে না। বীর্য্য কেন স্থির থাকিতেছে না, এত নিয়মে থাকিয়াও স্বপ্ন-দোষ কেন নিবৃত্ত হইতেছে না, এই প্রকার দুর্দ্দশা আমার কি জন্য হইতেছে, স্থির করিতে না পারিয়া ঠাকুরকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম।

ঠাকুর একটু ধমক দিয়া আমাকে বলিলেন :—"দু' দশ দিনের একটু চেষ্টায়ই একটা কিছু হ'তে চাও নাকি? কু-অভ্যাসে ছেলেবেলা বহুকাল বীর্য্য নষ্ট ক'রেছ। তার একটা স্রোত কি একবারেই বন্ধ হয়! এখন খুব নিয়ম ধ'রে কিছুকাল চল্‌লে, ক্রমে সব ঠিক হ'য়ে আস্‌বে। ব্যস্ত হ'লে হবে কেন! ও সব দিকে দৃষ্টি না ক'রে নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রে'খে চল। চিত্ত-চাঞ্চল্যে স্বপ্নদোষ হয়, ক্রোধ কর্‌লে স্বপ্নদোষ হয়, স্নায়বীয় দুর্ব্বলতায় হয়, পেট গরম, মাথা গরম হ'লে হয়, আহারের দোষে হয়, আর অতিরিক্ত নিদ্রাতেও স্বপ্নদোষ হয়। সন্ধ্যার পর

কিছুক্ষণ ঘুমায়ে রাত দশটা এগারোটার সময় উ'ঠে, সারারাত্রি ব'সে নাম কর্‌তে পার না! ঘুম্‌টি কমাও। ঘুম বেশী হ'লে স্বপ্নদোষ যা'বে না। শয়নের পূর্ব্বে দুই হাত কুনুই পর্য্যন্ত, দুই পা হাঁটু পর্য্যন্ত ধুয়ে নিও। পশ্চিম বা উত্তর দিকে মাথা রেখে শু'তে নাই। শোবার সময়ে বেলপাতায় গায়ত্রী লিখে মাথার নীচে রাখ্‌তে পার। তুলসীপাতা রাখ্‌লেও কারো কারো উপকার হয়।"

ঠাকুরের উপদেশ শুনিয়া মনে মনে দুঃখিত হইলাম, একটু বিরক্তিও আসিল। ভাবিলাম, স্বপ্নদোষের কথা ঠাকুরকে বলিলেই ঠাকুর এক এক দিন এক একটি নূতন হেতু তুলিয়া নূতন নূতন নিয়ম ঘাড়ে চাপাইয়া দেন। এ-ও উৎপাত মন্দ নয়! নিদ্রাটি না হয় কমাইয়া ফেলিব, কিন্তু শয়নকালে ঘাড়টি সোজা রাখিয়া রাত্রিতে যা একটু আরাম পাইতাম, এবার ঠাকুর যে তা-ও সারিলেন! এগারোটার পরে আসনে বসিতে হইলেই তো মাথাটি গুঁজিয়া বসিতে হইবে, অধিক নিদ্রায় স্বপ্নদোষ হয়, একথা আর কখনও শুনি নাই।

ঊর্দ্ধরেতাঃ হওয়ার সাধন-প্রণালী।

ঠাকুরের উপদেশমত চলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। রাত্রি প্রায় বারোটা পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া, সারারাত্রি নাম করিয়া কাটাইতেছি। কিন্তু বীর্য্যতো কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিতেছি না। বীর্য্যধারণ না হইলে সাধন ভজন তপস্যা ও ব্রত নিয়মাদি সমস্তই বৃথা মনে করিয়া, অতিশয় অস্থিরচিত্তে ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম :—"শুনিয়াছি, ঊর্দ্ধরেতাঃ না হইলে কিছুতেই বীর্য্যধারণ হয় না। কি প্রণালীতে সাধন করিলে ঊর্দ্ধরেতাঃ হওয়া যায়? নিয়ম মত চলিলে ঊর্দ্ধরেতাঃ হইতে কতকাল লাগে?"

ঠাকুর বলিলেন :—"ঊর্দ্ধরেতাঃ হওয়া সাধারণের সহজসাধ্য নয়। আবার নির্দ্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে যে সকলেই হবে, তাও বলা যায় না। এমন লোকও আছেন যে, তিন দিনের মধ্যেই ঊর্দ্ধরেতাঃ হ'তে পারেন। কেহ তিনমাসে হয়, কারো বা তিন বছর লাগে। আবার বহুকাল চেষ্টা ক'রেও কারো কারো হওয়া অসম্ভব হয়। যারা অভ্যস্ত, তাদের একটু সময় লাগে; শীঘ্র হয় না। তোমার বীর্য্য অনেক পরিমাণে নষ্ট হ'য়ে গে'ছে। এজন্য একটু সময় নেবে। নিয়ম মত চল্‌তে থাক, বিশেষ ব্যস্ত হবার কোনও আবশ্যক নাই।"

ঊর্দ্ধরেতাঃ হওয়ার জন্য কি কি নিয়মে চলিতে হয়, ইহা পরিষ্কাররূপে জানিতে ইচ্ছা

হইল। আমি সাহস করিয়া আবার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম।—ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন ঃ—"ঠিক নিয়ম ধ'রে চল্‌তে থাক, বেশী সময় তোমার লাগ্‌বে না। এখন থে'কে সর্ব্বদা পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি স্থির রাখ্‌তে চেষ্টা কর। কখনো অন্য দিকে তাকাবে না। পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি রাখ্‌তে নিতান্ত না পার্‌লে নাসাগ্রেও রাখ্‌তে পার। তবে তাতে মাথা একটু গরম হয়। পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টিতে মাথা খুব ঠাণ্ডা থাকে। অন্ধকার রাত্রেও এদিক সেদিক চাইবে না। সর্ব্বদাই একভাবে মাথা হেঁট্‌ ক'রে থাক্‌বে।"

ঠাকুর একটু সময় চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেনঃ—"আর একটি কায ক'রো। প্রস্রাব এক ধারায় না ক'রে, একটু থে'মে থেমে, ক'রো। দুচার সেকেণ্ড্‌ প্রস্রাব ত্যাগ ক'রে, আবার দুচার সেকেণ্ড্‌ থে'মে যে'ও। এইরূপ ধীরে ধীরে একটু একটু ক'রে, ধারণ ক'রে ক'রে, ত্যাগ কর্‌তে অভ্যাস কর। ধারণের সময়ে খুব কুম্ভক ও সঙ্গে সঙ্গে খুব নাম কর্‌বে। যতক্ষণ কুম্ভক ক'রে থাক্‌তে পার্‌বে, ততক্ষণই ধারণের চেষ্টা রাখ্‌বে। অল্প অল্প ত্যাগ ক'রে ক'রে, অন্ততঃ পাঁচ সাতবারে সমস্তটী প্রস্রাব ত্যাগ কর্‌বে। এটি অভ্যাস কর্‌তে কর্‌তে প্রস্রাবের রাস্তার মাংসপেশী খুব দৃঢ় হ'য়ে আস্‌বে। ধারণের ক্ষমতাও বৃদ্ধি হ'বে। এখন থে'কে এটি বেশ অভ্যাস কর।"

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন ঃ—"স্বাভাবিক কুম্ভক ক'রে সর্ব্বদা নাম কর্‌বে। ধীরে ধীরে প্রতি দমে দমে কুম্ভকের সহিত নাম কর্‌তে পার্‌লে, এবিষয়ে যথেষ্ট উপকার পা'বে। এ সকল ক্রিয়া, যার সঙ্গে শরীরের বিশেষ একটা যোগ আছে, হঠাৎ এক্‌বারে হয় না। সময় লাগে। নানা কারণেতে নানা অবস্থায় দেহের বীর্য্য মথিত হ'য়ে প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে উপস্থের দিকে চলে। বীর্য্যের ঊর্দ্ধদিকে যাবারও একটি সংকীর্ণ পথ আছে। নীচের পথটির মুখ একেবারে বন্ধ না হ'লে, বীর্য্য কখনো ঊর্দ্ধপথে যে'তে পারে না। বীর্য্যের স্রোত ঊর্দ্ধপথে দিতে না পার্‌লে, কোনও উপায়েই উহা দেহে রাখা যায় না। বীর্য্য একস্থানে কখনো থাক্‌বার বস্তু নয়। বীর্য্য অধোগামী না হয়, সে জন্য কত

লোকে কত কাণ্ডই করে! শরীরের গরম কমাবার জন্য কেহ শিরা কেটে ফেলেন। কেহ মনের উত্তেজনা কমাতে অঙ্গাদি ছেদন করেন, কিন্তু তাতে যথার্থ কোন উপকারই হয় না। ঐ সকল উপায় অবলম্বন করায় ধর্ম্মজীবনেরও কোন কল্যাণ হয় না। সংযম দ্বারা চিত্ত স্থির রেখে, নামযোগে কুম্ভক দ্বারা বীর্য্য ঊর্দ্ধদিকে আকর্ষণ কর্‌তে হয়। কুম্ভক কর্‌লেই বীর্য্যের নীচের দিকের পথে চাপ পড়ে, আর উপরের পথও প্রশস্ত হয়। সুতরাং বীর্য্যের গতি নীচ দিকে আর না হ'য়ে ঊর্দ্ধদিকেই হয়। একবার বীর্য্যের গতি ঊর্দ্ধদিকে হ'লে, উহা আর নীচে যায় না। আমার যখন ঐ রকম হ'য়েছিল, মনে হ'লো, যেন একটা অমৃতের সাগরে আমাকে ডুবায়ে দিলে। চেষ্টা ক'রে কুম্ভকাদিতে কোনও ফলই হয় না। নামের সঙ্গে অবিশ্রান্ত স্বাভাবিক কুম্ভক ক'রেই এ সব হয়। অস্বাভাবিক কুম্ভকে লাভ নাই। নামের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু ক'রে এই ভাবে কুম্ভক অভ্যাস কর। এ সব বিষয়ে সর্ব্বদা খুব একটা চেষ্টা রাখ্‌তে হয়। দৃঢ়তা না থাক্‌লে বেশী দিন চেষ্টা রাখা যায় না।"

ঠাকুর এ সকল বলিয়া নীরব হইলেন। আমি কতক্ষণ পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, —"আমার কি কখনও ঊর্দ্ধরেতাঃ হওয়ার সম্ভাবনা আছে? কত অত্যাচার তো এক সময়ে করিয়াছি।"

ঠাকুর বলিলেন:—"অত্যাচার আর এমন কি করেছ? চেষ্টা কর্‌লে কেন হ'বে না? দেখ, আমারও তো ছেলেমেয়ে হ'য়েছে। আমিও তো তোমাদেরই মত ছিলাম। স্ত্রীলোক দেখে, আমারও কামভাব হ'তো, কত সময় উত্তেজিত হ'তাম। এখন কাম যে কি, তা কল্পনাতেও আনা যায় না। ঊর্দ্ধরেতাঃ হ'লে তোমারও এই রূপই হ'বে। সর্ব্বদা শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম কর, আর স্বাভাবিক কুম্ভক অভ্যাস কর। দমে দমে কুম্ভকের সঙ্গে নাম কর্‌তে পার্‌লে, ঊর্দ্ধরেতাঃ হ'তে পার্‌বে। ঊর্দ্ধরেতাঃ হ'লে শরীরটী সর্ব্বদা বেশ সুস্থ থাক্‌বে। ব্যারাম স্যারাম কিছুই হ'বে না। অল্প আহার, অধিক আহার, ভাল আহার বা খারাপ আহার কিছুতেই শরীরের কোন অনিষ্ট কর্‌তে পার্‌বে না।"

একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেনঃ—"বীর্য্যধারণ কর্‌তে হ'লে, আহার বিষয়েও খুব সাবধান হ'য়ে চল্‌তে হয়। আহারের দোষে অনেক সময়ে উত্তেজনা হ'য়ে থাকে। সকল বিষয়েই খুব সতর্কতার সহিত না চল্‌লে, এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন।"

আমি অমনি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আহার সম্বন্ধে কি প্রকার নিয়মে চলিব?"

ঠাকুর বলিলেনঃ—"আহারটি খুব নির্জ্জনে কর্‌বে। আহারের বস্তু কাহাকেও দেখ্‌তে দেবে না। আহারের সময়ে প্রতিগ্রাসে নাম কর্‌বে। আহারের সময়ে আহারের বস্তু ব্যতীত আর কোনও দিকে দৃষ্টি কর্‌বে না। শুদ্ধ সাত্ত্বিক বস্তুমাত্র আহার কর্‌বে। অধিক ঝাল, অধিক নূন বা অধিক টক্ খা'বে না। মিষ্টি একেবারেই ত্যাগ কর্‌বে। দুধ খাওয়াও ভাল নয়; আবশ্যক হলে, সামান্য পরিমাণে একবল্‌কা দুধমাত্র খে'তে পার। ঘন দুধ বড়ই অনিষ্ট-কর।"

এ সব শুনিয়া আমি বলিলাম,—"আরও কি কোন বিষয়ে কিছু নিয়ম আছে?"

ঠাকুর বলিলেনঃ—"আছে বই কি? শয়নেরও নিয়ম আছে। যেখানে সেখানে শু'তে নাই। শোবার বিছানা সর্ব্বত্রই পৃথক রাখ্‌বে। অন্যের বিছানায় শোওয়া, বসা বা অন্যের বস্ত্রাদি ব্যবহার করা একেবারে ত্যাগ কর্‌বে। এ সকল নিয়মে সর্ব্বদা খুব মনোযোগ রেখে চল্‌বে। না হ'লে বিশেষ ক্ষতি হয়। অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি যেমন ব্যবহার কর্‌বে না, নিজের ব্যবহারের বস্ত্রাদিও কখন অন্যকে ব্যবহার ক'রতে দেবে না। সমস্তই পৃথক রাখ্‌বে। অন্যের স্পর্শ পর্য্যন্ত হ'লে এই সাধনের অবস্থায় অনেক সময় ক্ষতি হয়।"

ঠাকুরের আদেশমত ঊর্দ্ধরেতাঃ হওয়ার সাধন-প্রণালী ধরিয়া খুব উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিলাম। খিচুড়ি ছাড়িয়া শুধু ভাতে সিদ্ধ ভাত আহার ধরিলাম। সমস্ত দিনে আর কিছুই খাই না। কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়াছি, মাত্র ঠাকুরের সঙ্গে যা ইচ্ছা বলি। শয়নের সময়ে ঘাড় সোজা করিয়া শুইতাম, এখন হইতে ঘাড় বাঁকা রাখিয়া শুইতে অভ্যাস করিতেছি। রাত্রি জাগরণ ঠিক ঠাকুরের কথামত হইতেছে না। কখনও বারোটা, কখনও বা একটার সময় হয়। নিদ্রিত হইয়া পড়িলে, যথাসময়ে উঠা তো আর আমার হাতে নয়!

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

স্বামিজী সচ্চিদানন্দ (শ্রীহরিমোহন চৌধুর
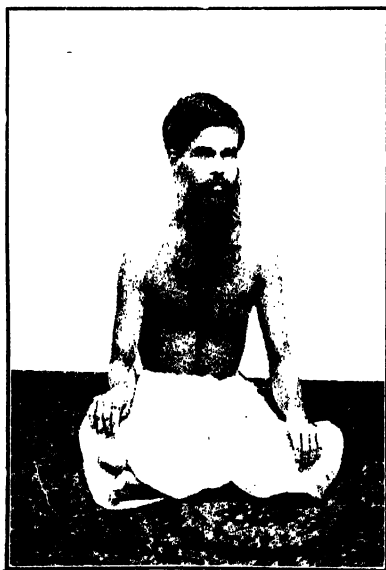
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রীশ্রীধরচন্দ্র ঘোষ।

ভাদ্র।

ঠাকুরকে একদিন বলিলাম,—"যখন ইচ্ছা করি, তখন তো ঘুম ভাঙ্গে না, কি কর্‌বো ?"

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন ঃ—"আচ্ছা, নিজের নাম নিয়ে চীৎকার ক'রে, ডেকে ব'লো, ওহে! আমাকে আজ রাত এতটার সময়ে তু'লে দিও। এরূপ ক'রে দেখ দেখি!"

আমি বলিলাম,—"তা আমি পার্‌বো না। লোকে হাস্‌বে। আমার লজ্জাবোধ হয়।"

ঠাকুর একটু হাসিলেন, আর কোনও কথা বলিলেন না। ইহা সত্য, না ঠাকুর আমাকে তামাসা করিলেন—একবার জানিতে হইবে।

শ্রীধরের বৃষ্টির জলে ভাবাবেশ ও কলহ।

ভাদ্র, ৭ই—১৮ই।

এই বৎসর ভাদ্রমাসে ঝড় বৃষ্টি তুফান খুব বেশী পরিমাণে হইতেছে। একদিন সকালবেলা পণ্ডিত মহাশয়ের রান্নাঘরে নিজ আসনে থাকিয়া নিত্যকর্ম্ম করিতেছি, অকস্মাৎ ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই এত প্রবল বেগে মুশলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল যে, মনে হইল, জলে আজ সমস্ত একাকার হইয়া যাইবে। উঠানে বিস্তর জল দাঁড়াইয়া গেল। দশ বারো হাত তফাতে অন্য ঘরের লোক ছায়ার মত দেখা যাইতে লাগিল। এ সময় শ্রীধর, পণ্ডিত দাদার ঘর হইতে 'হরিবোল, হরিবোল' বলিতে বলিতে উঠানে নামিয়া পড়িলেন। সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করিয়া, করজোড়ে আকাশের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। পরে লেংটিমাত্র পরিধানে—শ্রীধর, ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চ উচ্চ লম্ফ প্রদান করিতে করিতে, 'জয় রাধে, জয় রাধে' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। একঘণ্টা কাল অতীত হইল, শ্রীধরের নৃত্য থামিতেছে না। আকাশ হইতে ভগবানের চরণামৃত পড়িতেছে, এই ভাবে মত্ত হইয়া, শ্রীধর পাগলের মত একবার কাদায় গড়াগড়ি, একবার উঠানের চতুর্দ্দিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃই শ্রীধরের হুঙ্কার গর্জ্জন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভাবাবেশে শ্রীধর অবিশ্রান্ত নৃত্য করিতে করিতে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। এ সব দেখিয়া আমার মনে হইল, শ্রীধরের প্রায়ই সটকৃজ্বর হয়, তখন বিষম যন্ত্রণায় অস্থির হ'ন। এখন যে ভাবেই শ্রীধর মত্ত থাকুন না কেন, এত লম্ফঝম্প বৃষ্টি ঐ শরীরে কখনই সহ্য হইবে না। যে কোন প্রকারে হউক, উহাকে একবার থামাইয়া দিতে

পারিলে হয়। এই ভাবিয়া আমি শ্রীধরকে ডাকিয়া বলিলাম,—"শ্রীধর! আর না। ঢের হ'য়েছে! এত লাফানি সহ্য হবে না, এখন থাম।" শ্রীধর আমার কথা শুনিয়াই একবার থম্‌'কে দাঁড়াইয়া আমার দিকে কট্‌মট্ করিয়া চাহিতে লাগিল, পরে আবার নৃত্য আরম্ভ করিল। আমি আবার বলিলাম,—"শ্রীধর! এত লাফানি সইবে না, থা'ম, থা'ম।"

শ্রীধর খুব বিরক্তির সহিত আমাকে গালি দিয়া বলিলেন:—"চুপ্ শালা, চুপ!"

আমি বলিলাম:—"আচ্ছা, আমি চুপ কর্‌ছি, কিন্তু জ্বর হ'লে তুমিও চুপ থে'কো। তখন চীৎকার ক'রে পাড়ার লোককে অস্থির ক'রো না।"

শ্রীধর আমার কথায় বিষম রাগিয়া গিয়া বলিলেন:—"চুপ্ কর্, শালা! এক লাথিতে তোর দাঁতগুলি ভে'ঙ্গে দিব।" এই বলিয়া শ্রীধর আমাকে পা দেখাইলেন। আমি ক্রোধে অভিমানে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। চীৎকার করিয়া বলিলাম:—"এত আস্পর্দ্ধা! পা দেখালে। আচ্ছা, যদি ব্রাহ্মণ হই, ছটি মাস ঐ পা নিয়ে প'ড়ে থাক্‌বে। এই লাফানি, এই পা দেখান, তখন মনে কর্‌বে, নিশ্চয় জেনো।"

শ্রীধর মুখ খারাপ করিয়া গালি দিতে দিতে আমাকে বলিলেন, "আরে শালা! আমি তো ম'রেই আছি। আমার উপর তোর বামনালী তেজ দেখিয়ে, এ লাফানি আর কি থামাবি? তোর উত্তেজনার সময়ে ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য যদি থামাতে পারিস্, তবেই জানি, তুই বামুন!" শ্রীধরের ব্যবহারে অত্যন্ত অভিমান ও ক্রোধ হইল বটে, কিন্তু উহার কথাটি বড়ই সত্য মনে করিয়া লজ্জিত হইলাম। জিজ্ঞাসিত না হইয়া নিজ হইতে উপদেশ দিতে গিয়াই আমার উপযুক্ত দণ্ড হইল, পুনঃ পুনঃ ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। সারাদিন ক্লেশে কাটিল। অবসর মত ঠাকুরের নিকট যাইয়া বলিলাম:—"অভিমানটি কিসে নষ্ট হয়?"

ঠাকুর প্রশ্নটি শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন:—"অভিমান নষ্ট! বড় সহজ কথা নয়। একেবারে মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্তই অভিমানটি থাকে। সকল অপেক্ষা নিজকে হীন ব'লে জান্‌তে হয়। যতদিন নিজকে দীনহীন কাঙ্গাল ব'লে না বুঝ্‌বে, ততদিন কিছুই হ'লো না, এটী নিশ্চয় জে'নো। মুটে মজুর, এমন কি নিতান্ত জঘন্য ইতর লোককেও, আপনা অপেক্ষা ভাল মনে করতে হয়, সকলকেই শ্রদ্ধাভক্তি কর্‌তে হয়। অভিমানের ভাব অনুমাত্র কোনো কারণে ভিতরে এ'লে—আর রক্ষা নাই। সামান্য বিষয়ে অভিমান জ'ন্মে কত বড় বড় যোগিদেরও পতন

হ'য়েছে, দেখেছি। ধর্ম্মলাভ বিষয়ে অভিমান, সর্ব্বাপেক্ষা শত্রু। সকলেরই নিকটে মাথা হেট ক'রে থাক্‌তে হয়। শুধু নিজের সাধন ভজন নিয়ে থাক্‌লেই কোনও উৎপাতে প'ড়্‌তে হয় না।"

আজ কয়দিন যাবৎ শ্রীধর সটকৃজ্বরে শয্যাগত আছেন। বর্ষার জলে ভিজিয়া বাত-জ্বরে শ্রীধর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। দুটি পা আর নাড়িবার যো নাই। যন্ত্রণায় অস্থির হইলে শ্রীধর আমাকে ডাকিয়া বলেন, "ভাই! তোর শাপেই আমার এ দশা ঘটিয়াছে। আমাকে ক্ষমা কর্।" শ্রীধরের অবস্থা দেখিয়া, তার কথা শুনিয়া বড়ই কষ্ট হয়! হায়! সকল প্রকার ভোগই মানুষের ভগবদিচ্ছায় হয়, তাঁরই ব্যবস্থামত সমস্ত ঘটিতেছে, বৃথা অভিমানে আঘাত পাইয়া একটা কথা বলিয়া, আমি কেন অনর্থক নিমিত্তের ভাগী হইলাম!

লোকসঙ্গই ক্রোধ অভিমানাদির হেতু হয় দেখিয়া, ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম :— "লোকালয় ছাড়িয়া পাহাড় পর্ব্বতে থাকিতে পারিলে, বোধ হয় অভিমানাদির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কি প্রকার অবস্থা হইলে পাহাড় পর্ব্বতে নিরুদ্বেগে থাকা যায়?"

ঠাকুর বলিলেন :—"লোকালয়ে থাক্‌লে অভিমানের অনেক কারণ উপস্থিত হয় বটে, পাহাড় পর্ব্বতে থাক্‌তে পার্‌লে, এ সকল দিকে ঢের নিরাপদ; কিন্তু আহারটি ত্যাগ না হ'লে নির্জ্জন পাহাড় পর্ব্বতে শান্তিতে থাকা যায় না। আহারের জন্য অস্থির হ'য়ে আবার লোকালয়ে আস্‌তে হয়। আহারের চিন্তায় সকলেই অস্থির। আহারচিন্তায় সাধকদের অনেক সময়ে বিস্তর অনিষ্ট হ'য়ে থাকে। এজন্য অনেক সময়ে সাধুরা কঠোর সাধন ক'রে প্রথমেই আহার ত্যাগ অভ্যাস করেন। আহারটি ত্যাগ হ'লে, ইন্দ্রিয়-দমনাদির বিষয়েও বিস্তর উপকার হয়। খুব অধ্যবসায়ের সহিত কিছুকাল নিয়ম ধ'রে চল্‌লে আহার ত্যাগ করা যায়। সকলের পক্ষেই সহজ নয় বটে, সম্ভবও নয়, কিন্তু কেহ কেহ চেষ্টা কর্‌লে খুব সহজেই কৃতকার্য্য হ'তে পারে। সে চেষ্টা আর কে করে?"

ঠাকুর এই ভাবে উপদেশ দিয়া, আহারত্যাগের প্রবৃত্তি আমার অতিশয় বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। প্রার্থী না হইলে নিজ হইতে ঠাকুর কোন বিষয়েই তো প্রায় কিছু বলেন না। তাই খুব আগ্রহের সহিত বলিলাম :—"চেষ্টা কর্‌লে আমি আহারত্যাগী হইতে পারি কি? যদি সম্ভব হয়, নিয়মগুলি আমাকে বলুন, আমি একবারে সাধ্য মত চেষ্টা ক'রে দেখি।"

ঠাকুর বলিলেন :—"আহারত্যাগ কর্‌তে ইচ্ছা হ'লে, এখনও তুমি পার। বয়স তোমার বেশী হয় নাই, চেষ্টা কর্‌লে সহজেই পার্‌বে, মনে হয়। আহার ত্যাগ একেবারে হঠাৎ হয় না। প্রণালীমত খুব ধৈর্য্যের সহিত ধীরে ধীরে অভ্যাস কর্‌তে হয়। যে সকল বস্তু আহার ক'রে থাক, তার মধ্যে অন্নের একটা পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট রাখ্‌বে। প্রথম প্রথম আরম্ভেই কম খাওয়া ঠিক নয়। ডাল তরকারী ইত্যাদি কতগুলি জিনিস দিয়ে আহার না ক'রে একটি দিয়ে খাওয়া অভ্যাস কর্‌তে হয়। শুধু ডাল-ভাত বা শুধু তরকারী-ভাত খাওয়া ভালরূপ অভ্যাস হ'লে, ভাতে-সিদ্ধ-ভাত ধর্‌তে হয়। এ সময়ে প্রয়োজন হ'লে সামান্য পরিমাণে দুধ ঘি খে'তে পার। দুধ না খাওয়াই ভাল। ভাতে সিদ্ধ ভাত অভ্যাস হ'লে, ধীরে ধীরে ভাতে সিদ্ধের পরিমাণ কমা'য়ে নেবে এবং জল দিয়ে তা পূরণ কর্‌বে। ক্রমে জল ভাত ধর্‌বে। এ সময় খুব সাবধান হ'য়ে ধীরে ধীরে ভাতের পরিমাণ কমায়ে, জলের মাত্রা বৃদ্ধি কর্‌বে। জল-ভাত অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে নুন ত্যাগ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বে। নুন ত্যাগ হ'লে, জল-ভাতের সঙ্গে অল্প অল্প ফল খেতে আরম্ভ কর্‌বে। ফলের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি কর্‌বে ভাতের পরিমাণও তেমনই কমা'য়ে নেবে। ক্রমে শুধু জল আর ফল খাবে। এ সময় ফলের সঙ্গে দু পাঁচটা নিম পাতা, বেল পাতা খে'তে আরম্ভ কর্‌বে। পরে ফলের পরিমাণ কমায়ে দিয়ে পাতার পরিমাণ বাড়ায়ে নেবে। তৎপরে শুধু জল ও পাতা খাবে। খুব ধীরে ধীরে এ সব অভ্যাস কর্‌তে হয়। না হ'লে অসুস্থ হ'য়ে পড়্‌বে। খুব দৃঢ়তার সহিত দীর্ঘকাল চেষ্টা কর্‌লে, আহারত্যাগ করা যায়। আহার ত্যাগ কর্‌তে ইচ্ছা হ'লে, মিষ্টি এখন হ'তে ছে'ড়ে দেও। মিষ্টির মধ্যে ফল মাত্র খে'তে পার। <u>বীর্য্যধারণই সমস্ত সাধনের মূল।</u> ওটি না হ'লে এ সব কিছুই হবে না। বীর্য্যধারণ হ'লে সমস্তই সহজ হ'য়ে আসে।"

সমাধি-মন্দির আরম্ভ ও গেণ্ডারিয়ার কথা।

মা ঠাকুরুণের দেহত্যাগের পরই একখানি অস্থি শ্রীবৃন্দাবনে সমাহিত হয়। হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভমেলার সময়ে আর একখানি ব্রহ্মকুণ্ডে গঙ্গাগর্ভে দেওয়া হইয়াছিল। অপর একখানি অস্থি সমাধি দিবার জন্য গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আনা হইয়াছে। ঢাকার গুরুভ্রাতারা চাঁদা তুলিয়া একটি ছোট মন্দির প্রস্তুত করাইতেছেন। গুরুভ্রাতা রাধারমণ গুহ মহাশয় মন্দিরের নক্‌সা আঁকিয়া দিয়াছেন। আশ্রমের দক্ষিণ সীমায় পুকুরের ঠিক উত্তর পাড়ে, আম গাছের তিন চারি হাত তফাতে, পশ্চিম দক্ষিণ কোণে, মন্দিরটি উঠিতেছে। মন্দিরের বনেদ্ খুঁড়িতে সীঁড়ির স্থানে দুইটি মুসলমানের কবর বাহির হইয়া পড়িল।

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"কিছুকাল পূর্ব্বেও গেণ্ডারিয়া মুসলমান ফকিরদের সাধন-স্থান ছিল। গেণ্ডারিয়ার জঙ্গলে অনেক স্থানেই মুসলমানদের কবর আছে। ভাল ভাল ফকিরেরা প্রায় অনেকেই চ'লে গেছেন। জঙ্গলে এখনও যে দুচা'র জন আছেন, তাঁরা শীঘ্রই চ'লে যাবেন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"যোগিণী মা'ইর কথা শুনিয়াছিলাম। তিনি কি আছেন? তাঁর আসন কোথায়?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"কিছুদিন হ'ল তিনি মণিপুরের জঙ্গলে চ'লে গেছেন। আনন্দবাবুর বাগানের দিকে যেখানে আমি বস্‌তাম, যোগিনী মাই সেখানেই প্রায় থাক্‌তেন। আসন তাঁর নির্দ্দিষ্ট একটা স্থানে ছিল না। সর্ব্বদা তিনি গাছে গাছে থাক্‌তেন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"সূক্ষ্ম দেহেতে যে সকল ফকির মহাত্মারা আছেন,—তাঁরাও কি গেণ্ডারিয়া ছে'ড়ে চ'লে যাবেন?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"যে সকল বৃক্ষ অবলম্বন ক'রে তাঁরা আছেন, সে সব কে'টে ফেল্‌লে আর থাক্‌বেন কেন? আনন্দবাবুর বাগানের ধারে নবকান্ত বাবুর বাড়ীর সীমাতে একটি বড় গাছ ছিল, তা কে'টে ফেলাতে দুটি মহাত্মা গেণ্ডারিয়া ছে'ড়ে চ'লে গেছেন। গেণ্ডারিয়াতে বেশী লোকের বাস হ'লে, সকলকেই বোধ হয় স'রে পড়্‌তে হবে।"

গেণ্ডারিয়া ভূমি বহুকাল হইতে মহাত্মাদের সাধন-ক্ষেত্র শুনিয়া বড় আনন্দ হইল।

গুরুর মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে সিদ্ধ পুরুষের পুনরাবৃত্তি।

'শ্রীমতী শান্তিসুধার' ছেলে 'দাউজীর' কথা অনেক সময়ে ঠাকুর বলিয়া থাকেন। দাউজী ঠাকুরের নিকট আসিলেই, ঠাকুর কত প্রকারে দাউজীর আদর করেন, দাউজীর মাথায় ফুল দিয়া নমস্কার করেন। জয় দাউজী! জয় বলদেব মহারাজ! বলিয়া আনন্দ করেন। দাউজীর এখনও কথা ফোটে নাই। কিন্তু উহার হাব-ভাব দেখিয়া অনেক সময় অবাক হইতেছি। সংকীর্ত্তনের সময় দাউজী খোল করতালের শব্দ পাইলেই, স্থির ভাবে একদিকে তাকাইয়া থাকে, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে। কাণের ধারে 'হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ' বলিতে থাকিলেই ধীরে ধীরে দাউজীর চৈতন্য লাভ হয়।

ঠাকুর বলিলেন:—"পূর্ব্বজন্মের সমস্ত কথা দাউজীর স্মরণ আছে। চৌরাশী প্রকার আসন উহার অভ্যস্ত ছিল, কিছুই ভোলে নাই। দাউজী একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে দামোদর পূজারির কুঞ্জে বলরামমূর্ত্তি দাউজী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই দাউজী সেই ঠাকুরেরই সেবা পূজা কর্‌তেন, একান্ত ভাবে উপাসনা ক'রে দাউজী সেই বিগ্রহেরই রূপ লাভ করেছেন।"

ঠাকুরের কথায় এখন বুঝিলাম। যথার্থই দাউজীর আকৃতি ঠিক সেই বিগ্রহের অনুরূপ। অনেক সময় ভাবিতাম, ছেলের চেহারার সহিত পিতা বা মাতার চেহারার সাদৃশ্য নাই; অথচ এই চেহারা খুব পরিচিত মনে হয়, কোথায় যেন দেখিয়াছি। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম:—"দাউজী চিরকালই কি জাতি-স্মর থাকিবে?"

ঠাকুর বলিলেন:—"তা কি আর থাকে? কথা বল্‌তে যেমন শিখ্‌বে, স্মৃতিও তেমনই নষ্ট হ'য়ে যাবে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম:—"দাউজী এত বড় সিদ্ধপুরুষ হ'য়েও, আবার এলেন কেন?"

ঠাকুর বলিলেন:—"এক ক্ষেত্রে গুরুর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করাতেই এবার দাউজীকে সংসারে আস্‌তে হ'য়েছে। দাউজী পূর্ব্বজন্মে একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন। গুরুর সঙ্গেই সর্ব্বদা থাক্‌তেন। গুরু একজন মহাপুরুষ ছিলেন। স্ত্রীলোক পুরুষ সর্ব্বদাই তাঁকে দর্শন কর্‌তে আস্‌তেন। একদিন কয়েকটী স্ত্রীলোক এই মহাপুরুষের নিকট আস্‌তেই, মহাপুরুষ তাঁদের আদর যত্ন ক'রে বসালেন। স্ত্রী-লোকটি ব্রজমায়ী, কতক্ষণ থেকে, হাস গল্প, আনন্দ ক'রে চ'লে গেলেন। গুরুর

নিকটে স্ত্রীলোক যায় আসে, বসে, কথাবার্ত্তা হাসিগল্প করে, দাউজী একেবারে পছন্দ কর্‌তেন না। অনেক সময়ে খুব বিরক্তিই প্রকাশ কর্‌তেন। ঐ দিন স্ত্রীলোকেরা চ'লে যে'তেই দাউজী গুরুকে খুব ধমক দিয়ে দুচার কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন। দাউজীর গুরুর নিকটে ঐ সময়ে একটি মহাপুরুষ ব'সে ছিলেন। তিনি দাউজীকে বল্‌লেন, 'আরে বাচ্চা! গুরুজীকো এয়সা মাৎ বোল্‌না। চুপ রহো।' দাউজী বল্লেন, 'কাঁহে? ওয়াজিব কাহেঁ নেহিঁ কহেঙ্গে?' মহাত্মা বল্লেন, 'আরে হাতী কেত্‌না খাতা হ্যায়, কেত্‌না হজম কর্‌তা হ্যায়, তু ক্যায়সে জানোগে। তু ত বিল্লি হ্যায়।' দাউজীর ক্রোধ হ'ল, অম্‌নি বলে ফেল্‌লেন, —'হাঁ জী হাঁ? বহুত বহুত ঐরাবত দেখা হ্যায়।' মহাপুরুষ শুনে বল্‌লেন,— 'হাঁ! এয়সা! আচ্ছা, ফের আউর একদফে দেখ্‌নে হোগা, লোট্‌নে পড়েগা।' দাউজীর গুরু অমনি মহাপুরুষের পায়ে প'ড়ে বল্‌লেন, 'ও ছেলে মানুষ, আপনি ওর অপরাধ দয়া ক'রে ক্ষমা করুন।' মহাপুরুষ বল্‌লেন, 'আর একবার ওর আসাতে বিশেষ কল্যাণই হবে, কোন অনিষ্টই হবে না।' এই জন্যই দাউজীর আসা। পরলোকে থেকে, দাউজী পঁচিশ বৎসর প্রাণপণে চেষ্টা ক'রেছিলেন, যাতে আর না এসে পারেন। কিন্তু মহাপুরুষের বাক্য কিছুতেই অন্যথা হ'লো না। মর্য্যাদা লঙ্ঘন বিষম অপরাধ। দণ্ড ভোগ না ক'রে এই অপরাধ হ'তে কিছুতেই নিষ্কৃতি লাভ করা যায় না।"

স্বপ্নে 'লালের' সহিত প্রতিযোগিতা।

একটি স্বপ্ন দেখিয়া মনে বড় উদ্বেগ আসিয়াছে। মধ্যাহ্নে ঠাকুরকে নির্জ্জনে পাইয়া স্বপ্ন-বৃত্তান্তটি বলিলাম :—" 'লাল' ও আমি আপনাকে লক্ষ্য করিয়া উর্দ্ধদিকে আকাশপথে উড়িয়া যাইতেছি। লাল আমার দু'তিন হাত আগে আগে যাইতে লাগিল। লালের উপরে উঠিতে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই পারিলাম না। মনে অতিশয় দুঃখ হইল, অমনি আপনার নিকট আসিয়া বলিলাম, 'লাল আমার অনেক পরে দীক্ষা পাইয়াছে, বিশেষতঃ সে জাতিতে শূদ্র। আমি ব্রাহ্মণ হইয়াও প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া লালের উপরে উঠিতে পারিলাম না কেন? লাল কোন চেষ্টা না করিয়া স্বাভাবিক

গতিতেই যাইতেছে দেখিতে পাইলাম। তথাপি আমা অপেক্ষা দুই তিন হাত আগে আগে চলিল। ইহা কেন হইল আপনাকে জিজ্ঞাসা করায় আপনি বলিলেন ঃ—"লালের বৈষ্ণব ভাব, আর তোমার শাক্ত ভাব।" আর কিছুই বলিলেন না। অমনি জাগিয়া পড়িলাম। এই কথা বলিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"শাক্তভাব ও বৈষ্ণবভাবে পার্থক্য কি ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"শাক্ত ও বৈষ্ণবের চরমে একই অবস্থা লাভ হয়। তবে পথে উপাসনার ভাবের পার্থক্য দেখা যায় মাত্র। যাঁরা বৈষ্ণবপ্রকৃতির লোক, তাঁরা ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই চা'ন না। ঐশ্বর্য্য তাঁদের ভক্তির অন্তরায় মনে ক'রে, বিষবৎ ত্যাগ করেন। একান্ত-প্রাণে তাঁরা দাসই হ'তে চা'ন। ভগবদ্ভক্তি লাভ ক'রে তাঁরা অভয় পদ প্রাপ্ত হ'ন। সমস্ত ঐশ্বর্য্য, তাঁরা ইচ্ছা না কর্‌লেও দাস দাসীর ন্যায় সর্ব্বদা তাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করে। আর শাক্তদের অন্য প্রকার,—শাক্তেরা প্রথমে ঐশ্বর্য্য আকাঙ্ক্ষা ক'রেই কঠোর সাধন করেন। পরে ক্রমে ক্রমে নানা প্রকার অলৌকিক ঐশ্বর্য্য লাভ ক'রে, পৃথিবীর অনেক কল্যাণ সাধন করেন। ঐ প্রকারে সর্ব্বজীবের সেবা ক'রে, ভগবদুপাসনা দ্বারা মোক্ষ লাভ করেন। শেষ অবস্থা সকলেরই এক।"

স্বপ্নটি বোধ হয় আমার অলীক নয়, কারণ ঐশ্বর্য্যের দিকেইতো আমার ঝোঁক বেশী। ঊর্দ্ধরেতাঃ হওয়া, আহার ত্যাগ করা ইত্যাদি, এ সকলগুলিইতো ঐশ্বর্য্যের ক্রিয়া। তবে এ সকল চেষ্টার লক্ষ্য যখন ভগবান্, তখন ভক্তির সাধন বিনা আর কি বলা যায়। তাঁকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহা কিছু করা যায়, সমস্ত তাঁরই সেবা।

কালীর অপমানে উৎপাত—পূজায় শান্তি।

কয়েক দিন পূর্ব্বের একটি অতি সুন্দর ঘটনা আমারই হাতের লেখা একখানা আল্গা কাগজে পাইলাম। ঘটনাটির ঠিক তারিখ বা মাস তাহাতে লেখা নাই এবং আমারও মনে নাই ; সুতরাং যেমন লেখা আছে, এই স্থলে তুলিয়া দিতেছি।

আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুত কুঞ্জঘোষ মহাশয় ঠাকুরের একান্ত অনুগত ও শ্রদ্ধাবান্ সেবক। ঘোষ মহাশয়ের সমস্তটি পরিবারই স্বতন্ত্র রকমের। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি হইতে কচি খোকা খুকিটি পর্য্যন্ত কথা-বার্ত্তায়, চাল-চলনে, আচার-ব্যবহারে, যেন ঠাকুরের ভাবে

মাখা। দেখিলে মনে হয়, ঠাকুর ভিন্ন এই পরিবারের কাহারোই জীবনে আর যেন কিছুই লক্ষ্য নাই। সহজ ভাবে নিঃসঙ্কোচে ঠাকুরের সঙ্গে মিলামিশা এই পরিবারের ছেলে বুড়োর যেমনটী দেখিতেছি, এমন আর কোথাও দেখি না। কিন্তু হায় অদৃষ্ট! ঠাকুর-গতপ্রাণ এই পরিবারের ভিতরেও বিষম উৎপাত আরম্ভ হইল।

একদিন প্রত্যুষে উঠিয়া সকলেই দেখিলাম, ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে রক্তবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী আশ্রমসংলগ্ন,—ঠিক পূর্ব্ব দিকে। আর কোথাও একবিন্দু রক্তের চিহ্ন নাই; কিন্তু ঐ বাড়ীতে উঠানে, ঘাসের উপরে ও গাছের পাতায় ফোঁটা ফোঁটা রক্ত, প্রায় সর্ব্বত্রই পড়িয়া রহিয়াছে। কুঞ্জবাবুর স্ত্রী ও ছেলে প্রভৃতি কয়েক জনের সকাল বেলা হইতে জ্বর আরম্ভ হইল। এই জ্বরের মাত্রা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়া, একশত চার পাঁচ ডিগ্রী পর্য্যন্ত চড়িল। রোগীরা সকলেই শয্যাগত, মূর্চ্ছিতপ্রায়। ঘোষ মহাশয়ের বৃদ্ধা শাশুড়ি, একবার ঠাকুরের নিকটে, আর একবার নিজ বাড়ীতে, ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। অবসর পাইয়া বৃদ্ধা ঠাকুরকে সমস্ত বিপদের কথা পরিষ্কাররূপে জানাইলেন। শুনিলাম, ঠাকুর নাকি বৃদ্ধাকে খুব ধমকাইয়া বলিয়াছেন যে, তারই অপরাধে এ সকল উৎপাত ঘটি-তেছে। বৃদ্ধাকে ঠাকুর, অপরাধের হেতু নিজ হইতে বলিবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধা বলিলেনঃ— "কয়দিন থে'কে নাম কর্‌বার সময়ে কালীমূর্ত্তি আমার নিকটে প্রকাশ পাইতেছিলেন। যতই নাম করি, ততই কালী আমার আরো নিকট হইতে থাকেন। আমি অনেকবার কালীকে সরিয়া যাইতে বলিয়াছি, কিন্তু যা'ন নাই। পরে, ঘর ঝাঁট দিয়া, হাতে ঝাড়ু নিয়া বসিয়া, দরজার ধারে নাম করিতেছি, দেখিলাম, কালী সাম্‌নে দাঁড়ান। বারংবার সরিয়া যাইতে বলিলাম, গেলেন না, তখন আমার রাগ হ'ল, হাতে ঝাড়ু ছিল, উহাই ছুঁড়িয়া মারিলাম। তার পর থেকে আর কালীকে দেখি নাই।"

ঠাকুর এ সকল শুনিয়া খুব ধমক্ দিয়া বলিলেনঃ—"**ক'রেছ কি? কালী, কাঁচা-খে'কো দেবী, তাঁকে তুমি ঝাঁটা মার্‌লে? লোকে কত সাধ্য সাধনা ক'রে একবার যাঁর দর্শন পায় না, দয়া ক'রে তিনি তোমাকে দর্শন দিয়েছিলেন, আর তুমি তাঁকে ঝাঁটা মার্‌লে?**"

বৃদ্ধা বলিলেনঃ—"আমি ভগবানের নাম করি, তাঁকেই ডাকি, কালী আমার কাছে আসেন কেন? আমি মনে ক'রেছিলাম—কালী আমার সাধন পথের প্রলোভন।"

ঠাকুর বলিলেনঃ—"সে কি? কালী কি ভগবান্ নন্?"

বৃদ্ধা বলিলেন ঃ—“শ্রীকৃষ্ণইতো ভগবান্‌। নাম তো তাঁরই করি ?”

ঠাকুর বলিলেন ঃ—“দীক্ষাকালে ভগবানের কি কোন নির্দ্দিষ্ট একটি রূপের কথা বলা গিয়েছিল? সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যিনি র'য়েছেন, অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁরই ভিতরে র'য়েছে, তিনিই ভগবান্‌। তিনি কি দ্বিভুজ মুরলীধর, না—চতুর্ভুজা, তা তো কিছুই বলা হয় নাই ! তিনি কোন্‌রূপে তোমার নিকটে প্রকাশ পাবেন, তা তিনিই জানেন। আগে থেকে এ সব কল্পনা কেন ?”

বৃদ্ধা বলিলেন ঃ—“তবে এখন কি কর্ব্বো ?”

ঠাকুর বলিলেন ঃ—“মানসিক ক'রে গি'য়ে কালীপূজা কর। কালী-প্রতিমা এ'নে ব্যবস্থা মত পূজা কর্‌তে হ'বে।”

ঠাকুরের কথা শুনিয়া বৃদ্ধা আর কিছু না বলিয়া নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। ঠাকুর তখন কুঞ্জঘোষ মহাশয়কে ডাকাইয়া বলিলেন, ঃ—“তোমার শাশুড়ী তো শুন্‌বে না। তুমি শীঘ্র কালীপূজা কর, নচেৎ অকল্যাণ হ'বে।”

ইহার পরই কুঞ্জবাবুর বাড়ীতে কালীমূর্ত্তি আসিল। ব্যবস্থা মত, যথাশাস্ত্র, বেশ সমারোহের সহিত কালীপূজা হইল। এই পূজার দিনে কি কারণে জানি না, বৃদ্ধার প্রতিনিধি রূপেই হউক, অথবা একটি ব্রাহ্মণের উপবাস করা ব্যবস্থা বলিয়াই হউক, ঠাকুর আমাকে নিরম্বু উপবাস করিতে বলিলেন। আমিও সারা দিন-রাত্রি উপবাস করিয়া রহিলাম।

রাত্রিতে কালীপূজা আরম্ভ হইলে ঠাকুর যাইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া করযোড়ে দর্শন করিতে লাগিলেন। এই অপূর্ব্ব দর্শন সম্বন্ধে ঠাকুর পরে এক সময়ে যাহা লিখিয়া জানাইয়াছিলেন, এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল ঃ—

ঠাকুরের স্বহস্তে লেখা,—“প্রথম দেখিলাম, মা-কালী নৈবেদ্যের আমটী মাথায় লইয়া বসিয়া আছেন। পরে দেখিলাম, মহাবীর শ্রীরামচন্দ্রকে স্কন্ধে লইয়া দণ্ডায়মান। তদনন্তর দেখিলাম, গরুড়ের স্কন্ধে বিষ্ণু রহিয়াছেন। পরে দেখি, মহাদেবের উপরে কালী-মূর্ত্তি। তাহার পরে দেখিলাম, বলরামের বুকের উপর রাধাকৃষ্ণ দণ্ডায়মান। অনন্ত ভাব কে বুঝিবে !”

এই পূজায় ঠাকুরের আজ্ঞানুসারে কুষ্মাণ্ড ও ইক্ষু বলিদান হইল। বহু গুরুভ্রাতা-ভগ্নীরা পূজার পরদিন প্রসাদ পাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

কালীপূজা হইয়া গেল পরে অবসর মত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"আপনার অজ্ঞাতসারেই কি কালী এরূপ একটা আপদ ঘটাইলেন ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"তাকি কখনও হবার যো আছে! কালীকে ঝাঁটা মার্‌তেই কালী এসে আমতলায় বল্‌লেন,—'দেখ্, আমাকে আহ্বান ক'রে অপমান করেছে, আমি ওকে একটু শিক্ষা দিতে চাই।'—তার পরই এই সব।"

আমি বলিলাম ঃ—"বৃদ্ধার আর এতে কি শিক্ষা হ'লো ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"যা হ'য়েছে, তাই যথেষ্ট।"

আমি বলিলাম ঃ—"কেন কালী ঐ বুড়িকে কিছু কর্‌তে পার্‌লেন না ?"

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ—"ও বুড়ী যে বড় সহজ বুড়ী নয়। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একটি ভদ্র লোকের বাড়ীতে বহুকাল থেকে একটি কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। ঐ ভদ্রলোকের মা-ঠাক্‌রুণ খুব শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত প্রত্যহ তাঁর সেবা কার্য্য করেন। ব্রাহ্ম ভদ্রলোকটি বাড়ী গেলেই কালী প্রতিমা ফেলে দিতে চাইতেন, আর মন্দিরের বারান্দায় নানা প্রকার অনাচার কর্‌তেন। কালী একদিন বৃদ্ধাকে স্বপ্নে বল্‌লেন, 'ওগো! সাবধান থাকিস্। তোর ছোট ছেলে যে বড় বিষম অত্যাচার আরম্ভ ক'রেছে। নিষেধ ক'রে দিস্। আবার ঐরূপ কর্‌লে আমি তোর বড় ছেলের ঘাড় মট্‌কাবো!' বৃদ্ধা বল্‌লেন, 'কেন মা! বড় ছেলের ঘাড় মট্‌কাবে কেন ? বড় ছেলে তো কোন অপরাধ করে নাই, ঘাড় মট্‌কাইতে হয় তো ছোট ছেলেরই ঘাড় মট্‌কাও না কেন ?' কালী বল্‌লেন, 'ওগো! সে যে আমাকে একে বারেই মানে না। কিছুই গ্রাহ্যি ক'রে না! তাকে আমি পার্‌বো না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"একই স্থানে দীক্ষা লাভ ক'রে, একই নাম জপ ক'রে, কেহ কালী দেখেন, কেহ বা কৃষ্ণ দেখেন, আবার কেহ কেহ অন্য দেব-দেবীও দেখেন, এরূপ হয় কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"যে যে বংশের, তার নিকটে প্রথম প্রথম সেই বংশের কুলদেবতাই প্রায় প্রকাশ হন্। পরে ক্রমে ক্রমে সবই হ'য়ে থাকে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"নাম করিতে করিতে যাহা কিছু প্রকাশ হয়, কি প্রকার ব্যবহার করিলে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"নাম কর্‌তে কর্‌তে যা কিছু প্রকাশ পাবে, খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি ক'রে নমস্কার ক'রে, সেখানেই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা কর্‌তে হয়। ওরূপ কর্‌লেই কল্যাণ হয়।"

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"কি আশীর্ব্বাদ চাইতে হয়?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"ভগবানের চরণে মতি গতি হউক, তাঁর চরণে ভক্তি হউক, এই মাত্র আশীর্ব্বাদ চাইলে, তাঁরাও সন্তুষ্ট হন্।"

গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা।

ভাদ্র, ১৮ই—৩১শে। কিছুকাল হয় ঠাকুর ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রামে, গুরু-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত * পণ্ডিত মহাশয়, ও শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় † প্রভৃতিকে লইয়া একটি প্রসিদ্ধ, সিদ্ধ ফকির সাহেবকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এই ফকির সাহবকে সকলেই শা সাহেব বলেন। শা সাহেবের একটি যুবক শিষ্য আছেন, তিনিও মুসলমান। এই শিষ্যটির অদ্ভুত অবস্থা ও অসামান্য গুরুভক্তির কথা ঠাকুর সময়ে

* পণ্ডিত ৺শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।—ঢাকা, বিক্রমপুরে, তেজপুর রশুনিয়া গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। সংস্কৃতে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া ইনি কিছুকাল অধ্যাপনা কার্য্য করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে ইঁহার অসামান্য অনুরাগ ছিল। ইঁহার উৎসাহ-পূর্ণ জীবনে সত্যনিষ্ঠা ও সাধনশীলতা দেখিয়া পূর্ব্ববঙ্গের অনেক শিক্ষিত ভদ্রসন্তান ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পুতুল পূজা মহা অপরাধ যে দিন বুঝিলেন, সেই দিন হইতে পূজার সময় পাছে ঢাকের শব্দ কাণে যায়, এজন্য তিনি সে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন।

ঠাকুরের নিকট ইনিই সর্ব্বপ্রথমে দীক্ষা লাভ করেন। দীক্ষাগ্রহণের পর ইনি আর ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়া প্রায় হ'ন নাই। পণ্ডিত মহাশয়ের দীর্ঘকালব্যাপী একটানা অসাধারণ সাধনচেষ্টা এবং পবিত্র জীবনের বিস্ময়কর দুর্লভ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের পরে, ইনি ঠাকুরের সমাধি আশ্রমেই শেষদিন পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। ১৩১৮ সালের ২০ শে ফাল্গুন তারিখে দোলপূর্ণিমার দিনে, ইনি দেহত্যাগ করেন। এই খণ্ডে পণ্ডিত মহাশয়ের কোন কথাই নাই, ঠাকুরের দয়া হইলে পর পর ডাইরিতে প্রকাশিত হইবে, আশা করি।

† ৺মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় B A. B L. নিবাস দমদমার নিকট কেদেটি গ্রাম। ইনি একজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কিছুকাল পরেই, ইনি ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ঠাকুর পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্ম-সমাজের সংশ্রব ত্যাগ করার পর, মন্মথবাবু উপাচার্য্যের কার্য্য করি-

সময়ে বলিয়া আনন্দ করেন। ঐ দিনের ঘটনাটি যেমন শুনিলাম, লিখিয়া রাখিতেছি :—বৃদ্ধ শা সাহেবের একপাশে শিষ্যটি নাড়ুগোপালের মত উপবিষ্ট থাকিয়া করযোড়ে গুরুর দিকে অনিমেষে চাহিয়া আছেন। যেন কোন হুকুম পাইলেই তাহা তামিল করিবেন, এই ভাবে ব্যস্ততার সহিত প্রতীক্ষা করিতেছেন। কখনো কখনো ময়দানের দিকে তাকাইয়া চমকিয়া উঠিয়া, অমনি হাতে ঠেঙ্গা লইয়া বিস্তৃত মাঠে ছুটাছুটি করিতে-ছেন, শূন্য স্থানেই দু'হাতে ঠেঙ্গা চালাইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, 'আরে উধার যা, হট্, এধার কাঁহে আয়া। কিষণজী তো ওধার গিয়া।' কখনও বা শূন্য মাটির উপরে লাঠি মারিয়া বলিতেছেন, 'আরে শালা! বলাইজীকা বাত নেহি মান্‌তা? মারেঙ্গে ডাণ্ডা তো মালুম্ হোই!' এই শিষ্যটির নিকট অনেক সময়ই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গো-চারণ লীলা প্রকাশিত হয় এবং ইনিও তাহাতে যোগ দেন। গরু বাছুরদের বেচাল দেখিলে সময়ে সময়ে ঠেঙ্গা হাতে লইয়া, ইনিও গিয়া শাসন করিয়া থাকেন।

ঐ দিন শা-সাহেব একটু চিন্তাযুক্ত ভাবে বসিয়া আছেন, কি যেন ভাবিতেছেন, দেখিয়া শিষ্যটি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—"শা-জী? আপ্ দুঃখী কাঁহে ভয়া?"

শা-সাহেব বলিলেন :—"আরে, গুরুজীকা হুকুম হুয়া, শাদি করনেকো।" শিষ্য বলি-লেন :—"বাঃ, আচ্ছাতো! গুরুজীকা হুকুম, ওতো করণেই হোগা। আব্ শাদি কীজিয়ে।" শা-সাহেব বলিলেন :—"আরে তু'তো কহতে হো, আব্ লেড়কী হাম্‌কো কোন্ দেয়গা? মেঁ তো বুঢ্‌ঢা হো গয়ি।" শিষ্য বলিলেন :—"কাহে গুরুজী, হাম দে দেতে। হামারা জরুকো আপ্ শাদি কি জিয়ে।" শা-সাহেব বলিলেন :—"সো ক্যায়সে হোগা। তুতো জিন্দা হ্যাঁয়। খসম্ মরণেসে জরুকো নিকা হো সেক্‌তা হ্যাঁয়।" শিষ্যটি একটু সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন, হাতে তালি দিয়া বলিলেন :—"আচ্ছা তো গুরুজী! আচ্ছা তো! উস্‌মে মুশ্‌কিল ক্যা? আভি হাম্ মর্ যাই, হামারা জরুকো আপ্ নিকা কীজিয়ে।" শা-সাহেব শিষ্যটিকে অনেক করিয়া থামাইলেন, শিষ্যটি এক একবার চমকিয়া উঠিয়া শা-সাহেবকে কেবলই বলিতে লাগিলেন, "গুরুজীকা হুকুম, ওতো করনেই হোগা।"

তেন। তখন ইঁহার উৎসাহপূর্ণ জ্বলন্ত বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই মনে করিতেন, বুঝি এই ব্যক্তির দ্বারা ৺কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের অভাব পূর্ণ হইবে। ইঁহার বক্তৃতাকালে প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা শক্তি সঞ্চারিত হইত যে, শ্রোতাগণ মন্ত্রমুগ্ধের মত অভিভূত হইয়া থাকিতেন। কিছুকাল পরে মন্মথ বাবুর মতের ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন; পরে কানপুরে ওকালতি কার্য্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া, অবশিষ্ট জীবন তথায়ই অতিবাহিত করিলেন।

শা-সাহেব বোধ হয় শিষ্যের গুরুভক্তি দেখাইতেই উপস্থিত ভদ্রলোকদের নিকট এই খেলা খেলিলেন। অদ্ভুত শিষ্য! অদ্ভুত দৃষ্টান্ত !!

শা-সাহেবের সাধন ও আমাদের সাধনে পার্থক্য কি, একটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে এই প্রশ্ন করিলে, ঠাকুর বলিলেন :—"এঁদের সাধনে নিজেদের পুরুষকারই প্রধান, গুরুকৃপাও চাই। আমাদের সম্পূর্ণ গুরুকৃপা, পুরুষকারের কিছুই অপেক্ষা করে না। এই মাত্র।"

শ্রীধরের উপহাস ও শিক্ষাদান।

কিছুকাল যাবৎ শ্রীধর পীড়িতাবস্থায় আছেন। সময়ে সময়ে সটক্ জ্বরে অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন। উপস্থিত শ্রীধরের উপস্থের অগ্রভাগে একটি ফোড়া হইয়া বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। অনভিজ্ঞ একটি গুরুভ্রাতাকে যন্ত্রণা-উপশমের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন,—"বেশ করিয়া কষ্টিক লাগাইয়া দেও, ফোড়া সারিয়া যাইবে।" শ্রীধর আর দ্বিধা না করিয়া আচ্ছা করিয়া তাহাতে কষ্টিক লাগাইয়া ভয়ানক ঘায়ের সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছেন। এখন শ্রীধর দিনরাত চীৎকার ও যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন। মহেন্দ্র দাদা শ্রীধরকে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ভাই শ্রীধর! কি হয়েছে?" শ্রীধর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া অমনি সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জবাব দিলেন—"আরে ভাই! আর কি হবে! দুষ্কৃতির ভোগ! সে দিন ঐ কুকুরটা এখানে এসেছিল, কি আর বল্‌ব, বেগ সামলাইতে পার্‌লাম না, তাই কুকর্ম্মের ফল! হায় কপাল!"

মহেন্দ্র দাদা পাগ্‌লা শ্রীধরের প্রকৃতি জানেন, মাথা গরম হইলে শ্রীধর সবই বলিতে পারেন, সবই করিতে পারেন, তাই আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিলেন। এবং অবসর মত শ্রীধরের কথা ঠাকুরকে বলিলেন।

ঠাকুর শুনিয়া খুব হাসিয়া বলিলেন :—"রাম! রাম !! ওসব কিছু নয়, কিছু নয়। শ্রীধরের মাথা গরম হ'লে ওরূপ ঢের মিথ্যা কথা বলে। ঔষধ দিয়ে ঘা ক'রেছে।"

মহেন্দ্র দাদা ভাবিলেন,—মাথা পাগলা শ্রীধর দ্বারা সব কাযইতো সম্ভব। শ্রীধর নিজেই তো তার দুষ্কৃতির কথা বলিলেন, শ্রীধরের দুষ্কার্য্য গোপন করিবার জন্যই ঠাকুর, শ্রীধরের

কথা একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। ইহার কিছুকাল পরে মহেন্দ্রদাদা একদিন শ্রীধরকে কথায় কথায় বলিলেন,—"শ্রীধর ! তোমার রোগের কথা সমস্ত গোঁসাইকে যাইয়া বলিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন যে, 'ওসব কিছু নয়, শ্রীধর মিথ্যা কথা ব'লেছে, ঔষধ দিয়ে ঘা ক'রেছে।' এই বলিয়া তিনি তোমার সব কথা ঢাকিয়া দিলেন।" শ্রীধর শুনিয়া মহেন্দ্র দাদার দিকে একটু চাহিয়াই খল্‌খল্ করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"মিত্রি ! এবার তুমি ঠ'কে গেলে। আমার কথায় তুমি বিশ্বাস কর্‌লে,—আর গোঁসাইয়ের কথায় বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লে না !" মিত্রি-দাদার তখন হুঁস্ হইল। একটু লজ্জিত হইলেন। অনেক সময় গুরু ভ্রাতাদের নিকটে এই বিষয় বলিয়া, মিত্রিদাদা আক্ষেপ করিয়া থাকেন। মহেন্দ্র বাবুর মত ঠাকুরের একান্ত নিষ্ঠাবান ভক্তেরও যখন এই প্রকার মতিভ্রম হয়, তখন আমি আর কোথায় আছি !

শ্রীধরের অবস্থা ও প্রকৃতি।

শ্রীধর ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণের পর ঠাকুরের সঙ্গছাড়া কখনও হ'ন্ নাই বলিলেই হয় ; বিশেষ প্রয়োজনেও শ্রীধর ঠাকুরের সঙ্গত্যাগে নারাজ, উহা যেন যমযাতনা মনে করেন। স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে শ্রীধরকে একান্ত ভজনপরায়ণ, শান্ত, সরল, নিষ্ঠাবান, বিশ্বাসী এবং অতি মধুরপ্রকৃতির একজন ভাবে মগ্ন মহাপুরুষ ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। আবার মাথা গরমের অবস্থায় তাঁহাকে দেখিলে, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য বিষম পাগল বলিয়া মনে হয়। চন্দ্রের উদয়ের সময় হইতে শ্রীধরের মাথা গরমের সূচনা হয়, আর চন্দ্র বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা ক্রমশঃ চড়িতে থাকে। একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শ্রীধর কোথায় কি অবস্থায়, কোন্‌রূপ ধরিবেন, কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। এই সময়ে আশ্রমস্থ সকলেই সশঙ্কিত থাকেন, কখন শ্রীধর কা'র ঘাড়ে চাপেন। কিন্তু এই উন্মাদ অবস্থায়ও শ্রীধর কোন-না-কোন প্রকারে ধর্ম্মেরই একটা অনুষ্ঠান না করিয়া থাকিতে পারেন না। গৃহস্থদের বাড়ী বাড়ী হইতে, তাহাদের জ্ঞাতসারে ঝগড়া করিয়া, বা অজ্ঞাতসারে প্রয়োজনীয় কাঠ-কুটা সংগ্রহ করিয়া প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালেন এবং দিনরাত একভাবে বসিয়া ধুনী তাপিতে থাকেন। কখনও একতারা বাজাইয়া মধুর স্বরে গান করিতে করিতে ভাবে মগ্ন হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন। আবার কখনও বা, অন্যে পছন্দ না করিলেও, নিজ হইতেই ঘাড়ে পড়িয়া, কাহাকেও ধর্ম্ম উপদেশ করিতে করিতে, অস্থির করিয়া তুলেন। এ সময় শ্রীধর কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্ম্মবুদ্ধিতেই লোকাচারবিরুদ্ধ কার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিয়া, খুব নির্ভীক ও

সরলভাবে দশজনের নিকট তাহা বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে থাকেন। মধুরপ্রকৃতি শ্রীধরকে মাথা গরমের অবস্থায়ও প্রায় সকলেরই মধুর লাগে। যখনই শ্রীধর যেখানে থাকুন না কেন, সকল অবস্থায়ই শ্রীধর আনন্দে ডগমগ। নিতান্ত বিমর্ষ ব্যক্তিও শ্রীধরের সঙ্গলাভে হর্ষ লাভ করেন। তবে মাথা গরমের অবস্থায় যখন শ্রীধর যাহার রাশিতে ভার হ'ন, তখনই তার পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে হয়।

গুরুতে অবজ্ঞা দর্শনে শ্রীধরের মাথাগরম।

সম্প্রতি হাইস্কুলের জনৈক প্রসিদ্ধ হেড্‌মাষ্টার স্ত্রীবিয়োগ-শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া, আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ঠাকুরকে তাঁর সমস্ত শোক দুঃখের কথা জানাইয়া বলিলেন,—"ম'শায়! এখন আমার শান্তি কিসে হয় বলিতে পারেন ?"

ঠাকুর তাঁহার দুঃখে খুব দুঃখ করিয়া বলিলেন ঃ—"শোক অতি বিষম জিনিস, ইহার শান্তি কিছুতেই হয় না। সময় যত যা'বে, শোক ততই আপ্‌না আপ্‌নি ধীরে ধীরে ক'মে আসবে। এখন রামায়ণ, মহাভারতাদি পাঠ, সৎসঙ্গ, ও যতটুকু পারেন, ভগবানের নাম ক'রে সময় কাটা'তে চেষ্টা করুন, এ'তে কতকটা শান্তি পাবেন।"

ভদ্রলোকটি ঠাকুরের উপদেশে বোধ হয় তেমন তৃপ্তিলাভ করিলেন না, ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিলেন এবং দক্ষিণের ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঐ ঘরের এককোণে শ্রীধর নিজ আসনের সম্মুখে ধুনী জ্বালিয়া, স্থিরভাবে একদৃষ্টে আগুনের দিকে চাহিয়া জপ করিতে ছিলেন। কম্বলমোড়া লেংটীপরা শ্রীধরকে একভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া, ভদ্রলোকটির মনে একটা আশা হইল ; তিনি কিছুক্ষণ শ্রীধরের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, "বাবাজী! কিছুকাল হয় আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে, আমার বড়ই ক্লেশ, একটু আরাম কিসে হয় বলিতে পারেন ?" শ্রীধর শুনিয়া ধীরভাবে বলিলেন,—"হাঁ, আরাম কিসে হ'বে বল্‌তে পারি। ঐ ঘরে যা'ন, গোঁসাইয়ের কাছে গিয়ে বসুন, তাঁকে কষ্টের কথা সব বলুন, আরাম পাবেন।" ভদ্রলোকটি বলিলেন,—"ম'শায়! এতক্ষণ তো গোঁসাইর কাছেই ছিলাম। তিনি যা বল্লেন তাও শুন্‌লাম, ও সব তো ঢের শুনা আছে, আপনি দয়া করে কিছু বলুন না ?" 'ও সব তো ঢের শুনা আছে' ঠাকুরের কথায় এরূপ অবজ্ঞাসূচক ভাব দেখিয়া, শ্রীধরের মাথা একেবারে গরম হইয়া উঠিল ; শ্রীধর বলিলেন, "বিয়ে কর্ব্বেন ?"

মাষ্টারটি বলিলেন,—"না ম'শায়, সে সব আর না। আপনি আমাকে কিছু প্রক্রিয়ার উপদেশ বলুন, যা'তে একটু আরাম পাই।" শ্রীধর তখন খুব উত্তেজিত হইয়া হাত নাড়া দিয়া বলিলেন,—"আমার কাছে প্রক্রিয়া শিখ্‌বেন। আচ্ছা, যা'ন, এখন গিয়ে এই ক্রিয়া করুন, খুব আরাম পাইবেন।" ভদ্রলোকটি শ্রীধরের হাতমুখ নাড়া দেখিয়া এবং শ্রীমুখের বচন শুনিয়া চটিয়া আগুণ হইলেন। অমনি গোঁসাইয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীধরের সমস্ত ব্যবহারের পরিচয় দিয়া বলিলেন,—"একে কি আপনি শাসন করবেন না ?"

ঠাকুর এ সব শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীধরকে ডাকিয়া বলিলেন :—

"একি শ্রীধর ! তুমি তো অতি বিষম লোক দেখ্‌তে পাচ্ছি, এই ভদ্রলোকটিকে তুমি কি বলেছ ? এরূপ পাগলামী কর্‌লে এখানে তোমার থাকা হবে না। খুব সাবধান হ'য়ে চল, না হ'লে এক্ষণই এখান থে'কে চ'লে যাও।"

শ্রীধরের মাথা আগেই গরম হইয়াছিল, এখন আবার ঠাকুরের ধমক খাইয়া, আরও উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "আপ্‌নার কাছে ধর্ম্মের উপদেশ শু'নে ইহার তৃপ্তি হয় নাই, আরাম হয় নাই। আমার কাছে গে'ছেন, শান্তির উপদেশ নিতে। আমি কি আচার্য্য ! আমার যখন স্ত্রী ম'রেছিল, তখন আমি যা ক'রে আরাম পেতাম, আমি তাই ব'লেছি। আমার যেমন অধিকার, আমি তো তেমনই বল্‌ব। এতে আমার দোষ হ'লো ?"—এই মাত্র বলিয়া শ্রীধর, অমনি দ্রুতপদে নিজ আসনে চলিয়া আসিলেন, এবং চোক মুখ রাঙ্গা-ইয়া বলিতে লাগিলেন,—"শালা ! গোঁসাইয়ের কথা অগ্রাহ্য ক'রে, আমার কাছে এসেছে আরামের উপদেশ নিতে !" সমস্ত দিন শ্রীধর রাগে গম্‌গম্‌ করিয়া কাটাইলেন। ঠাকুর ভদ্রলোকটিকে শ্রীধরের মাথা গরমের অবস্থার পরিচয় দিয়া, ক্ষমা চাহিলেন, এবং খুব মিষ্ট ভাবে উপদেশ দিয়া ঠাণ্ডা করিলেন। শ্রীধরের কার্য্য, মাথা গরম হইলে কখনো কখনো এই প্রকার সৃষ্টি ছাড়া দেখা যায়।

ঠাকুর আমাদের মত একগুঁয়ে, অসংযত ও উন্মাদপ্রকৃতি শিষ্যদের বুকে রাখিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় কি প্রকারে স্থির আছেন এবং সকলের বিষ হজম করিয়া কি ভাবে পরমানন্দে দিন কাটাইতেছেন, এটুকুই দেখিবার বিষয়। প্রতিপদেই আমাদের অত্যাচার ও অবাধ্যতায় ঠাকুরের ধৈর্য্য, বিরোধ বিসম্বাদে শান্তি, এবং সকলের সকলপ্রকার দুরবস্থায় ঠাকুরের অসাধারণ দয়া ও সহানুভূতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেছি।

শ্রীধরের জঠরানলে আহুতি।

শ্রীধরের আর একটি কার্য্য এস্থলে লিখিয়া রাখিতেছি। শ্রীধরের অসুখ হওয়ার কয়েক দিন পূর্ব্বে, একদিন আমাদের আশ্রমের ভাণ্ডার নিঃশেষ হইল। সকাল বেলা উঠিয়া বুড়োঠাক্‌রুণ (দিদি মা) ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তুই তিন বাড়ী ঘুরিয়া, ধার করিয়া তুটি টাকা আনিলেন। এবং শ্রীধরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "শ্রীধর! এখন ধ্যান ধারণায় চল্‌বে না, আসন থেকে ওঠ, ভাণ্ডার একেবারে শূন্য, একবার বাজারে যাও, বাজার হ'তে এলে, রান্না চ'ড়বে।"

শ্রীধর বুড়োঠাক্‌রুণের কথায় কোন জবাব না দিয়া চোক বুজিলেন। বুড়োঠাক্‌রুণ পুনঃপুনঃ শ্রীধরকে ডাকিতে আরম্ভ করায় শ্রীধর চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বাজার কি অম্‌নি হয়? টাকা ফেলুন, টাকা কই?" বুড়োঠাক্‌রুণ টাকা দিতেই, শ্রীধর টাকা হাতে নিয়া আসন হইতে লাফাইয়া উঠিলেন, এবং বাজারে যাইতে দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। বুড়োঠাক্‌রুণ শ্রীধরকে ডাকিয়া বলিলেন, "শ্রীধর! কি কি জিনিস আন্‌বে, তা একবার শুন্‌লে না?" শ্রীধর বলিলেন, "আমি ভাত খাই না? কি আন্‌বো তা জানি না? ডাল আন্‌বো, চাউল আন্‌বো, আবার কি?" বুড়োঠাক্‌রুণ আর বেশী কথা না বলিয়া, যে সকল জিনিস আনিতে হইবে, বলিয়া দিলেন। শ্রীধর বলিলেন, "আপনি যা'ন, গিয়ে উনন্‌ ধরা'ন, আমি তো যা'ব, আর আস্‌বো।" এই বলিয়া শ্রীধর ঝোলা কাঁধে লইয়া বাজারে চলিলেন। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল; শ্রীধর আসিতেছেন না দেখিয়া বুড়োঠাক্‌রুণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বেলা দশটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া শ্রীধরের কোন খোঁজ খবর না পাইয়া, এবাড়ী ওবাড়ী হইতে চাউল ডাউল ধার করিয়া আনিয়া, রান্না চাপাইলেন। রান্না হ'য়ে গেল, শ্রীধর আসিলেন না। সকলে ডাল ভাত মাত্র আহার করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বেলা সাড়ে বারটা, ঠাকুরের ধুনী আমতলায় জ্বলিল। ঠাকুর আহারান্তে আমতলায় যাইয়া বসিলেন। মহাভারতপাঠ হইতে লাগিল, বেলা প্রায় তুইটা; শ্রীধর একটা বড় পুঁটলি ঘাড়ে লইয়া দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং ঠাকুরের দক্ষিণ দিকে আমতলায়, ধুনী সম্মুখে রাখিয়া আসন করিয়া বসিয়া পড়িলেন। পাঁচ ছয় মিনিট অন্তর অন্তর এক একবার শ্রীধর পুঁটলি হইতে ধূপ ধুনা, চন্দন, গুগ্‌গুলাদি মুঠে-মুঠে তুলিয়া, 'অগ্নয়ে স্বাহা, অগ্নয়ে স্বাহা' বলিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিলেন। ঠাকুর উহা দেখিয়া কোন কথাই না বলিয়া খুব আনন্দের সহিত মৃত্ব মৃত্ব

হাসিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বুড়োঠাকুরুণ শ্রীধরের কথাই ঠাকুরকে বলিতে আমতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় শ্রীধরকে স্থিরভাবে বসিয়া ধুনীর দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঠাকুর বুড়োঠাকুরুণকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। বুড়োঠাকুরুণ শ্রীধরকে বলিলেন, "কি শ্রীধর! তুমি বাজারে যাও নাই?" শ্রীধর সে কথার কোন জবাব না দিয়া, খুব মনোযোগের সহিত পুঁটলি হইতে ধুনা চন্দনাদি মু'ঠে মু'ঠে তুলিয়া 'অগ্নয়ে স্বাহা, অগ্নয়ে স্বাহা' বলিয়া আগুনে আহুতি দিতে লাগিলেন। বুড়োঠাকুরুণ বলিলেন, "পাগল! একি কাণ্ড? এতে কি দিন যাবে?" শ্রীধর খুব তেজের সহিত বলিলেন, "আবার কি বল্‌ছেন আপ্‌নি? জঠরানল তো অনল? আগুনে আহুতি দিলে কখনো আবার ক্ষুধা থাকে? শাস্ত্র জানেন?"

শ্রীধরের কথা শুনিয়া ঠাকুর খুব হাসিয়া উঠিলেন এবং বুড়োঠাকুরুণকে বলিলেন ঃ—

"আপ্‌নি বাজার কর্‌তে শ্রীধরকে টাকা দিয়েছেন। শ্রীধর ঐ টাকা দিয়ে ধূপ্‌ধুনা এ'নে জঠরানলে আহুতি দিচ্ছেন।"

সকলেই শ্রীধরের কাণ্ড দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। শ্রীধরের তখন বাক্যটি নাই, বুড়োঠাকুরুণ ধার করিয়া বাজারের টাকা দিয়াছিলেন, সুতরাং 'টাকা কি করিলে' বলিয়া গালাগালি দিতে লাগিলেন। শ্রীধর আর আসনে না থাকিয়া লাফাইয়া উঠিলেন এবং বুড়োঠাকুরুণের নিকটে যাইয়া বলিলেন, "হ'য়েছে! হ'য়েছে!! এখন চলুন, এত বেলা হয়েছে, আমার ক্ষুধা পায় না? খাবার দিন, গালিতে পেট ভরে না।"

বুড়োঠাকুরুণ শ্রীধরের মাথা গরম বুঝিয়া, তাড়াতাড়ী সঙ্গে লইয়া গিয়া খাবার দিলেন। শ্রীধরের এই প্রকার পাগলামী প্রায় সর্ব্বদাই দেখিতেছি। বুড়োঠাকুরুণ দিদিমার ঘাড়েই এ সকল উৎপাত উপদ্রব অনেক সময় পড়িয়া থাকে। শ্রীধরের মাথাগরমের পাল্লায়, দিদিমার সহিষ্ণুতা ও দয়া দেখিয়া অবাক হইতেছি।

আশ্বিন মাস।

মাঠাকৃরুণের সমাধি-মন্দির।

আশ্বিন মাসের প্রথম ভাগে মাতা ঠাকুরাণীর দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় বাড়ী গেলাম। বাড়ী হইতে আশ্রমে আসিতে দশবারো দিন বিলম্ব হইল। এদিকে দেখিতে দেখিতে শারদীয়-পূজা আসিয়া পড়িল। আফিস আদালত স্কুলাদি ছুটী হইল। দলে দলে গুরু-ভ্রাতা ভগ্নীগণ গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আসিয়া আশ্রমটি পরিপূর্ণ করিলেন। ঠাকুরকে দেখিয়া সকলেরই প্রাণে কত আনন্দ! মহাষ্টমীর দিনে মহামায়ার পূজা বহুকাল আমরা দেখি নাই। এবার ঠাকুরের কৃপায় তাঁরই ইচ্ছায় ঐ তিথিতে ভগবতী যোগমায়ার অস্থি নূতন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। মা-ঠাকৃরুণের নিত্য সেবা পূজা ঐ তিথিতে আরম্ভ হইবে। ঐ দিনের কল্পনা করিয়া এখন হইতেই আমাদের মনে কত আনন্দ! গুরুভ্রাতাদের সম্মিলনে ঠাকুরের আশ্রমে, একমাত্র ঠাকুরকে লইয়াই আমাদের নিত্য আনন্দ মহোৎসব। এবার মহাষ্টমীতে দেশব্যাপী মহা আনন্দের দিনে, ঠাকুর আমাদের স্নেহময়ী মাতা যোগমায়ার স্মৃতি জাগাইয়া, তাঁর শীতল বিমল আনন্দ-প্রদ শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া থাকিবার অবসর দিবেন। এবার হইতে আমাদেরও প্রতি বৎসর মহাষ্টমী তিথিতে মহামায়া ভগবতী যোগমায়ার মহাপূজা হইবে মনে করিয়া, গুরুভ্রাতাভগ্নীদের কতই আনন্দ, কতই উৎসাহ!

অন্তর্দ্ধানের কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে মাঠাকৃরুণের অবস্থানকালে একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, 'দেখিবে, এবার গেণ্ডারিয়াতে অবিলম্বেই শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজিবে'। তখন একবার কল্পনাও করি নাই যে, ইহা মা-ঠাকৃরুণেরই সমাধি-মন্দিরে ঘটিবে!

মন্দিরটি প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। ঠিক নক্সা অনুরূপ মন্দির হয় নাই। ঠাকুর মন্দির দেখিয়া বলিলেন ঃ—"ভগবানের ইচ্ছায় যা হবে, তাতে কি মানুষের আর কোনও হাত আছে! নক্সা মত প্রস্তুত কর্‌তে রাজেন্দ্র তো যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেছিল, কিন্তু আর এক প্রকার হ'য়ে গেল। মন্দিরটি অনেকটা বিষ্ণুমন্দিরের মত হ'য়েছে।"

মন্দির-প্রতিষ্ঠা-প্রণালী।

পঞ্চমী তিথিতে সকালে নয়টার সময়ে ঠাকুর আমাকে বলিলেন ঃ—"মহাষ্টমীর দিনে প্রতিষ্ঠার কার্য্যটি তুমি করবে। ঐ দিনে তোমার নিত্যকর্ম্ম মন্দিরে ব'সে ক'রো। চণ্ডীপাঠ ক'রে হোম ক'রো, তা-হ'লেই হবে।"

আমি বলিলাম ঃ—"সমস্ত চণ্ডীখানি পাঠ করিয়া কি হোম করিব? হোম কি যেমন করিয়া থাকি, তেমনই করিব?"

ঠাকুর ঃ—"সমস্ত চণ্ডী পাঠ না ক'রেও হয়। যে হোম ক'রে থাক, তাই ক'রো, একশত আটটী আহুতি দিও।"

পাছে চণ্ডী পাঠের সময়ে প্রতিষ্ঠাকার্য্যে চণ্ডীপাঠ ভুল হয়, এই আশঙ্কায় চণ্ডী আবৃত্তি আরম্ভ করিলাম। ভাল দেখিয়া শুষ্ক বিল্বকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম। এই প্রতিষ্ঠা কার্য্যে দেখিতেছি, আমার প্রতি ঠাকুরের বিশেষ কৃপা! জয় গুরুদেব!

সপ্তমী তিথিতে শ্রীমন্দিরের জমির মধ্যস্থলে পাকা চতুষ্কোণ সিমেণ্ট করা কুণ্ডের ভিতরে যোগজীবন প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা একটি কৌটায় ভরিয়া মা ঠাকুরুণের অস্থি স্থাপন করিলেন; এবং তাঁহার নামাঙ্কিত সাদা মার্‌বেল প্রস্তর দ্বারা আবৃত করিয়া, সিমেণ্ট দ্বারা পাকা করিয়া আঁটিয়া দিলেন। পরে উহার উপর একখানি জলচৌকি রাখিয়া, তদুপরি মা ঠাকুরুণের ব্যবহৃত আসন, বালিস, বস্ত্রাদি, গদি আকারে পরিপাটীরূপে সাজাইয়া, গৈরিক বসন দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেন। তাঁহার একখানি ফটো এবং ঠাকুরের লেখা "নামব্রহ্মের" পট কল্য উহার উপর স্থাপন করা হইবে।

নানা শ্রেণীর পত্র পুষ্প দ্বারা মালা গাঁথিয়া, মন্দিরের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করা হইয়াছে। মন্দিরের সিঁড়ির দুই পার্শ্বে দুইটি কদলী বৃক্ষ রোপণ করিয়া, তাহার মূলদেশে দুইটি পূর্ণ কুম্ভ স্থাপন করা হইয়াছে। কল্য আম্রপল্লব, নারিকেল ও পুষ্পমালা দ্বারা উহা যথারীতি সাজান হইবে। সন্ধ্যার সময়ে আমতলায় সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এই কীর্ত্তনানন্দে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত কাটাইয়া, আপন আপন আসনে যাইয়া আমরা বিশ্রাম করিলাম।

মা-ঠাকুরুণের সমাধি-প্রতিষ্ঠা।

২০শে আশ্বিন, রবিবার। মহাষ্টমীর দিনে অরুণোদয়ে বুড়ীগঙ্গায় স্নান তর্পণাদি করিয়া আসিলাম। মালা তিলক ধারণ করিয়া, ঠাকুরের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। এবং

সমাধি-প্রতিষ্ঠার অনুমতি লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। কুতুবুড়ী ও মঙ্গলী, প্রতিষ্ঠা কার্য্যের যাবতীয় বস্তু সংগ্রহ করিয়া দিতে লাগিল। দক্ষিণে মা-ঠাকুরুণের আসন রাখিয়া, পূর্ব্বাভিমুখে নিজ আসন পাতিয়া বসিলাম। মা-ঠাকুরুণের ফটোকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া গদির উপরে উত্তরমুখ করিয়া স্থাপন করিলাম। "নাম-ব্রহ্মের" পট খানিকেও ঐ প্রকার নমস্কার করিয়া, মা-ঠাক্‌রুণের গদির উপরেই রাখা হইল। মন্দিবের মেজেতে বালি সাজাইয়া হোমের জন্য বিল্ব ও উড়ুম্বর কাষ্ঠ ঠিক করিয়া রাখিলাম। আতপ তণ্ডুল, রম্ভা, শর্করা প্রভৃতি দ্বারা সুন্দররূপে প্রস্তুত করা নৈবেদ্য কয়েকখানি আসিয়া পড়িল, হোম-কুণ্ডের ধারে উহা ধরিয়া রাখিলাম। পরে আচমনান্তে কয়েকবার প্রাণায়াম কুম্ভক করিয়া স্থিরভাবে মা ঠাকুরাণীর সেই স্নেহপূর্ণা কৃপাময়ী মূর্ত্তিখানিকে ধ্যানে রাখিয়া, ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিলাম। তৎপরে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক গায়ত্রী জপান্তে, ফুল, তুলসী, বিল্বপত্রাদি দ্বারা মা-ঠাকুরাণীর পূজা করিয়া, ফটো ও নাম-ব্রহ্মের পট পরিপাটী-রূপে মালা, তুলসী, পুষ্প চন্দ-নাদি দিয়া সাজাইলাম। অনন্তর মহাষ্টমী পূজার লগ্নে শঙ্খ, ঘণ্টাধ্বনি করিয়া, শ্রীচণ্ডী পাঠ আরম্ভ করিলাম। মন্দিরের প্রাঙ্গণে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজিয়া উঠিল ; এই সময় ঠাকুর ধীরে ধীরে মন্দিরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অনিমেষ নয়নে ঠাকুর, মা-ঠাকুরাণীর ফটোর দিকে, কিছুক্ষণ তাকাইয়া, কয়েক শ্লোক চণ্ডীপাঠ শুনিয়াই মন্দির হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং ভাবাবেশে দক্ষিণে বামে হেলিয়া ছুলিয়া মন্দির পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। সমস্ত গুরুভ্রাতা-ভগ্নীরা আনন্দধ্বনি করিয়া, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজাইতে বাজাইতে ঠাকু-রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। মেয়েরা মুহুর্মুহুঃ হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই আমার চণ্ডীপাঠ শেষ হইল। মা-ঠাকুরাণীর শ্রীচরণে পত্র পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া, হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিলাম। বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত সংযোগে অখণ্ডিত বিল্বপত্র দ্বারা হোম আরম্ভ করিলাম। এই সময় গুরুদেবের অদ্ভুত কৃপা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়া মাত্রই, উহা দক্ষিণাবর্ত্ত হইয়া নানাবর্ণের শিখা বিস্তার করিয়া মা-ঠাকুরাণীর ফটোর অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ নখ-পরিমিত এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি, অতিশয় চঞ্চল ভাবে, সমস্ত অগ্নিতে ইতস্ততঃ নৃত্য করিয়া, ক্ষণে অন্তর্দ্ধান, ক্ষণে প্রকাশ হইতে লাগিলেন। মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি কিছুতেই স্থির রাখিতে পারিলাম না। অথচ অগ্নির যে দিকে দৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তথায়ই বিদ্যুতের মত অত্যু-জ্জ্বল চঞ্চলমূর্ত্তি নৃত্য করিতে করিতে, ক্ষণে প্রকাশ, ক্ষণে মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইতে লাগি-লেন, প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। সে মূর্ত্তিটী আমার বিশেষ পরিচিত বলিয়া, আমার আন-

শ্রীযুক্তেশ্বরী-মা-ঠাকরুণ শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী।

U. RAY & SONS

ন্দের আর পরিসীমা রহিল না; আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। ভগবান্ গুরুদেবের কৃপায়ই, হোম কার্য্যে ১০৮টী আহুতি দান সম্পন্ন হইল। নৈবেদ্য মা-ঠাকুরাণীকে নিবেদন করিয়া দিয়া, আরতি করিলাম। পরে বারান্দায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া মন্দির হইতে নামিয়া পড়িলাম। জয় ঠাকুর, তোমারই জয়! তোমারই জয়!! তোমারই জয়!!!

মধ্যাহ্নে বহুবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া পক্কান্ন দ্বারা মা-ঠাকুরাণীর ভোগ দেওয়া হইল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা সময় শ্রীমন্দিরের দরজা বন্ধ রহিল। ভোগ সরিলে সকলে প্রসাদ পাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

সন্ধ্যার সময় কুতুবুড়ী মা-ঠাকুরাণীর আরতি করিলেন, তৎপর মন্দিরের প্রাঙ্গণে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। গুরুভ্রাতা-ভগ্নীগণ ঠাকুরকে লইয়া কীর্ত্তনানন্দে মাতিলেন। কীর্ত্তনের পর ঠাকুর স্বহস্তে 'হরির লুট' বিলাইয়া, আপন আসনে যাইয়া বসিলেন। আমরাও স্ব স্ব স্থানে গিয়া বিশ্রাম করিলাম।

হোম করিতে করিতে শেষকালে অকস্মাৎ এক বিষম উৎপাত উপস্থিত হইল। কাঁচা সিমেণ্টের উপর হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় সিমেণ্ট ফাটিয়া চটাচট্ শব্দে চটা উঠিয়া, জ্বলন্ত কয়লা সহিত চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমস্ত ঘরে ও বারান্দায় জ্বলন্ত কয়লা গিয়া পড়িলেও, এক টুকরা সিমেণ্ট বা কয়লা মা-ঠাকুরাণীর অর্দ্ধহস্ত তফাৎ আসনে বা আমার শরীরে আসিয়া পড়ে নাই।

শক্তি-পূজা ও ভগবানের নরলীলা।

২৬শে আশ্বিন, সোমবার। নবমীর দিনে প্রত্যুষে স্নান তর্পণ করিয়া আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতে গেলাম।

ঠাকুর আমাকে বলিলেন ঃ—"তোমার নিত্য ক্রিয়া মন্দিরে ব'সেই ক'রো, চণ্ডীপাঠ ক'রে, হোম ক'রো।"

গত কল্য মন্দিরের মেজের চটা উঠিয়া গিয়াছে বলাতে, ঠাকুর বলিলেন ঃ—"মন্দিরের মেজেতে হোম না ক'রে, পিতলের যে একখানি বড় ধুনুচি আছে, তাতে হোম ক'রো।"

আমি বুড়ো ঠাকুরুণের কাছে চাহিয়া ঐ ধুনুচি আনাইয়া লইলাম। নাম, প্রাণায়াম,

ও গায়ত্রী জপ করিয়া, গীতা ও চণ্ডী পাঠের পর হোম করিয়া, মা-ঠাকুরাণীর পূজা করিলাম। তৎপরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইলাম। বেলা ১২টার সময় মা-ঠাকুরাণীর ভোগ দেওয়া হইল। 'ভোগ দিয়া অর্দ্ধঘণ্টা মন্দিরের দরজা বন্ধ রাখা আবশ্যক,' ঠাকুর এইরূপ বলিয়া দিয়াছেন।

সন্ধ্যার সময় পঞ্চপ্রদীপ, ধুনা, শঙ্খ, বস্ত্রাদি দ্বারা কুতুবুড়ি মা-ঠাকুরাণীর আরতি করিলেন। শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসরের ধ্বনিতে আশ্রম যেন নৃত্য করিতে লাগিল। সন্ধ্যা আরতির পর, সমস্ত গুরুভ্রাতারা আমতলায় সংকীর্ত্তন করিলেন। ঠাকুর 'হরির লুট' দিলেন।

দশমী ঃ—মা-ঠাকুরাণীর পূজা নিত্যই এক নিয়মে চলিল। আজ সতীশ, শ্রীধর প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা, ঠাকুরের নিকট শক্তিপূজা, দুর্গাপূজা, মূর্ত্তিপূজা বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিলেন।

আমি বলিলাম ঃ—"শ্রীরামচন্দ্র কি দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"হাঁ, ক'রেছিলেন। এ সম্বন্ধে বাল্মীকি রামায়ণে কোনও উল্লেখ নাই, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি অন্যান্য স্থানে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে।"

আমি বলিলাম ঃ—"শ্রীরামচন্দ্রতো স্বয়ং ভগবান্। তিনিতো সবই জানিতেন, সবই পারিতেন, তিনি আবার দুর্গাপূজা করিলেন কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"এযে নরলীলা ! এখানে জানা টানার, পারা না পারার কোন কথা নাই। তিনি যদি পূর্ণব্রহ্মের ন্যায়ই সব ক'রবেন, তা হ'লে আর অবতীর্ণ হ'লেন কেন ? সেখানে থেকেইতো সব ক'রতে পারতেন। তাঁর আর অসাধ্য কি আছে ! যাঁর ইচ্ছাতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হ'তেছে, তিনি মুহূর্ত্তে কি না করতে পারেন ! যখন তিনি যে উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি ঠিক সেইরূপই আচরণ করেন। লীলা-সময়ে তাঁর আপন মায়াশক্তি দ্বারাই তিনি আপনাকে আপনি আচ্ছন্ন রাখেন, যেমন গুটিপোকা আপন সুতায় আপনি আবদ্ধ হয়। তাঁর লীলা কি বোঝবার সাধ্য আছে ! শুধু তাঁর কৃপা।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"শ্রীরামচন্দ্র যে বালিবধ ক'রেছিলেন, সে সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকমের কথা বলেন।"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"তাদের কথায় কর্ণপাতও করতে নাই, অনিষ্ট হয়। যাঁরা

সমস্ত শাস্ত্র আগাগোড়া পড়েন না, বোঝেন না, তাঁরাই ওরূপ বলেন। যাঁরা শাস্ত্রের কতকাংশ গ্রহণ করেন, কতকাংশ ত্যাগ করেন, তাঁরা শাস্ত্র বিশ্বাস করেন না, নিজের মনোমত কথাই বেছে নেন্ মাত্র। তাঁদের আবার শাস্ত্র-আলোচনা, শাস্ত্রচর্চ্চা কেন! শাস্ত্র বিশ্বাস কর্‌লে, আগাগোড়া সমস্ত শাস্ত্রই বিশ্বাস কর্‌তে হয়। একটু ক'রে, একটু না কর্‌লে চ'ল্‌বে কেন! শাস্ত্র-কর্ত্তারা কোনও কথাইতো গোপন ক'রে যান নাই! সমস্ত বিষয়েরই পরিষ্কার মীমাংসা ক'রে গেছেন। দুর্দ্দশাগ্রস্ত, বিপন্ন, একান্ত শরণাগত, ভক্ত সুগ্রীবকে রক্ষা কর্‌বার জন্য যে, শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতৃদারাপহারী বালিকে বধ করেছিলেন, তাহাতো পরিষ্কার রামায়ণে লেখা আছে। কোন শাস্ত্র গ্রন্থেরই আগাগোড়া সমস্ত বিষয় বিশ্বাস ক'রে না প'ড়লে, একটা অর্থ বোধ হয় না। শ্রদ্ধার সহিত যাঁরা শাস্ত্র পাঠ না করেন, তাঁরা শাস্ত্র না প'ড়ে, ইংরাজি পুস্তকে বাঘের গল্প, কুকুরের গল্প প'ড়্‌লেই তো পারেন! শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাস ক'রে না প'ড়্‌লে, শাস্ত্র পড়া না পড়া সমান।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"ব্রজগোপীরা যে ভগবতীর পূজা ক'রেছিলেন, তাহা কি কোনও মূর্ত্তি গ'ড়ে? গোপীরা আবার শক্তিপূজা কর্‌লেন কেন?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"শক্তিপূজা না ক'রে, কারো কি পার পা'বার যো আছে? শক্তির কৃপা না হ'লে কিছুই যে হয় না। ব্রজগোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ কর্‌বার জন্যই কাত্যায়ণী পূজা ক'রেছিলেন। এখনও সেই প্রণালীমত ব্রজমায়ীরা প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে প্রাতঃস্নান ক'রে, যমুনারকূলে বালি দিয়ে বেদী প্রস্তুত করেন, এবং তা'তে কাত্যায়ণী পূজা করেন। এই পদ্ধতিতে কোন প্রকার মূর্ত্তি স্থাপন হয় না। মূর্ত্তিপূজার বহু প্রণালী আছে। বেদীতে পূজা করা, বা যন্ত্র এঁকে পূজা করা, এই মূর্ত্তিপূজারই প্রকারভেদ মাত্র।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"দুর্গা ও'কালী একই তো শক্তি, কারো পূজা রাত্রিতে, আবার কারো পূজা দিনে কেন?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"শক্তি-পূজা তন্ত্রমতেও হয়, আবার বৈদিক মতেও হয়। কালীপূজা তন্ত্রমতে রাত্রিতে হয়, আর দুর্গাপূজা বৈদিক মতে দিনে হয়।

হিমালয়ের ঘরে প্রথমে শ্যামবর্ণা দ্বিভুজা কালী জন্ম গ্রহণ করেন, তার পরে পার্ব্বতী।”

ব্রহ্মজ্ঞান ও অবতারতত্ত্ব।

আজ একটি গুরুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—“নির্গুণ পরব্রহ্মই কি আবার সাকার হ’য়ে লীলা করেন? মহাপ্রলয়ে এই সমস্তই কি সেই পরব্রহ্মে লীন হয়?”

ঠাকুর বলিলেন ঃ—“হাঁ, মহাপ্রলয়ে কিছুই আর থাকে না। ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ যা কিছু, সমস্তই অদ্বয় ব্রহ্মেরই পরিণাম। ব্রহ্মছাড়া আর কিছুই নাই। শ্রুতিতে ব’লেছেন,—‘যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥’ ‘যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে’,—ইহাই বলিয়াছেন, কিন্তু ‘যাহা কর্ত্তৃক হইয়াছে’, এইরূপ বলেন নাই। পঞ্চমীতে রে’খে গিয়েছেন। করণার্থে তৃতীয়া করেন নাই। ‘যাহা হইতে’ যেমন মৃত্তিকা হ’তে ঘট, স্বর্ণ হ’তে কুণ্ডল, সমুদ্র হ’তে তরঙ্গ ইত্যাদি। মৃত্তিকা এবং ঘট একই বস্তু, মৃত্তিকারই একপ্রকার পরিণাম ঘট, স্বর্ণেরই একপ্রকার পরিণাম কুণ্ডল এবং সমুদ্রেরই একপ্রকার পরিণাম তরঙ্গ। তাহ’লেও ঘটকে মৃত্তিকা এবং তরঙ্গকে সমুদ্র বল্‌তে হ’বে না। ঘটই বল্‌তে হ’বে, তরঙ্গই বল্‌তে হ’বে। সেইরূপ ব্রহ্ম অদ্বয়,—আর চরাচর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই পরিণাম। তাই এই প্রকার দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝায়েছেন। কুম্ভকার এবং ঘট, এইপ্রকার দৃষ্টান্ত তাঁরা দেন নাই। যত কিছু সমস্তই ব্রহ্ম। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, আমার এই লাঠিখানি, মালাটি, এই অস্থি, মাংস, আমি, সবই ব্রহ্ম। ইহাকেই বলে ব্রহ্মজ্ঞান। এই অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান হ’লেই সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝ্‌তে পারে। নির্গুণ অদ্বয়তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি না হ’লে, সগুণ সাকারতত্ত্ব বুঝ্‌বার কি সাধ্য আছে! সাকার কি এমনি সোজা কথা! শ্রীমদ্ভাগবতে বলেছেন ঃ—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥"

এই নির্গুণ পরব্রহ্মই আবার সাকার হ'য়ে লীলা কর্চ্ছেন। কাক ভুশুণ্ডীর পর্য্যন্ত সংশয় জন্মেছিল। 'সেই নির্গুণ পরব্রহ্মই কি এই দশরথ-তনয় শ্রীরামচন্দ্র ? তিনিই কি এই অযোধ্যায় দশরথের ঘরে ?' একদিন শ্রীরামচন্দ্র আঙ্গিনায় হাতে ক'রে খাবার খাচ্ছেন, কণিকা মাটিতে পড়্‌ছে, আবার তা কুড়িয়ে নিচ্ছেন, কাক ভুশুণ্ডীকে দেখে শ্রীরামচন্দ্র একটু হেসে ধর্‌বার জন্য শ্রীহস্ত বাড়ালেন, ভুশুণ্ডী ভয়ে পালা'ল। কিন্তু হাত তার পেছনে পেছনে চল্‌ল। কাক ভুশুণ্ডী সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘুর্‌তে লাগ্‌লেন, শ্রীহস্ত তার পেছনে পেছনে। অবশেষে আর কোথাও স্থান না পেয়ে, পুনরায় দশরথের আঙ্গিনায় সেই স্থানেই এসে উপস্থিত হ'লেন। তাঁকে দেখে রামচন্দ্র একটু হাস্‌লেন। তখন ভুশুণ্ডী শ্রীরামচন্দ্রের মুখের ভিতর প্রবেশ কর্‌লেন। দেখ্‌লেন,—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, লোক, লোকান্তর, চতুর্দ্দশ ভুবন, সমস্ত রামচন্দ্রের শ্রীমুখের ভিতরে বর্ত্তমান। কত ব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ কতশত রাম লীলা কর্চ্ছেন, নিজকেও ভুশুণ্ডী ঐরূপ একস্থানে দেখ্‌লেন। এসকল দেখে ভুশুণ্ডী তো অবাক! শ্রীরামচন্দ্র তখন আবার একটু হাস্‌লেন, ভুশুণ্ডী অমনি মুখ হ'তে বা'র হ'য়ে পড়্‌লেন। প্রত্যক্ষ এ সমস্ত দেখ্‌লেন, তথাপি সন্দেহ দূর হ'লো না। তখন শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে কৃপা ক'র্‌লেন। অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব ও সগুণ সাকার লীলাতত্ত্ব তাঁর কাছে প্রকাশ হ'ল। তখন ভুশুণ্ডী সমস্তই বুঝ্‌লেন। খণ্ড প্রলয়ে একটী ব্রহ্মাণ্ডের লয় হ'লেও অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড থেকে যায়, কিন্তু মহাপ্রলয়ে আর কিছুই থাকে না। একমাত্র ব্রহ্মই থাকেন। ব্রহ্ম ব্যতীত আর দ্বিতীয় বস্তুই যখন নাই, তখন কিছু আর থাকে না, এরূপও বলা যায় না, থাকে এরূপও বলা যায় না। ব্রহ্ম নিত্য, সুতরাং সমস্তই নিত্য।"

এসকল উপদেশের পর নানাপ্রকার গল্প আরম্ভ হইল। পাগ্‌লা শ্রীধর হাসিতে হাসিতে বলিলেন :—"ব্রহ্মকে জানিয়াছি তাহাও নহে, ব্রহ্মকে জানি নাই তাহাও নহে।

এই কথার অর্থ যিনি জানিয়াছেন তিনিই ব্রহ্মকে যথার্থ জানিয়াছেন।" উপনিষদের এই কথা শ্রীধর এসময় বলাতে সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

ভগবানের নরলীলা।

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"পরমেশ্বরকে তো সকলেই বিশ্বাস করে, তবে তিনি সংসারে যখন অবতীর্ণ হন্‌, তাঁকে ধরা যায় না কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"অনাদি অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বত্রই র'য়েছেন, এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁর উপাসনা করা, ধ্যান করা সহজ। সাধকেরা প্রথম এই ব্রহ্মজ্ঞানেই উপাসনা করেন। অবতারতত্ত্বে, লীলাতত্ত্বে. বিশ্বাস অনেক পরে। যিনি ঠিক আমাদেরই মত খাচ্ছেন, দাচ্ছেন, বেড়াচ্ছেন, রোগের যন্ত্রণায় আহা উহু, গেলাম্‌রে, ম'লাম্‌রে, চীৎকার ক'রে ছট্‌ফট্‌ ক'র্চ্ছেন, শোকেতে অস্থির হ'য়ে 'কোথা গেলরে', 'কোথা গেলে পা'বরে', ব'লে কেঁদে কেঁদে দেশ দেশান্তরে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কখনো ক্ষুধায় কাতর হ'চ্ছেন, কখনো বা পিপাসায় অস্থির হ'চ্ছেন, ইনিই সেই সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী, আনন্দময়, চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর, ইহা মনে করা,—বিশ্বাস করা, কি তামাসার কথা! তিনি যাকে দয়া করেন, সেই মহা ভাগ্যবানই মাত্র তাঁকে বুঝতে পারেন, না হ'লে কারোই সাধ্য নাই। স্বয়ং ব্রহ্মার পর্য্যন্ত এতে সংশয় হ'য়েছিল।

ব্রহ্মা ভাব্‌লেন,—'একি কখনও সম্ভব! যিনি মাঠে মাঠে হৈ হৈ ক'রে গরু চরাচ্ছেন, রৌদ্রে কাতর হ'য়ে গাছতলায় যাচ্ছেন, বৃষ্টিতে পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়াচ্ছেন, খেলায় হেরে গিয়ে রাখাল বালকদের কাঁধে নিচ্ছেন, তাদের সঙ্গে লাফালাফি ছুটোছুটি কচ্ছেন, কখনও কাদায় প'ড়্‌ছেন, আছাড় খাচ্ছেন, আবার চুরি ক'রে ভয়ে জড়সড় হ'য়ে পালাচ্ছেন, ইনিই কি সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ,—এই গোকুলে? আচ্ছা দেখা যাক্‌।' এই ভেবে তিনি অকস্মাৎ গোবৎস, রাখালগণ, বেণু, যষ্ঠি ইত্যাদি সমস্ত হরণ ক'রে, পর্ব্বতের এক গুহায় লুকায়ে রাখ্‌লেন, দরজায় একখানি পাথর চাপা দিয়ে চলে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার কর্ম্ম বুঝে তৎক্ষণাৎ মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজেই গোবৎস, রাখালবালক,

বেণু, যষ্টি, শিঙ্গা, সিকা, হাঁড়ী, লাঠি সমস্তই হ'লেন। কেহই বিন্দুমাত্র জান্‌তে পারলেন না। বলরাম সেদিন গোষ্ঠে যান নাই, বৎসগণের প্রতি গাভীগণের, সন্তানদিগের প্রতি গোপীগণের, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্নেহ ভালবাসা দেখে বলরাম ভাব্‌লেন, 'একি! এমনটিতো পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। এযে সমস্তই অদ্ভুত দেখ্‌ছি।' তিনি কিছু স্থির কর্‌তে না পেরে ধ্যানে বস্‌লেন, সমস্ত তখন তিনি জান্‌তে পার্‌লেন। একটী বৎসর এইভাবে চ'লে গেল, পরে ব্রহ্মা এসে দেখ্‌লেন, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত নিয়ে পূর্ব্বেরই মত লীলা কর্‌ছেন। তখন ব্রহ্মা পর্ব্বতগুহায় যেয়ে দেখ্‌লেন, তিনি যে ভাবে ঐ সব রেখে গিয়েছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই সমস্ত রয়েছে। ব্রহ্মা একবার পর্ব্বতগুহায়, আর একবার গোষ্ঠে ছুটোছুটি কর্‌তে লাগ্‌লেন। পরে একেবারে অবাক হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণে এসে পড়্‌লেন ও স্তব কর্‌তে লাগ্‌লেন—'প্রভো! আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমি অবোধ। সন্তান জননীর কোলে থেকে কত অত্যাচার করে, লাথি মারে, তাতে কি জননী ক্রোধ করেন? তুমিই ধন্য। ধন্য ব্রজবাসীগণ। এই ব্রজের বৃক্ষলতাও ধন্য। কারণ তাঁরা তোমার ও ব্রজবাসীদের চরণধূলির স্পর্শ পায়। দয়া ক'রে আমাকে তোমার ব্রজের বৃক্ষলতা ক'রে রাখ।' গ্রন্থাদিতে যেমনটি লেখা আছে, শ্রীবৃন্দাবনে নিয়ম মত বাস কর্‌লে ক্রমে ক্রমে তা প্রত্যক্ষ করা যায়। ভগবানের নরলীলা, তাঁর কৃপা না হ'লে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবেরও বুঝ্‌বার যো নাই। মানুষের আর কথা কি!"

সংশয়-সম্বন্ধে উপদেশ।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম :—"সঙ্গে থাকিয়া তো দেখি, সন্দেহ পদে পদে। এর উপায় কি? বিশ্বাস না হ'লে তো নিস্তার নাই।"

ঠাকুর বলিলেনঃ—"সংশয়ও হয় আবার বিশ্বাসও হয়। সবই তাঁর ইচ্ছায়। শাক্য সিংহ যখন সংসারে এলেন, একদিন বাড়ীর বাহির হ'য়েই জরা, মৃত্যু, পীড়ার দৃশ্য দেখে অকস্মাৎ বিষম বৈরাগ্য হ'ল। তিনি গৃহত্যাগ কর্‌লেন। ছয়বৎসর কাল

একটানা কঠোর তপস্যা ক'রে একেবারে স্থাণুর মত হ'য়ে গেলেন। কিন্তু যা চান, তা লাভ হ'ল না। তিনি নিরাশ হ'য়ে আসন হ'তে উঠে পড়্লেন,একটি শবের বস্ত্র পেয়ে তা পর্তে উদ্যত হ'লেন। দেবতারা ঐ বস্ত্রখানা ধুয়ে এনে দিলেন। বুদ্ধ-দেব ক্ষুধিত ছিলেন, আহার কর্তে ইচ্ছা কর্লেন। সেই সময়ে অভুক্ত অতি-থিকে ভোজন করাবার জন্য সুজাতা লোক পাঠালেন, সে খুঁজে কোথাও লোক পেল না। একমাত্র বুদ্ধদেবকে দেখ্তে পেল। সুজাতা শাক্যসিংহকে একটি সুবর্ণ বাটিতে মিষ্টান্ন ভোজন কর্তে দিলেন। নিরঞ্জনা নদীতে দাঁড়ায়ে শাক্যসিংহ মিষ্টান্ন খেতে লাগ্লেন। দেবতারা তখন তাঁর চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ালেন, কিন্তু শাক্যসিংহের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত যে পাঁচজন শিষ্য ছিলেন, তাঁরা শাক্যসিংহকে মিষ্টান্ন ভোজন কর্তে দেখে, পরস্পর বলাবলি কর্তে লাগ্লেন, 'দেখেছ ভাই, এ বেটা বিষম ভণ্ড! এইরূপে মিষ্টান্নই খায়, কিন্তু আমাদের জানিয়ে খায় না। চল, এই ভণ্ড বেটার সঙ্গে থেকে আর কিছুই লাভ নাই।' এই ব'লে সামান্য কারণে খট্কা লাগাতে তাঁরা সকলে চ'লে গেলেন। শাক্যসিংহ ভোজনান্তে সুজাতাকে বল্লেন, 'ভগ্নি, মিষ্টান্ন খেয়েছি, এই বাটি কি কর্ব?' সুজাতা বল্লেন,—'মিষ্টান্ন-সহিত বাটিও তোমাকেই দিয়েছি।' শাক্যসিংহ তখন সেই বাটি নদীমধ্যে নিক্ষেপ কর্লেন। দেবগণ তখন উহা হইতে প্রসাদ পে'তে লাগ্লেন। ভোজনান্তে শাক্যসিংহ অভীষ্ট লাভের নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ক'রে বোধিদ্রুমতলে বস্লেন। অন্তরের সমস্ত রিপুকুল পরাস্ত হ'লো, বাসনা কামনা একেবারে লয় পেল, বোধিসত্ত্ব তাঁর মধ্যে প্রবেশ কর্লেন, তিনি বুদ্ধ হ'লেন। বুদ্ধদেব অবতার,কিন্তু আত্ম-বিস্মৃত ছিলেন। তিনি বোধিসত্ত্ব লাভ ক'রে ভাব্লেন, এবস্তু কাকে দেই। তখন সেই পাঁচটী শিষ্যের কথা মনে হ'ল। তাদেরই এ বস্তু দিবার জন্য তিনি চল্লেন। পথে ঘাট-মাঝিকে নদীপার কর্তে বলায়, সে পয়সা চাইল। পয়সা নাই, তখন সঙ্কল্পমাত্রেই দেখ্লেন, অপর পারে পৌঁচেছেন। কাশী যেয়ে সেই পাঁচজন শিষ্যকে দেখ্তে পেলেন, তাঁরাও দূর হ'তে বুদ্ধদেবকে দেখ্তে পেয়ে, পরস্পর বল্তে লাগ্লেন, 'আরে ভাই! ঐ দেখ, সেই ভণ্ড

বেটা! আবার সেই বেটা, এদিকে আস্‌ছে! ওর সঙ্গে আমরা কোনও আলাপই কর্‌ব না।' কিন্তু বুদ্ধদেব যখন তাঁদের কাছে উপস্থিত হ'লেন, তখন তাঁরা খুব সসম্ভ্রমে ভক্তির সহিত আদর অভ্যর্থনা কর্‌লেন। তাঁর প্রভাবকে তো আর কারো অগ্রাহ্য কর্‌বার সাধ্য নাই! বুদ্ধদেব তখন তাঁদের কৃপা কর্‌লেন। এবং বল্‌লেন,—'তোমরা এই বস্তু প্রচার কর।' তাঁরাও ঐ আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে সকলকে সন্ন্যাসী কর্‌লেন। ভগবান যখন যাহা কর্‌তে আসেন, তাতো না ক'রে যান্ না। তিনি যাদের ধরেন কখনও ছাড়েন না। তিনি না ধর্‌লে মানুষের কি সাধ্য যে, তাঁকে ধ'রে থাকে! মানুষের কিছুই ক্ষমতা নাই, তাঁর কৃপাই সার।"

শ্রাদ্ধান্ন ও উচ্ছিষ্টের অপকারিতা।

আমাদের একটি গুরুভ্রাতা (পার্ব্বতী বাবু) ঠাকুরকে আমতলায় জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ— "শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খাইলে কি কোনও অনিষ্ট হয়? আমাদেরতো প্রায়ই শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ হ'য়ে থাকে।"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"শ্রাদ্ধে আহার কর্‌লে বিশেষ অনিষ্ট হ'য়ে থাকে, ভক্তি-ভাব একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়। শ্রাদ্ধান্ন ভোজন কর্‌লে সকল প্রকার দুষ্কার্য্যই তাহা দ্বারা সম্ভব হ'তে পারে।"

এই বলিয়া ঠাকুর কিছুকাল পূর্ব্বের একটী ঘটনার উল্লেখ করিলেন। ঘটনাটি ঢাকা হইতে কয়েক ঘণ্টা তফাৎ মুন্সিগঞ্জে ঘটিয়াছিল। বেশী দিনের কথা নয়।

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন ঃ—"কিছু দিন হ'লো, একটি ভাল সন্ন্যাসী এই পথে চন্দ্রনাথ যেতেছিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় মুন্সিগঞ্জ পৌঁছে একটি ব্রাহ্মণের বাড়ী আশ্রয় নেন। ব্রাহ্মণ খুব ভক্তি শ্রদ্ধা ক'রে, নিজে ঠাকুর ঘরের বারান্দায় তাঁকে থাক্‌বার স্থান ক'রে দিলেন। সন্ন্যাসী স্বপাকে রান্না ক'রে, ভোজনান্তে বিশ্রাম কর্‌লেন। ব্রাহ্মণের বাড়ী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি সেই ঠাকুরকে খুব ভক্তি কর্‌তেন, অনেক সোণার গয়না দিয়ে সাজায়ে রাখ্‌তেন। সন্ন্যাসী সন্ধ্যা-আরতির সময় সে সকল দে'খে, খুব আনন্দ প্রকাশ কর্‌লেন। শেষ রাত্রিতে

তিনি সেই সকল গয়না ঠাকুরের অঙ্গ হ'তে খুলে নিয়ে চম্পট দিলেন। সকালে ব্রাহ্মণ উঠে দেখ্‌লেন, সন্ন্যাসী নাই। ভাব্‌লেন, উদাসীন সন্ন্যাসী ওদের ত কোন লোক লৌকিকতা নাই! ইচ্ছে হয়েছে, চলে গিয়েছেন। ব্রাহ্মণ স্নানান্তে ঠাকুর পূজা কর্‌তে ঠাকুর-ঘরে যেমনি প্রবেশ কর্‌লেন, দেখ্‌লেন ঠাকুরের গায়ে সোণার গয়না নাই। দেখে তো একেবারে অবাক্। তখন সন্ন্যাসীরই এই কর্ম্ম, বুঝে গ্রামের সকলকে খবর দিলেন, সকলে চারদিকে চোরের অনুসন্ধানে লোক পাঠা'ল। এদিকে সন্ন্যাসী গয়না নিয়ে শেষ রাত্রি থেকে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে দৌড়িতে বেলা অপরাহ্নে একটি স্থানে, বৃক্ষতলে বিশ্রামার্থে বস্‌লেন। একটু পরে স্থির হ'তেই হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল, 'ভাল! একি কর্‌লাম!' তখন মাথা কপাল চাপ্‌ড়ে হাহাকার কর্‌তে লাগ্‌লেন। তৎক্ষণাৎ আর বিলম্ব না ক'রে আবার সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীর দিকে দৌড়িতে লাগ্‌লেন। সন্ন্যাসী তথায় পৌঁছিবামাত্রই, সকলে নানা প্রকার গালি-গালাজ কর্‌তে লাগ্‌লেন। সন্ন্যাসী গয়নার পুঁটলি সম্মুখে রেখে বল্‌লেন, 'আপনারা একটু আমাকে স্থির হ'তে দিন, আপনাদের সমস্ত গয়নাই আমার কাছে পাবেন। পাড়ার দশটি ভদ্রলোককে এখানে ডেকে নিয়ে আসুন, আমার কিছু বল্‌বার আছে; সকলের সাক্ষাতেই গয়না দিব।' ব্রাহ্মণ তাই কর্‌লেন। গ্রামের দশটি ভদ্রলোক এলে, সন্ন্যাসী সকলকে বল্‌লেন, "দেখুন! আপনাদের সকলের সাক্ষাতে এই ব্রাহ্মণকে আমি ক'টি কথা জিজ্ঞাস কর্‌ছি। ইনি আমার যথার্থ উত্তর দিবেন। ছেলে বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে, এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত আমি দেশে দেশে পর্য্যটন ক'রে কাটাচ্ছি, এরূপ দুর্ম্মতি তো আমার কখনও হয় নাই। এতকাল ভজন সাধন ক'রে, যা কিছু আমি লাভ করেছিলাম, আপনার গৃহে একবেলা মাত্র অন্ন গ্রহণ ক'রে, আমার সে সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে। আমি জীবনে কখনও কারো এক কপর্দ্দক চুরি করি নাই। আপনার অন্ন গ্রহণের পর, অকস্মাৎ আমার এই দুর্ম্মতি হ'ল কেন? ভাল! জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাকে যা রান্না কর্‌তে দিয়েছিলেন, তাতে কি চোরের কোন প্রকার সংস্রব আছে? একবার অনুসন্ধান ক'রে

দেখুন দেখি ?" ব্রাহ্মণ গৃহে প্রবেশ ক'রে অনুসন্ধানে জান্‌লেন, চাল, ডাল ঘৃতাদি যা তিনি যজমানের বাড়ী হ'তে পেয়েছিলেন, তাই সন্ন্যাসীর সেবাতে দিয়েছিলেন। সন্ন্যাসীকে ব্রাহ্মণ ঐরূপ বলাতে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "আপনি যজমানের বাড়ী কি কার্য্য ক'রে, ঐ সকল জিনিষ পেয়েছিলেন ?" ব্রাহ্মণ বল্‌লেন, "কেন ! শ্রাদ্ধ করিয়ে পেয়েছিলাম। তাই আপনাকে দেওয়া হয়েছিল।" সন্ন্যাসী চম্‌কে উঠে বল্‌লেন,—"শ্রাদ্ধান্ন দিয়েছিলেন ! আচ্ছা, যাঁর শ্রাদ্ধ করেছিলেন, সে কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিল ?" তখন গ্রামের সকল ভদ্রলোকই বল্‌লেন,—"বাবাজি ! তার কথা আর জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না। অমন ভয়ানক চোর আর এদেশে জন্মেছে ব'লে আমরা কখনও শুনি নাই। এদেশের লোক তার নামে কাঁপ্‌ত, সে কয়েকবার জেলও খেটেছিল।"

সাধু বল্‌লেন ঃ—"দেখুন, সেই চোরের শ্রাদ্ধের অন্নগ্রহণেই আমার এই সর্ব্বনাশ। এই আপনাদের গয়না নিন, এখন আমার আর চন্দ্রনাথ যাওয়া হবে না, আমার সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে। একমাস কাল আমাকে চান্দ্রায়ণ ক'রে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে।" গ্রামের সকলে তখন তাঁকে যত্ন করে রেখে, চান্দ্রায়ণের যোগাড় করে দিলেন। সাধু একমাস মুন্সিগঞ্জে থেকে চান্দ্রায়ণ ক'রে চ'লে গেলেন। শ্রাদ্ধান্ন অতি বিষম জিনিষ। খেলে আর রক্ষা নাই। ভক্তির দিক একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"শ্রাদ্ধান্নতো, শ্রাদ্ধ সময়ে যাহা কিছু প্রেতকে দেওয়া হয়, এই জানি। ঐ শ্রাদ্ধবাড়ীর চাল, ডাল দুষিত হয় কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"শ্রাদ্ধসময়ে প্রেতকে আহ্বান করা হয়। ঐ প্রেতের দৃষ্টি যে সকল বস্তুতে পড়ে, সে সমস্তই প্রেতের উচ্ছিষ্ট হ'য়ে যায়। এই জন্য শ্রাদ্ধবাড়ীর কোন বস্তুই খে'তে নাই, খেলে ঐ প্রেতের উচ্ছিষ্ট খাওয়া হয়।"

পার্ব্বতী বাবু ঃ—"তাহ'লে আমরা যজমানের বাড়ী শ্রাদ্ধ করাইয়া আর কিছু নিব না ? শ্রাদ্ধের ভোজ্যগ্রহণ এই নিয়মতো চিরকালই পুরোহিতদের ভিতর চলিয়া আসিতেছে ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"ভোজ্য নিবেন না কেন ! তবে উহার ব্যবহার নিজেদের কর্‌তে নাই, বিক্রি ক'রে ফেল্‌তে হয়।"

আমি বলিলাম ঃ—"যিনি খরিদ ক'রে নিবেন, তাঁরতো উচ্ছিষ্ট বস্তুই গ্রহণ কর্‌তে হবে ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"না যিনি মূল্য দিয়ে নিবেন, তিনি পবিত্র বস্তুই নিবেন। 'দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি।' মূল্য দিয়ে নিলে ও সব জিনিষ পবিত্র হয়, কোন দোষই থাকে না। যিনি বিক্রি করেন, এবং যিনি গ্রহণ করেন, কারও ক্ষতি হয় না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজন করান, ইহাতো সকল সমাজেই আছে। শাস্ত্রেরও ব্যবস্থা শুনিয়াছি। শ্রাদ্ধবাড়ীতে সকলেই তো নিমন্ত্রণ খায়।"

ঠাকুর ঃ—"শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খাবে না কেন ? শ্রাদ্ধদিনে শ্রাদ্ধবাড়ীতে কিছুই খেতে নাই। ব্রাহ্মণভোজনাদি ঐ দিনে ত হয় না।"

শ্রাদ্ধদিনে প্রেতকে আহ্বান করাতে প্রেতের দৃষ্টিতে ঐ বাড়ীর যাবতীয় বস্তুই প্রেতের উচ্ছিষ্ট হয় বলিয়াই, শ্রাদ্ধবাড়ীতে ভোজন নিষেধ। প্রেতের কল্যাণার্থে ব্রাহ্মণাদি ভোজন যে সময়ান্তরে হয়, তাহাতে প্রেতের আহ্বান নাই, উচ্ছিষ্ট সম্ভাবনাও নাই।

ঠাকুর এই প্রকার অনেক কথা বলিলেন।

অপঘাতে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মার উৎপীড়ন।

বরিশাল জেলার অন্তর্গত কোনও ভদ্রপল্লীর কায়স্থবংশোদ্ভব একটি বালক কিছুকাল হয় ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। দীক্ষা গ্রহণের পরই ইঁহার ভজননিষ্ঠা, ঠাকুরের প্রতি স্বাভাবিক টান এবং সরলতা দেখিয়া অনেক সময় বিস্মিত হইয়াছি। একদিন ঠাকুরের নিকট আসিয়া সে বলিল ঃ—"গোঁসাই,সত্যই তুমি আমাদের উদ্ধার করবেতো ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"তোমাদের উদ্ধার না হ'লে আমার তো নিষ্কৃতি নাই। দেখ না, রাখাল সমস্ত গরু নদীর পারে জড় ক'রে, একটী একটী ক'রে সকলগুলিকে পার ক'রে দেয় ; পরে শেষ যেটি থাকে, তার লেজ ধ'রে নিজে পার হয়। আমিও, তোমরা সকলে পার হ'লে, শেষটীকে ধ'রে নিজে পার হ'ব।"

শুনিতেছি কিছুদিন যাবৎ নানাপ্রকার অলৌকিক কার্য্য ও অস্বাভাবিক ব্যবহার আমা-

দের এই গুরুভাইটির দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতেছে। মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে বলিয়া অভিভাবকেরা তাহাকে নাকি দোতালা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখেন। তিনি তথা হইতেই রাস্তায় লাফাইয়া পড়িয়া, বিন্দুমাত্র আঘাত না পাইয়া, অনায়াসে একদিকে ছুটিয়া পলাইয়া যান। আবার কখনও বা কোঠা ঘরে বন্ধ করিয়া বাহিরে শিকল দিয়া আসিবার পর দেখা গিয়াছে, সে রাস্তায় আসিয়া বেড়াইতেছে, শিকল খোলা রহিয়াছে। সাধনপ্রভাবে সে অদ্ভুত শক্তি লাভ করিয়াছে বলিয়াই এতদিন আমাদের সংস্কার ছিল। কিন্তু এখন দেখিতেছি, অন্য প্রকার। গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আসিয়া এখন সে বিষম উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। উপস্থিত, তার অসীম দুঃসাহস, অনাচার ও অত্যাচার দেখিয়া সকলেই অস্থির। কয়েকদিন যাবৎ তার মানুষ খুন করিবার ঝোঁক চাপিয়াছে। আশ্রমে এখন কাহারও স্থির হইয়া চোখ বুজিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিবার যো নাই। সকলেই তার ভয়ে সশঙ্ক। ঠাকুরের নিকটে সে কখনও যায় না। দূর হইতে সে ঠাকুরকে দেখিতে পাইলে কখনও বা ভয়ে কাঁপিতে থাকে, স্তব স্তুতি করে, আবার কখনও নানাপ্রকার অশ্লীল ভাষায় ঠাকুরকে গালাগালি করিয়া, ইষ্টকাদি ছুঁড়িয়া, তাঁহাকে মারিবারও চেষ্টা করে। নিয়ত উহাকে চোখে চোখে রাখিতে হয়, ইহা এক বিষম উৎপাত। নির্জ্জন পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"অকস্মাৎ এই ছেলেটির এই দশা ঘটিল কেন ? কিছুকাল পূর্ব্বেওত এ ভালমানুষ ছিল ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"একটি প্রেত ওকে আশ্রয় ক'রেছে। এখন ওর সমস্ত কার্য্যই ঐ প্রেত দ্বারা হ'তেছে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"প্রেত উহাকে ধরিল কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"ওর পূর্ব্ব পুরুষ কোনও ব্যক্তি, একটি ধনী ভদ্রলোকের সঙ্গে চন্দ্রনাথ যাইতেছিলেন। ঐ ভদ্রলোকটির সঙ্গে বিস্তর টাকা ছিল। টাকার লোভ সম্বরণ ক'রতে না পেরে, তিনি নির্জ্জন পথে সেই ভদ্রলোকটিকে অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। অপঘাতে মৃত্যু ঘটাতে সেই প্রেতের বিষম আক্রোশ জন্মে। ইনি যতকাল জীবিত ছিলেন, এই প্রেত দ্বারা নানাপ্রকার অত্যাচার ভোগ করেছেন। দেহত্যাগের পরেও, বংশধর দ্বারা কোন প্রকার সদ্গতি লাভ না হয়, এই অভিপ্রায়ে, ওঁর বংশলোপ করবার চেষ্টায় আছে। এই ছেলেটির দ্বারা তার পূর্ব্ব পুরুষের সদ্গতি লাভ হবে জেনেই, একে আশ্রয় ক'রে, নানা-

প্রকারে বিপন্ন কর্‌বার চেষ্টায় আছে। তোমরা এর সঙ্গে ব্যবহারে সর্ব্বদা সাবধান থেকো।”

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—“সময় সময় এমন বিষম কাণ্ড কর্‌তে চেষ্টা করে যে, তাহা দেখিয়া সহ্য করা যায় না, কখন কা’কে খুন করে সর্ব্বদা এই ভয় হয়। সহ্য কর্‌তে না পার্‌লে কি কর্‌ব ?”

ঠাকুর বলিলেন ঃ—“মনে মনে প্রেতকে লক্ষ্য ক’রে খুব তেজের সঙ্গে নাম কর্‌তে কর্‌তে ওকে কিল চাপর মেরো। তাতে প্রেতকেই মারা হবে। ছেলেকে স্পর্শ কর্‌বে না। এরূপ কর্‌লে প্রেত ছুটেও যেতে পারে।”

ইহার পর আমরা ছেলেটির অত্যাচার দেখিলেই কিল চাপড় মারিতে লাগিলাম। ২।৪ দিন প্রহারের চোটেই ছেলেটির ঘাড়ের ভূত ছুটিয়া গেল এবং সে প্রকৃতিস্থ হইল। কিন্তু জানি না কেন, বেশীদিন আশ্রমে টিঁকিতে পারিল না। দিন দুই হয় কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

অর্থ হইতে কতপ্রকার অনর্থ ঘটে তাহা বুঝাইতে ঠাকুর বলিলেন ঃ—“টাকার জন্যই-তো অপঘাত-মৃত্যু এবং পরলোকে প্রেতত্ব লাভ হ’ল ? আর একজন, টাকার লোভেই নরহত্যা ক’রে, পরলোকে অসদ্‌গতি লাভ ও বংশধরদের পর্য্যন্ত বিপন্ন ক’রলে। টাকা বিষম কালকূট, কখনও পুষে রাখ্‌তে নাই। টাকা উপার্জ্জন ক’রে, প্রয়োজন মত খরচ কর্‌তে হয়। অবশিষ্ট যা কিছু থাক্‌বে, ভগবানের গচ্ছিত ধন মনে ক’রে যার অভাব, অকাতরে তা’কেই দিতে হয়। বিপদে প’ড়ে কেউ কিছু চাইলে, অমনি দিয়ে দিতে হয়, কোনও দ্বিধা কর্‌তে নাই। ধর্ম্ম যাঁরা চান, তাঁদের এভাবেই চ’ল্‌তে হয়। দিন কোনও প্রকারে কেটে গেলেই হ’ল।”

প্রেতাত্মার মুক্তির উপায়।

অপঘাত মৃত্যু প্রভৃতিতে যাহাদের পরলোকে অসদ্‌গতি ঘটে, বংশধরদের কিরূপ কার্য্য-দ্বারা তাহাদের সদ্‌গতি লাভ হয় ?

ঠাকুর বলিলেন ঃ—“শাস্ত্রে আছে, গয়াতে যথামত পিণ্ড-দান ক’র্‌লেই, তাদের সদ্‌গতি হ’য়ে থাকে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"গয়াতে পিণ্ড দিলে সত্যই কি প্রেত তাহা গ্রহণ করে?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"হাঁ, ব্যবস্থামত দিলে, পরলোকগত আত্মা তা গ্রহণ করে। আমি যখন গয়ায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কর্‌তে গিয়েছিলাম, তখন আকাশগঙ্গা পাহাড়ে অনেক সময় থাক্‌তাম। ঐ সময়ে একবার একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘ'টেছিল। আমার একটী ব্রাহ্ম-বন্ধু, বিলাত ফেরত ডাক্তার, সেই সময়ে গয়ায় গিয়েছিলেন। তাঁর পরলোকগত পিতা তাঁকে একদিন স্বপ্নে বল্‌লেন, 'বাপু, যদি গয়ায় এসেছ, আমাকে একটা পিণ্ড দাও, আমি বড়ই কষ্ট পেতেছি।' তিনি ব্রাহ্ম, ও সব কিছুই বিশ্বাস করেন না, তাই উড়িয়ে দিলেন। পরদিন রাত্রিতে আবার স্বপ্নে দেখ্‌লেন, পিতা অত্যন্ত কাতরভাবে বল্‌ছেন,—"বাবা, তোমার কল্যাণ হবে, আমাকে এবার একটি পিণ্ড দিয়ে যাও।" দুবার স্বপ্ন দেখেও তিনি তা গ্রাহ্য কর্‌লেন না। আমাকে এ বিষয় এসে বল্‌লেন। আমি তাঁকে বল্লাম ঃ—"পুনঃ পুনঃ যখন এরূপ দেখ্‌ছেন, তখন পিণ্ড দেওয়াই উচিত।" তিনি আমার উপর বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লেন, 'আপনি ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক হ'য়ে এরূপ কু-সংস্কারে বিশ্বাস করেন?' আমি তাঁকে বল্‌লাম, 'আপনিতো আর আপনার বিশ্বাস মত দিবেন না, আপনার পিতার বিশ্বাস মত দিবেন, তাতে বাধা কি?' তিনি তাতেও সম্মত হলেন না। পরে আর একদিন শুয়ে আছেন, সামান্য একটু তন্দ্রা এসেছে, দেখ্‌লেন, পিতা যোড় হাত ক'রে বল্‌ছেন, 'বাপু, আমাকে একটি পিণ্ড দিলে না? বন্ধুটী তখন আমাকে এসে বল্‌লেন, 'মশায়, আজ আবার পিতাকে স্বপ্নে দেখ্‌লাম, তিনি করযোড়ে কাতর হ'য়ে বল্‌ছেন, 'বাপু আমাকে একটী পিণ্ড দিলে না?' আমি বড়ই কষ্ট পেতেছি।' শুনে আমার কান্না পে'ল। আমি তখন বল্‌লাম, 'আপনি নিজে না দেন, প্রতিনিধি দ্বারাওত দেওয়াইতে পারেন?' তিনি চুপ ক'রে রইলেন। আমি দুটি টাকা নিয়ে একটী পাণ্ডাকে ওঁর প্রতিনিধি হ'য়ে পিণ্ড দিতে ব্যবস্থা ক'রে দিলাম। এই পিণ্ড দানের দিন বন্ধুটিকে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে বিষ্ণুপাদপদ্মে উপস্থিত হ'লাম। প্রতিনিধি পাণ্ডা যখন পিণ্ডদান কর্‌লেন, তখন দেখ্‌লাম, বন্ধুটির চোখ দিয়ে

দর দর ধারে জল পড়ছে। তিনি কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়ে পড়লেন, পরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় বললেন, 'মশায়, যখন পিণ্ড দেওয়া হয়, তখন আমি পরিষ্কার দেখলাম, আমার পিতা খুব আগ্রহের সহিত দুই হাত পেতে পিণ্ড গ্রহণ করলেন, এবং হাত তুলে আমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বললেন, 'বাপু, আমার যথার্থ উপকার করলে, তুমি সুখে থাক, ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন।' আহা, আগে যদি আমি জানতাম, পিতা এভাবে এ'সে পিণ্ড গ্রহণ করবেন, তা হলে আমি নিজেই খুব যত্ন করে পিণ্ড দিতাম।' এ সকল ব্যাপার কি যুক্তি তর্কে বুঝান যায় ?"

ধর্ম্মরূপে অধর্ম্ম।

আজ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রেইতো দয়া সরলতা প্রভৃতিকে ধর্ম্ম বলিয়াছেন, কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায়, দয়া ক'রে লোকের ক্ষতি করা হয়। আবার সরল হ'য়ে এবং বিশ্বাস ক'রেও অনুতাপ ভোগ করতে হয় ; সুতরাং যথার্থ ধর্ম্ম অধর্ম্ম কিসে বুঝ্‌ব ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"অধর্ম্ম অধর্ম্ম-রূপে মানুষের নিকট উপস্থিত হ'লে, লোকে তা সহজেই বুঝতে পারে, এবং তাহার আক্রমণ হ'তে রক্ষা পাওয়ারও একটা চেষ্টা করতে পারে; কিন্তু অধর্ম্ম ধর্ম্মের আকারে এসে প'ড়লে, তা বুঝে নেওয়া বড়ই শক্ত। সিদ্ধ পুরুষেরাও সে স্থলে ঠ'কে যান, স্বয়ং ভক্তরাজ মহাবীরেরও মতিভ্রম ঘটেছিল, মানুষের আর কথা কি !"

এই বলিয়া ঠাকুর ভক্তরাজ মহাবীরের কথা এইরূপ বলিতে লাগিলেন ঃ—নিজের ইষ্টদেবতা রামলক্ষ্মণকে পাপরূপী মহীরাবণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিজ লেজের কুণ্ডলী দ্বারা গড় প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে রাম লক্ষ্মণকে রাখিলেন এবং স্বয়ং দরজায় খুব সতর্ক হইয়া রহিলেন, যেন কোন ছলে মায়ারূপী পাপ-মহীরাবণ ভিতরে প্রবেশ করিয়া রাম লক্ষ্মণকে অপহরণ না করে। মহীরাবণ কখনও কৌশল্যার, কখনও দশরথের, কখনও বা জনকের, কখনও বা ভরতের আকারে আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন ; কিন্তু ভক্তরাজ সকলকেই করযোড়ে বলিলেন, একটুকু অপেক্ষা করুন, বিভীষণ এখনই আসিবেন, তিনি বলিলেই দরজা ছাড়িয়া দিব। মহীরাবণ যখন কোনও প্রকারে

হনুমানকে ভুলাইতে পারিলেন না, তখন বিভীষণেরই রূপ ধরিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং বলিলেন মহাবীর! শীঘ্র দরজা ছাড়িয়া দাও আমি একবার রামলক্ষণকে দেখিয়া আসি। হনুমানের একবার সংশয় হইল বটে, কিন্তু তাহাতে আর মনোযোগ দিবার অবসর পাইলেন না। বিভীষণরূপী মহীরাবণ অমনি বলিলেন 'মহামায়াবী মহীরাবণ নিয়ত ঘুরিতেছে, জানিনা কখন কোনছলে ভিতরে প্রবেশ করে। তুমি খুব সাবধান থাক, আমি একবার রাম লক্ষ্মণের শিরে রক্ষা বেঁধে আসি।' তখন হনুমান দ্বার ছাড়িয়া দিলেন। মহীরাবণও অনায়াসে ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত রাম লক্ষ্মণকে নিয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন।

এই ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, ঃ—অধর্ম্ম যে কোনও রূপে ভক্তের নিকট আসুক না কেন, ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি স্থির থাক্‌লে কিছুতেই তাকে বিচলিত কর্‌তে পারেনা। কিন্তু ধর্ম্মের আকারে অধর্ম্ম এসে উপস্থিত হ'লে মহা সিদ্ধপুরুষকেও মুগ্ধ ক'রে ফেলে। গয়ার আকাশ গঙ্গার বাবাজী, দয়া কর্‌তে গিয়ে, কি বিষম দুর্দ্দশাগ্রস্তই না হ'লেন!

রঘুবর বাবাজীর ঐশ্বর্য্যের কথা।

আকাশ-গঙ্গার বাবাজীর কথা জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, ঃ—গয়ার বাবাজীর অদ্ভুত শক্তি আমি স্বচক্ষে দেখেছি। রাত্রে বড় বড় বাঘ এসে বাবাজীর পায়ের কাছে মাথা হেঁট ক'রে প'ড়ে থাক্‌তো, বাবাজী আটার টিক্কর প্রস্তুত ক'রে রাখ্‌তেন, রাত্রিতে বাঘ এলে হাতে ক'রে তিনি তাই বাঘ্‌কে খাওয়াতেন। গোখ্‌রো সাপ গুলো বাবাজীর চারদিকে ঘুরে বেড়াতো। বাবাজী নিশ্চল হ'য়ে, নাম জপে মগ্ন থাক্‌তেন। আকাশের দিকে তাকায়ে কখনও পাখিদের বল্‌তেন্ "আরে তু ভি রামজীকা জীবহো, মৈঁ ভি উন্‌হিকা দাস; ইঁহা আয়কে মেরা কাণ সাফা কর্‌দে।" বাবাজী বল্‌বা মাত্র পাখী উড়ে এসে বাবাজীর ঘাড়ে পড়্‌তো এবং কান খুঁচে দিয়ে যে'তো। এক এক সময় দুই তিন শত লোক বাবাজীর আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেও বাবাজী আসন হ'তে না উঠে তাঁদের লুচি মণ্ডা প্রভৃতি দিয়ে ভোজন করাতেন। পাহাড়ে জলাভাবে অনেক সময়ে বিষম ক্লেশ হ'তো। বাবাজী মহাবীরের কাছে তিন দিন ধন্না দিয়ে প'ড়ে র'লেন; পরে মহা-

বীরের কৃপা হ'লো, পাহাড়ের পশ্চিমদিকে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তর দেখায়ে মহাবীর বল্‌লেন "একখানা লাঠি দিয়ে এই পাথরের উপর সামান্য আঘাত কর পাথরের নীচ হ'তে ঝরণা বে'রিয়ে পড়্‌বে"। বাবাজী তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে একখানা লাঠি নিয়ে যেমনি ঐ প্রস্তরের উপর আঘাত কর্‌লেন, অম্‌নি প্রকাণ্ড একটা পাথরের চটান লক্ষমণেরও অধিক, ক্রম ক'রে ভেঙ্গে প'ড়ে গেল। আর অমনি সেই স্থান হ'তে কল্ কল্ রবে ঝরণা ছুট্‌লো। বাবাজী ঐ ঝরণার নাম যমুনা রেখেছিলেন, এখনও সেই ঝরণা সেই রকমই আছে। কখনও ওখানে জলাভাব হয়না।

দয়াতে পতন।

ঠাকুরের কথা শেষ না হইতেই আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, শুনিতে পাই বাবাজী নাকি খুব ভক্তও ছিলেন, সকলেরই প্রতি নাকি তাঁর খুব দয়া ছিল?

ঠাকুর বলিলেন, ঃ—দয়া তাঁর অসাধারণ ছিল কিন্তু এই দয়াই তাঁর পতনের কারণ হ'লো?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—দয়া করিলে আবার পতন হয় নাকি?

ঠাকুর বলিলেন, ঃ—তা আর হয়না।

এই বলিয়া ঠাকুর আকাশ গঙ্গার রঘুবর বাবাজী সম্বন্ধে এইরূপ বলিতে লাগিলেন ঃ—বাবাজীর একটি গুরুভাই ছিলেন, তিনি ফল্গুর অপর পারে রাম গয়া পাহাড়ের নীচে একটী গ্রামে বাস করিতেন। তাঁর স্ত্রী এবং নাবালক দুইটী ছেলে ছিল। গুরুভাই পীড়িতাবস্থায় শয্যাগত হইলে বাবাজী প্রত্যহ যাইয়া তাহার সেবা করিতেন। মৃত্যু সময়ে তিনি নাবালক দুটী, সন্তান এবং স্ত্রীকে বাবাজীর হাতে সমর্পণ করিয়া গেলেন। বাবাজী প্রত্যহ দুবেলা নিজে রান্না করিয়া, তাহাদের জন্য দুই ক্রোশ তফাৎ খাবার লইয়া যাইতেন; কিছুদিন এইরূপ সেবা করিয়া বৃদ্ধ বাবাজী হয়রান হইয়া পড়িলেন। তখন ভাবিলেন অসহায়া বিধবা স্ত্রীলোক ও নাবালক ছেলে দুটীকে নিকটেই আনিয়া রাখিনা কেন? ইহাতে আমার ভজনের সময় পাইব, যাতায়াতেও হয়রান হইতে হইবেনা, স্ত্রীলোকটিকে সর্ব্বদা নজরে রাখিতে পারিব। ছেলে দুটিও মানুষ হইবে। এই স্থির করিয়া বাবাজী ছেলে দুইটীর সহিত স্ত্রীলোকটিকে আশ্রমে আনিলেন। পাহাড়ে আসিয়াই একটি ছেলের মৃত্যু

হইল। অপর ছেলেটির প্রতি বাবাজীর ক্রমেই মায়া বৃদ্ধি পাইল। বাবাজী ছেলেটীর ভবিষ্যত ভাবিতে লাগিলেন। বাবাজীর নিকট অনেক সময় বড় বড় লোক যাইতেন, শত শত টাকা প্রণামী পড়িত, বাবাজী একটী কপর্দ্দক পর্য্যন্ত না রাখিয়া সমস্ত দীনদুঃখীদের দান করিয়া ও ভাণ্ডারা দিয়া ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু যে সময় স্ত্রীলোকটি আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, সেই সময় হইতে দান ও ভাণ্ডারা কমিয়া গেল। লোকে অনুমান করিতে লাগিল, ঐ স্ত্রীলোকটির ও ছেলেটির মায়ায় পড়িয়া, বাবাজী অর্থসঞ্চয় আরম্ভ করিয়াছেন। বাবাজীর একটি প্রিয় শিষ্য পুনঃ পুনঃ বাবাজীকে বলিলেন, "মহারাজজী, লেড়কা আউর আউরত্‌কো পাহাড়মে নেহি রাখ্‌না। আপ্‌কা বিপদ হোগা, সহরমে রাখ্‌ দিজিয়ে।" বাবাজী প্রথম প্রথম তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "আমার গুরু-ভাই মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া আমার নিকট যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমি তাহাতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি ; সুতরাং যতটা নিরাপদে ইহাদিগকে রাখিতে পারি, রাখিব। ইহারা আমার আশ্রিত, ইহাদিগকে নিয়ত সঙ্গে রাখিয়া বিপন্ন হইলেও, আমি ইহাদের কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না। ইহারা বড়ই দুঃখী" ঐ শিষ্যটি বাবাজীকে আর একদিন বলিলেন, "মহারাজ, পাহাড়ে স্ত্রীলোক থাকিলে আপনার বিষম দুর্নাম হইবে। আর উহাদের জন্য টাকা পয়সা সঞ্চয় করিতেছেন, সাধারণের এইরূপ একটা সংস্কারও জন্মিবে। এই নির্জ্জন পাহাড়ে গুণ্ডাদেরও উৎপাত হইবে।" বাবাজী তখন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'কোন্‌শালা হামারা ক্যা কর্‌নে সেক্‌তা হ্যায়? আনে দেও।" শিষ্যটীও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। শুনিতে পাই, ২।৪ দিন পরে ঐ শিষ্যটীই গুণ্ডাদের লোভ দেখাইয়া, বাবাজীর আশ্রম লুট করিতে যুক্তি দেন। একদিন গভীর রাত্রিতে সতর জন গুণ্ডা বাবাজীর আশ্রমে মার্‌ মার্‌ রবে আসিয়া পড়িল। বাবাজী একখানা লাঠি হাতে নিয়া বাহির হইলেন। একাকী সতর জন গুণ্ডাকে পিটাইয়া ভাগাইলেন। দ্বিতীয় বারে গুণ্ডারা বাবাজীকে আবার যখন আক্রমণ করিল, বাবাজী পূর্ব্বের মত এবারও হাতের লাঠি খানা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সকলকে তাড়াইয়া নিয়া চলিলেন। হঠাৎ লাঠিখানী একখানা পাথরে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গেল, অমনি গুণ্ডারা বাবাজীকে ধরিয়া ফেলিল, তৎপরে লাঠীর উপর লাঠী মারিয়া বাবাজীকে একেবারে জ্ঞানশূন্য করিল। বাবাজী সংজ্ঞাশূন্য হইলেও গুণ্ডারা নিরস্ত হইল না, পাথরের দ্বারা ঠুকিয়া ঠুকিয়া বাবাজীর মাথার, পাঁজরার ও হাতের হাড়গুলি ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিল। অতঃপর পায়ে গামছা বান্ধিয়া ৪।৫ জনে টানিয়া ছেঁচ্‌ড়িয়া পাহাড়ের উপর তুলিল। এবং একটা স্থানে বাবাজীকে ফেলিয়া বড় একখণ্ড প্রস্তর বাবাজীর বুকের উপর চাপাইয়া

চলিয়া গেল। নিত্য প্রত্যুষে যাহারা পাহাড়ে যাইতেন,ঐ দিন ভোর হইতেই তাঁহারা যাইয়া দেখিলেন, আশ্রম শূন্য, বাবাজী নাই, যেখানে সেখানে খণ্ড খণ্ড রক্ত পড়িয়া রহিয়াছে। বাবাজী কোথায়, অনুসন্ধান করিতে করিতে, পাহাড়ের উপরে সকলে যাইয়া দেখিল, বাবাজী প্রকাণ্ড একখানা পাথর চাপায় পড়িয়া আছেন, রক্তে সমস্ত স্থানটি ভাসিয়া গিয়াছে। তখন বহুলোক একত্র হইয়া অনেক চেষ্টায় পাথরখানা সরাইয়া ফেলিল, পরে বাবাজীর দেহটি আশ্রমে আনিয়া মহাবীরের নিকট ফেলিয়া রাখিল, এবং পুলিসে খবর দিল, পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্‌ সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাজীর সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত এবং শ্বাস নাই দেখিয়া সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। অকস্মাৎ বাবাজী গা নাড়া দিয়া মহাবীরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে বলিতে লাগিলেন, "জয় মহাবীরজী তেরা জয়, ধন্য তেরা দয়া! হাম্! য্যায়সা কসুর কিয়া ত্যায়সাই দণ্ডদিয়া। তু বড়া দয়াল! তু বড়া দয়াল!" পুলিস সাহেব বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "যাহারা আপনার উপর অত্যাচার করিয়াছে তাহাদের কাহাকেও আপনি চিনেন?" বাবাজী বলিলেন, আমি সকলকেই চিনি, কিন্তু তাদের একজনেরও নাম বলিবনা, তাহারা ভগবানের দিক হইতেই গুরুতর দণ্ড পাইবে, আপনারা আবার তাদের শাস্তি দিবেন কেন? পুলিস সাহেব অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বাবাজী কিছুতেই তাহাদের নাম বলিল না, এই ঘটনার পর বাবাজীর জ্বর হয়, তিনি পাহাড় ত্যাগ করিলেন; এখন আর রাত্রিতে তিনি পাহাড়ে থাকেন না, "চানচউরাতে" থাকেন।

এইরূপ বলিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেনঃ—"আকাশ-গঙ্গার বাবাজীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখ্‌লে তাঁর অতীত অবস্থা স্বপ্ন ব'লে মনে হয়, আকাশের নক্ষত্র যেমন ছুটে পড়ে, একটু অহঙ্কার জন্মালেই মহা মহা যোগীদেরও সেই প্রকার পতন হয়, অহঙ্কারের হাত হ'তে রক্ষা পাবার উপায়, সর্ব্ব-জীবে সেবা। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ লতারও সেবা ক'রতে হয়। গুয়ের পোকাকেও ঘৃণা করতে নাই। সকলকেই নিজ হ'তে বড় মনে করতে হয়। প্রাণের সহিত সকলের পায়ে মাথা নোয়ায়ে রাখ্‌লেই রক্ষা। মাথা তুল্‌লে আর নিস্তার নাই, পরমহংসজী যখন আমাকে কৃপা কর্‌লেন বাবাজীকে আমি সমস্ত বল্‌লাম, বাবাজীর শুনে অভিমান হ'লো, তিনি বল্‌লেন, "আরে এক জঙ্গলমে, দো সের নেহি রহনে সেক্‌তা হ্যায়, ইঁহা আউর কোই নেহি হ্যায়; তোমারা যো কুচ্ছ হুয়া

হাম ইঁ কিয়া, দেখো হিঁয়া যমুনা হামই লে আয়া, দোস্‌রা কোই নহি।” আমার তখনই মনে হ'লো, বাবাজীর এরূপ অভিমানেই অচিরে সর্ব্বনাশ ঘট্‌বে। এমন শক্তিশালী পুরুষকেও পতিত হ'তে হ'ল। পরে তাঁর কিনা দুর্দ্দশা ঘট্‌ল। এখন তিনি মুষ্টি ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—বাবাজী কি আর পূর্ব্বাবস্থা লাভ কর্‌তে পারবেন না ?

ঠাকুর বলিলেন ঃ—তিনি খুব কঠোর সাধক, স্থির হ'য়ে বস্‌লে অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত শুধ'রে নেবেন, পূর্ব্বাবস্থা লাভ কর্‌বেন।

রঘুবর বাবাজীর কথা শুনিয়া আমরা সকলেই অবাক হইলাম এতবড় মহাত্মারও এরূপ দুর্দ্দশা ঘটে ! জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—কামিনী কাঞ্চনে আকর্ষণ কতদিন থাকে ?

ঠাকুর বলিলেন ঃ—যতদিন মন থাকে, তত দিন স্ত্রী-পুরুষে এবং বিষয়-বিষয়ীর আকর্ষণ থাকে। মন লয় হলেও কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য হ'য়ে থাকে বটে, কিন্তু তাহা অন্য প্রকার।

অভিমান কিসে হয় ?

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—রঘুবর বাবাজী ত খুব বিনীত সাধু ছিলেন, তাঁর আবার অভিমান কিসে হইল ?

ঠাকুর বলিলেন ঃ—অভিমান ত আর এক প্রকার নয়? অভিমানও নানা রকমের আছে। অনেক টাকা থাক্‌লে অভিমান হয়, অনেক বিদ্যাতে অভিমান হয়। এরূপ যে অভিমান, তা সহজেই নষ্ট করা যায় কিন্তু আর এক রকমের অভিমান আছে, ঠিক এর বিপরীত। তার হাত হ'তে এড়ান বড়ই কঠিন। নির্ধন ব্যক্তি মনে করে, ধনী তাঁকে ঘৃণা করেন ; সুতরাং ধনীর উপরে তার অভিমান হয়। মূর্খ মনে করে, বিদ্বান তাকে অগ্রাহ্য করেন, এ ভাবে বিদ্বানের উপরও মূর্খের অভিমান হয়। পাপী সংসারাশক্ত ব্যক্তিও, ধার্ম্মিক উদাসীন সন্ন্যাসীর উপর অভিমান করে, এই প্রকারের অভিমান সত্য যুগ হ'তে চ'লে আস্‌ছে। রাজর্ষি জনকের নিকট অনেক ঋষি তপস্বীরাও যেয়ে এই প্রকার অভিমান প্রকাশ কর্‌তেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—সদগুরুর নিকট যারা সাধন লাভ করেন তাঁদেরও কি ভগবান দয়া কর্‌বেন না ?

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"তাঁরা উপযুক্ত সাধন লাভ ক'রেছেন, তাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু দীন হীন কাঙ্গাল ব'লে নিজকে না বুঝা পর্য্যন্ত; কিছুইত হবে না। কাঙ্গালকেই দীননাথ দয়া ক'রে থাকেন। অভিমানী ব্যক্তি দয়ার পাত্র নয়।"

একটী গুরুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—মহাপুরুষেরা দয়া ক'রে মুহূর্ত্ত মধ্যে আমাদের সমস্ত কুস্বভাব দূর ক'রে ভাল ক'রে নিতে পারেন না কি ?

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"হঁা, তা পারেন, কিন্তু যিনি প্রণালী মত না ক'রে ঐ প্রকার দয়া করেন, তাঁকে ভুগ্‌তে হয়, পতিত হ'তে হয়। যেমন গয়ার বাবাজী পরের উপকার কর্‌তে গিয়ে, বৃদ্ধ বয়সে আপনি পতিত হন। তাঁর সেই অসাধারণ প্রভাব একে বারেই নষ্ট হ'য়ে গেছে। এখন দেখ, তিনি ঢাকায় এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এ সকলের কি দরকার ছিল ? সুখ, দুঃখ ভোগ মাত্র। ভগবানইত সব করেন, আমার কি ক্ষমতা, আমি আর কি কর্‌তে পারি ? কার কোন অবস্থায় প'ড়ে পতন হয়, তা বলা যায় না। মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত আর কিছুরই বিশ্বাস নাই। কারো হয়ত মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে একটা বাসনা জন্মে। তাই শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও, কিছুরই বিশ্বাস নাই।"

কার্ত্তিক মাস।

ঔষধে বাবাজীর আপত্তি।

কার্ত্তিক ১লা—১৭ই পর্য্যন্ত

আশ্বিন মাস শেষ হইতেই মাতাঠাকুরাণীকে দেখিতে আমার প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। আমি ঠাকুরের অনুমতি লইয়া বাটী গেলাম। গহনার নৌকায় ৪।৫ ঘণ্টা থাকিয়া সেরাজদিঘা পঁহুছিতে হয়। গহনার নৌকায় সাতটার সময় চাপিয়া বেলা প্রায় বারোটা পর্য্যন্ত থাকিতে হয়। অর্দ্ধেক পথ আসিয়া আমার ভয়ানক শিরঃপীড়া হইল, আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম, গহনায় প্রায় পচিশ জন লোক ছিল, সকলেই আমার অবস্থা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একজন কবিরাজ আমাকে একটি ঔষধের বড়ি দিয়া বলিলেন, "এক গণ্ডুষ জল সহিতে ইহা খেয়ে ফেলুন, বেদনা সারিয়া যাইবে।" ঐ সময়ে একজন বৈষ্ণব 'গলুইএর' উপর বসিয়া হরি নামের ঝুলি লইয়া জপ করিতেছিলেন, সকলে তাহাকে উপহাস করিতেছিল। আমি যেমনই ঐ ঔষধের বড়িটি কবিরাজের নিকট হইতে খাইবার জন্য হাতে লইলাম, অমনি সেই বৈষ্ণব বাবাজী কট্ মট্ করিয়া একবার কবিরাজের দিকে চাহিয়াই আমার বেশভূষা দেখিয়া আমাকেও নিজেরই দলের লোক ঠাওরাইয়া নৌকার গলুই হইতে লাফাইয়া উঠিলেন এবং দুই তিন লাফে আমার নিকট আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন "আজ্ঞা গোঁসাই আপ্‌নে ক্যান ওষুধ খাবেন, ঐ বড়ি ফিক্যা ফালাইয়া দ্যান্ ধলেশ্বরীর জলে, একবার কিষ্ট কন্, একবার কিষ্ট কন্।" বাবাজীর রকম দেখিয়া আমি আর ঔষধ খাইতে সাহস পাইলাম না, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে বাবাজীর ঐ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তৎক্ষণাৎ আমার বেদানার শান্তি হইল, নৌকার সকলেই তখন অবাক হইয়া গেল।

আমাদের পাড়া-গাঁ সম্বন্ধে ঠাকুরের নানা কথা।

বাড়িতে সাত আট দিন থাকিয়া আবার গেণ্ডারিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলাম, যখনই আমি বাড়ী হইতে আসি ঠাকুর আমাকে দেশের খবর জিজ্ঞাসা করেন। এবার ঠাকুর বলি-লেন :—"তোমাদের গ্রাম হইতে 'জৈনসার' যাবার পথে একটি বহুকালের প্রাচীন প্রকাণ্ড 'বট-অশ্বত্থের গাছ' ছিল, সেই গাছটি এখন কি অবস্থায় আছে?"

আমি বলিলাম ঐ গাছের তলা দিয়াই চিরকাল সাধারণের যাতায়াতের পথ, ওখানে পঁহুছিলেই শরীর যেন শীতল হইয়া যায়। গাছ তলায় একটু না বসিয়া পারা যায় না। গাছটি ছোট সময়ে যে প্রকার বড় ও ঝাপড়া দেখিয়াছি এখন আর সে প্রকার নাই, আপ্‌না আপ্‌নিই একটি একটি করিয়া বড় ডালগুলি শুকাইয়া যাইতেছে, শুনিয়াছি নিকটবর্ত্তী কোন কোন লোক ঐ গাছের দু' এক খানা ডালা কাটিতে গিয়া মুখে রক্ত উঠিয়া অকস্মাৎ মারা পড়িয়াছে। গাছে যে কি আছে জানিনা।

ঠাকুর আক্ষেপ করিয়া বলিলেনঃ—"আহা! তোমাদের অঞ্চলে ঐ প্রাচীন বৃক্ষটি ধর্ম্মের নিশান স্বরূপ। ঐ বৃক্ষের ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় প্রাচীন ধর্ম্ম ভাবও তোমাদের দেশে লয় পাবে।"

আমি শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—"তোমাদের ও দিকের লোকের ধর্ম্ম ভাব এখন কেমন? আমি বলিলামঃ—কোজাগর পূর্ণিমা দিনে আমাদের দেশে ঘরে ঘরে বড়ই আনন্দ। এই পূর্ণিমাতে মেয়েরা ঢালের মত বড় লক্ষীর সরা খরিদ করিয়া আনাইয়া পূজা করেন, খুব বড় লোক হইতে নিতান্ত গরীব পর্য্যন্ত যাহারা এক সন্ধ্যা আধ পেটা খে'য়ে জীবন ধারণ করেন তাহারাও এই লক্ষী পূজা করিয়া থাকেন, এবং প্রতি গৃহস্থের ঘরেই যথা সাধ্য এই লক্ষীপূজার আড়ম্বর হইয়া থাকে, পাড়ার প্রত্যেক বাড়ীর লোকেরাই প্রত্যেকে বাড়ী উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সহিত রাত্রিতে প্রসাদ পাইয়া থাকেন। এই প্রসাদ ভোজন শেষ করিতে রাত্রি ভোর হইয়া যায়। সারা দিন মেয়েরা অনেকে নিরম্বু উপবাস করিয়া থাকেন। এবার দেখা-দেখি আমিও উপবাস করিয়াছিলাম, বড়ই ভাল লাগিল।

ঠাকুর বলিলেনঃ—পাড়া গাঁয়ে মেয়েরা ব্রতাদি করে না?

আমি বলিলাম;—আমাদের দেশে প্রায় সকল পাড়া গাঁয়েই এই কার্ত্তিক মাসে চার পাঁচ বৎসরের কচি কচি মেয়ে গুলি ভোর বেলা উঠিয়া যম-পুকুরের ব্রত করে। বাড়িতে কোন ঘরের কোনে, উঠানে, এক ফুট আন্দাজ স্থানে চতুষ্কোণ গর্ত্ত করিয়া পুকুর কাটে, ঐ পুকুরের পাড়ে ছোট ছোট কলা গাছ, কচু গাছ, এবং ধান গাছ, পুতিয়া রাখে, ঐ গর্ত্তের চারি দিকে কাক, চিল, বাজ, কচ্ছপ, কুমীর, যম এবং যমুনা প্রভৃতির ছোট ছোট মৃত্তিকা-পুতুল স্থাপন করিয়া, জল নাড়িতে নাড়িতে ব্রতমন্ত্র পড়িতে থাকে, এবং ঐ গর্ত্ত হইতে

গণ্ডূষে গণ্ডূষে জল লইয়া মেয়েরা তাহাদের ভাবী শ্বশুর শাশুড়ীর পরলোকে জল প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিয়া ঐ সমস্ত পুতুলের মুখে জল ঢালিতে থাকে, ছোট ছোট মেয়েরা এই প্রকার কোন না কোন ব্রত বৎসরের অধিকাংশ সময়ই করিয়া থাকে।

ঠাকুর বলিলেন ঃ—পূজা, ব্রত, উপবাস এ সকল যত করা যায় ততই ভাল, খেলার ছলে এ সকল ব্রত নিয়মাদিতে শিশুকাল থেকে ছোট ছোট মেয়েদের অভ্যস্ত করান এদেশের প্রথা ছিল। এ সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে যে কত কল্যাণকর তাহা এখন আর কেহ বুঝে না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বোধ হয় এ সমস্তই লোপ পে'য়ে যাবে, মেয়েদের হইতেই দেশে ধর্ম্ম রক্ষা হয়। শিশুকাল থেকে এসব কর্‌লে বড়ই কল্যাণ হয়।

গুরুর অপমান,—ফল হাতে হাতে।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—তোমাদের দেশে সাধারণ লোকদের ভিতরে হরি সংকীর্ত্তন (মহাপ্রভুর) মহোৎসবাদি পূর্ব্বে প্রায় সকল গ্রামেই হইত, এখনও সেই প্রকার হয়ত ?

ঠাকুরের প্রশ্ন শুনিয়া আমি আমার একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা বলিবার সুযোগ পাইয়া বলিতে লাগিলাম, আমাদের পাড়ার সংলগ্ন "সুজানগরে" দত্ত পরিবারের এক জন ধনী বৈষ্ণব, কিছু দিন হয় একটি বৃহৎ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে গ্রামের সমস্ত লোকেই খুব উৎসাহের সহিত যোগদান করিল। ধেনো জমির প্রায় ৫০।৬০ বিঘা লইয়া এই মহোৎসবের স্থান প্রস্তুত হইল ; নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রায় শতাধিক উনানে রাশি রাশি অন্ন ও লাফরা ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইতে লাগিল,এবং সে সমস্ত, অনাবৃত মাঠে চাটাই হোগ্‌লা বিছাইয়া তাহার উপর স্তূপীকৃত হইতে লাগিল। চারদিক হইতে সহস্র সহস্র লোক দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইল, মৃদঙ্গ, খোল, করতাল লইয়া বৈষ্ণবেরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গুরু পুরোহিত ক্রমে ক্রমে সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূজা, ভোগ, আরতির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কর্ম্মকর্ত্তা, তাহার গুরুদেবের নিকট যাইয়া কার্য্যারম্ভের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। গুরুদেব গরীব ছিলেন, তিনি কিছু অতিরিক্ত দক্ষিণা চাহিলেন। কর্ম্মকর্ত্তা তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'আপনাকে যাহা

দিতেছি, তাহাই লইয়া অনুমতি দেন, না হ'লে যথা ইচ্ছা চলিয়া যান। আপনি অনুমতি না দিলেও আমার এই কার্য্য এখন আর অসম্পন্ন থাকিবে না।' শিষ্য মুখে এই প্রকার অবজ্ঞা-সূচক কথা শুনিয়া গুরু অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইয়া অমনি উঠিয়া পড়িলেন, এবং যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, 'মহাপ্রভু জাগ্রত দেবতা, আমি তোমার গুরু, আমাকে যখন তুমি এই ভাবে অপমান কর্‌লে, তোমার এই কার্য্য কখনও তিনি সুসম্পন্ন হ'তে দিবেন না।' এদিকে সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। মহাপ্রভুর আসন সাজান হইতে লাগিল, এমন সময় হঠাৎ আকাশে কালমেঘ উঠিয়া পড়িল, এবং দেখিতে দেখিতে, তাহা বৃহৎ আকার ধারণ করিয়া চারি দিক অন্ধকার করিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড় তুফান প্রবল বেগে আসিয়া মুসলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। লোক সকল চতুর্দ্দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইতে লাগিল, রাশীকৃত অন্নব্যঞ্জনাদি, সমস্ত উপকরণ সহিত অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই জল-প্লাবনে নষ্ট হইয়া গেল। প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে যে বিরাট ব্যাপার হইয়াছিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহা একেবারে পণ্ড হইয়া গেল। এ ঘটনা আমি বাড়ী থাকিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

ঠাকুর বলিলেনঃ—"গুরুর অপমান, এযে গুরুতর অপরাধ; তাই ফল হাতে হাতে। অপরাধের দণ্ড, অপরাধ বুঝিয়া, কোথাও তিন দিনে, কোথাও তিন মাসে, কোথাও বা তিন বৎসরের ভিতরে হয়। অনেক অপরাধের দণ্ড পর-লোকে ভোগ কর্‌তে হয়।

পুত্রের জীবন লইয়া শিষ্য-পুত্রের-জীবনদান।

গুরুর প্রাণে ক্লেশ দিলে যেমন অকস্মাৎ বিপদের উৎপত্তি হয়, গুরুকে প্রসন্ন করিলেও তেমন তাঁহার কৃপায় মহা আপদ হইতে আশ্চর্য্য প্রকারে রক্ষা পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে আমাদের পরিবারের একটি যথার্থ ঘটনা এবার মা-ঠাকুরাণীর মুখে শুনিয়া আসিয়া, ঠাকুরকে বলিলাম।—

আমার বড় মামার উপর্য্যুপরি কয়েকটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই মারা পড়িতে লাগিল। ভূমিষ্ঠ হইবার পরই সন্তান চীৎকার করিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীরের বর্ণ লাল, নীল, হলুদ ইত্যাদি নানা প্রকার পরিবর্ত্তন হয়, পরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, এবং অল্প-ক্ষণের মধ্যেই মারা যায়। বার বার এই রূপ হওয়াতে আমার মাতুল মহাশয় অতিশয় উদ্বিগ্ন ও হতাশ হইয়া পড়িলেন। একবার আমার মামী-মাতার প্রসব হওয়ার সময়েই

দৈবক্রমে তাঁহার গুরুদেব ঐ গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তিনি একজন তান্ত্রিক সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন। নরকপাল, সুরা প্রভৃতি লইয়া অতি কঠোর সাধন করিতেন। পুত্রটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই অন্যান্য বারের মত চিঁ, চিঁ করিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং তার সর্ব্ব শরীর নীল বর্ণ হইয়া গেল। আমার মাতুল মহাশয়, এবারও পুত্রটি মারা যায় দেখিয়া যারপরনাই মর্ম্মাহত ও হতাশ হইলেন। পরে হঠাৎ তাঁহার গুরুদেবের কথা স্মরণ হওয়ায়, সেই অন্ধকার রাত্রে দৌড়িয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণ দুটি জড়াইয়া ধরিয়া যাহাতে এবার তাঁহার বংশরক্ষা হয়, সেই জন্য অত্যন্ত কাতর হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার গুরুদেব তখন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া, থাকিয়া বলিলেন, 'একটি বিল্বপত্র লইয়া আইস।' বিল্ব পত্র আনা হইলে, তিনি তাহাতে সিন্দূরের দ্বারা এক প্রকার যন্ত্র ও একটি মূর্ত্তি আঁকিলেন, পরে সেই পত্রটি স্পর্শ করিয়া, কিছুক্ষণ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। অতঃপর আমার মাতুলকে বলিলেন যে, "তুমি যদি এক দৌড়ে এই বিল্বপত্রটি লইয়া গিয়া তোমার নবজাত পুত্রটির বক্ষস্থলে রাখিতে পার, তাহা হইলে ঐ সন্তান দীর্ঘায়ু হইবে। কিন্তু যদি রাস্তায় কোন স্থানে এই বিল্বপত্র লইয়া দাঁড়াও, তাহা হইলে তোমার বিষম বিপদ ঘটিবে। আর এক কথা, এই পুত্রটির নাম "হরচরণ" রাখিও।" আমার মাতুল মহাশয় সেই বিল্বপত্রটি লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে এক দৌড়ে বাটি আসিলেন এবং উহা সেই শিশুর বক্ষস্থলে ধরিলেন। আশ্চর্য্য এই যে, তৎক্ষণাৎ ছেলেটীর সমস্ত উপসর্গ একেবারে শান্ত হইয়া গেল, এবং ক্রমে ক্রমে বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল। পরদিন আমার মাতুল তাঁহার গুরুদেবের নিকট যাইয়া শিশুটির সুস্থতার সংবাদ জানাইলেন এবং কৌতুহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পুত্রটির নাম "হরচরণ" রাখিতে তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন কেন? তাহাতে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার পুত্রের নাম "হরচরণ" এবং তাহারই আয়ু লইয়া তিনি উহা ঐ শিশুটীর দেহে সঞ্চার করিয়াছেন। তিন দিন পরে সংবাদ আসিল যে, সত্য সত্যই তাঁহার পুত্র ঐ সময়ে কলেরা হইয়া মারা গিয়াছেন।

ঘটনাটি শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন:—"তান্ত্রিকদের ভিতরে খুব ভাল ভাল সিদ্ধ মহাপুরুষ এখনও আছেন। তোমার মাতা ঠাকুরাণীর নিকট আর কি শুনলে?"

আশ্চর্য্য জন্মবিবরণ।

আমি বলিলাম ঃ—"মহাপ্রভুর কৃপাতে আমার বড় দাদার (হরকান্ত বাবুর) যে ভাবে জন্ম হয়, সেই কথাও তিনি বলিলেন।"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"সে কি রকম, বলনা ?

আমি বলিলাম ঃ—গর্ভের একাদশ মাস উত্তীর্ণ হইয়া গেল অথচ সন্তান প্রসব হইতেছে না দেখিয়া, আত্মীয় স্বজন সকলেই অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন ! এমন সময়ে এক দিন প্রসব বেদনা আরম্ভ হইল। তিন দিন বেদনায় মাতা-ঠাকুরাণী জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। তৃতীয় দিন রাত্রিতে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, কোন জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ঃ—"তুমি মহাপ্রভুর মহোৎসব মানস কর, তবেই অচিরে তোমার সন্তান হইবে, নচেৎ কিছুতেই ইনি ভূমিষ্ঠ হইবেন না।" ঠিক সেই সময়ে বাড়ীর অপর ঘরে মায়ের পিসি ঠাকুরাণীও ঠিক ঐ রূপ স্বপ্ন দেখিয়া 'জয় মহাপ্রভু, জয় মহাপ্রভু' বলিতে বলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। তখন ঐ স্বপ্নের বিষয় আলোচনা হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে গ্রামের অপর প্রান্তের একটি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ (রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য) হাঁপাইতে হাঁপাইতে অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—"এই মাত্র স্বপ্ন দেখিলাম, মহাপ্রভুর মহোৎসব মানস না করিলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে না ; তোমরা মহাপ্রভুর মহোৎসব মানস কর।" তিন জনে বিভিন্ন স্থানে থাকিয়াও ঠিক একই স্বপ্ন একই সময়ে দেখিলেন, ইহাতে সকলেই অবাক হইয়া গেলেন, এবং আত্মীয়গণ অগৌণে ঐ রূপ মানস করিলেন। আশ্চর্য্য এই যে, ইহার অল্পক্ষণ পরেই দাদার জন্ম হইল। কিন্তু দাদা শৈশবে নানা প্রকার রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। মাতাঠাকুরাণী ইহাতে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সেই সময় একদিন তিনি আবার স্বপ্ন দেখিলেন, কে যেন আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, "মানস মত মহোৎসব না করাতে ছেলে এ সকল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।" আমরা শাক্ত পরিবার হইলেও এই ঘটনাতে মহাপ্রভুর মহোৎসব খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়া দাদার অন্নপ্রাশন কার্য্য হইয়াছিল।

ঠাকুর বলিলেন ঃ—শ্রীবৃন্দাবনে যাবার সময় আমরা সকলে কিছুদিন ফয়জাবাদে তোমার দাদার বাসায় ছিলাম, তাঁর অবস্থা দেখে বড়ই আনন্দ হ'ল। তিনি এ যুগের লোক নন, সত্য যুগের লোক, ও রকমটি প্রায় দেখা যায় না।

এই বলিয়া ঠাকুর দাদার জীবনের আশ্চর্য্য কয়েকটি অবস্থার কথা উল্লেখ করিলেন, ঠাকুর যখন ফয়জাবাদে ছিলেন, তখন সেখানে যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল, সে সকল বলিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত ঘটনা আমার সেই সময়ের ডাইরিতে পরিষ্কার লেখা রহিয়াছে বলিয়া, এস্থলে আর লিখিলাম না।

অহিংসককে কেহ হিংসা করেনা।

মহাভারত পাঠের পর ঠাকুরকে আজ জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ পাহাড় পর্ব্বতে নিরাপদে কি উপায়ে থাকা যায় ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"মহাভারতে পুনঃপুনঃ প'ড়তেছতো ! যাদের ভিতরে হিংসা নাই তাদের কেহই হিংসা করেনা, হিংস্র জন্তু সকলেও তাদের গাছ পাথরের মত মনে করে।"

এই বলিয়া ঠাকুর একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন যথা ঃ—"কিছুদিন পূর্ব্বে এখানকার হাতী খেঁদার এণ্ডারসন্ সাহেব হাতীতে চড়িয়া জয়-দেবপুরের জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সাহেব বিপদে পড়িলেন। হাতীটি বাঘের গন্ধ পাইয়া সাহেবকে হাওদা হইতে ফেলিয়া পলাইল। সাহেব বাঘটীকে লক্ষ্য করিয়া দুই তিনবার বন্দুক ছুড়িলেন কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হইল। প্রকাণ্ড বাঘটা সাহেবের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সাহেব প্রাণপণে জঙ্গলের নানাদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। বাঘ যেন শিকার হাতে পাইয়াছে বুঝিয়াই খেলা করিতে করিতে ধীরে ধীরে সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। সাহেব কিছুক্ষণ ছুটাছুটির পর হয়রান অবস্থায় জঙ্গলের ঝোপে একটী উলঙ্গ সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহারই নিকট গিয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী, সাহেবকে স্থির হইয়া বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এত ব্যস্ত হইয়াছ কেন ? সাহেব ত্রস্ত হইয়া বলিলেন, "বাঘে যে আমাকে ধ'রে ফেল্‌বে।" তখন সন্ন্যাসী বাঘটিকে হাত নাড়িয়া অগ্রসর হইতে নিবারণ করিয়া বলিলেন, "বৈঠ্ বাচ্ছা আউর নগিজ মত্ আও।" বাঘ একটু বসিয়া থাকিয়া লেজ নাড়িয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল, পরে একদিকে চলিয়া গেল। সন্ন্যাসী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাঘের ভয়ে তুমি এত অস্থির হইলে কেন ? সাহেব বলিলেন, আমি এই বাঘটিকে শিকার করিতে দুই তিন বার গুলি ছুড়িয়াছি কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয়, অমনি বাঘ আমাকে আক্রমণ করিতে পেছন নেয়। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাঘকে তুমি গুলি ছুড়িলে কেন ? তুমি কি বাঘ

খাও ?" সাহেব বলিলেন, না, "বাঘ আমরা খাইনা, আমোদের জন্য শিকার করি। আপনার ইঙ্গিতে বাঘ স্থির হইল, পরে চলিয়া গেল। বনের বাঘকে কি উপায়ে আপনি বশ করিলেন, আমাকে দয়া করিয়া বলুন।" সন্ন্যাসী বলিলেন "কোন মন্ত্র তন্ত্র নাই, শুধু ভালবেসে, পশু পক্ষি, কীট, পতঙ্গ মনুষ্য সকলকেই একমাত্র ভালবাসার দ্বারা বশ করা যায়। তোমার ভিতরে হিংসা আছে বলিয়াই, অন্যেও তোমাকে হিংসা করে। হিংসা শূন্য হইলে সাপে বাঘেও কিছুই করেনা"। সাহেব শুনিয়া অবাক্ হইলেন। ভিতরে তার কি এক চমক্ লাগিল, তিনি খুব কাতর হইয়া সন্ন্যাসীর আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। সন্ন্যাসী সাহেবকে দীক্ষা দিলেন, এবং ঘরে যাইয়া ভজন সাধন করিতে বলিলেন। সাহেব কুটীরে আসিয়া বাবুরচিকে বিদায় করিলেন। তদবধি ব্রাহ্মণের পাকে নিরামিষ আহার করিতেছেন। সাধু সন্ন্যাসী দেখিলে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। ঢাকার অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে যান। সকলেই তাঁর অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। উপস্থিত তিনি কোথায় আছেন জানিনা।

ঠাকুর যে এণ্ডারসন্ সাহেবের কথা বলিলেন, দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ, এই সাহেবকে আমি অনেকবার ক্রিকেট্ খেলিতে দেখিয়াছি। শুনিলাম এখন তিনি চাট্‌গাঁর দিকে বদ্‌লি হইয়া গিয়াছেন। খুব সাত্বিক ভাবে বৈষ্ণব আচারে থাকেন। পাচক ব্রাহ্মণ সঙ্গে রহিয়াছে।

এই ঘটনা বলার পর ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন ঃ—যেখানে হিংসা নাই সেখানে সাপে বাঘেও হিংসা করেনা। খাদ্য-খাদক সম্বন্ধে বধ পৃথক ; তাকে যথার্থ হিংসা বলেনা। কামাখ্যাতে একদিন অচলানন্দ স্বামী একটি জলাশয়ের কাছে ব'সে আছেন, ব্রাহ্মণেরা সেখানে পূজা আহ্নিক কর্‌ছেন। এমন সময়ে একটি বাঘ জলখেতে এসে উপস্থিত হ'ল। ব্রাহ্মণেরা বাঘের ভয়ে সন্ধ্যা আহ্নিক ছেড়ে পালাতে ব্যস্ত হ'লেন। অচলানন্দ-স্বামী সকলকে স্থির হ'য়ে থাক্‌তে ব'লে, ব'ল্লেন ঃ—'আপনারাইতো ব'লে থাকেন কামাখ্যায় হিংসা নাই, তবে এত ভীত হ'চ্ছেন কেন ? আপনাদের কোনও ভয় নাই। নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিজেদের কার্য্য করুণ।' স্বামীজীর কথা শুনে ব্রাহ্মণেরা সশঙ্ক হ'য়ে আপন আপন সন্ধ্যা আহ্নিকাদি কর্‌তে লাগ্‌লেন বাঘটিও জল খেয়ে চ'লে গেল।"

ঠাকুরের শান্তিপুর যাইতে ব্যস্ততা।

১৮ই কার্ত্তিক
মঙ্গলবার

প্রায় একমাস হইল নানা স্থানের গুরুভ্রাতাদিগের সম্মিলনে, ঠাকুরের সঙ্গে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে পরমানন্দে কাটাইলাম। জানিনা আজ কেন ঠাকুর অকস্মাৎ শান্তিপুরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আজ সকালে চা-সেবার কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর বলিলেন ঃ—"মাকে দেখ্‌তে কা'ল ভোরেই আমি শান্তিপুর যাব।"

আমরা অনুমান করিলাম, ঠাকুর-মা অতিশয় পীড়িতা, তাই ঠাকুর বোধ হয় তাঁহার শেষ সময় বুঝিয়া, বৃদ্ধা মাতাকে দেখিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। ঠাকুরের সঙ্গে কে কে শান্তিপুরে যাইবেন জিজ্ঞাসা করাতে,

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"যার যার ইচ্ছা হয় যেতে পার।"

আমরা আট নয়টি গুরুভাই ঠাকুরের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। শ্রীধর বাতরোগে শয্যাগত, তাহার উঠিবার শক্তি নাই, ঠাকুরের সঙ্গে যাইতে পারিবেন না ভাবিয়া, কান্দিয়া অস্থির হইলেন। শ্রীধর ঠাকুরের নিত্য-সঙ্গী,ঠাকুর কখনও তাহাকে সঙ্গ-ছাড়া করিয়া রাখেন না, এ সময় শ্রীধরকে নিতান্ত অচল দেখিয়া, ঠাকুর খুব স্নেহের সহিত বলিলেন ঃ— শ্রীধর, এই তোমার পাথেয় রইল, যখন সমর্থ হবে তখনই আমার কাছে চ'লে যেতে পারবে।"

শ্রীধর সারা রাত্রি কান্দিয়া কাটাইলেন।

শান্তিপুর যাত্রা।

১৯শে কার্ত্তিক
বুধবার।

ট্রেন যাইবার বহুপূর্ব্বেই শেষ রাত্রিতে ঠাকুর ধোলাইগঞ্জ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। গুরুভ্রাতারা অনেকে নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত ঠাকুরকে ষ্টীমারে উঠাইয়া দিবার জন্য সঙ্গে চলিলেন। রাণাঘাট পর্য্যন্ত আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর আট নয় খানা টিকেট করা হইল। নারায়ণগঞ্জ ষ্টেশনে পহুঁছিয়া আমরা গোয়ালন্দ ষ্টীমারে উঠিলাম। গুরুভ্রাতারা ঠাকুরের চরণে প্রণাম করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বিদায় হইলেন। ষ্টীমারে উঠিয়া একপাশে ঠাকুরের আসন পাতিয়া আমরা কয়েকজন গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে ঘেরিয়া বসিলাম। অনেক লোক আসিয়া ঠাকুরকে দেখিয়া যাইতে লাগিল। কেহ কেহ মামলা মোকদ্দমার ফলাফল, কেহ বা সাংসারিক নানা প্রকার অশান্তি উৎপাতের প্রতিকারের উপায়, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল; আবার কেহ কেহবা খুব কাতর হইয়া পুনঃপুন উৎকট রোগের ঔষধের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল।

ঠাকুর ধীরভাবে সকলকেই বলিতে লাগিলেন ঃ—"আমি ও সব কিছুই জানিনা। ভগবানের নাম করি মাত্র।"

কিন্তু ঠাকুরের কথা শুনিয়াও কেহই পুনঃপুন জেদ্ করিতে নিবৃত্ত হইল না। ঐরূপ লোকের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল দেখিয়া, আমরা অতিশয় বিরক্ত হইয়া পড়িলাম। একটু অবসর পাইয়া ঠাকুরকে বলিলাম, "ইহারা এইভাবে সমস্তটা দিনই জ্বালাতন করিবে। আপনি বলিলে আমি সহজে এক কথায়ই ইহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারি। তাই করিব কি ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"তুমি কি ব'লে এদের নিবৃত্ত কর্‌বে ?"

আমি বলিলাম ঃ—"ইনি হাজার টাকার কমে কিছুতেই ঔষধ দেন না। মোকদ্দমার ফলাফলের কথাও বলেন না। ইহা বলিলে টাকার কথা শুনিয়াই, সকলের শ্রদ্ধা উড়িয়া যাইবে, আর কখনও এদিকে ঘেঁসিবে না।"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"যদি কেহ হাজার টাকা দিতে রাজি হয়, তখন কি কর্‌বে ? এমন লোকওত থাক্‌তে পারে !"

আমি আর এ কথার কোনও উত্তর দিতে পারিলাম না।

ঠাকুর তখন বলিলেন ঃ—"ওরূপ বল্‌তে নাই, যথার্থ কথাই বল্‌তে হবে। যে বিশ্বাস করে করুক, না করে তাতেই বা ক্ষতি কি ? লোকে আশা ক'রে আসে, একটু বিরক্তও কর্‌বে না ? এতে অস্থির হ'লে চল্‌বে কেন ?"

আমি লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম। আমরা প্রায় সন্ধ্যার সময়ে গোয়ালন্দে নামিয়া ট্রেনে চাপিলাম, এবং শেষ রাত্রে রাণাঘাটে পঁহুছিয়া তথায়ই ভোর বেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

২০শে কার্ত্তিক
বৃহস্পতিবার

প্রত্যুষে ঘোড়ার গাড়ীতে রওয়ানা হইয়া প্রায় সাড়ে আটটার সময় শান্তিপুরে পঁহুছিলাম। ঠাকুরের বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ঠাকুর-মা সেখানে যেন ঠাকুরেরই জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ঠাকুর সাষ্টাঙ্গ হইয়া ঠাকুর-মার চরণে প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের চক্ষে জল আসিল। ঠাকুর-মা বলিলেন, "তুই এখন এলি যে ?"

ঠাকুর বলিলেনঃ—"মা তুমি যে আমাকে 'বিজয়,' 'বিজয়' ব'লে ডেকে ছিলে, তা আমি শুনেছিলাম।"

ঠাকুর-মার শরীরে প্রহারের চিহ্ন সমস্ত দেখিয়া আমরা অবাক হইলাম। কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র কাহারও বিরুদ্ধে ঠাকুরকে একটি কথা বলিলেন না। ক্রমে আমরা ঠাকুর-মার সঙ্গে আলাপে জানিতে পারিলাম যে, উন্মাদের অবস্থায় যাঁহাদের উপরে ঠাকুর-মার রক্ষণা-বেক্ষণের ভার ছিল, তাহাদের মধ্যে কোনও ব্যক্তি উঁহাকে সামলাইতে না পারিয়া এমন দারুণ প্রহার করিয়াছিলেন যে, ঠাকুর-মা দুই তিনবার "বিজয়", "বিজয়" চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; ঠাকুর-মার ঐ চীৎকার শুনিয়াই ঠাকুর শান্তিপুরে আসিবার জন্য অস্থির হইয়াছিলেন, ইহা পরিষ্কার জানিতে পারিয়া অবাক্ হইলাম। ঠাকুর, বাড়ীতে পঁহুছিয়া নীচের ঘরেই আসন করিয়া বসিলেন। অবিলম্বেই আমরা উপরের ঘর পরিষ্কার করিয়া ঠাকুরের সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করিয়া নিলাম। এতকাল আমি স্বপাক আহার করিয়াছি, আজ সকলের সঙ্গেই প্রসাদ পাইতে ঠাকুর আমাকে আদেশ করিলেন, উপরের একটি মাত্র ঘর তাহাতেই আমরা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে রহিলাম।

পাণ্ডব বিজয় যাত্রা,—সত্য নিষ্ঠার উপদেশ।

২১শে কার্ত্তিক
শুক্রবার

আহারান্তে অপরাহ্নে আমরা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে বাহির হইলাম গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করিয়া ঠাকুর আমাদিগকে শান্তিপুরের বহু দেবালয়ে লইয়া গেলেন। সর্ব্বত্রই সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার একটু পরে আমরা যাত্রা শুনিতে, কোনও এক গোস্বামীর বাড়ী প্রবেশ করিলাম। গৃহস্বামী যাত্রাস্থলে ঠাকুরকে বসিতে আহ্বান করাতে, ঠাকুর আমাকে মাত্র সঙ্গে লইয়া সভায় গিয়া বসিলেন। অপরাপর সকলকে দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যাত্রা শুনিতে ইঙ্গিত করিলেন। ব্রাহ্মণদের সভায় অপর জাতি একাসনে বসেন না বলিয়াই ঠাকুর সকলকে লইয়া সভাস্থলে গেলেন না, এ কথা পরে জানাইলেন। যাত্রা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, প্রাণভয়ে দণ্ডীরাজা পাণ্ডবদিগের শরণাগত হইলেন। ভীমসেন দণ্ডীরাজকে অভয় দিয়া আশ্রয় দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উহা জানিতে পারিয়া পাণ্ডবদের নিকটে আসিয়া দণ্ডীরাজকে চাহিলেন। পাণ্ডবেরা বলিলেন, 'ইনি প্রাণভয়ে আমাদের শরণ লইয়াছেন। আমরাও ইঁহাকে অভয় দিয়া আশ্রয় দিয়াছি। সুতরাং কিছুতেই

ইঁহাকে ত্যাগ করিতে পারিবনা।' শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'তা হ'লে তোমাদের সঙ্গে আমার বিষম বিরোধ ঘটিল দেখিতেছি।' ভীমসেন বলিলেন, 'হে কৃষ্ণ, আমাদের একমাত্র বল তুমি। তোমার আত্মীয়তার গরবেই আমরা ইন্দ্রচন্দ্রকেও তৃণতুল্য গণ্য করিনা। কিন্তু শরণাগতকে রক্ষা করিতে আমাদের জীবন যদি দিতে হয়, এমন কি তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণও যদি করিতে হয়, অনায়াসে করিব। ধর্ম্ম কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিবনা।' শ্রীকৃষ্ণ তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্ত্তিক, গণেশ, প্রভৃতি দেবগণকে লইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। পাণ্ডবেরাও ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবগণের সহিত মিলিত হইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত দেবগণের সহিত কুরুপাণ্ডবগণের মহাযুদ্ধ বাধিল। এই যুদ্ধের পরিণাম, "পাণ্ডবের জয় ও শ্রীকৃষ্ণের পরাজয়।" এই যাত্রা শুনিয়া আসিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "শ্রীকৃষ্ণ যদি সাক্ষাৎ ভগবান, তাহ'লে তিনি সমস্ত দেবগণের সহিত মিলিত হইয়াও সামান্য পাণ্ডবদের নিকট পরাস্ত হইলেন কেন?"

ঠাকুর বলিলেন :—"এই দেখালেন যে, নিজ কর্ত্তব্যে যদি তেমন দৃঢ়তা থাকে, সত্যে ও ধর্ম্মে যদি একান্ত নিষ্ঠা এবং চেষ্টা থাকে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচাদির সহিত মিলিত হ'য়েও স্বয়ং ভগবান তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়ে কিছুই কর্‌তে পারেন না। সত্যের সর্ব্বত্রই জয় জান্‌বে। যাহা সত্য, যাহা ধর্ম্ম, তাহাতেই স্থির থাক্‌বে। ভগবানও যদি নানা প্রকার ঐশ্বর্য্য দেখায়ে বিচলিত কর্‌তে চেষ্টা করেন, কখনই টল্‌বেনা। তিনি যদি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে পরাস্ত কর্‌তে চেষ্টা করেন, পারবেন না। দেব, দেবী, যক্ষ, রক্ষঃ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে মিলিত হ'য়েও পরাস্ত হবেন, তাঁর কৃপায় সর্ব্বত্র সত্যেরই জয় হয়, ইহা নিশ্চয় জেনো।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, :—"গুরু যাকে যেটি নিয়ম করিয়া দেন তাহাইত তার কর্ত্তব্য? আর তাঁর উপদেশইত ধর্ম্ম?"

ঠাকুর বলিলেন :—"হাঁ তা বই আর কি?"

আমি বলিলাম, :—"সকল নিয়মই কি আর ষোল আনা সর্ব্বত্র রক্ষা করা যায়?"

ঠাকুর বলিলেন :—"হাঁ, তা না কর্‌লে হবে কেন? যার যেটী নিয়ম তা সর্ব্বত্র ষোল আনা রক্ষা ক'রে চল্‌তে হবে, একটু বাদ পড়্‌লে চল্‌বে না, নিয়মের একটী ছাড়্‌লে, সঙ্গে সঙ্গে আর পাঁচটীও ছাড়্‌তে হয়। শত সহস্র বাধা বিঘ্নের

মধ্যেও নিজের নিয়মে দৃঢ়তা রাখ্‌বে। এ বিষয়ে বজ্রের মত কঠিন হবে। বজ্রের মত কঠোর ও পুষ্পের মত কোমল হ'তে ঋষিরা যে ব'লেছেন, তাহা এই নিয়ম রক্ষা বিষয়েই। আর এই নিয়মে প্রবেশ বিষয়েই আবার পুষ্পের মত কোমল হ'তে হবে। অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত ধীর ও শান্ত ভাবে নিজের নিয়ম রক্ষা ক'রে যাবে।"

চিত্ত-বিকৃতি ও শাসন।

সৎসঙ্গের প্রণালী ও উপদেশ।

২২ শে কার্ত্তিক শনিবার। ঠাকুর শান্তিপুরে পঁহুছিলেন, ঠাকুরের আত্মীয় স্বজনগণ, বহু স্ত্রীলোক পুরুষ আসিয়া ঠাকুরকে দেখিয়া যাইতেছেন। একটী অল্পবয়স্কা ব্রাহ্মণ-বিধবা প্রায় সর্ব্বদাই আমাদের এখানে আসেন। জানিনা, কেন তাঁর বিশেষ নজর আমার উপর পড়িল। গত কল্য হইতে আমাকে তিনি তাঁর বাড়িতে লইয়া যাইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতে আমি বলিলাম, "ঠাকুর না বলিলে আমি কোথাও এক পা যাইতে পারি না। আপনি ঠাকুরকে বলুন না।" স্ত্রীলোকটি ঠাকু-রকে যাইয়া বলিলেন, "তোমার ব্রহ্মচারী শিষ্যটিকে একবার আমার বাড়ী নিয়ে যেতে চাই।"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"ব্রহ্মচারীর ইচ্ছা হ'লে যাবে।"

ঠাকুরকে ছাড়িয়া পাঁচ মিনিটের জন্যও অন্যত্র যাইতে আমার ইচ্ছা হয় না। অথচ স্ত্রী-লোকটির বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধ দেখিয়া, আমি বিষম সমস্যায় পড়িলাম। ঠাকুর আমাকে অনুমতি দিয়াছেন, কোনও প্রকারে মনকে বুঝাইয়া উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলি-লাম। উহার বাড়ী পঁহুছিয়া দেখি, অন্য একটি লোকও ঐ বাড়ীতে নাই, মাত্র একটি ছোট ছেলে রহিয়াছে। বিধবাটি আমাকে বসিতে আসন দিয়া, জল খাবার আয়োজন করিতে লাগিলেন, আমি নিষেধ করাতে নিবৃত্ত হইলেন। পরে সম্মুখে বসিয়া নানা কথায় আমার পরিচয় নিতে লাগিলেন। উহার অস্বাভাবিক মমতা, হাসি, গল্প, চঞ্চলতা, দেখিয়া আমার সন্দেহ জন্মিল। কিন্তু সুন্দরী যুবতীর রূপলাবণ্য ও হাব ভাব দেখিয়া আমি যেন কেমন হইয়া পড়িলাম। আমার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। আমি থাকিব, কি যাইব, ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। অকস্মাৎ ভয়ে আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। আমি বিধবা-টিকে বলিলাম, "অনেকক্ষণ হয় আসিয়াছি, শীঘ্র আমাকে ঠাকুরের নিকট পঁহুছাইয়া দিন।

আমার অসুখ বোধ হইতেছে, বরং অন্যদিন আসিব।" স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কয়েক বার থাকিতে বলিয়া আর বিশেষ জেদ্ করিলেন না। রাস্তা দেখাইয়া দিলেন। আমি বাড়ী পঁহুছিয়া ঠাকুরের নিকটে নিজ আসনে যাইয়া বসিলাম।

ঠাকুর আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, ঃ—"কি, ব্রহ্মচারী, বেড়িয়ে এলে, বেশ ভাল লাগ্‌লো ?"

আমি বলিলাম, ঃ—"বিষম ভাল লাগ্‌ল, আমি কি আর জানি, এমন !"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"তা আবার জান না, না জেনেই কি গিয়েছিলে।"

আমি খুব লজ্জিত হইয়া বলিলাম, ঃ—"কি করিব উহার অনুরোধ ছাড়াইতে পারিলাম না। আমার তেমন একটা ইচ্ছা ছিল না।"

ঠাকুর একটু তেজের সহিত বলিলেন ঃ—"তবে গেলে কেন ? ধর্ম্মলাভ কর্‌তে ইচ্ছা হ'লে, লোকের অনুরোধ উপরোধ ছাড়্‌তে হবে, কিসে কার মনে কষ্ট হবে, কিসে কার মন রক্ষা হবে, এসব দিক তাকালে কখনও ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় না। ঠিক প্রাণের সরল আকর্ষণের দিকে তাকায়ে সমস্ত কার্য্য কর্‌তে হয়। কারও অনুরোধে কোথাও যাওয়া বা কোনও কার্য্য করা ঠিক নয়। ঐরূপ কর্‌লে উপকার না হ'য়ে, বরং অনেক সময় বিষম ক্ষতিই হয়। সহজভাবে প্রাণের আকর্ষণ মত কার্য্য ক'রে গেলে কোনও ক্ষতিই হয় না। অবশ্য এমনও ঘট্‌তে পারে যে, একজন লম্পটের উপর আকর্ষণ পড়্‌ল, আবার একজন সাধুর উপরও হ'ল না। সে সব স্থলে বুঝে নেওয়া বড়ই কঠিন, তা হ'লেও সরল ভাবে প্রাণের সহজ টানে কোন কার্য্য কর্‌লে, পরিণামে অমঙ্গল ঘটে না। যেই যত উন্নত হউন না কেন, স্ত্রীলোক হ'তে সকলকেই সর্ব্বদা তফাৎ থাক্‌তে হবে। এমন কি ঊর্দ্ধরেতাঃ হ'লেও, স্ত্রীলোক হ'তে বিষম অনিষ্ট হ'য়ে থাকে।"

ঠাকুরের এই সকল কথা শুনিয়া আমার বড়ই অভিমান হইল। ঠাকুরের উপরই একটু চাপ দিয়া আমি বলিলাম, "নিয়ত সদ্‌গুরুর সঙ্গলাভ করিয়াও এ সকল কু-প্রবৃত্তি আমার কিছুতেই গেল না।"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"সদ্‌গুরুর সঙ্গ! সেত অনেক দূরের কথা, সৎসঙ্গও তোমরা ঠিকমত করছ না। সৎসঙ্গ হ'লে সমস্ত কুপ্রবৃত্তি নষ্ট হ'য়ে যায়।"

আমি বলিলাম, ঃ—"আবার সৎসঙ্গ কিরূপে কর্‌তে হয়? সৎসঙ্গ কা'কে বলে?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"**সাধুর সঙ্গে দশটা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলাই সৎসঙ্গ নয়। সাধুর নিকটে থেকে তাঁর সমস্তগুলি কার্য্য কলাপ, আচার ব্যবহার, খুব ধৈর্য্যের সহিত ধীর ভাবে দেখে যেতে হয়। কখন তিনি কি করেন, কার সঙ্গে কোন্ অবস্থায় তিনি কিরূপ ব্যবহার করেন, তিনি কি প্রকারে সময় অতিবাহিত করেন, সাধুদের এ সমস্ত কার্য্যে নিয়ত মনোযোগ থাক্‌লে, চিত্ত তাতে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে। ধীরে ধীরে, নিজের দিকে যাহা কিছু ত্রুটি আছে, ধরা পড়ে ও তাতে ধিক্কার জন্মে। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির এ সমস্ত বিকৃত ভাবও নষ্ট হ'য়ে যায়।**"

বাবলায় অপ্রাকৃত হরিসংকীর্ত্তন।

২৩ শে কার্ত্তিক রবিবার। ঠাকুর এখানে আছেন খবর পাইয়া, কলিকাতা হইতে কয়েকটী গুরুভ্রাতা গতকল্য শান্তিপুর আসিয়াছেন। প্রত্যূষে আমরা সকলেই গঙ্গাস্নানে গেলাম, গঙ্গা বহুদূরে, চড়াতে পঁহুছিয়াও প্রায় এক মাইল চলিতে হয়।

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"**বড় রাস্তার উপরে, যে স্থানে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব প্রতিষ্ঠিত আছেন, কিছুকাল পূর্ব্বেও গঙ্গা সেই স্থানে ছিলেন।**"

আহারান্তে আমরা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে অদ্বৈতপ্রভুর ভজন-স্থান দেখিতে বাবলাতে চলিলাম। অনেক দূর চলিয়া আমরা একটি খাল পাইলাম।

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"**এই খাল এক সময়ে গঙ্গা ছিল।**"

সন্ধ্যার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আমরা বাবলাতে পঁহুছিলাম। একটি বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী অদ্বৈত প্রভুর মন্দিরে সেবক রহিয়াছেন। বাবাজীর বিনয়, ভক্তি, ও সেবা নিষ্ঠা দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। স্থানটি অতিশয় নির্জ্জন, গঙ্গা হইতে এখন বহুদূরে। এক সময় গঙ্গা এই মন্দিরেরই ধার দিয়া প্রবাহিতা ছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে আমরা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে বসিলে,

ঠাকুর আমাদিগকে বলিলেন ঃ—"**স্থানের প্রভাব বড়ই চমৎকার। একটু স্থির হ'য়ে ব'সে নাম কর্‌লেই বুঝতে পার্‌বে।**"

আমরা সকলেই স্থিরভাবে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরেই শুনিতে পাইলাম, বহুদূর হইতে যেন খোল, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টা ও মুহুর্মুহুঃ শঙ্খধ্বনি

সংযোগে একটি মহা সংকীর্ত্তন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ভাবিলাম, ঠাকুর এস্থানে আজ উপস্থিত জানিয়াই বুঝি আশপাশের লোক সংকীর্ত্তন লইয়া এস্থানে আসিতেছেন। আমরা খুব উৎসাহের সহিত নাম করিতে লাগিলাম। সংকীর্ত্তন ধ্বনিতে আমাদের চিত্ত নাচিয়া উঠিল। দুই এক মিনিট অন্তরেই, সংকীর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছে সুস্পষ্ট বোধ হওয়াতে, আমরা কেহ কেহ আসন ছাড়িয়া সংকীর্ত্তনে যোগ দিতে মন্দিরের বাহির হইয়া পড়িলাম। এবং অদূরেই সংকীর্ত্তন হইতেছে বুঝিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অদ্ভুত ভগবানের খেলা, ঠাকুরকে ছাড়িয়া যতই আমরা সংকীর্ত্তনে যোগ দিবার আকাঙ্খায় চলিতে লাগিলাম, ততই সংকীর্ত্তন-ধ্বনি ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া দুই এক মিনিটের মধ্যে একবারেই বিলুপ্ত হইয়া গেল। আমরা ঠাকুরকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সংকীর্ত্তনের মহা কোলাহল শুনিয়া তাহাতে যোগ দিবার আকাঙ্ক্ষায় যেমন আমরা মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম, জানিনা, অকস্মাৎ কি প্রকারে সেই সংকীর্ত্তন মুহূর্ত্তমধ্যে কোন্ দিকে চলিয়া গেল।"

এই সংকীর্ত্তন সম্বন্ধে ঠাকুর বলিলেন ঃ—"ছেলেবেলা প্রায়ই আমি বাবলায় আস্‌তাম। এই সংকীর্ত্তন শুন্‌তাম, তখন একবার এদিক, একবার ওদিক ছুটাছুটি ক'রতাম। স্থির হ'য়ে ব'সে নাম ক'রলেই, ক্রমে ওতে আরও যোগ দিতে পার্‌তে, এই সংকীর্ত্তন সাধারণ কীর্ত্তন নয়। তোমরা খুব ভাগ্যবান, মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনের ধ্বনী শুনেছ।"

আমরা শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম, সমস্তই ভগবান গুরুদেবের কৃপা। তাঁরই কৃপাতে সেই অপ্রাকৃত মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনের আভাস পাইলাম। কুবুদ্ধি বশতঃ ঠাকুরের নিকট হইতে দূরে যাইতেই তাঁর অপরিসীম কৃপার ফল মুহূর্ত্ত মধ্যে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ধন্য গুরুদেব! তোমার কৃপা ব্যতীত সমস্ত অলৌকিক অবস্থা, অদ্ভুত দৃশ্য ও অপ্রাকৃত আনন্দকেও কিছুই যেন মনে করিনা, এই আশীর্ব্বাদ করিও। বাবাজী, ঠাকুরকে অদ্বৈত-প্রভু বলিয়া বহু স্তবস্তুতি করিলেন। বাবজীর নিষ্কপট শ্রদ্ধাভক্তি দেখিয়া বড়ই ভাল লাগিল। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"হিন্দুস্থানী বাবাজী এখানে আসিয়া রহিলেন কিরূপে? কতকাল যাবৎ এখানে আছেন?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"কতকাল যাবৎ আছেন বলিতে পারিনা। বহুকাল হ'তেই বাবাজীকে এই অবস্থায় দেখে আস্‌ছি। অল্প বয়সে ইনি অকস্মাৎ এখানে

এসে পড়েন, অদ্বৈত প্রভুর বিশেষ কৃপা লাভ ক'রেই এস্থানে প'ড়ে আছেন। এরূপ মরার মত প'ড়ে না থাক্‌লে কি আর ধর্ম্মলাভ হয়? ধর্ম্ম কি আর এমনই সহজ জিনিস? অভিমান শূন্য হ'তে হবে। বৃক্ষের যেমন বীজ না প'চ্‌লে তা হ'তে অঙ্কুর বে'র হয় না, মানুষেরও অভিমানটি একেবারে নষ্ট না হ'লে, ধর্ম্মের অঙ্কুরই জন্মায় না। অভিমান যতকাল আছে, ততকাল প্রকৃত ধর্ম্মের নাম গন্ধও নাই; এ নিশ্চয় জান্‌বে, জীয়ন্তে মৃত হ'তে হবে।"

হিমালয়ে গুরু অন্বেষণ ও মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার।

২৪শে কার্ত্তিক সোমবার। আহারান্তে ঠাকুরের নিকট বসিয়া আমরা শান্তিপুরের অনেক কথা ঠাকুরের মুখে শুনিতে লাগিলাম। কথা প্রসঙ্গে সুবিধা পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বারদির ব্রহ্মচারী মহাশয়ের জন্মস্থান শুনিয়াছি এই শান্তিপুরেই ছিল? শান্তিপুরের আরও কোন প্রাচীন মহাত্মা এখন আছেন কি?"

ঠাকুর বলিলেন:—"জীবিত আছেন কিনা বলিতে পারিনা, তবে হিমালয়ের উপরে একটি মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছিলাম, তিনি ব'লেছিলেন তাঁহারও জন্মস্থান এই শান্তিপুরে।"

ঠাকুর, কখন কি ভাবে তাঁর দর্শনলাভ করিয়াছিলেন, জানিতে আমাদের কৌতূহল হইল। জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিতে লাগিলেন:—"গুরু নির্দ্দিষ্ট র'য়েছেন, সময়ে লাভ হবে, পুনঃ পুনঃ এরূপ কথা মহাত্মাদের মুখে শুনে আমি গুরুর অনুসন্ধানে অস্থির হ'য়ে পাগলের মত ছুটোছুটি করতে লাগ্‌লাম। সেই সময়ে, আমি হিমালয়ে উঠে, বহু দুর্গম স্থানে, লামা গুরুদের মঠে মঠে ঘুর্‌তে লাগ্‌লাম। কয়েকটী বৌদ্ধ যোগীর মুখে শুন্‌তে পেলাম, ঝরণার উপরে গভীর অরণ্যের ভিতর একটী গোফার সন্নিকটে, এই পর্ব্বতের উচ্চশৃঙ্গে, একটী বাঙ্গালী মহাপুরুষ বহুকাল আছেন। প্রায় অহোরাত্র তিনি সমাধিস্থই থাকেন। সময় সময় প্রয়োজন মত শিষ্যেরা নিকটবর্ত্তী গোফা হ'তে বে'র হ'য়ে এসে, তাঁকে চৈতন্য করান। মহাপুরুষের খবর পেয়ে তাঁর দর্শন আকাঙ্ক্ষায়, আমি অত্যন্ত অস্থির হ'য়ে পড়্‌লাম।

হিমালয়ের উপরে নিবিড় অরণ্যের ভিতর দিয়ে অজ্ঞাত পথে মহাপুরুষের উদ্দেশে চল্‌তে লাগ্‌লাম। দুইদিন দুইরাত্রি আমার আহার নিদ্রা একেবারে ছিল না। তৃতীয় দিনে ক্ষুধা পিপাসায় শরীর এত অবসন্ন হ'ল যে, একটী বৃক্ষ-মূলে আমি সংজ্ঞাশূন্য হ'য়ে পড়্‌লাম। ভগবানের অদ্ভুত দয়া। একটী উলঙ্গ, দীর্ঘাকৃতি পর্ব্বত-বাসী বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আমাকে এসে সুস্থ কর্‌লেন। পরে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ আমার হাতে দিয়ে বল্‌লেন, "বাচ্ছা, এহি দানা পায় লেও, ভুখ্‌ পিয়াস্‌ ছুট্‌ যায়েগা, পর্ব্বত্‌পর যেত্‌না রোজ রহোগে, দুএক দানা পায় লিও, ভুখ্‌ পিয়াস কভি নেহি হোগা।" এই বলিয়া তিনি আমাকে কতকগুলি সর্‌-ষের দানার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ দিলেন। আমি দুই একটি দানা খেতেই ক্ষুধা পিপাসা ও পথশ্রান্তি একেবারে দূর হ'য়ে গেল। ঐ বীজ অনেক দিন আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল, পাহাড়ে আমি যতকাল ছিলাম, ঐ বীজ দুই একটী প্রয়োজন-মত সময় সময় খেতাম; পাহাড়বাসী সন্ন্যাসীকে ঐ মহাপুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বল্‌লেন, "হাঁ, বাঙ্গালী এক বড়া ভারী মহাত্মা পর্ব্বতকা উপর্‌মে রহতে হ্যাঁয়। কভি কভি নীচুমে আয়কে ঝরণামে আসনান্‌ কর্‌কে বিজ্‌লিকা মাফিক্‌ তুরন্ত্‌ চলে যাতে। লম্বা লম্বা জটা, পানি ঝর্‌ ঝর্‌ গিরতী হ্যায়। এয়সে চলে যাও, মিল যায়গা? এই ব'লে তিনি ঐ অরণ্যের ভিতর প্রবেশ কর্‌লেন। আমি ঐ পথ ধ'রে চল্‌তে চল্‌তে মহাপুরুষের নিকটে উপস্থিত হ'লাম। দুটি শিষ্য নিয়ত তাঁর সেবায় র'য়েছেন দেখ্‌লাম। মহাপুরুষ অনাবৃত স্থানে প্রস্ত-রের উপরে একভাবে একাসনে সমাধিস্থ হ'য়ে থাকেন। রাত্রিতে বরফে মহাপুরু-ষের সর্ব্বাঙ্গ একেবারে ঢেকে যায়। পরদিন সকালে বরফের স্তূপ ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। পরে যেমন বেলা হ'তে থাকে, বরফ গ'লে গ'লে ক্রমে ক্রমে মহাপুরুষের কলেবরও প্রকাশ পে'তে থাকে। শিষ্যেরাও ঐ সময়ে মহাপুরুষের সম্মুখে আগুন জ্বেলে তাপ দিতে আরম্ভ করেন। এবং অবসর বুঝে সময় সময় খুব গরম গরম চা মুখে ঢেলে দেন। বেলা প্রায় ১১টার সময় মহাপুরুষের বাহ্যজ্ঞান হয়।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"হিমালয়ের উপরেও সাধুরা চা খান ? চা তাঁরা কোথায় পান ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"হিমালয়ের উপরে যে সকল বৌদ্ধযোগী, মহাত্মারা আছেন, নিয়তই তাঁদের ধুনিতে চায়ের জল চড়ান থাকে। দশ পনর মিনিট অন্তর অন্তর তাঁরা একটু একটু চা খেয়ে থাকেন। সেই চা আমাদের চায়ের মত নয়। ঐ চায়ের গাছ খুব বড় হয়। সাধুরা পাতা এনে শুকায়ে রাখেন। পাতাগুলিও খুব বড় বড় হয়।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"চায়ে কি তাঁরা দুধ দেন না ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"হাঁ, খুব উৎকৃষ্ট দুধ দেন। পালানে দুধ ভার হ'লেই পাহাড়ের গাভীরা এক একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে দুধ ছেড়ে যায়। ঐ সকল দুধ বরফময় প্রস্তরে পড়া মাত্রেই, জমাট হ'য়ে যায়। সাধুরা ঐ সকল দুধ চিমটা দিয়ে খুঁড়ে নিয়ে আসেন। গরম জলে ফেল্‌লেই উৎকৃষ্ট দুধ হয়। চায়েতে তাঁরা মিষ্টি দেন না। প্রয়োজন হ'লে তা'ও অনায়াসে সংগ্রহ কর্‌তে পারেন। ইক্ষুরসের মত মিষ্টরসযুক্ত লতা পাতা, পাহাড়ে বিস্তর জন্মায়, সাধুরা সে সকলেরও সন্ধান রাখেন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"মহাপুরুষ কি কোন কথাই বলিলেন না !"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"হাঁ, খুব বল্‌লেন, নিজের সমস্ত পরিচয় দিলেন। অল্প বয়সে উপনয়নের পরই, একটি সন্ন্যাসীর সঙ্গ পেয়ে তিনি গৃহ ছেড়ে চ'লে যান। তিনি অনেক উপদেশ দিয়ে অবশেষে এই বল্‌লেন, "বীর্য্যধারণ ও সত্য রক্ষা এই দুটি ঠিক হ'লেই, ক্রমে যোগিজনদুর্ল্লভ "ব্রহ্মপদ" লাভ হয়। বীর্য্যধারণ ও সত্যরক্ষা না হ'লে কিছুই হয় না। বীর্য্যধারণ যেমন শরীর রক্ষা বিষয়ে একপক্ষে সর্ব্বপ্রধান কারণ, সত্যও আত্মরক্ষা বিষয়ে ঠিক তদ্রূপ। অসত্য চিন্তা, অসত্য ব্যবহার, যোগসাধন বিষয়ে বিষম অনিষ্টকর। মিথ্যা কথা বলা যেমন মহাপাপ, মিথ্যা কল্পনা করাও ঠিক সেইরূপ, যাঁরা যোগপথে চল্‌বেন, যাবতীয় কার্য্যেই তাঁদের সত্যের সঙ্গে যোগ থাকা চাই। নাটক নভেল প্রভৃতি যাহার মূলই অসত্য, মিথ্যা, তা শোনা বা পড়া যোগ শাস্ত্রে নিষেধ। অসত্য চিন্তা

মহাপাপ জানবে। ওতে মস্তিষ্ক নষ্ট করে। ভগবানই সত্য, ভগবৎ চিন্তাতে মস্তিষ্কের শক্তি সকল দিকেই এত বৃদ্ধি করে যে, তাহা বলা যায় না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম :—"সাধু মহাত্মাদের সঙ্গলাভ হ'লে, তাঁহারা যে সকল উপদেশ দিবেন, সেইমত কি আমরা চলিতে পারি?"

ঠাকুর বলিলেন :—"হাঁ, ইচ্ছা হ'লে খুব পার। যেখানে সত্য, যেখানে ন্যায়, সেখানেই আমাদের অধিকার আছে। সকল স্থানে, সকলেরই কাছে, আমরা শিক্ষালাভ করতে পারি, তাতে কোনও নিষেধ নাই। তবে প্রয়োজনও কিছুই নাই। এই সাধন ধ'রে চলতে পারলে ক্রমে সমস্তই লাভ হবে। কিছুরই অভাব থাকবে না। অন্যের উপদেশ মত চলতে গেলে, অনেক সময় ক্ষতিও হ'য়ে থাকে। নিষ্ঠার দিকেও অনিষ্ট করে। অনেকেই নিজ মতে টেনে নিতে চেষ্টা করেন, এ'তো প্রায়ই দেখা যায়।"

জাতিভেদ সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর।

২৫—২৯শে কার্ত্তিক
মঙ্গলবার—শনিবার

এখানে আসিয়া আমার দুদিন হোম বন্ধ ছিল। এখন নিত্য হোম করিতেছি। আজ হইতে ঠাকুর আমাকে আবার স্বপাক আহার করিতে বলিলেন। নানাপ্রকার অসুবিধাতেও আমি স্বপাক আহারের সমস্ত আয়োজন করিয়া নিলাম। ঠাকুরের সঙ্গে অপরাহ্ণে আর বেড়াইতে সুবিধা পাইব না ভাবিয়া, বড়ই দুঃখ হইল। দেখিতেছি এই উৎপাত না থাকিলেই ভাল ছিল। ভাবিলাম, গুরুকুলে বাস করিতেছি, গুরুপরিবারের ব্রাহ্মণকন্যাই রান্না করিতেছেন, ঠাকুরের ভোগ হইতেছে, কোনও প্রকার অনাচারেরই সম্ভাবনা নাই, এখানে আবার স্বপাক! ইহার তাৎপর্য্য কি? লোকসমাজে যে প্রকার জাতিভেদ প্রচলন রহিয়াছে, আমার প্রতি ব্যবস্থাতো দেখিতেছি তাহা অপেক্ষাও বহুগুণে সঙ্কীর্ণ। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক অবস্থায়, ঠাকুর সাধারণের অন্তর হইতে জাতি-বুদ্ধির মূল উৎপাটন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও ব্যবহারিক জাতিভেদের আঁটাআঁটী, ঠাকুরের কার্য্য কলাপে ততটা দেখিতে পাইতেছি না। তবে আমার উপরই বা এত কঠোর নিয়মের আদেশ কেন? ঠাকুরের মুখ হইতে কোনও প্রকারে একবার জাতিভেদের একটু দোষ প্রকাশ হইলেই, আমার পক্ষে এ সকল জাতিবুদ্ধির সঙ্কীর্ণতা-পূর্ণ কঠোরতার যে ব্যবস্থা, তাহা একেবারে উল্টাইয়া লইব, স্থির

করিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আমাদের দেশে যে একটা জাতিভেদ প্রথা আছে, তা কি থাকা ভাল ?"

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ—"জাতিভেদ প্রথা শুধু আমাদের দেশে কেন, সে-তো সর্ব্বত্রই র'য়েছে। প্রকৃতিগত জাতিভেদ শুধু মনুষ্য সমাজে নয়, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা, সকলেরই ভিতরে আছে, দেখ্‌তে পাবে। এই জাতিভেদ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভরা। কোথাও ইহা কেহ অতিক্রম কর্‌তে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে যে জাতিভেদ এদেশে প্রচলিত র'য়েছে, তাহা সমাজগত। কোনও দেশে বা ব্যবসাগত, আবার কোথাও বা মর্য্যাদাগত বা অবস্থাগত দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যে ভাবেই হউক না কেন, জাতিভেদ সকল দেশেই, মনুষ্যসমাজে সকল জাতির ভিতরেই আছে। কিন্তু ঋষিরা যে জাতিভেদের উল্লেখ ক'রে গিয়েছেন, তাহা অন্য প্রকার, তাহা গুণগত। সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ ভেদে যে জাতিভেদ, তাই ঋষিরা স্বীকার ক'রেছেন, তাহাই স্বাভাবিক। সে হিসাবে, এখন শূদ্র জাতির ভিতরে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ জাতির ভিতরেও বিস্তর শূদ্র দেখা যায়। সামাজিক জাতি একপ্রকার, আর প্রকৃতিগত জাতি অন্যপ্রকার। পরমহংস অবস্থা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত, কেহই এই জাতি-বুদ্ধি ত্যাগ করতে পারে না। উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট বুদ্ধি থাক্‌লেই, সেখানে জাতি-বুদ্ধি থাক্‌বে। হিংসা, লজ্জা, মান, অপমান, ভাল-মন্দ বুদ্ধি, যতকাল আছে, মানুষ ততকাল কোন প্রকারেই জাতিভেদ অতিক্রম কর্‌তে পারে না। যার তার হাতে খেলেই, জাতি-বুদ্ধি যায় না ; বরং তাতে আরও বিষম অনিষ্টই হ'য়ে থাকে। যার পাক করা অন্ন আহার করা হয়, তার শারীরিক মানসিক সমস্ত ভাব, আহার্য্য বস্তুর সঙ্গে ভোজনকারীর ভিতরে সংক্রামিত হ'য়ে থাকে। সাধারণ চক্ষে মানুষ তা দেখ্‌তে পায় না বটে, কিন্তু এ অতি সত্য, এ সকল এক বিষম সমস্যা।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"কোন্ অবস্থা লাভ করিলে, যার তার হাতে খাওয়ায় কোন অনিষ্ট হয় না ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"যে অবস্থা লাভ কর্‌লে মানুষ সমস্ত বস্তুতে একেরই

অস্তিত্ব দর্শন করেন। যিনি নিত্যশুদ্ধ, মঙ্গলময়, পতিতপাবন, যাঁর নামেতে মহাপাপী উদ্ধার হ'য়ে যায়, তিনি যেখানে অবস্থান কর্‌ছেন, প্রত্যক্ষ হয়, তা কি কখনও আর অপবিত্র মনে করা যায়? বিষ্ঠাতে চন্দনেতে যিনি নিজের সেই ইষ্টদেবতারই অধিষ্ঠান প্রকাশিত দেখ্‌তে পান, তিনি কি তা পরম পবিত্র তীর্থ মনে না ক'রে থাক্‌তে পারেন? বস্তুবিশেষে তার আর ভেদবুদ্ধি হবে কি ক'রে? এ প্রকার পরমহংস অবস্থা লাভ হ'লে, সর্ব্বত্র সকল কার্য্যেই তিনি ভগবল্লীলা দর্শন করেন, সর্ব্বত্রই তিনি অমৃত ভোজন করেন, তাঁর কথা স্বতন্ত্র। তা না হ'লে যতকাল ভেদবুদ্ধি আছে, ততকাল মুচি, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ একাকার ক'রে, যার তার হাতে খেলেই জাতিভেদ যায় না। ভিতর হ'তে জাতি-বুদ্ধি যাওয়া সহজ কথা নয়, বড়ই কঠিন।"

প্রসাদ সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর ও শ্যামাক্ষেপার কথা।

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম :—"সাধারণের পক্কান্ন ভোজনে যে অনিষ্ট ঘট্‌বার সম্ভাবনা বল্‌লেন, ঠাকুরের প্রসাদ ভোজনেও কি সেইরূপ অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে?"

ঠাকুর বলিলেন :—"প্রসাদ ভোজন্‌তো মহাভাগ্যের কথা, তাতে পরম কল্যাণই হ'য়ে থাকে, কিন্তু রান্না ক'রে ঠাকুরের নিকটে ধ'রে দিলেই যে, ঠাকুর তা গ্রহণ কর্‌বেন, আর প্রসাদ হ'বে, তাতো নিশ্চয় বলা যায় না। বহুকাল পূর্ব্বে বাল্যাবস্থায় এই শান্তিপুরে একটী মহাত্মাকে দেখেছি, সকলে তাঁকে 'শ্যামাক্ষেপা' বলে ডাক্‌ত। শ্যামাক্ষেপা কোন্ সম্প্রদায়ের সাধু ছিলেন, তা তাঁর চাল-চলন, আচার-ব্যবহারে বা কথা-বার্ত্তায় বুঝ্‌বার যো ছিল না। একস্থানে তিনি কখনও থাক্‌তেন না। প্রায় নিয়তই রাস্তায় রাস্তায়, গলিতে গলিতে, পাগলের মত ঘুরে বেড়াতেন। আহারের জন্য, ঠাকুরের ভোগ সর্‌বার সময় বুঝে, অকস্মাৎ শ্যামাক্ষেপা কোনও বাড়ী যেয়ে উপস্থিত হ'তেন। অনেক সময়ে মেয়েদের অসাবধানতা বশতঃ ভোগ রান্না সময়ে কোনও প্রকার অনাচার হ'য়ে পড়্‌লে, প্রসাদ না পেয়েই শ্যামাক্ষেপা উঠে পড়্‌তেন; এবং গাল্ দিয়ে ব'লে যেতেন, 'আরে, ভোগে এই গন্ধ পাচ্ছি, রান্নার সময় রান্ধুনি এই ক'রেছিল, এই হ'য়েছিল,

আজ ইহা প্রসাদ হয় নাই, ঠাকুর যে সেবা করেন নাই,অনাহারে র'য়েছেন। শীঘ্র গিয়ে আবার রান্না ক'রে দে।' আশ্চর্য্য এই যে, তিনি যেমন যেমনটী ব'লে যেতেন, অনুসন্ধানে জানা যেত, তা যথার্থ। মেয়ে ছেলেরা লজ্জায় ম'রে যেত। শ্যামা-ক্ষেপা কখন কার বাড়ী যেয়ে প্রসাদ পেতে উপস্থিত হন, এই ভয়ে মেয়েরা সশঙ্ক থাক্‌তেন, এবং অত্যন্ত সাবধান হ'য়ে ব্যবস্থা মত ভোগ রান্না কর্‌তেন। আমাদের বাড়ীতেও একবার এরূপ ঘটনা ঘটেছিল। ঠাকুরের প্রসাদ পাওয়া ব্যতীত লোকালয়ে যাবার তাঁর আর কোন প্রয়োজনই ছিল না।

শান্তিপুর নিবাসী কোন একটী গোস্বামী, একবার পুরীধাম হ'তে লিখে জানালেন, 'শ্যামাক্ষেপা শ্রীক্ষেত্রে কিছুদিন যাবৎ এসেছেন। প্রায়ই তাঁকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে দেখ্‌তে পাই।' অথচ দেখা গিয়েছিল, শ্যাপাক্ষেপা সেই সময়ে শান্তিপুরেই ছিলেন। শ্যামাক্ষেপা আমাকে দেখ্‌তে পেলে, ছুটে এসে ধরে ফেল্‌তেন, কয়েক সেকেণ্ড্ ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকায়ে থেকে বল্‌তেন,"কাল কুচকুচে", "লাল টুক্‌টুকে", "সাদা ধপ্‌ধপে," "আর এই হলদে কিরে ভাই, আর এই হলদে কিরে ভাই" পুনঃ পুনঃ এইরূপ ব'লে এক দিকে ছুটে অদৃশ্য হ'তেন। কিছুকাল পরে শ্যামাক্ষেপা কখন কোথায় যে চ'লে গেলেন, তাঁর আর খোঁজ খবর পাওয়া গেল না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"সন্ন্যাস গ্রহণ না কর্‌লে, ঘরে থেকে কি কেহ এ প্রকার পরমহংস অবস্থা লাভ কর্‌তে পারে না ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"হাঁ, খুব পারে। ভিতরে সমস্ত বাসনা কামনা থাক্‌তে, সাময়িক উৎসাহে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে, কঠোর বৈরাগ্যের পথে চলা বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নয়। দুর্গের ভিতরে থেকে যেমন নিরাপদে যুদ্ধ করা যায়, সংসারে থেকেও সেই প্রকার বৈধ উপায়ে কর্ম্মক্ষয় করা সহজ, কর্ম্মক্ষয় না হ'লেত কিছুই হবার যো নাই। সন্ন্যাস একটা কথার কথা নয়, বা মত নয়, মানুষের ভিতরেরই একটা অবস্থা ; ভগবানে সম্যক্ প্রকারে আত্মসমর্পণই সন্ন্যাস।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"উৎপাতশূন্য স্থানে থাকিয়া নিরুদ্বেগে ভগবানের উপাসনা করিতে হয় শুনিয়াছি। সংসারে নানাপ্রকার বিষম প্রলোভনের মধ্যে, বাঘ

মহিষের সঙ্গে লড়াই করিয়া যাঁহারা স্থিরভাবে ভগবদুপাসনা করিতে অসমর্থ, তাঁহারা কি করিবেন ?”

ঠাকুর বলিলেন ঃ—“সম্মুখ যুদ্ধ আর কয়জনে কর্‌তে পারে ? বীরত্বের পরিচয় দেওয়াতো আর ভগবদুপাসনার তাৎপর্য্য নয় ? সংসারের প্রলোভন অতিক্রম ক'রে নিরুপদ্রবে যাঁরা ভজন সাধন কর্‌তে না পারেন, তাঁরা অবশ্যই অন্য উপায় নিবেন। সংসারে থেকে ধর্ম্ম করা উচিত, লোকে বলে বটে, কিন্তু যাঁরা তা না পারেন, নিজকে নিতান্ত দুর্ব্বল মনে করেন, তাঁরা যে অবস্থায় যেখানে যেয়ে ধর্ম্মলাভ কর্‌তে পারেন তাই কর্‌বেন। এ ভিন্ন আর উপায় কি ? সকল-কেই যে এক পথ ধ'রে চল্‌তে হবে, এরূপও কিছু নয়। প্রকৃতি ভেদে, অবস্থা ভেদে, পথও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অবলম্বন করা আবশ্যক হ'য়ে থাকে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—“সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেও কি আবার সাধারণ কর্ম্মবন্ধন থাকে ?”

ঠাকুর বলিলেন ঃ—“বাড়ী-ঘর, টাকা-কড়ি, বিষয়-সম্পত্তি, এ সকলকে সংসার বলে না। এ সকল ত্যাগ কর্‌লেই সন্ন্যাসী হয় না। দেহাত্মবুদ্ধিই সংসার। এই দেহাত্মবুদ্ধি নষ্ট না হ'লে, সমস্তই বিড়ম্বনা। যতদিন পর্য্যন্ত মানুষের যথার্থ বৈরাগ্য না জন্মে, ততদিনই কর্ম্ম থেকে যায়। বাহিরে একটা সন্ন্যাস গ্রহণ করুন আর নাই করুন, কর্ম্ম কর্‌তেই হবে। ভগবানকে লক্ষ্য রেখে কর্ম্ম ক'রে গেলে, অচিরে সেই কর্ম্ম শেষ হ'য়ে যায়।”

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—“জীব যখন পরাধীন, নিজ ইচ্ছায় কিছু করে না, তখন তার আবার বন্ধন কেন ?”

ঠাকুর বলিলেন ঃ—“জীব সম্পূর্ণরূপে পরাধীন হ'লেও, বাসনা কামনা যা কিছু তার মনে নিয়ত উঠ্‌ছে, তাই তার বন্ধনের হেতু হয়। এই বাসনাই কর্ম্ম, এতো আর স্বাধীন পরাধীনের অপেক্ষা রাখে না। আত্মার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, বাসনা, কামনা ক্ষয় হয়। উহা ক্ষয় হবার সময় বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়।”

শান্তিপুরের রাস।

৩০শে কার্ত্তিক
রবিবার,
১৫ই নবেম্বর,

আজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা। সকাল বেলা হইতেই সমস্ত শান্তিপুরবাসীরা, ভগবানের রাসোৎসব স্মরণ করিয়া যেন নাচিয়া উঠিলেন। সকল গোস্বামী প্রভুদের বাড়ীতেই, কোথাও শ্যামসুন্দর, কোথাও রাধাগোবিন্দ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ সমস্ত বহুকাল যাবৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আজ তাঁহারা আপন আপন বাড়ীর ঠাকুরকে পরিপাটি করিয়া সাজাইতে, পরম উৎসাহ সহকারে নিযুক্ত হইয়াছেন। শান্তিপুরে আজ আনন্দের সীমা নাই।

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"ঢাকার জন্মাষ্টমী, শ্রীবৃন্দাবনের দোল-যাত্রা, অযোধ্যার ঝুলন, এবং শান্তিপুরের রাস-যাত্রা দেখ্‌বার জিনিস। এর তুলনা আর কোথাও নাই। চক্ষে যাঁরা না দেখেছেন, কিছুতেই তাঁদের বুঝান যায় না। এ সকল উৎসবে যাঁরা যোগদান করেন, তাঁদের ভিতরের সমস্ত অশান্তি, উদ্বেগ নষ্ট হ'য়ে গিয়ে, চিত্ত প্রফুল্ল হ'য়ে ওঠে।"

সন্ধ্যার সময়ে আমরা সকলে, রাসোৎসব দেখিতে বাহির হইলাম। ঠাকুর প্রথমে নিজ বাড়ীর প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিতে, মন্দিরপ্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া শ্যামসুন্দরের পানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া, ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দর দর ধারে চক্ষের জল পড়িয়া ঠাকুরের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। প্রায় ১৫।২০ মিনিট কাল একভাবে অবিশ্রান্ত কান্দিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। একটু স্থির হওয়ার পর শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করিয়া, মন্দির হইতে বাহির হইলেন। বড় রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া আমরা রাসযাত্রা দেখিতে লাগিলাম। বিগ্রহ সকলের বহুমূল্য বেশভূষা ও সজ্জার পারিপাট্য দেখিয়া, আমি অবাক হইয়া গেলাম। আহা! যদি কেহ যথার্থই ভগবদ্ বুদ্ধিতে আপন ঠাকুরকে এ সকল ঐশ্বর্য্যে সাজাইয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি ধন্য হইয়া গিয়াছেন। আমিত এ সকল পুতুলখেলায় অনর্থক বিপুল অর্থব্যয়ের আড়ম্বর দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যাইতেছি।

ঠাকুরের মুখে শ্যামসুন্দরের কথা।

একটু অধিক রাত্রিতে ঠাকুর নিজবাড়ীর শ্যামসুন্দরের কথা বলিতে লাগিলেন।

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"একবার শ্যামসুন্দর এসে আমাকে বল্লেন, 'ওরে, আমি

সোণার চূড়ো পর্‌বো, আমাকে একটি চূড়ো গড়িয়ে দেনা।' আমি বল্‌লাম, 'আমি তোমাকে বিশ্বাস টিশ্বাস করি না ; যারা করে, তাদের গিয়ে বল। আমি টাকা কোথায় পাব ?' শ্যামসুন্দর বল্‌লেন, 'দ্যাখ্‌, তোর খুড়িমাকে বল্‌গে, তার ঝাঁপির ভিতরে টাকা আছে। তা নিয়ে নে-না ?' পরে খুড়িমাকে এ বিষয় বলাতে, খুড়িমাও বল্‌লেন, 'ওরে ! কাল্ শ্যামসুন্দর এসে আমাকে স্বপ্নে বল্‌লেন, 'ওগো আমাকে চূড়ো গড়িয়ে দেনা।' আমি বল্‌লাম, 'আমি কোথায় টাকা পাব ? আমারতো কিছু নাই !' শ্যামসুন্দর বল্‌লেন 'ওগো ! ৪০।৫০ টি টাকা কি তুই আর দিতে পারিস্ না ? দেখ্‌না, না পারিস্ তো বিজয়কে বল্‌গে, সে দেবে।' খুড়িমা এই ব'লে খুব কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, আর বল্‌লেন, '৬৭৲ টি টাকা আমি অতি গোপনে রেখেছিলেম, তা কেউ জানে না।' ঐ টাকা খুড়িমা দিয়েছিলেন, আমি সেই টাকা দিয়ে ঢাকা হ'তে সোণার চূড়ো গড়িয়ে দিই। আজ শ্যামসুন্দর সেই চূড়ো প'রেছেন। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে, আমি যখন এই ছাদের উপর গিয়েছিলাম, তখন শ্যামসুন্দর উঁকি মেরে দেখে আমাকে বল্‌লেন, 'ওরে একবার দেখে যানা, চূড়ো প'রে আমি কেমন সেজেছি।' আমি বল্‌লাম, 'আমি আর কি দেখব, আমিত আর তোমাকে মানি না !' শ্যামসুন্দর বল্‌লেন, 'তাতে আর কি ? নাই বা মান্‌লি, একবার দেখ্‌তেও কি দোষ !' পরে আমি শ্যামসুন্দরের কাছে যেয়ে তাঁর স্নেহমাখা স্নিগ্ধ-দৃষ্টি, উজ্জ্বল রূপের ছটা দেখে, একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে পড়্‌লাম। শ্যামসুন্দর একটু হেঁসে বল্‌লেন, 'এ কি ! তুই না আমাকে বিশ্বাস করিস্ না !' আমি বল্‌লাম, 'ঠাকুর, আমার উপর তোমার এতই যদি দয়া, তবে আর এত কাল এত ঘুরালে কেন ? সমস্ত ভাঙ্গিয়ে চুরিয়ে বিষম কালাপাহাড় করেছিলে কেন ?' শ্যামসুন্দর বল্‌লেন, 'তাতে আর তোর কি ! ভেঙ্গেও ছিলেম আমি, এখন আবার গ'ড়েও নিচ্ছি আমি, তোর তাতে আর কি হ'য়েছে ? ভেঙ্গে গড়্‌লে আরো কত সুন্দর হয় জানিস্ ?"

ঠাকুর বলিলেন :—"প্রচারক অবস্থায় সময় সময় মাঠাকুরাণীকে দেখ্‌তে আমি বাড়ী আস্‌তাম। একবার এই ঘরে মধ্যাহ্নে ব'সে আছি, শ্যামসুন্দর এসে বল্‌লেন,

গ্যাখ, আজ আমাকে খাবার দিয়েছে, আর জল দেয় নাই।' আমি অমনি খুড়ি মাকে ডেকে বল্‌লাম, 'খুড়ি মা! তোমাদের শ্যামসুন্দর বল্‌ছেন, আজ তোমরা তাঁকে জল দেও নাই।' খুড়ি মা আমাকে বল্‌লেন, 'হ্যাঁ, শ্যামসুন্দরতো আর লোক পেলেন্ না। তুই ব্রহ্মজ্ঞানী কিনা, তাই তোকে গিয়ে বল্‌ছেন, জল দেয় নাই।' আমি বল্‌লাম, 'আচ্ছা, অনুসন্ধান ক'রে দেখনা।' খুড়িমা অমনি অনুসন্ধানে জান্‌লেন, যথার্থই জল দেওয়া হয় নাই। এরূপ শ্যামসুন্দর অনেক সময় অনেক কথা বল্‌তেন। পূজারী কোন প্রকার অনাচার বা ত্রুটি কর্‌লে, শ্যামসুন্দর এসে ব'লে যেতেন। শিশুকাল থেকে শ্যামসুন্দরের আশ্চর্য্য কৃপা দেখে আস্‌ছি। আমি না মান্‌লেও তিনি কখনও আমাকে ছাড়েন নাই।"

ভাবের অমর্য্যাদা—নীলকণ্ঠের যাত্রাভঙ্গ।

ঠাকুর গুরুভ্রাতাদিগকে সঙ্গে লইয়া দেশপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যাত্রা গান শুনিতে একটি ভদ্রলোকের বাড়ী পঁহুছিলেন। শান্তিপুরের গণ্য মান্য অনেক গোস্বামী প্রভুরাও এই গান শুনিতে উপস্থিত হন। যাত্রা আরম্ভ হইলে ঠাকুর ভাবাবেশে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। অশ্রু কম্প পুলকাদি এক সঙ্গে প্রকাশ হইয়া পড়িল। নীলকণ্ঠ উহা দর্শন করিয়া মহা উৎসাহে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর ভাব সম্বরণ করিতে না পারিয়া লাফাইয়া উঠিলেন, এবং উচ্চ উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নীলকণ্ঠও মাতিয়া গিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া আরতি করিতে লাগিলেন। তখন গুরুভ্রাতাদের ভিতরেও, ভাবের ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। এসময় গোস্বামী প্রভুরা অতিশয় বিরক্তি প্রকাশপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এরা ভারি গোলমাল করছে, শীঘ্র এদের থামায়ে দাও।" ভাববিরোধী দলের প্রতিকূল চেষ্টা দেখিয়া, নীলকণ্ঠ গান বন্ধ করিলেন। এবং বলিলেন, যে স্থলে এ সব ভাবের আদর নাই, আর ভক্ত মহাপুরুষের মর্য্যাদা নাই, সে স্থলে আমি গান করি না। সে স্থানে থাকাও আমি অপরাধ মনে করি। এই বলিয়া সকলে তৎক্ষণাৎ সভা হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরও আমাদের সকলকে লইয়া চলিয়া আসিলেন।

অগ্রহায়ণ মাস।

সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীর কথা।

১লা—৫ই অগ্রহায়ণ, ১৬—২০ নবেম্বর।

আহারান্তে সকলে ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আছি, অবসর পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম :—"হিন্দুদের মঠে মন্দিরে সর্ব্বত্রইতো দেবদেবীর মূর্ত্তি, শালগ্রাম, শিবলিঙ্গ এ সমস্তই প্রতিষ্ঠিত দেখ্‌তে পাই, গেণ্ডারিয়া সমাধি মন্দিরে মা-ঠাকুরাণীর ফটোর সহিতে যে নাম-ব্রহ্মের পটও প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছেন, ঐরূপ পট প্রতিষ্ঠা কোথাওতো দেখি নাই!"

ঠাকুর বলিলেন :—"কেন? কালনায় সিদ্ধভগবানদাস বাবাজীর আশ্রমে নাম ব্রহ্মের পট প্রতিষ্ঠিত আছে—বহুকাল পূর্ব্বে আমি তা দেখে এসেছিলাম। আরো দুই একটি স্থানে আছে।"

একটি গুরুভাই বলিলেন :—"ভগবান্ দাস বাবাজী কি প্রকারের সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন? সিদ্ধ শুনিলেই তো ভয় হয়!"

ঠাকুর বলিলেন :—"দেশে সাধারণের সংস্কার এরূপই বটে। "সিদ্ধ" শুন্‌লেই একটা ভয়ানক কিছু মনে করে। ভগবান দাস বাবাজী বৈষ্ণব পরমহংস ছিলেন। ইনি যেন বিনয়ের অবতার ছিলেন। কারো দোষ কখনও দেখ্‌তে পেতেন না। দোষের কথা কেহ তাঁর কাছে বল্‌লে, উনি কেঁদে ফেল্‌তেন, সকলের চেয়ে নিজকে হীন মনে কর্‌তেন।"

গুরুভাইটি আবার জিজ্ঞাসা করলেন :—"আপনি তো ব্রাহ্ম অবস্থায় ওখানে গিয়াছিলেন? বাবাজী কিরূপ ব্যবহার করিলেন?"

ঠাকুর বলিলেন :—"প্রচারক অবস্থায় আরো দুটি ব্রাহ্মবন্ধুর সঙ্গে সিদ্ধ ভগবান-দাস বাবাজীকে দর্শন কর্‌তে কাল্‌নায় গিয়েছিলাম। আমরা পৌঁছিতেই বাবাজী সকলকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে বস্‌তে আসন দিলেন। পথশ্রান্তিতে আমার খুব পিপাসা পেয়েছিল। বাবাজীকে বলাতে, বাবাজী নিজ কমণ্ডলু ধুয়ে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল এনে, আমাকে পান কর্‌তে দিলেন। কমণ্ডলুটি বাবাজীরই বুঝ্‌তে

পেরে আমি বল্‌লাম,—'বাবাজী! আমি যার তার হাতে খাই, জাতটাত্ কিছু মানি না,—ব্রহ্মজ্ঞানী; আমাকে অন্য একটা পাত্রে জল দিন।' বাবাজী খুব কাতরভাবে করযোড়ে বল্‌লেন, 'প্রভো! আমার আকাঙ্ক্ষায় বাধা দিবেন না। জাত্ কুল থাক্‌তে কি কখনও ভক্তি লাভ হয়! ব্রহ্মজ্ঞানইতো সমস্ত ধর্ম্মের মূল। আপনি দয়া ক'রে এই পাত্রেই জল পান করুন।' আমি জলপান ক'রে কমণ্ডলুটি রাখ্‌তেই, বাবাজী সেটি নিয়ে কপালে ছুঁইয়ে, সমস্তটা জল পান কর্‌লেন। কয়েকটি ভদ্রলোক ঐস্থানে ব'সে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজনে বল্‌লেন, 'বাবাজী! একি কর্‌লেন। ইনি যে পৈতা ফেলে দিয়েছেন, আর ব্রাহ্ম-সমাজে ঢু'কেছেন, কিছুই মানেন না।'

বাবাজী বল্‌লেন,—'আমার অদ্বৈতেরওতো পৈতা ছিল না। ব্রাহ্ম-সমাজে ঢুকেছেন, কিন্তু দেখ, সেখানেও আমার গোঁসাই আচার্য্য।' ভদ্রলোকটি একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ ক'রে বল্‌লেন, 'তা ঠিকই বলেছেন বাবাজী! আচার্য্য! আচার্য্য কেমন দেখ্‌তেতো পাচ্ছেন! কেমন জামা, জুতো, ধুতি, চাদর!! বাঃ!' শুনিয়া বাবাজীর চ'ক্ষে জল এল, তিনি বল্‌লেন, 'আহা! প্রভুকে পরিপাটী ক'রে সাজান, এতো আমাদেরই কর্ত্তব্য! এমনই দুর্ভাগ্য যে তা পার্‌লাম না। প্রভু নিজের প্রয়োজন মত জিনিষ নিজেই সংগ্রহ ক'রে নিচ্ছেন, তা দেখে যে একটু আনন্দ কর্ব্বো, হায়! হায়!! সে অদৃষ্টও ঘট্‌ল না।' এই ব'লে বাবাজী বালকের মত হু হু শব্দে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে একেবারে অস্থির হ'য়ে পড়্‌লেন।

বাবাজী, ওখানেই 'নাম ব্রহ্ম' প্রতিষ্ঠিত দেখি, তিনি খুব শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত তাহার নিত্য সেবা পূজা কর্‌তেন।"

বৈরাগ্য ও ত্রিতাপ সম্বন্ধে উপদেশ।

আজ একটি গুরুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন:—"কি ভাবে চলিলে প্রকৃত বৈরাগ্য লাভ হয়? আর বৈরাগ্য লাভ হইলে কিসে তাহা জানা যাইবে?"

ঠাকুর বলিলেন:—"বিষয়ের আসক্তি নষ্ট না হ'লে, ত্রিতাপ না গেলে, যথার্থ

বৈরাগ্য লাভ হয় না। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোগ-শোক, মান অপমানাদিতে যতকাল কর্ত্তব্য কার্য্য কর্‌তে বাধা জন্মাবে, ততকালই ত্রিতাপ নষ্ট হয় নাই জান্‌বে। ততদিন পর্য্যন্ত খুব নিয়মে থাক্‌তে হয়। দিবসটিকে নানা কার্য্যে বিভাগ ক'রে খুব নিষ্ঠার সহিত তাতে নিযুক্ত থাক্‌তে হয়। কিছুতেই ঐ সব নিয়মের অন্যথাচরণ কর্‌তে নাই। এই প্রকারে চল্‌লেই, ক্রমে ত্রিতাপ নষ্ট হ'য়ে যায়।"

জিজ্ঞাসা করিলাম :—"ত্রিতাপ কি ? কষ্টইতো তাপ ?"

ঠাকুর বলিলেন :—"শুধু কষ্ট কেন ? বিষয়ের অনুভূতি সমস্তই তাপ। দুঃখ যেমন তাপ, সুখও তেমনি তাপ। নিরানন্দ যেমন তাপ, আনন্দও তেমনি তাপ। সুখে দুঃখে, আনন্দে নিরানন্দে, মানে অপমানে চিত্তকে যতকাল স্পর্শ কর্‌বে, ততকাল যথার্থ ধর্ম্মের অঙ্কুরই জন্মায় নাই—জান্‌বে।"

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম :—"বিষয় জ্ঞান ও তাপবোধ না থাকিলে সে কোন কার্য্য করে কিরূপে ?"

ঠাকুর বলিলেন :—"কর্ত্তৃত্বাভিমান যতকাল আছে—তাপও ততকাল আছে। কর্ত্তৃত্বাভিমান না গেলে, মানুষ মুক্ত হয় না। মুক্ত হ'লেও মানুষের কর্ম্ম দেখা যায় বটে, কিন্তু তা বালক-ক্রীড়াবৎ, উন্মাদ-নৃত্যবৎ। একটা যন্ত্রের মত দেহদ্বারা তাদের কার্য্যগুলি অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে মাত্র।"

ছেলেবেলায় উৎপীড়ন-দর্শনে ঠাকুরের মূর্চ্ছা।

আজ দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালী, অত্যাচারী, শান্তিপুরের একটী জমিদারের প্রকাণ্ড ভবনের জনমানবশূন্য শ্মশানতুল্য পরিণাম দেখিয়া, ঠাকুর আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন :—

"এক সময়ে এই বাড়ীর কতই জাঁক জমক ছিল। জমিদার * * * বাবুর ভয়ে, এ বাড়ীর ধার দিয়ে কেউ চল্‌তে সাহস পে'ত না। শান্তিপুর-বাসীরা এর অত্যাচারের আশঙ্কায় সর্ব্বদা শঙ্কিত থাক্‌তেন। আজ সেই বা কোথায় ! আর তার সাধের বাড়ীই বা কোথায় ! দেখ্‌তে দেখ্‌তে কিছু কালের মধ্যে একেবারে সমস্ত ছারখার হ'য়ে গেল। কিছুই আর চিরদিন এক অবস্থায়

থাকে না, সঙ্গেও কিছুই যায় না; তবু একে অন্যকে পীড়ন ক'রে সুখী হ'তে চায়,—বড় লোক হ'তে চায়! পরিণাম যে কি, তা একবার কেউ ভাবে না!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"এই জমিদার কি প্রকার অত্যাচারী ছিলেন? অত্যাচার ক'রে তাঁর কি দুর্দ্দশা ঘ'টেছিল?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"এর এক দিনের অত্যাচার আমি চক্ষে দেখেছি। মনে হ'লে এখনও শরীর শিউরে ওঠে। তখন আমার বয়স ছয় সাত বৎসর, সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে খেলা ক'র্‌তে ক'র্‌তে একদিন এই বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হ'য়ে শুন্‌লাম, জমিদার বাবু টাকার জন্য একটি গরিব লোকের উপর ভয়ঙ্কর পীড়ন কর্‌ছেন। আমি খেলা ফেলে ছুটে গিয়ে এই বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে দেখি, একটি লোকের উপরে বাঁশডলা দিচ্ছে, লোকটী যন্ত্রণায় হাত-পা আছড়াচ্ছে, মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠ্‌ছে,—আর সময় সময় তার দম বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। দেখেই আমি উন্মত্তের মত হ'য়ে, একেবারে জমিদারের সম্মুখে লাফায়ে প'ড়ে, খুব চীৎকার ক'রে তাকে ব'লতে লাগ্‌লাম,'তুমি ডাকাত! ডাকাত!! লোকটী যে ক্লেশে ম'রে গেল। তোমার লাগ্‌ছে না? ভাল চাও এক্ষণি একে ছেড়ে দাও, এক্ষণি একে ছেড়ে দাও।' এ কয়টি কথা ব'লেই, আমি মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়ে গেলাম। জমিদার বাবু কিন্তু তখনই লোকটিকে ছে'ড়ে দিলেন। ছেলেরা গিয়ে বাড়ীতে আমার মূর্চ্ছার খবর দিল। কিছুক্ষণ পরে, আমার জ্ঞান হ'লে, জমিদার বাবু আমাকে বল্‌লেন, 'ওহে তোমার কথাতেই ঐ বেটাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। ভাল, তোমারতো খুব সাহস দেখ্‌ছি! আমাকে তুমি ধমক্ দিলে! একটুকু ভয় হ'ল না?' আমি বল্‌লাম, 'ভয় কেন ক'র্ব্বো, আমিতো ঠিকই ব'লেছি। জান না আমি গোঁসাইদের ছেলে?'

এর কিছুকাল পরেই জমিদার বাবু, একটি অসহায়া ব্রাহ্মণ-বিধবার বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে, তার যথাসর্ব্বস্ব লুট ক'র্‌লেন। বিধবাটি রান্না চড়া'য়েছিলেন, ভাতের হাঁড়িটি লাথি মেরে ফেলে দিলেন, পরে, তার উপর যথেচ্ছ অত্যাচার কর্‌লেন। বিধবাটি আর কি ক'রবেন, এই মাত্র বল্‌লেন,—'আমি নিতান্ত অসহায়া-বিধবা,

হায়, হায়, আমার উপর তুমি এ ব্যবহার ক'রলে! আচ্ছা! আমি আর কা'কে বল্‌ব! আমার আর কে আছে! ভগবানকেই বল্‌ছি, তিনিই এর বিচার ক'রবেন। যেমন যেমনটী আমাকে তুমি কর্‌লে, ঠিক তেমন তেমনটী তোমার স্ত্রীরও ঘট্‌বে।' আশ্চর্য্য এই যে, এ ঘটনার কিছুদিন পরেই জমিদার বাবু একটী শক্ত মামলায় প'ড়ে, একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হ'লেন,—কঠিন পরিশ্রমের সহিত জমিদার বাবুর জেল হ'ল, জেলে তিনি ভুগ্‌তে ভুগ্‌তে মারা গেলেন। একদিন তার বিধবা স্ত্রী, হবিষ্যান্ন কর্‌তে রান্না চাপিয়েছিলেন, শত্রুপক্ষের লোকেরা সেই সময় ঐ বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে সমস্ত লুট কর্‌লো। আধসিদ্ধ ভাতের সঙ্গে পিতলের হাঁড়িটি, একজন লাথি মেরে ফেলে দিয়ে, তাও নিয়ে গেল। নীচ প্রকৃতি ছোটলোকদের নানা প্রকার অকথ্য অত্যাচার ভু'গে, জমিদারের স্ত্রী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাড়ী হ'তে বের হ'য়ে প'ড়্‌লেন। কথায় বলে, 'দুঃখ পে'য়ে হাড়িনি শাপে, এড়াতে পারে না বামুণের বাপে'—কথাটা বড়ই সত্য! নিতান্ত অধম অপদার্থ দুরাচারী ব্যক্তিও যদি দারুণ ক্লেশ পেয়ে শাপ দেয়,—একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে,—উৎকৃষ্ট ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণও তার হাত এড়াতে পারেন না।"

সমস্তই অসার—ধর্ম্মই সার।

ইহার পর ঠাকুর বলিলেন ঃ—"কিছুইতো থাকে না। সমস্তই অসার,—একমাত্র ধর্ম্মই সার। সংসারের সুখের জন্য,—অর্থের জন্য, কখনই অসত্য পথ অবলম্বন কর্‌বে না, ধর্ম্ম ত্যাগ করবে না। এতে সংসার থাকে থাক্‌,—যায় যাক্‌। বরং ভিক্ষা ক'রে সারাটি জীবন কাটায়ে দিবে। পতির প্রতি যেমন সতীর, ধর্ম্মের প্রতিও সেই রকম সাধকের সর্ব্বদা দৃষ্টি রে'খে চল্‌তে হয়। স্বয়ং ভগবানই সকল অবস্থায় ধর্ম্মার্থীকে রক্ষা ক'রে থাকেন।"

নাম ও ধ্যান সম্বন্ধে উপদেশ।

শান্তিপুরে আসিয়া অবধি এখানে অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইতেছে। আমার বেশ দেখিয়া অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন ঃ—"তুমি কোন্ ভাবের উপাসক?"

আমি তাহাদের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারি না। কারণ আমি কোনও বিশেষ একটা ভাব লইয়া সাধন করি না। নানা প্রকারের ভাবই, আমার ভিতরে সময়ে আসে, আবার চলিয়া যায়। ঠাকুরকে আজ জিজ্ঞাসা করিলাম :—"কোন্ ভাবের উপাসক কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা কি বলিব ?"

ঠাকুর বলিলেন :—"যার যে ভাব ভাল লাগে, সে তাই ব'ল্‌বে। বিষ্ণু ভাল লাগ্‌লে বৈষ্ণব ব'ল্‌বে, শিব ভাল লাগ্‌লে শৈব ব'ল্‌বে, এইরূপ।"

আমি বলিলাম :—"এক সময় একটা ভাব ভাল লাগে, আবার একটু পরেই অন্য আর একটা ভাব শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। একটা কিছু স্থির ভাবে ধরিয়া থাকিতে পারি না, এরূপ চঞ্চলতা হয় কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন :—"নানাপ্রকার অবস্থায় প'ড়ে, সংসর্গেতে ও সন্দেহেতে, পূর্ব্বাভাস এসে উপস্থিত হয়। যতকাল কর্ম্ম আছে, ততকাল কেহই কোন একটাতে স্থির হ'তে পারে না ; এরূপ চঞ্চলতা ত্যাগ হওয়া অসম্ভব হয়। নামই আমাদের একমাত্র অবলম্বন, নামই ধ'রে থাক। এই নামেরই ভিতর দিয়ে, ভগবানের অনন্ত রাজ্য, অনন্ত রূপ, অনন্ত ভাব ও অনন্ত লীলা প্রকাশ পাবে। অনন্ত রাজ্যে, অনন্ত দিক্ দিয়ে, অনন্ত ভাবে চল্‌তে হবে। কোনও একটী বাদ প'ড়লে, পরে মনে হ'তে পারে, ওদিক দিয়ে ও ভাবে চল্‌লে, আরও সুবিধা হ'ত। এ প্রকার আক্ষেপ পরে আর না আসে, সে জন্য নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে, নানা ভাবে, নানা দিক দিয়ে চলা সাধকের পক্ষে প্রয়োজন। এতে সমস্ত জানাও হয়।"

এসব শুনিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম :—"মনতো নিতান্ত চঞ্চল, তার উপরে বাহিরের উপসর্গও বিস্তর, স্থির হ'য়ে নাম করিব কি উপায়ে ? আমাদের কি কিছু ধ্যানের ব্যবস্থা নাই ?"

ঠাকুর বলিলেন :—"বৈধ ধ্যান, ও রাগের ধ্যান, এই দুই প্রকার ধ্যান আছে বটে,—তবে আমাদের সে সকলের কোনও প্রয়োজন নাই। মনটিকে কোন একটী চক্রে বসা'য়ে এবং চক্ষের দৃষ্টি কোন একটী বস্তুতে স্থির রে'খে, নাম কর্‌তে হয়, এরূপ ক'রলে অনেক উৎপাত হ'তে রক্ষা পাওয়া যায়। কার্য্যটিও

সকল অবস্থায়ই প্রায় ঠিক চলে। চক্রে মন রেখে নাম করতে করতে, এক টুকু স্থির হ'লেই দেখা যায়, চক্রের ভিতরে একটী রূপের প্রকাশ হয়; যেমনি প্রকাশ—অমনি টপ্ ক'রে ধরা। কল্পনা ক'রে আমাদের কোনও রূপের ধ্যান নাই। ভগবানের রূপ অনন্ত। কোন্ রূপে তিনি কার কাছে প্রকাশিত হবেন, কে বল্‌তে পারে! আর এক রূপেই যে তিনি সর্ব্বদা দর্শন দিবেন, তারই বা নিশ্চয় কি! শুধু শ্বাস প্রশ্বাস ধ'রে নাম ক'রে যাও, তাতেই সমস্ত ঠিক হ'য়ে আস্‌বে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম:—"নাম করিতে করিতে মন স্থির হইবে না, মন স্থির করিয়া নাম করিতে হইবে?"

ঠাকুর বলিলেন:—"তা কি আর কেউ পারে! ভগবানের নাম শ্বাস প্রশ্বাস ধ'রে করতে করতে, তাঁরই কৃপায়, মন স্থির হ'য়ে আসে। ওরূপ ক'রলে ক্রমে সবই বুঝতে পার্‌বে।"

নয় বৎসর বয়সে, ঠাকুরের দয়া ও উদারতা।

আজ বিকাল বেলা ঠাকুরের সঙ্গে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, প্রায় দেড় মাইল দূরে, নির্জ্জন স্থানে, একটী জীর্ণ কুটীরে, উপস্থিত হইলাম। একটু সময় সেখানে বসিয়া ঠাকুর বলিলেন,:—"বহুকাল পূর্ব্বে এই কুটীরে একটী হীনজাতি, ভজনানন্দী বৈষ্ণব বাবাজী ছিলেন। সময় সময় বাড়ী হ'তে আমি তাঁকে শ্যামসুন্দরের প্রসাদ এনে দিতাম। অনেক দিন হ'ল তিনি দেহ রেখেছেন। তার পর হ'তে এই স্থান শূন্য প'ড়ে আছে।"

বাবাজীর সহিত ঠাকুরের কোথায় কি ভাবে পরিচয় হইয়াছিল, জানিতে ইচ্ছা হওয়ায়, ঠাকুরকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম।

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন:—"আমার ছেলেবেলা, নয় বৎসর বয়সের সময়, একটী সমারোহের কার্য্যে, প্রসাদ পেতে বাবাজী আমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের ভোজনের পূর্ব্বে অপর জাতিদেরতো আর দেওয়া হয় না। বাবাজী দরজায় দাঁড়ায়ে দু তিন বার খাবার চাইলেন, তাঁকে বলা হ'ল, 'একটু অপেক্ষা করুন, ব্রাহ্মণেরা ব'স্‌লেই আপনাকে খাবার দিচ্ছি।' বাবাজী আর

অপেক্ষা না ক'রে চ'লে যেতে প্রস্তুত হ'লেন। আমি অম্‌নি বাড়ীর ভিতরে গিয়ে বল্‌লাম, 'একটী বৈষ্ণব প্রসাদ চেয়ে, না পে'য়ে চ'লে যাচ্ছেন! ক্ষুধিত হ'য়ে খাবার চাচ্ছেন, খাবার র'য়েছে দিয়ে দিবে,—এতে আবার ব্রাহ্মণ শূদ্র কি?' আমাকে সকলে বল্‌লেন, 'বাবাজীকে একটু বস্‌তে ব'ল্‌গে।' আমি এসে দেখি, বাবাজী দ্বারে নাই, রাস্তায় চ'লে যাচ্ছেন। অম্‌নি দৌ'ড়ে গিয়ে, বাবাজীকে ধ'র্‌লাম,—অনেক ক'রে ব'ল্‌লাম, কিন্তু বাবাজী আর ফির্‌লেন না। তখন তাঁর ঠিকানাটী জিজ্ঞাসা ক'রে রাখ্‌লাম। একটু পরেই ব্রাহ্মণেরা সেবায় ব'সলেন্, আমিও অম্‌নি একজনের মত প্রসাদ চেয়ে নিয়ে, জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে এখানে এসে উপস্থিত হ'লাম। বাবাজীকে প্রসাদ দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম্ঃ— 'বাবাজী! প্রতিদিন কি ভাবে আপনার সেবা চলে?' বাবাজী বল্‌লেনঃ— 'ভিক্ষা করি। তার পর ভগবান যে দিন যে রকম দেন, সে রূপই জোটে।'

এর পর, যতকাল বাড়ীতে ছিলাম, ক্ষুধা হ'লেই আমার বাবাজীর কথা মনে হ'ত। চেষ্টা ক'রে শ্যামসুন্দরের প্রসাদ রেখে, বাবাজীকে এখানে এনে দিতাম। না হ'লে আহারে আমার রুচি হতো না। শান্তিপুরে কিছু কাল পূর্ব্বেও বৈষ্ণব মহাপুরুষদের অভাব ছিল না। আজকাল আর সেরূপ মহাত্মাদের বড় দেখা যায় না। ক্রমে সমস্তই লোপ হ'য়ে গেল।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া অবধি দিন রাত কেবল উহাই মনে উঠিতেছে। আহা! ছয় সাত বৎসরের বালক অবস্থায়, যিনি একজনের যাতনা দেখিয়া ছট্ ফট্ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং নয় বৎসর বয়সে যিনি সংস্থানশূন্য ভিক্ষোপজীবী ক্ষুধিত বাবাজীর কথা মনে করিয়া, বহুকাল প্রতিদিন, আহারে তৃপ্তিলাভ করেন নাই, রৌদ্র বৃষ্টি-তেও দেড় মাইল চলিয়া গিয়া যিনি খাবার দিয়া আসিতেন,—হে ভগবান, জন্মান্তরে এমন কি সুকৃতি করিয়াছিলাম যে, সেই দয়ার শরীরের আশ্রয় পাইলাম!! ধন্য দয়ার ঠাকুর! তোমার গৌরবে আমরাও ধন্য।

ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলামঃ—"অন্যের রোগ-শোক, ক্ষুধা-পিপাসাদির যন্ত্রণা দেখিয়া তেমন লাগে না কেন? মুখে একটা 'আহা' 'উহু' করি মাত্র। কতকালে যথার্থ দয়া প্রাণে জাগিবে?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—“তা কি বলা যায়! সকলেরই ভিতরে সকল সবৃত্তি আছে, সময় হ’লেই তা ফুটে ওঠে। যেমন বৃক্ষের ফল ফুল সময়ে প্রকাশ হয়। নিয়মে চ’লে, সময়ের প্রতীক্ষা ক’রে, প’ড়ে থাক।”

প্রশ্ন করিলাম ঃ—“সময়ে হবে, ইহা অনেক সময় বলেন। এই সময়ের অর্থ কি কোনও নির্দ্দিষ্ট কাল?”

ঠাকুর বলিলেন ঃ—“তা শুধু নয়। ঋতুবিশেষে এক এক জাতীয় বৃক্ষের ফল ফলে, কিন্তু সেই ঋতুতে গাছটিরও ফল প্রসবের উপযুক্ত বয়স হওয়া চাই। চারা বড় না হওয়া পর্য্যন্ত ছাগল গরু হ’তে তা রক্ষা করা, বেড়া দেওয়া, জল দেওয়া, উত্তাপ লাগার ব্যবস্থা করা,—এ সকল যেমন আবশ্যক,—সকলেতেই সেই প্রকার। নিয়মে না থাক্‌লে সময়ও উপস্থিত হয় না।”

সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীর ভবিষ্যৎ-বাণী।

আহারান্তে নানা কথার পর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—“শুনিয়াছি, এক বাবাজী নাকি আপনাকে ‘মালা তিলক ধারণ করিতে হইবে’ এরূপ কথা বহুকাল পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন? সে কবে? আপনি কি বাবাজীকে ঐ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করিয়াছিলেন, না অম্‌নি?”

ঠাকুর বলিলেন ঃ—“ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশের কিছুকাল পরে, সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীকে দর্শন কর্‌তে নবদ্বীপে গিয়েছিলাম। সে সময়ে এ দেশে সকলেই বাবাজীকে মহা সিদ্ধপুরুষ ব’লে ভক্তিশ্রদ্ধা কর্‌তেন। বাবাজীর নিষ্কিঞ্চনভাব, স্বাভাবিক বিনয়, ও ভক্তিভাব দেখে বড়ই আনন্দ হ’লো। বিড়াল কুকুরকেও তিনি ভূমিষ্ঠ হ’য়ে নমস্কার কর্‌তেন। ছেঁড়া কাঁথা, নারকেলের মালা ও একটি মাটির করোয়া ভিন্ন, বাবাজীর আর কিছুই সম্পত্তি ছিল না। আমি বাবাজীর নিকটে কিছু সময় ব’সে থেকে, জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, ‘বাবাজী, ভক্তি কিসে হয়?’ বাবাজী আমার প্রশ্ন শুনে, কোনও উত্তর না দিয়ে, একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে থেকে

থর থর ক'রে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। বাবাজীর সমস্ত শরীরটি পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হ'তে লাগ্‌ল, মস্তকের শিখাটী খাড়া হ'য়ে উঠ্‌লো। বাবাজী অস্ফুটস্বরে একটি গভীর হুঙ্কার ক'রে বল্‌লেন, 'কি বল্লে গোঁসাই! তুমি বল্‌লে ভক্তি কিসে হয়! তুমি বল্‌লে ভক্তি কিসে হয়!! এঁ, তুমি বল্‌লে ভক্তি কিসে হয়!!!' এই বলেই সমাধিস্থ হ'লেন। তিন ঘণ্টা কাল বাবাজীর আর বাহ্য সংজ্ঞা ছিল না। সে সময় বাবাজীর শরীরে অশ্রু কম্প পুলকাদি নানা প্রকারের আশ্চর্য্য ভাব দেখে আমি একেবারে অবাক হ'য়ে গেলাম। সমাধিভঙ্গের পর বাবাজী সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে, করযোড়ে বল্‌লেন, 'প্রভু! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন নিষ্কিঞ্চন কাঙ্গাল হ'তে পারি। তা না হওয়া পর্য্যন্ততো ভক্তির নাম গন্ধও নাই! এখন আপনি যে ভাবেই চলুন না কেন, আপনার ললাটে তিলক, কণ্ঠে মালা, পরিস্কার আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি। ভক্তিতো আপনারই ভাণ্ডারের জিনিষ, আমার অদ্বৈতের ভাণ্ডারে কি আর ভক্তির অভাব আছে?' বাবাজীর কথা শুনে চ'লে এলাম। তখন আমি একবার কল্পনাও করি নাই যে, কখনও আমাকে আবার তিলক মালা নিতে হবে। আর একটী ভদ্রলোক বাবাজীকে ঐ প্রশ্ন করায়, বাবাজী ব'লে ছিলেন, 'দুটী পয়সায়ই ভক্তিলাভ হয়।' সে ভদ্রলোকটী শুনে বল্লেন, 'সে কি বাবাজী! দু পয়সায় ভক্তিলাভ! সে আবার কেমন ভক্তি! আপনি আমাকে উপহাস কর্‌লেন?' বাবাজী বল্লেন,—'হরে কৃষ্ণ! উপহাস করি নাই, ঠিকই বলেছি। দুটী পয়সা দিয়ে একখানা বটতলা ছাপার 'নরোত্তম দাসের প্রার্থনা' এনে কিছুকাল পড়ুন, তা হলেই সব বুঝতে পার্‌বেন।"

ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম:—"দূরদৃষ্টি, ভবিষ্যৎদৃষ্টি, এবং অনিমাদি ঐশ্বর্য্য, যাহা সিদ্ধ পুরুষেরা লাভ ক'রে থাকেন, তাকি যোগ ক'রে?"

ঠাকুর বলিলেন:—"যোগ ক'রেই এ সকল ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, না হ'লে হয় না, এমন কিছু নয়। যে কোন প্রকারে চিত্তটী একাগ্র হ'লেই হ'লো,—তখন আপনা আপনি এ সমস্ত ঐশ্বর্য্য এসে পড়ে; কিন্তু এসব ঐশ্বর্য্য প্রকাশ কর্‌লেই সর্ব্বনাশ! গোপনে রাখ্‌লেই এ সব শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। এ সকল ঐশ্বর্য্য লাভ করা সহজ, কিন্তু রক্ষা করাই শক্ত। যোগীদের পক্ষে এসব

ঐশ্বর্য্যত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। কত শত যোগীদের সাধনের সম্পত্তি, এই ঐশ্বর্য্যের তুফানে প'ড়ে, একেবারে ডুবে গে'ছে। বড়ই সাবধানে থাকৃতে হয়।"

আমি আবার বলিলাম ঃ—"প্রয়োগই যদি না করিলাম, ব্যবহারই যদি না হইল, তবে আর এসকল শক্তিতে লাভ কি ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"সমস্ত শক্তি, সমস্ত ঐশ্বর্য্যইতো ভগবানের, তাঁরই কৃপায় এসব মানুষের লাভ হয়। তাঁরই ইঙ্গিত অনুসারে তা প্রয়োগ কর্‌তে হয়। নিজ ইচ্ছায় কিছু ক'র্‌তে গেলেই গোল।"

খোদার উপর খোদ্দারী।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"শাস্ত্রে যে সকল কার্য্যকে সৎকার্য্য বলিয়াছেন, 'ধর্ম্মকার্য্য' বলিয়াছেন, সে সকল বিষয়েও কি যোগৈশ্বর্য্য প্রয়োগ করিতে নাই ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"সৎ অসৎ বুঝা বড় সহজ নয়তো ! মুসলমানদের একখানা ধর্ম্মগ্রন্থে এ বিষয়ে বড় সুন্দর একটি গল্প আছে। একটি দয়ালু ফকির, সহরে দুঃখ দরিদ্রতা, রোগ শোক ইত্যাদিতে লোকের ক্লেশ দে'খে ভাব্‌লেন, আহা ! খোদা এদেরতো কিছুই কর্‌ছেন না ! তিনি খোদার কাছে প্রার্থনা কর্‌লেন, 'প্রভো ! একটি দিনের জন্যও যদি শক্তি দিয়ে মাত্র এই সহরে আমাকে তোমার খোদ্দারী দাও, তাহ'লে আমি সকলের সকল প্রকার ক্লেশ দূর ক'রে পরম শান্তি স্থাপন করি।' খোদা 'তাই হউক' ব'লে তার প্রার্থনা মঞ্জুর ক'র্‌লেন। ফকির সাহেব সহরে সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান হ'লেন। অমনি তিনি যাবতীয় প্রাণীর দুঃখ কষ্ট, রোগ শোক একেবারে দূর ক'রে, মহা আনন্দের ঢেউ তুলে দিলেন। একটী ভয়ঙ্কর দুর্ব্বৃত্ত, ঘোর পাষণ্ড ব্যক্তি ঐ সহরে একটী সুন্দরী যুবতীর প্রতি অতিশয় আসক্ত ছিল। বহু চেষ্টাতেও যুবতীর জীবদ্দশাতে সে কোন প্রকারে উহাকে পায় নাই। অকস্মাৎ স্ত্রীলোকটীর

দেহ ত্যাগ হ'ল। তার আত্মীয় স্বজনেরা তাকে কবর দিয়ে চলে গেলেন। একটু পরেই ঐ দুরাচারী ব্যক্তি তা জান্‌তে পেরে, নির্জ্জন স্থানে ঐ কবরের কাছে উপস্থিত হলো, এবং যুবতীর মৃত শরীর কবর হ'তে তুলে নিয়ে, তারই উপর নিজ জঘন্য বৃত্তি চরিতার্থ কর্‌বার উদ্যোগ কর্‌তে লাগলো। ফকির সাহেবের নজরে যেমনি এই ব্যাপার প'ড়লো, অমনি তরোয়াল হাতে নিয়ে লাফা'য়ে উঠ্‌লেন, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তার কাছে উপস্থিত হ'য়ে 'কাফের' 'কাফের' ব'লে চীৎকার ক'রে, তার গর্দ্দান লক্ষ্য ক'রে তরোয়াল হাঁক্‌লেন। খোদা তৎক্ষণাৎ ঐ তরোয়াল ধ'রে ফেল্‌লেন এবং ফকির সাহেবকে বল্‌লেন 'এ·কি কর্‌ছ! কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য খোদ্দারী পেয়েই এতটা! এর সারা জীবনে প্রতিদিন এই রকম কত দুষ্কার্য্য দেখেও আমি একে ক্ষমা ক'রে আস্‌ছি। আর দশটার মত সকল অবস্থায়ই আমি একে প্রতিপালন কর্‌ছি, একটি দিনের জন্যও একে উপবাসী রাখি নাই, আর তুমি মাত্র একটা দোষ দেখেই একে একেবারে বধ কর্‌তে উদ্যত হ'লে! যাও! আর তোমার খোদ্দারী কর্‌তে হবে না।' ফকির সাহেব বল্‌লেন, 'প্রভো! আমিতো অন্যায় কিছু করি নাই। কোরানেইতো ব্যবস্থা আছে, এরূপ অপরাধীকে বধ কর্‌তে হয়।' খোদা বল্‌লেন, 'কোরানের ব্যবস্থা কি তোমার জন্য, না আমার জন্য?' ফকির বল্‌লেন—'মানুষেরই জন্য, আমার জন্য।' খোদা বল্‌লেন, 'তবে! আজতো তুমি আর তুমি নও, আজ যে তুমি খোদা হয়েছিলে। খোদার জন্যত আর কোরানের ব্যবস্থা নয়!' ফকির সাহেব তখন, ভগবানের কার্য্য ও অসীম দয়া দেখে এবং নিজের বিচারবুদ্ধি ও অবস্থা বুঝে, একেবারে মুগ্ধ ও লজ্জিত হয়ে প'ড়্‌লেন। সাধারণ লোকের অসাধারণ শক্তি লাভ হ'লে, তার দ্বারা সংসারের বিশেষ অনিষ্টই হয়, এজন্যই শ্রীরামচন্দ্র শূদ্র তপস্বীকে বধ ক'রেছিলেন।"

ঠাকুর এসব বিষয়ে অনেক কথা বলিলেন। শক্তি লাভ হইলে সম্পদ অপেক্ষা বিপদই বেশী।

ঠাকুরের শান্তিপুর হইতে কলিকাতা গমন।

৬ই অগ্রহায়ণ, শনিবার।

ঠাকুরের বাল্যলীলাভূমি শান্তিপূর্ণ মধুর শান্তিপুরের বাস আজ আমাদের ফুরাইল। ঢাকা, বরিশাল, কলিকাতা ও কাকিনা প্রভৃতি স্থানের গুরু-ভ্রাতারা ঠাকুরকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। কলিকাতার গুরু-ভ্রাতাদের প্রাণের অতিশয় আগ্রহ জানিয়া, কিছুদিন পূর্ব্বে ঠাকুর তাঁহাদিগকে জানাইয়াছিলেন, অবিলম্বেই তিনি তথায় পঁহুছিবেন। কলিকাতার গুরুভ্রাতাদের কাহারও অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নয়, সকলেই গরীব। ঠাকুরের সঙ্গে বহু লোক উপস্থিত হইলে, ব্যয়ভার কি প্রকারে নির্ব্বাহ হইবে ভাবিয়া, গুরুভ্রাতারা একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এবং অনেক লোক লইয়া ঠাকুর কলিকাতা পঁহুছিলে, বিশেষ অসুবিধা ঘটিবে, ইহাও তাঁহারা ঠাকুরকে পরিষ্কার জ্ঞাত করাইয়াছিলেন। ঠাকুর তখন তাঁহাদের সেই কথার কোনও উত্তর না দিয়া একটু হাসিয়াছিলেন মাত্র।

শান্তিপুর হইতে ঠাকুরের কলিকাতা পঁহুছিবার নির্দ্দিষ্ট দিন অবগত হইয়া শ্রদ্ধেয় অচিন্ত্যবাবু, মণিবাবু, বৃন্দাবন বাবু প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা যথাসময়ে আহিরীটোলা ষ্টীমার ঘাটে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে ৩।৪টী মাত্র লোক আসিবে অনুমানে, তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে ঠাকুরের জন্য এক খানা ছোট বাসা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাস্তায় অকস্মাৎ ষ্টীমারের গতি রুদ্ধ হওয়াতে যথাসময়ে ষ্টীমার কলিকাতা পঁহুছিতে পারিল না। এদিকে গুরুভ্রাতারা বহুক্ষণ ষ্টীমারের প্রত্যাশায় থাকিয়া, অবশেষে রাত্রি প্রায় দশটার সময় সকলেই হতাশপ্রাণে স্ব স্ব আবাসে চলিয়া গেলেন।

কলিকাতা পঁহুছিতে আমাদের অনেক রাত্রি হইল। ঠাকুর ষ্টীমার হইতে নামিয়াই কাহারও প্রত্যাশায় না থাকিয়া, একবারে ব্রাহ্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলেন। আমরা নগেন্দ্রবাবুর বাসায় পঁহুছিয়া দেখিলাম, তিনি এবং তাঁহার সহধর্ম্মিনী "মা আনন্দময়ী" আমাদের আট দশটি লোকের আহারের সুব্যবস্থা রাখিয়া, খুব উৎকণ্ঠার সহিত ঠাকুরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ইহাতে মনে হইল, পূর্ব্বেই উঁহারা কোনও প্রকারে আমাদের সকলের ঐ দিনে তাঁহাদের বাসায় পঁহুছিবার সংবাদ জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন।

পরদিন ঠাকুরের খবর পাইয়া সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুভ্রাতাদের আনন্দের আর সীমা নাই। উঁহাদিগকে পাইয়া আমরাও খুব প্রফুল্ল হইলাম। কিন্তু এত লোকের সমাবেশ কোথায় হইবে ভাবিয়া, সকলেই একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দেব মহাশয় বারো দিনের ছুটি লইয়া বৈদ্যনাথ চলিলেন। গুরুভ্রাতারা তাঁহার খালি বাড়ীতে আমাদের থাকিবার সুবিধা হইতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারই বিশেষ আগ্রহে,মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীটস্থ তাঁহার খালি বাড়ীতে আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়া গেল। একদিন মাত্র নগেন্দ্র বাবুর বাসায় থাকিয়া ৮ই অগ্রহায়ণ সোমবার আহারান্তে ঠাকুরের আসন লইয়া ঐ বাড়ীতে আমরা উপস্থিত হইলাম।

মস্‌জিদ্‌বাড়ীষ্ট্রীটের বাসা।

৮ই—১৫ অগ্রহায়ণ, সোমবার।

এই বাসায় পঁহুছিয়া, ঠাকুরের থাকিবার ঘরখানা আমরা সর্ব্বাগ্রে পছন্দ করিয়া লইলাম। রাস্তার উপরে, খোলা-মেলা দোতলা ঘরের এককোণে ঠাকুরের আসন পাতিলাম। এই ঘরের ভিতরদিকে, সাম্‌নেই বড় বারান্দা এবং বারান্দাসংলগ্ন একধারে দুখানা বড় বড় কুঠরী আছে। ঠাকুরের সঙ্গে যে কয়টী গুরুভ্রাতা রহিয়াছেন, স্বচ্ছন্দরূপে তাঁহারা এই বাসায় থাকিতে পারিবেন ভাবিয়া, সকলেরই মনে খুব আনন্দ হইল। কিন্তু এই আনন্দ বেশী ক্ষণ আমাদের রহিল না। এখন দেখিতেছি, অপরাহ্নে দর্শনার্থী হইয়া দলে দলে লোক আসিয়া যখন বাড়ীটিকে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে, তখন স্থানাভাবে বড়ই অসুবিধা হয়। সন্ধ্যাকীর্ত্তনের পরে একটু বেশী রাত্রিতে, বাহিরের লোকের সংঘট্ট কমিয়া যায় বটে ; কিন্তু তখন আবার গুরুভ্রাতাদের ভিড়ে অস্থির হইয়া পড়ি। আফিস আদালত ছুটি হইলেই, গুরুভ্রাতারা সকলে এখানে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং অনেকে সারারাত্রি এখানে থাকিয়া, প্রত্যূষে আপন আপন বাসায় চলিয়া যান। ঠাকুরের ঘরটি সমস্ত রাত্রিই লোকে পরিপূর্ণ থাকে। দু,তিন ঘণ্টা কালও কেহ ঘুমান কিনা সন্দেহ। রাত্রিতে সামান্য জলযোগ করিয়া, প্রায়

অভুক্ত অবস্থায়, ক্লান্তশরীরে, গুরুভ্রাতারা এখানে অবস্থান করেন। তাঁহারা প্রায় সারারাত্রি এইভাবে জাগরণ করিয়া প্রতিদিন আফিস আদালতের এবং ব্যবসা বাণিজ্যের কার্য্য অবাধে, সুচারুরূপে কি প্রকারে সম্পন্ন করিতেছেন, ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছি।

বৃন্দাবনবাবুর সেবা-নিষ্ঠা।

ঠাকুরের প্রতি গুরুভ্রাতাদের আন্তরিক টানের এক একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া, অবাক হইয়া যাইতেছি। ঠাকুরের সঙ্গ লাভ করিতে, কোনও দিকের কোনও প্রকার বাধা গুরুভ্রাতারা তৃণতুল্য মনে করেন না। কোনও কারণে ঠাকুরের সেবার একটুকু অসুবিধা হইতেছে শুনিলেই, উঁহারা একেবারে অস্থির হইয়া পড়েন।

আজ আমাদের উনন ধরাইবার ঘুঁটে না থাকায়, সকালে মেয়েরা আসিয়া জানাইলেন, "ঘুঁটে ফুরাইয়া গিয়াছে। ঘুঁটে না আনিলে গোঁসাইর রান্না হবে না।" গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র মজুমদার মহাশয়, 'ঘুঁটে এনে দিচ্ছি' বলিয়া, তখনই বাসা হইতে বাহির হইলেন। ঘুঁটের অনুসন্ধান করিতে করিতে কোথাও না পাইয়া, অবশেষে তিনি অনেক ঘুরিয়া, গোয়াবাগানে একটি ঘুঁটের দোকানে উপস্থিত হইলেন। মুটের দ্বারা ঘুঁটে বাসায় লইয়া যাইতে অত্যন্ত বিলম্ব হইবে ভাবিয়া, অস্থির হইয়া পড়িলেন। এবং কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া, জুতা, মোজা, কোট ও গরম গাত্রবস্ত্র পরিহিত থাকা অবস্থায়ই, ঘুঁটের ঝুড়ি একেবারে মাথায় তুলিয়া লইলেন। অমনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, বড় রাস্তার উপর দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই গুরু-ভ্রাতাটী একটী নগণ্য লোক নহেন,পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী। কায়স্থসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি-শালী, এবং কলিকাতার বহুসম্মানিত লোকের পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ঠাকুরের প্রতি ইঁহার সুন্দর সখ্যভাব। ইঁহার অসাধারণ সরলতা ও উদারতার কথা ঠাকুর অনেক সময় বলিয়া আনন্দ করেন।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল চক্রবর্ত্তী।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত নবিনচন্দ্র ঘোষ।

শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র মজুমদার।

U. RAY & SONS.

ঠাকুরের মুক্তি-ফৌজ দর্শন—আমার অভিমান চূর্ণ।

আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়, জেনারেল্‌ বুথ্‌ ও মুক্তি-ফৌজ সম্বন্ধে একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন। ঠাকুর পুস্তক খানা শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। এ সময়ে মুক্তি-ফৌজের অধ্যক্ষ জেনারেল্‌ বুথ্‌ সম্বন্ধে ঠাকুরের নিকট অনেক সময় আলোচনা হইতে লাগিল।

নিঃস্বার্থ কর্ম্মবীর পরোপকারী দয়ালু জেনারেল্‌ বুথের অসাধারণ সেবাব্রত এসময় সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বড় বড় লর্ড-পরিবারের সম্ভ্রান্ত মহিলারাও সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, এই মহাত্মার দৃষ্টান্তানুসারে রোগি-সেবা-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। উঁহারা কাঙ্গাল-বেশে, ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া, রাস্তার নিরাশ্রয় অন্ধ, খোঁড়া, এমন কি কুষ্ঠ রোগীদিগকেও আগ্রহের সহিত উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর বাসস্থানে লইয়া আসেন এবং অত্যন্ত যত্ন সহকারে তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। রোগীদিগের প্রতি ইঁহাদের দরদ ভালবাসা এবং রোগীদিগের অত্যাচারেও ইঁহাদের ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও দক্ষতার কথা শুনিয়া, ঠাকুর কান্দিয়া ফেলিলেন এবং উহাদিগকে দর্শন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"পরদুঃখে যাঁদের প্রাণ কাঁদে, তাঁরা তীর্থস্বরূপ, তাঁদের দর্শনেও লোক পবিত্র হয়।"

এই বলিয়া ঠাকুর, বেলা প্রায় দুটার সময় সকলকে লইয়া মুক্তি-ফৌজ দর্শন করিতে চলিলেন। সকলের সঙ্গে আমিও যাইতে প্রস্তুত হইলাম। ঠাকুর তখন আমার দিকে চাহিয়া, খুব স্নেহভাবে বলিলেন ঃ—"আমার আসনটি শূন্য ঘরে থাক্‌বে, তুমি এই সময়টুকু এখানে থাক্‌তে পার্‌বে না!"

একটী গুরুভাই বলিলেন—"কেন, বাসায় তো আরো লোক আছে!"

ঠাকুর আবার বলিলেন ঃ—"শুধু আসনের জন্যও নয়। মুক্তি-ফৌজের ভিতরে অল্পবয়সী যুবতী মেয়েরা সব আছেন, ব্রহ্মচারীর ওখানে যাওয়া কি ঠিক হবে?"

আমি ঠাকুরের অভিপ্রায় বুঝিয়া, যাইতে নিরস্ত হইলাম। নিজ আসনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, 'হায়রে কপাল! এই ব্রহ্মচর্য্যে আমার প্রয়োজন কি? যদি সর্ব্বত্র, সকল অবস্থায়, ঠাকুরের সঙ্গেই থাকিতে না পারিলাম!'

মনে বড় দুঃখ হইল,—ঠাকুরের উপর খুব অভিমানও আসিয়া পড়িল। ভাবিলাম,

ঠাকুর এই মাত্র বলিলেন, 'উঁহারা তীর্থস্বরূপ, উঁহাদের দেখ্‌লেও পুণ্য হয়।' ভাল, ঠাকুর সকলকে লইয়া তীর্থে গেলেন, সকলে পবিত্র হইবে, আর শুধু আমিই গেলে একেবারে অপবিত্র হইয়া যাইতাম। বিশেষতঃ ঠাকুর যেখানে স্বয়ং উপস্থিত থাকিবেন, সেখানেও আমাকে লইয়া যাইতে এত আশঙ্কা! ঠাকুর আমাকে কি এতই অপদার্থ, এতই কামুক মনে করেন! এই প্রকার আক্ষেপ করিতে করিতে ঠাকুরের উপর আমার অত্যন্ত অভিমান আসিয়া পড়িল। আমি ঠাকুরকে ভাবিতে ভাবিতে মুক্তি-ফৌজই দেখিতে লাগিলাম। এসময় নিজেরই অজ্ঞাতসারে, কল্পনার স্রোতে পড়িয়া সুন্দরী মেমেদের অঙ্গসৌষ্ঠব ও রূপলাবণ্য মনে মনে আঁকিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই অদম্য কামের উত্তেজনায় পড়িয়া গিয়া, আসন হইতে উঠিয়া পড়িলাম এবং একবার ঘর একবার বাহির করিয়া, ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। অবশেষে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে একেবারে অবসন্ন হইয়া বারান্দায় পড়িয়া রহিলাম।

আমার অভিমান চূর্ণ করিতে দয়া করিয়া ঠাকুরই আমার প্রকৃত রূপ আমাকে দেখাইলেন,—এ সময় আমি বেশ বুঝিলাম।

ঠাকুর আমাকে ব্রহ্মচর্য্য দিয়াছেন—সুতরাং এই ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া, শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে কিছুতেই তো প্রশ্রয় দিবেন না! এই জন্যই আমাকে স্ত্রীলোকদের ভিতরে নিজের সঙ্গেও নিলেন না। বলিলেনঃ—"ব্রহ্মচারীর ওখানে যাওয়া কি ঠিক হবে?"

তাহা আর আমি বুঝিলাম কই! আমি এই কথার অন্য প্রকার অর্থ বুঝিয়াছিলাম, যেন আমার প্রকৃতির দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়াই ঠাকুর ঐ সকল কথা বলিয়াছেন। যাহা হউক, নিজের অবস্থা নিজে না বুঝিয়া, যেমন ঠাকুরের কার্য্যে অভিমান করিয়াছিলাম, তেমনই দয়া করিয়া ঠাকুর আমার প্রকৃতি আমাকে দেখাইয়া, আমার সেই অভিমানটী চূর্ণ করিলেন।

ঠাকুরের অনুপস্থিত সময়ে, পোষ্টাফিসের ডেপুটী কণ্ট্রোলার ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী শ্রীযুক্ত উমাচরণ দাস মহাশয় আসিয়া, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কখন আসিলে গোঁসাইকে নির্জ্জনে পাইব?" ইঁহার সহিত আলাপে জানিলাম, দু এক দিনের মধ্যেই ইনি ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। ইঁহাকে আমি দু'টা হ'তে তিন্‌টার মধ্যে আসিতে বলিলাম।

গুরুভ্রাতা ডাক্তার শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আসিয়া ঠাকুরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইনি আমার বড় দাদার অত্যন্ত বন্ধু ও সমপাঠী, ইঁহার কথায়

দাদাকে ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আসিতে লিখিলাম। ঠাকুরের অনুমতির অপেক্ষাও করিলাম না।

ঠাকুর বাসায় আসিলে, অবসর মত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"নিয়মে থাকিয়া সাধন ভজন যতই করিতেছি, ততইতো রিপুর বৃদ্ধি দেখিতেছি। সাধারণ লোক অপেক্ষা সাধকদের কি রিপুর প্রাবল্য অধিক ? কামের উত্তেজনার তো কিছুতেই বিরাম হইতেছে না।"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"কাম, যে আমাদের শরীরে, মনে অত্যন্ত অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে। সাধারণ লোকদের অপেক্ষা সাধকদের আবার এসব অনেক প্রবল হ'য়ে থাকে। কারণ এসমস্ত তো আত্মারই বৃত্তি। জল উত্তাপাদি দ্বারা যেমন বৃক্ষের বৃদ্ধি হ'য়ে থাকে, সাধন ভজন দ্বারাও সেই প্রকার আত্মার বৃত্তিসকলের পুষ্টি হয়। তবে যতকাল এসকল বৃত্তি বহির্ম্মুখ থাকে, ততকালই রিপুর মত কার্য্য করে। অন্তর্ম্মুখ হ'লেই সাধক তখন বুঝ্‌তে পারেন, এসকলের বৃদ্ধির কত প্রয়োজন ছিল ; এই বৃদ্ধিতেই তখন আবার কত আনন্দ ! সাধন ভজন দ্বারা আত্মার সমস্ত বৃত্তির পুষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। এসকল বৃত্তি বহির্ম্মুখ অবস্থায় যত কাল থাকে, তত কালই রিপুর মত কার্য্য করে, অনিষ্ট-কর বোধ হয় ; কিন্তু ভগবৎকৃপায় একবার মুখটি ফিরে গেলে, তখন ইহারাই আবার পরম উপকারী হ'য়ে থাকে। সাধকদের জীবনের অবস্থা সমস্তই স্বতন্ত্র প্রকারের। সাধারণ লোকের মত এদের কিছুই নয়। একমাত্র তাঁর অনুগত হ'লেই নিরাপদ।"

কলেজের কতিপয় ছাত্রের সংকীর্ত্তন। মুকুন্দঘোষের আকর্ষণ।

ঠাকুর কলিকাতায় আসিয়াছেন শুনিয়া, একদিন শ্রীযুক্ত মুকুন্দ ঘোষ ঠাকুরকে কীর্ত্তন শুনাইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন, সেইমত দিনও ধার্য্য হইয়া যায়। ঠাকুর ঐ দিন অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, ভয়ানক জ্বর হইল, এদিকে মুকুন্দ ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্রের সেই দিনেই অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। মুকুন্দ ঘোষ তাহাকে লইয়া শ্মশানে গেলেন। অপরাহ্ণ প্রায় পাঁচ ঘটিকার সময়, বকুলাল বাবু, অমিয় বাবু প্রভৃতি কলেজের ছাত্রগণ, ঠাকুরকে গান শুনাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরের অসুখ সংবাদ পাইয়া

তাঁহারা আর উপরে উঠিলেন না, নীচে থাকিয়াই হরিসংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন ক্রমে ক্রমে বেশ জমাট হইয়া পড়িল, ঠাকুর অসুস্থ অবস্থায়ও, আসনে স্থির থাকিতে না পারিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং লাঠিতে ভর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নীচে যাইয়া কীর্ত্তনস্থলে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরকে দেখিয়া সকলেরই উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। ঠাকুর উচ্চ উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, গুরুভ্রাতারাও মাতিয়া গেলেন। এই কীর্ত্তনে, প্রায় দুই ঘণ্টা কাল সকলে ভাবাবেশে অভিভূত হইয়া রহিলেন। এই সময়ে মুকুন্দ ঘোষও হঠাৎ আসিয়া, কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কীর্ত্তনান্তে আমাদের কোন গুরুভ্রাতা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—"আপনি এ সময়ে কি প্রকারে আসিলেন ?" তিনি বলিলেন, "শ্মশানে প্রভুর কথা মনে হইতেই, প্রাণ যেন কেমন হইয়া গেল, তাই সৎকারের পরই বাড়ীতে না গিয়া ছুটিয়া আসিয়াছি, আসা আমার সার্থক, আজ আমার পূর্ণ দর্শন হইল। পূর্ব্বে আর এক বার প্রভুর এই রূপ দর্শন করিয়াছিলাম।"

অনুসন্ধানে জানিলাম, গত ১২৯৪ সালে ঠাকুর যখন শান্তিসুধার বিবাহের কথা স্থির করিতে কলিকাতা চোরবাগানে আসিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুর বাসায় ছিলেন, তখন একদিন নগেন্দ্র বাবুর সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি কাঁসারিপাড়ার শ্রীযুক্ত হরজহরের বাড়ী গিয়াছিলেন। ওখানে ঠাকুর ভগবানের নাম শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, মুকুন্দ ঘোষ কীর্ত্তন করেন। এই কীর্ত্তনে ঠাকুরের অবস্থা দেখিয়া অনেকে সঙ্গাশূন্য হন, মুকুন্দও একবারে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। সেই হইতে নিয়ত মুকুন্দের প্রাণে আকাঙ্খা ছিল যে, ঠাকুরকে আর একবার পাইলে কীর্ত্তন শুনাইয়া ঐ রূপ দর্শন করেন।

বৈষ্ণব দর্শন—মহাপ্রভুর কথা।

আজ ঠাকুর একটি ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইলেন। যোগজীবন, সতীশ এবং আমি ঠাকুরের সঙ্গে চলিলাম। অনেক রাস্তা হাঁটিয়া আমরা একটি বাড়ীতে পঁহুছিলাম। ভদ্রলোকটি ঠাকুরকে দেখিয়াই অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের সকলকেই তিনি তাঁর কোঠা ঘরের দোতালার বারান্দায় আগ্রহ করিয়া লইয়া গেলেন। ঠাকুর তাঁকে খুব ভক্তি করিয়া নমস্কার করিলেন। ভদ্রলোকটি বৃদ্ধ। মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত, গৌড়িয়া বৈষ্ণব অথবা কর্ত্তা-ভজা সম্প্রদায়ের খুব উচ্চ অবস্থার লোক বলিয়া অনুমান হইল। ভগবৎপ্রসঙ্গে নানাপ্রকার সাত্ত্বিক ভাব উভয়েরই শরীরে ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ কথা বার্ত্তার পর বৃদ্ধটি ঠাকুরকে

জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি শ্রীবৃন্দাবনে বহু দিন ছিলেন, ওখানে তাঁকে কখনও দেখিতে পাইলেন ? শুনিয়াছি, তিনি এখনও সেই শরীরেই আছেন।"

ঠাকুর বলিলেন :—হাঁ, ঠিক সেইই আছেন। এক দিন দয়া ক'রে হঠাৎ এসে উপস্থিত হ'লেন—দর্শন মাত্রেই বুঝ্‌লাম, মহাপ্রভু।"

বৃদ্ধটী জিজ্ঞাসা করিলেন :—"তার পর, কিছু বলিলেন কি ?"

ঠাকুর বলিলেন :—"দর্শন মাত্রেই পায়ের উপর প'ড়ে খুব কাঁদ্‌তে লাগ্‌লাম, কত কি বল্‌লাম। তিনি মাথায় হাত বুলায়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌লেন,— 'সমস্তইতো পূর্ণ হ'য়েছে, আর কেন ? স্থির হও, স্থির হও। আমিতো তোমাদেরই ঘরে কেনা'। ঐ সময়ে আমি সংজ্ঞাশূন্য হ'য়ে পড়্‌লাম। পরে জ্ঞান হ'লে উঠে দেখি, আর তিনি নাই, চ'লে গেছেন।"

ঘণ্টা দুই পরে আমরা ঠাকুরের সঙ্গে বাসায় আসিলাম।

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গৈরিক গ্রহণ।

অপরাহ্ণ প্রায় ৩ টার সময়, আমাদের পরম আত্মীয় বহুকালের পরিচিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়. ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে খুব সমাদর করিয়া বসাইলেন। তিনি বলিলেন, 'নির্জ্জনে আমার কিছু বলিবার আছে।' শুনিয়াই আমি আসন হইতে উঠিয়া বারান্দায় গেলাম। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গলার আওয়াজ একটু বড়, বারান্দায় থাকিয়াও তাঁর কয়েকটা কথা শুনিতে পাইলাম ; তিনি বলিলেন, "গঙ্গোত্রী হইতে হিমালয়ের উপরে গিয়া কিছুকাল ছিলাম। একদিন ব্যাসদেবের দর্শন পাইলাম। তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কয়েকটি উপদেশ দিলেন। এবং আপনার নিকট হইতে গৈরিক বস্ত্র গ্রহণ করিয়া, আপনার উপদেশ মত চলিতে বলিলেন। আপনি দয়া করিয়া আমাকে গৈরিক বস্ত্র দিন এবং কি প্রকারে আমাকে চলিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিন।"

ঠাকুর বলিলেন :—"সর্ব্বত্রই মঠ মন্দিরাদিতে ভগবানের বিগ্রহ দর্শন ক'রে সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে প্রণাম ক'র্‌লে উপকার হ'য়ে থাকে। সত্যকে লক্ষ্য রেখে সরল ভাবে চল্‌লেই সব হয়। গৈরিক ধারণ কর্‌লে, বীর্য্যও ধারণ ক'র্‌তে হয়, শাস্ত্রের এরূপ ব্যবস্থা আছে, না হ'লে বিশেষ অনিষ্ট হ'য়ে থাকে।"

এই বলিয়া ঠাকুর আমাকে ডাকিয়া নিজের একখানা বহির্ব্বাস, বিদ্যারত্ন মহাশয়কে দিতে বলিলেন। তিনিও ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া উহা লইয়া চলিয়া গেলেন।

ঠাকুরের শাসন ও সান্ত্বনা।

আমাদের বাসাটি ছোট হওয়াতে দিন দিন বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। সকালে ও রাত্রিতে লোকের ভিড় ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। কয়েকটি গুরুভগ্নী নিয়ত এখানে থাকাতে আর আর স্ত্রীলোকেরাও দলে দলে ঠাকুর দর্শন করিতে আসিবার সুযোগ পাইয়াছেন। ঠাকুর নিজেই দয়া করিয়া তাঁর ঘরে আমাকে আসন করিতে দিয়াছেন, তাই অনেকটা আরামে আছি। কিন্তু রান্না খাওয়া ও হোমাদি কার্য্যের খুবই অসুবিধা প্রত্যহ ভুগিতেছি। উপরের ঘরের সম্মুখের বারান্দায় আমি নিত্য হোম করি। এসময় প্রায়ই গুরুভ্রাতাভগ্নিদের সঙ্গে আমার ঝগড়া হ'য়ে থাকে। কাঁচা কাঠের ধোঁয়াতে সকলেরই প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। গুরুভ্রাতারা আমাকে এখানে হোম করা বন্ধ করিতে অনেক বার বলিয়াছেন, কিন্তু আমি কাহারও কথা গ্রাহ্য করি নাই, বরং উল্টা তাহাদিগকে ধম্‌কাইয়া দিয়াছি। আজ ভিজা কাঠ অনেক চেষ্টায় জ্বালাইয়া, যেমন তাহাতে কয়েকটি মাত্র আহুতি দিয়াছি—অতিরিক্ত ধুয়াতে অস্থির হইয়া,আমাদেরই একজন, তার ছেলেটিকে কোলে লইয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন—"তুমি কি রকম লোক! সকলকে মেরে ফেল্‌বে নাকি? রেখে দেও তোমার হোম! সকলকে জ্বালাতন কর্‌লে যে।" আমি উহার হাত নাড়া, মুখ নাড়া ও বিরক্তিভাবের কথা শুনিয়াই জ্বলিয়া উঠিলাম, এবং খুব তেজের সহিত বলিলাম—"বটে! লোকের উপর বড়ইতো দয়া দেখ্‌তে পাচ্ছি। ছেলেটা যখন টেঁ টেঁ ক'রে চিৎকার করে, আর সকলকে জ্বালাতন ক'রে তোলে, তখন ছেলেটার মুখ চেপে ধ'র্‌তে পারনা! তখন ছেলেটাকে সরিয়ে দাও? তোমাদের জ্বালা হয় ব'লে, আমার নিত্যকর্ম্ম আমি কর্‌ব না? বাঃ।" তিনিও আমার কথার উত্তর দিতে না পারিয়া সরিয়া পড়িলেন। সেই মুহূর্ত্তেই ঠাকুর আসন হইতে খুব বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেনঃ—"**কে আছ ওখানে, এক্ষণই আগুনে জল ঢেলে দেও। একি রকম! একটা সাধারণ কর্ত্তব্যবুদ্ধি নাই!**"

ঠাকুরের মুখ হইতে যেমনই ঐ কথা বাহির হওয়া, অমনি দুই তিনটি গুরুভাই জল আনিতে ছুটিয়া গেলেন। আমি নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া নিজের মান রাখিতে নিজেই

তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের আসিবার পূর্ব্বে জল ঢালিয়া আগুন নিবাইয়া দিলাম। ঠাকুর আমাকে দশজনের কাছে এতটা অপ্রস্তুত করিলেন মনে করিয়া ছাদের উপর চলিয়া গেলাম। লজ্জায় অভিমানে আমার সমস্ত শরীর যেন দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। ঠাকুরের উপর খুব রাগিয়া গেলাম। ভাবিলাম, এদিকে আপন আপন নিয়মে অটল থাকিতে দিনের মধ্যে দশবার উপদেশ দিচ্ছেন. এখন তো এদের কষ্ট দেখে আমার নিয়মটি ভেঙ্গে দিতে একবারও ভাব্‌লেন না! সীঁড়ি ঘরে যাইয়া আবার আগুন জ্বালিয়া হোম করিলাম। আর ঠাকুরের ঘরে যাইব না স্থির করিয়া নিতান্ত অপ্রশস্ত চারফুট মাত্র স্থানে কুকুর-কুণ্ডলী হইয়া পড়িয়া রহিলাম। সমস্তটি দিন মানসিক ক্লেশে ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইলাম।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে, ঠাকুর অকস্মাৎ ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আমাকে ওখানে ঐ অবস্থায় দেখিয়া বলিলেনঃ—"কি তুমি এখানে হোম কর্‌বার ঠিক ক'রে নিয়েছ? সে বেশ হ'য়েছে! সকলকে ক্লেশ দিয়ে কি ও ভাবে কিছু কর্‌তে আছে? উপাসনা কর্‌তে গিয়ে কারো ক্লেশ জন্মালে—উপাসনা হয় না। বিশেষতঃ বৃদ্ধ, বালক, রোগী ও গর্ভবতী, এদের সুবিধা সকল অবস্থায়ই সকলের আগে দেখ্‌তে হয়। না হ'লে অপরাধ হ'য়ে পড়ে। যাও,এখন গিয়ে রান্না কর।"

ঠাকুর এমন স্নেহভাবে এই কথা কয়টি বলিলেন যে, আমার ভিতর একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেল। ঠাকুর কখনও কারো ক্লেশ দেখিয়া সহ্য করিতে পারেন না—এ আবার শিশুর ক্লেশ ও রোগীর ক্লেশ! তারপর আমার মানসিক ক্লেশেইবা উদাসীন রহিলেন কই? কখনও ছাদে আসেন না, আজ আমার যাতনার বিষয় কিছু না বলাতেও,—নিজে উহা অনুভব করিয়া আমাকে ঠাণ্ডা করিতে, ঠাকুর ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধন্য দয়াল ঠাকুর! এই দয়াইত আমাদের ভরসা!

আজ অপরাহ্নে বাসাটি লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের একটি অনুগত শিষ্য আসিয়া বহুক্ষণ ঠাকুরের সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিলেন। আমি এই সময় রান্নার চেষ্টায় ছাদে চলিয়া গেলাম, সময় সময় আসিয়া দু-একটা কথা শুনিয়া যাইতে লাগিলাম। তিনি তাঁর গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া ভক্তিভাবে গদগদ হইয়া বলিলেন,—'ধন্‌, মন্‌, তন্‌,' এ সমস্তই গুরুদেবের চরণে উৎসর্গ না হ'লে কিছুই হ'ল না, সবই বিড়ম্বনা। কথাটি শুনিয়া বড়ই ভাল লাগিল।

মা আনন্দময়ীর সঙ্গীত।

আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুর স্ত্রী (শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবী) আমাদের অনেক গুরুভগ্নীদিগকে সঙ্গে লইয়া অপরাহ্নে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর ইঁহাকে 'মা আনন্দময়ী' বলিয়া ডাকেন। মা আনন্দময়ী যখন যেখানে যান, স্বাভাবিক স্নেহ ভালবাসাতে সেখানকার সকলকে যেন আনন্দে ডুবাইয়া রাখেন। আমি রান্নার চেষ্টায় হয়রাণ হইয়া যাইতেছি বুঝিতে পারিয়া, মা আমাকে বলিলেন,—'কেন বাবা এ কষ্ট? সকলের সঙ্গে এক মুটো খেয়ে নিলেইতো পার!' আমি বলিলাম :—'কি কর্‌বো মা! নিজে রান্না ক'রে খাই, ইহা যে উনি ভাল বাসেন! আমি তো আপনাদের সেই ব্রাহ্ম-সমাজের ছেলে,—সবই পারি, কিছুই বাধে না।' রান্না করিয়া কোন প্রকারে আহার করিয়া নিজ আসনে যাইয়া বসিলাম। সন্ধ্যা-কীর্ত্তন শেষ হইতে রাত্রি প্রায় নয়টা হইল।

ঠাকুরের আহারান্তে মা আনন্দময়ী একটি একতারা লইয়া গান আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে গান এমন জমাট হইয়া পড়িল যে, সকলেই নিশ্চল ভাবে আপন আপন আসনে পুত্তলিকার মত স্থির হইয়া রহিলেন। মা আনন্দময়ী ভাবে বিভোর। কিছুক্ষণ পরে কীর্ত্তনের পদ মধুর কণ্ঠস্বরে মিলিত হওয়ায়, এমনই ভাবের তরঙ্গ উঠিয়া পড়িল যে, ঠাকুরও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ঘন ঘন অশ্রু-কম্প-পুলকাদিতে অবশ হইয়া আসনেই বারংবার ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। ঐ সময় 'হরিব'ল' 'হরিব'ল' 'জয়-রাধে' 'জয়রাধে', আঃ উঃ ইত্যাদি এক একটি শব্দ ঠাকুরের মুখ হইতে নির্গত হইয়া, একটা প্রবল শক্তি ঝঞ্ঝাবাতের মত আসিয়া, ঘরের ভিতরে ও বাহিরে সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। চারিদিকে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। কেহ কেহ চীৎকার করিতে লাগিলেন—কারো কারো বাহ্য সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। আবার কতকগুলি লোক মূর্চ্ছিত অবস্থায়ই গড়াইতে গড়াইতে ঠাকুরের দিকে চলিলেন। আমার কখনও ভাব হয় না, আমি স্থির হইয়া সকলের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও ভাবের বিকাশ দেখিতে লাগিলাম। এই রূপে ক্ষণে স্থির, ক্ষণে অস্থির অবস্থায়, প্রায় সমস্তটি রাত্রি অতিবাহিত হইল।

মা আনন্দময়ীর পুত্র (মনীন্দ্রনাথ) বলিলেন,—"ঐ সময় গোঁসাইর ভিতর হইতে প্রবল শক্তি আসিয়া আমাকে অভিভূত করিল। মনে হইল আজ গোঁসাই এ ভাবেই আমাকে শক্তি সঞ্চার করিয়া কৃপা করিলেন।"

—:•:—

প্রসাদী বস্ত্র স্পর্শে ভাবাবেশ

ঠাকুর দিনরাত আসনেই বসিয়া থাকেন। বিশেষ প্রয়োজন না হইলে কখনও আসন ছাড়িয়া উঠেন না। ঠাণ্ডা ঘরে একটানা বসিয়া থাকাতেই বোধ হয় পায়ে বাতের বেদনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে শীতও খুব পড়িয়াছে। গুরুভ্রাতা মনি বাবু এবং বৃন্দাবন বাবু ঠাকুরের জন্য একটি উলের ট্রাউজার আনিয়া ঠাকুরকে পরিতে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুর এ সকল কখনও ব্যবহার করেন না, কিন্তু উহাদের আগ্রহ দেখিয়া খুব সন্তোষভাবে গ্রহণ করিলেন। এবং ৫।৭ মিনিট পরিয়া রহিলেন। পরে উহা খুলিয়া বৃন্দাবন বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন ঃ—

"বৃন্দাবন! তুমি এটি পর, তুমি পর্‌লেই আমার পরা হবে।"

বৃন্দাবন বাবু কোনও প্রকার দ্বিধা না করিয়া, তৎক্ষণাৎ উহা পরিয়া বসিলেন। আমরা সকলে দেখিয়া বড়ই বিরক্ত হইলাম। ভাবিতে লাগিলাম ঠাকুরের ব্যবহৃত বস্ত্র স্বয়ং হাতে ধরিয়া দিলেন, উহাতো মাথায়ই রাখিতে হয়, বৃন্দাবন বাবুর এ কি প্রকার ধৃষ্টতা যে, অনায়াসে উহা পায়ে লাগাইয়া পরিলেন!

তিন চার মিনিট পরেই বৃন্দাবন বাবু উহা অতিশয় ব্যস্ততার সহিত খুলিয়া ফেলিলেন এবং খুব বিস্ময়ের সহিত ঠাকুরকে বলিলেন ঃ—"মশায়! একি !! একটা ইন্‌এনিমেট্‌ (Inanimete) বস্তুতেও এত ইলেক্ট্রীসিটি (Electricity) ঢুকিল! আমার সমস্তটি শরীর ঝিম্‌ ঝিম্‌ করিতেছে, কিছুতেই আর এটি রাখিতে পারিলাম না! এ কি রকম? এই বলিয়া বৃন্দাবন বাবু পুনঃ পুনঃ শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। আমরা তো তখন অবাক্‌! ভাবিলাম, ঠাকুরের হাত পা টিপিয়া শরীরের সেবা করিয়াও তো কত সময় কাটাইয়া দিতেছি, কিন্তু কখনওতো এমন একটা কিছু অনুভব হয় না যাহাতে শরীর মন অস্থির বা অন্য প্রকার হয়! আর দু-চার মিনিটের জন্য ঠাকুরের ব্যবহৃত বস্ত্র বৃন্দাবন বাবু স্পর্শ করিয়া এমনই হইলেন যে, শরীর তাঁর একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। পুনঃ পুনঃ কম্পিত হইতে লাগিলেন। এবং কিছুক্ষণ তিনি একেবারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। একি আশ্চর্য্য! বৃন্দাবন বাবুর সমস্তই অদ্ভুত!

মধ্যাহ্নে ঠাকুরের আহারান্তে প্রসাদ লইয়া মহা হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। বৃন্দাবন বাবু খুব নিরীহ প্রকৃতির লোক বলিয়া আজ প্রসাদ পাওয়ার সুবিধা করিতে পারিলেন না। শূন্য পাতা খানা মাত্র কুড়াইয়া নিয়া দ্রুত পদে নীচে চলিয়া গেলেন। উহা কপালে কয়েক

বার স্পর্শ করাইয়া, খুব আগ্রহের সহিত ডাঁটা সহিত সমস্ত কলাপাতা খানাই চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তাঁর ভক্তিভাবে ছল্ ছল্ চক্ষু ও সমস্তটি মুখের এক প্রকার চমৎকার প্রভা দেখিয়া, বিস্মিত হইলাম। ধন্য বৃন্দাবন বাবু!

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঠাকুর কয়েকটি গুরু ভ্রাতার সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে বৃন্দাবন বাবুর বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বৃন্দাবন বাবুও তখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন, ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন:—"বৃন্দাবন তোমার বাড়ীটিত বেশ, তোমার সেই কুঞ্জ কই ? শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন। ঠাকুর কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়াইয়া করযোড়ে বাড়ীটিকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া, বাসায় চলিয়া আসিলেন। একটু পরে কথায় কথায় বলিলেনঃ— "বৃন্দাবনের বাড়ী যেয়ে শরীরটি আমার ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল, ইচ্ছা হ'ল একবার ঐ মাটিতে প'ড়ে খুব গড়িয়ে নেই। বাড়ীটি কি সুন্দর! পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন!"

রাত্রিতে বৃন্দাবন বাবু আসিয়া ঠাকুরের ঐ কথা শুনিতে পাইয়া ঠাকুরকে বলিলেন "মশায়! বাড়ী পরিষ্কার হোক্, আর যাই হোক্ এখন ভূতের জ্বালাতনে যে বাড়ীতে টেকা শক্ত হ'য়ে প'ড়্‌লো! আপনার সাধন নিয়ে আর কিছু হোক্ আর নাই হোক্, ভূতে কিন্তু বেশ বিশ্বাস হ'ল।"

ঠাকুর বলিলেন:—"শুধু ভূতে কেন! যাহা সত্য সে সকলেই ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস হবে। সবইতো উড়ায়ে দিয়ে ব'সে ছিলে!"

আমাদের একটি গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত নন্দবাবু অন্য সম্প্রদায়ের একটি মহাত্মার নিকট যাতায়াত করিয়া, তাঁহার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। অদ্য তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—"গুরুর সঙ্গ অপেক্ষা অন্য কোন সাধুর সঙ্গে যদি অধিক আনন্দ হয়, তা'হলে সেখানে যাওয়া যায় কিনা ? এবং গুরুর নিকট না আসাতে কোন অপরাধ হয় কিনা ?"

ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন:—"যার যেখানে গিয়ে আনন্দ হবে, উপকার পাবে, সে সেখানেই যাবে। গুরুর কাছে যেয়ে আনন্দ না হ'লে, উপকার না পেলে, সেখানে না যাওয়াই ভাল। এরূপ স্থলে যাওয়াতে বরং পাপই হয়।"

বাসা পরিবর্ত্তন।

১৫ই অগ্রহায়ণ।

আমাদের বর্ত্তমান বাসাতে জলের, পাইখানার, রান্নার ও থাকার বড়ই অসুবিধা হইতেছে, তাহার উপর দিন দিন লোক সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ঠাকুর-মা একটি ঝি ও * সীতানাথকে সঙ্গে লইয়া কিছুকাল এখানে থাকিবার প্রত্যাশায়, শান্তিপুর হইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু চারি পাঁচ দিন মাত্র থাকিয়াই চলিয়া গেলেন। শ্রীমতী শান্তি সুধা ও তাহার ছেলে (দাউজী) দ্বারভাঙ্গায় ছিলেন। ঠাকুর তাহাদের এখানে আনাইয়াছেন। শান্তির সঙ্গে থাকিবার সুযোগ পাইয়া কয়েকটি গুরু-ভগ্নীও উপস্থিত এখানেই রহিয়াছেন। মনি বাবু, বৃন্দাবন বাবু প্রভৃতি তিন চারিটি গুরু-ভ্রাতা, বাড়ী ঘরের সম্বন্ধ একেবারে ছাড়িয়া দিয়া আফিসের সময় বাদে দিবা রাত্রি এখানেই আছেন। তাঁহারা ভাতে-সিদ্ধ-ভাত খাইয়া আফিসে চলিয়া যান, রাত্রিতে মুড়ি মুড়কি দু এক মুটা পাইলেই যথেষ্ট মনে করেন। তার পর নবাগত লোকের সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। এদিকে বাড়ীর মালিক সুরেশ বাবুরও ছুটি শেষ হইয়া আসিল। সুতরাং অবিলম্বেই আমাদের অন্যত্র না যাইয়া উপায় নাই। ঠাকুর সকলকেই একটি বাসার অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গুরুভ্রাতারা নিজে-দের বাসার সন্নিকট বাড়ী তালাস করিয়া সুবিধা অসুবিধা ঠাকুরকে জানাইতেছেন। শ্রীচরণ বাবুর চেষ্টায় শ্যামবাজার বড় রাস্তার তেমাথার উপরে কান্তি ঘোষের বাড়ীর তেত-লাটি মাত্র ভাড়ায় পাওয়া গেল। বাসা খানা নবীন বাবুর বাড়ীর কাছে, রাস্তার ঠিক বিপরীত দিকে। কিন্তু তেতলায় ঠাকুরের থাকা হইলে নিয়ত উঠা নাবা সকলেরই অসু-বিধা হইবে বলিয়া, ঠাকুর একটু অসম্মতি জানাইলেন। পরে নবীন বাবু প্রভৃতি গুরুভ্রাতা-দের আগ্রহ এবং মনি বাবুর জেদ্ দেখিয়া, অগত্যা সেই বাসায়ই যাইতে রাজি হইলেন। পরদিন আহারান্তে আমরা ঐ বাসাতেই যাইব, স্থির হইয়া গেল।

"শ্যাম বাজারের বাসা।"

১৬ই অগ্রহায়ণ।
১লা ডিসেম্বর।
মঙ্গলবার।

অদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতার পারলৌকিক কল্যানার্থে উপাসনাদি হইবে। ঠাকুর নিমন্ত্রিত হইয়া যোগজীবনের সহিত তথায় চলিয়া গেলেন। শ্যামবাজারের নূতন

---

* শ্রীমান সীতানাথ, প্রভুজীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৺ ব্রজগোপাল গোস্বামীর পৌত্র ও যোগেন্দ্রনাথ গোস্বামীর পুত্র।

বাসায় উপস্থিত বেবন্দোবস্তের ভিতরে পীড়িতাবস্থায় শান্তিসুধার থাকার অসুবিধা হইবে, এই জন্য শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন বাবু তাঁহার বাসায় উহাকে লইয়া গেলেন। শান্তিসুধা এখন কয়েক দিন সেখানেই থাকিবেন।

অপরাহ্নে আমরা সমস্ত জিনিসপত্র লইয়া শ্যামবাজারের বাসায় পঁহুছিলাম। এবাড়ীর তেতলাটিমাত্র আমাদের জন্য নেওয়া হইয়াছে। হল্-ঘরের মধ্যস্থলে, দেওয়ালের ধারে, উত্তরমুখে ঠাকুরের আসন পাতিলাম। ঠাকুর নিজ আসনের পশ্চিমদিকে, দরজাটি মাত্র ব্যবধান রাখিয়া, আমাকে আসন করিতে বলিলেন, আমি সেইমত ঠাকুরের বামদিকে প্রায় চার ফুট অন্তরেই নিজের আসন করিলাম। নিত্যহোম আমার অন্যত্র করিতে হইবে।

বাসার অবস্থা দেখিয়া খুব ভালই মনে হইল। হল্-ঘরের ভিতরে অনায়াসে পঞ্চাশ জন লোক থাকিতে পারে। এই ঘরের দক্ষিণে ও উত্তরে অপ্রশস্ত লম্বা বারান্দাও রহিয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে দুই খানা ঘর আছে। পূবের ঘরের সম্মুখে, দক্ষিণ দিকে দোতলার প্রকাণ্ড ছাদ্, এবং পশ্চিমের ঘরের সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে বড় একখানা রান্না ঘর আছে। বাড়ীর একেবারে উত্তর পূর্ব্ব কোণে একটি মাত্র পাইখানা। উহা ঠাকুরের ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিল।

হলরূমের পশ্চিম দিকের ঘরখানাতে ভাণ্ডার রাখার ব্যবস্থা হইল। চব্বিশ ঘণ্টা ঠাকুরের নিকট গুরুভ্রাতারা বসিয়া থাকিতে অসুবিধা বোধ করেন। সুতরাং এইঘরে প্রয়োজন মত তাঁহাদের বিশ্রাম করাও চলিবে। হলের পূর্ব্বদিকের ঘর, মেয়েদের জন্য রহিল।

তেতলায় জলের কোন ব্যবস্থা নাই, ভারীর দ্বারা জল তুলিয়া লইতে হইবে। পাইখানা একটি মাত্র থাকায় গুরুভ্রাতারা নবীন বাবুর বাড়ী যাইবেন। রাস্তা হইতে তেতলা পর্য্যন্ত সোজা সীঁড়ি থাকাতে ঐ বাড়ীতে যাতায়াতের কোন ক্লেশ নাই। নবীন বাবু তাঁর বাড়ীখানা গুরুভ্রাতাদেরই দিয়া রাখিলেন। আবশ্যকমত যে কেহ ওখানে অবাধে যাইতে ও থাকিতে পারিবেন।

আজ সন্ধ্যা হইতে না হইতেই দলে দলে গুরুভ্রাতারা আসিয়া পড়িলেন। খোল করতাল লইয়া সংকীর্ত্তনের খুব ঘটা পড়িয়া গেল। সকলেরই এ বাসায় আসিয়া মহা আনন্দ। সংকীর্ত্তনান্তে ঠাকুর স্বহস্তে হরির লুট দিলেন। গুরুভ্রাতারা আজ অনেকেই এখানে রাত্রি যাপন করিলেন। রাত্রি প্রায় একটা পর্য্যন্ত আনন্দ—আলাপে কাটাইয়া আমরা নিদ্রিত হইলাম।

শ্যামবাজারে ঠাকুরের দৈনন্দিন কার্য্য।

শেষ রাত্রিতে, প্রায় চার্‌টার সময় ঠাকুর আসনে উঠিয়া বসেন। গুরুভ্রাতারাও অনেকেই এই সময় জাগ্রত হন, এবং আপন আপন আসনে বসিয়া সাধন করিতে আরম্ভ করেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর করতাল বাজাইয়া দুই তিনটী গান করেন। তৎপরে গুরুভ্রাতারা ভোর পর্য্যন্ত প্রাতঃসঙ্গীত করিয়া থাকেন।

ঠাকুর কীর্ত্তনান্তে প্রত্যুষে আসন ত্যাগ করিয়া শৌচে যা'ন। অর্দ্ধঘণ্টা পরে আসনে আসিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন। বেলা প্রায় আটটার সময়ে চা সেবা হয়। তৎপরে কিছুক্ষণ গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া পাঠ আরম্ভ করেন। প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত পাঠ হয়। ১১ টার পরে অর্দ্ধঘণ্টার জন্য শৌচে যা'ন। ১২টার সময় আহার হয়। আহারের পর অর্দ্ধঘণ্টাকাল ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবার অবসর পাওয়া যায়। তৎপরে ঠাকুর ধ্যান-মগ্ন অবস্থায় প্রায় ৪টা পর্য্যন্ত কাটাইয়া দেন। এই সময়ে অবিরল ধারে অশ্রু বর্ষণে, ঠাকুরের বুকের আলখিল্লা ভিজিয়া যায়। ৪ টার পর তাঁহার বাহ্যস্ফূর্ত্তি হয়। তখন নানা শ্রেণীর লোকের সমাগমে ঘরটি পরিপূর্ণ হইয়া যায়। কথা-বার্ত্তা, প্রশ্ন-উত্তর, হাসি-গল্প সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। আমি নিজের রান্নার ব্যাপারে এই সময় ব্যস্ত থাকি সুতরাং অনেক প্রয়োজনীয় কথা শুনিতে পাই না। বিশেষ কোন ঘটনা ঘটিলে, বা প্রয়োজনীয় উপদেশ হইতে থাকিলে, রান্না ফেলিয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হই। রান্না ঘরটি খুব নিকটে বলিয়া এ বিষয়ে আমার বেশ সুবিধা হইয়াছে।

সন্ধ্যার সময় হরিসংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। এই সময় ঘরের ভিতরে সকলের স্থান হয় না। সংকীর্ত্তন সাধারণতঃ রাত্রি ৯৷৹ সাড়ে নয়টার মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। পরে ঠাকুরের সেবা হয়। তৎপরে রাত্রি প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে ঠাকুরের হাসি গল্পে, কথায়-বার্ত্তায়, কাটিয়া যায়, তার পর একেবারে নিস্তব্ধ। রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেলে ঠাকুর একবার শয়ন করেন। কোন কোন দিন সমাধিস্থ থাকায় শয়ন করাও হয় না। এই ভাবে সমস্ত দিনরাত্র অতিবাহিত হইতেছে।

যথার্থ সত্য কি উপায়ে লাভ হয়।

আকাশবাণী—"গণ্ডি ছাড়"।

১৭ই অগ্রহায়ণ, বুধবার। ঠাকুরের বিশেষ ঘনিষ্ঠ—লব্ধ প্রতিষ্ঠ—কৃতবিদ্য একটি ব্রাহ্ম বন্ধু (শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত) ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—'যথার্থ সত্য কি উপায়ে লাভ হয়' ?

ঠাকুর বলিলেন :—"যথার্থ সত্যলাভ ক'রতে হ'লে, সকল প্রকার সংস্কার বর্জ্জিত হ'তে হয়। সংস্কার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ হ'লে, মনটি একেবারে নির্ম্মল হ'য়ে যায়, তখন কোন ভাবই আর থাকে না। সেরূপ অবস্থায়ই সত্যের অনু- সন্ধান। মত, আচরণ, ভাব ও সংস্কার, মন হ'তে একেবারে চ'লে গেলে যা লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত সত্য। সংস্কার বর্জ্জিত অন্তরে সত্যের এক কণা মাত্র প্রকাশ হলেও, তাহাই অমূল্য। বৌদ্ধ যোগীরা প্রণালীগত উচ্চসাধন অবলম্বন কর্‌বার প্রারম্ভেই এই সংস্কারটিকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট ক'রে নেন্‌। এতে,— তাঁদের প্রায় তিন বৎসর সময় লাগে। গোড়াতে সংস্কার বর্জ্জিত হয় ব'লেই বৌদ্ধদিগকে অনেকে নাস্তিক বলে।"

একটু থামিয়া ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন :—"যাঁরা কোন কোন মতের বা সংস্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে চলেন, তাঁরাই বিশেষ বিশেষ দলের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েন। যাঁরা কোনও মতামতের বা সংস্কারের অধীন না হ'য়ে, কেবল মাত্র নিজের অন্তরে সত্যেরই অনুসন্ধান করেন, তাঁদের কোনও দল নাই, সম্প্রদায়ও নাই। (ব্রাহ্মধর্ম্মের) প্রচারক অবস্থায় কিছুকালের জন্য আমি বাগ-আঁচড়ায় ছিলাম, ঐ সময় আমার কার্য্য প্রণালী ও বক্তৃতা উপদেশাদি নিয়ে ব্রাহ্ম-সমাজের ভিতরে খুব হুলুস্থুল প'ড়ে ছিল। আমি অত্যন্ত অশান্তিতে দিন কাটাতে লাগলাম্‌। আমার কয়েকটি বন্ধু, ক'লকাতা হ'তে পুনঃ পুনঃ ঐ সমস্ত আলোচনার প্রতিবাদ কর্‌তে, আমাকে লিখ্‌তে লাগ্‌লেন এবং আমাকে কল্‌- কাতায় উপস্থিত হ'তে বল্‌লেন। আমি বিষম সমস্যায় প'ড়ে গেলাম। নিজের কর্ত্তব্য বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়ে, ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে থাকা ঠিক হবে কি না, প্রাণে সর্ব্বদা এই আলোচনা হ'তে লাগ্‌ল। আমি ভগবানের নিকটে প্রার্থনা

করলাম্ ঃ—'ঠাকুর, এ সময় আমার কি করা কর্ত্তব্য, বলে দাও।' এ সময় পরিষ্কাররূপে আকাশবাণী হ'লো, শুন্‌লাম গণ্ডির ভিতরে থাক্‌লে জীবনে সত্য-লাভ হবে না।" আকাশবাণী শুনে আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম। মানুষের দিকে চেয়ে চল্‌লে, ধর্ম্ম কর্ম্ম কখনও হয় না। মানুষে আমার কার্য্যের নিন্দাই করুন, আর প্রশংসাই করুন, সেই দিকে দৃষ্টি পড়্‌লেই সর্ব্বনাশ। কারও দিকে না তাকায়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে, যদি নিজের কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে কার্য্য ক'রে যেতে পারি, তবেই রক্ষা, নাহ'লে নিজকে বাঁচান বড়ই কঠিন। সত্য অনন্ত,—সত্যের ভাব অনন্ত,—সত্যের রূপ অনন্ত, আবার এই সত্যলাভের উপায়ও অনন্ত। এই সত্যলাভের জন্য সকলকেই যে একই পথে, একই মতে চ'লতে হবে তা বলা যায় না। মানুষ যেমন পৃথক পৃথক, তাদের প্রকৃতিও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। সকলকেই আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী চল্‌তে হবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন পথ, সুতরাং প্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অব-লম্বন করা আবশ্যক হয়।"

একটি লোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়! আহারের সঙ্গে কি ধর্ম্মের কোনও প্রকার সম্বন্ধ আছে?"

ঠাকুর বলিলেন,ঃ—"হুঁ, খুব আছে। আহার বিষয়ে খুব সাবধান হওয়া প্রয়োজন। অপবিত্র আহারে, শরীরে ব্যাধি জন্মে। মনও অত্যন্ত চঞ্চল হয়। সুতরাং ধর্ম্মলাভ কঠিন হ'য়ে পড়ে। সর্ব্বদা পবিত্র আহার ক'রতে হয়।"

আনুগত্যই—ব্রহ্মচর্য্য।

আজ সমস্ত দিন উদ্বেগে অশান্তিতে গিয়াছে। ধর্ম্মলাভ করিব আশায় সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, অনাহারে অনিদ্রায় কত ক্লেশ করিয়া দিন কাটাইয়া দিতেছি, কিন্তু কোন একটা বিষয়েই তো কৃতকার্য্য হইব এরূপ ভরসা পাইতেছি না। ঠাকুর ব্রহ্মচর্য্য দিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত! তাতে উপকার আর কি হইতেছে! স্ত্রীসঙ্গটাই মাত্র করিতেছি না। মনে

মনে সমস্তইতো চলিতেছে। একটি সুন্দর—স্ত্রীলোক দেখিলে সেই ধ্যানেইতো থাকিতে অধিক আরাম পাই। হায়! হায়!! আমি আবার জীবনে ধর্ম্মলাভ করিব? যে সকল গুরুভ্রাতারা স্ত্রীসঙ্গ করিতেছেন, তাঁহারাও তো আমা অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট অবস্থা লাভ করিয়া আনন্দ করিতেছেন! সুতরাং এ ব্রহ্মচর্য্যে লাভ কি, যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য আর হইল কই? ··· ··· ইত্যাদি চিন্তায় আমার মাথা গরম হইয়া উঠিল। সকলে নিদ্রিত হইলেন আমি বিছানায় পড়িয়া সময় সময় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছি, ঠাকুর সমাধিস্থ—রাত্রি প্রায় দুটা, অকস্মাৎ ঠাকুরের মুখ দিয়া এই কথা কয়টি বাহির হইয়া পড়িল :—

"এক পরিবারে দুই কর্ত্তা, এক রাজ্যে দুই রাজা, মঙ্গল কখনও হয় না। নিজে ম'রে গিয়ে ইষ্টদেবতাকে দেহমনের রাজা কর্‌তে হবে। না হ'লে আর কল্যাণ নাই। বৃক্ষের বীজ পচ্‌লেই তা অঙ্কুরিত হয়। অভিমান নষ্ট হ'লেই চিত্তে চৈতন্য প্রকাশ পাবে।"

একটু থেমে আবার বল্‌লেন :—"গভীর নিশীথে, নির্জ্জনে, নিজের ভিতরে প্রবেশ ক'রে অনুসন্ধান ক'রলে ক্রমে জানা যায়, "আমি কি"!

ব্রহ্মচর্য্যই সমস্ত সাধনের গোড়া। অনুগত না হ'লে সেটি হ'বার যো নাই। একমাত্র গুরুকৃপায়ই যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য লাভ হয়। ব্রহ্মচর্য্য হ'লে আর কিছুই বাকী থাকে না। তখন সমস্ত অবস্থা "করতলন্যস্ত আমলকবৎ" হ'য়ে থাকে। আনুগত্যই ব্রহ্মচর্য্য।"

আমি অবশিষ্ট রাত্রি ঠাকুরের এই কথা কয়টি ভাবিয়া কাটাইলাম। কোন প্রশ্ন নাই, ইঙ্গিত নাই, নিজের জ্বালায় নিজে জ্বলিতেছি, সমাধিস্থ থাকিয়াও ঠাকুর তাহা অনুভব করিয়া উপদেশ দানে আশ্বস্ত করিলেন। ধন্য দয়াল ঠাকুর!

এ দেশের যথার্থ কল্যাণ কিসে হইবে।

ঠাকুর এই বাড়ীতে আসিয়াছেন পরে, বহুলোকের সমাগম হইতেছে। দর্শন প্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ঠাকুর অপরাহ্ণ চারিটা হইতে সন্ধ্যা কাল পর্য্যন্ত সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। প্রতিদিনই অপরাহ্ণে বহুদূর হইতেও বিভিন্ন অবস্থার লোক, সঙ্গ প্রত্যাশায়, ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইতেছেন। শিক্ষিত সমাজের শীর্ষস্থানীয় মহা-

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়, ঠাকুরের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলাপ আলোচনায় পরম সন্তোষ লাভ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এদেশের যথার্থ কল্যাণ কিসে হইবে ?"

// ঠাকুর এই প্রশ্ন শুনিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ—"স্কুল কলেজের ছেলেদের জীবনের উপরেই দেশের সমস্ত কল্যাণ নির্ভর কর্‌ছে ! আমাদের দেশে ঋষিদের সময়ে তাঁহারা ছেলেদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই, বীর্য্যধারণ ও সত্যরক্ষা অভ্যাস করায়ে দিতেন। বর্ত্তমান সময়ে ছেলেদের শিক্ষা সে প্রণালী ধ'রে হয় না। এজন্য শিক্ষালাভ ক'রেও সে প্রকার ফল হয় না। আমি যখন ঢাকাতে ছিলাম, স্কুল কলেজের ছেলেরা এসে প্রায়ই এই প্রশ্ন কর্‌তেন, ... 'মশায় আমাদের কু-অভ্যাস কিসে ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ব ? ছেলেবেলা আমাদের পিতা, মাতা, শিক্ষক, বা অভিভাবকেরা কখনও বুঝায়ে দেন নাই যে, বীর্য্য নষ্ট করা অনিষ্টকর। সুতরাং সে বিষয়ে সাবধান হ'তে কখনও চেষ্টাও করি নাই। এখন বুঝ্‌ছি যে ওতে আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাচ্ছে। কিন্তু কি ক'র্‌ব ! অনেক কালের কু-অভ্যাস, এখন আর বহু চেষ্টাতেও, ছাড়াতে পারচ্ছিনা।' বাস্তবিক সর্ব্বত্রই এ বিষয়ে ছোট ছোট ছেলেদের ভিতরে একটা শিক্ষা না থাকাতে, ভয়ঙ্কর ক্ষতি হ'চ্ছে। আমাদের দেশে যাঁরা শিক্ষকতা ক'রছেন, তাঁরা যদি ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিলে মিসে এমন সুবিধা ক'রে দেন যে, ছেলেরা তাঁদের ভিতরের সমস্ত অবস্থা নিঃসঙ্কোচে শিক্ষকদের নিকট ব'লতে পারে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এ সকল কু-অভ্যাসের পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ, সে বিষয়ে একটা সংস্কার ছেলেদের মনে জন্মায়ে দেন, তাহ'লেই তাদের এবং দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয়। যে শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন এবং যার উপর ব্যক্তিগত জীবনের ও দেশের সমস্ত মঙ্গল নির্ভর কর্‌ছে, সম্প্রতি দেশে আর সে শিক্ষা নাই। একবার অনেক দিন হয় হিমালয়ে একটি মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম, এদেশের কল্যাণ কিসে হয়' ? তাতে তিনি ব'লেছিলেন, 'একমাত্র সত্য ও বীর্য্য রক্ষা ক'র্‌লেই দেশের কল্যাণ হবে।' তা ব্যতীত দেশের আর কল্যাণ নাই।"

ঠাকুর এ বিষয়ে আরও অনেক কথা বলিলেন। ব্রজেন্দ্র বাবু দেশ মান্য, সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক। ঠাকুরের মুখে এসকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

ধর্ম্ম,—সহজ লভ্য নয়।

১৮ই অগ্রহায়ণ, কয়েকটি ভদ্রলোক আসিয়া ধর্ম্ম কি উপায়ে সহজে লাভ হয়, এ বিষয়ে ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন।

ঠাকুর বলিলেন,ঃ—"আজকাল দেখ্‌ছি, সকলেই খুব সহজে ধর্ম্মলাভ কর্‌তে চায়। ধর্ম্ম যে কত মূল্যবান বস্তু,—ধর্ম্ম লাভকরা যে কতদূর কঠিন, তা একবার কেহ ভাবে না। অন্তরের কু-অভ্যাস সমস্ত দূর না হ'লে, ধর্ম্ম কিছুতেই লাভ হয় না। বহুদিনের কু-অভ্যাস মানুষ ইচ্ছামাত্রেই দূর কর্‌তে পারে না, তা দু এক দিনের কর্ম্মও নয়। এসব দূর কর্‌তে যে সময় টুকু লাগে, তত টুকু সময়ও কেহ ধৈর্য্য ধ'রে থাকতে চায় না। খুব শীঘ্রই একটা কিছু পেতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে, তাই কিছুই হয় না। তার পর সকলেই আবার আপন আপন রুচিমত ধর্ম্ম চায়। নিজ রুচির সঙ্গে একটু অমিল হ'লে, তা ধর্ম্ম ব'লেই কেহ স্বীকার করে না। এই দুটি কারণে, ধর্ম্মলাভ করা লোকের কঠিন হ'য়ে পড়েছে। ধর্ম্ম একটা গাছের ফল নয়, যে ইচ্ছামাত্রই তা টপ্‌ ক'রে কেহ পেড়ে নিবে।"

তাঁহারা আবার প্রশ্ন করিলেন, "ভগবানকে লাভ করিতে হইলে, তাঁর প্রিয় কার্য্য করিতে হইবে, না—শুধু জপ তপ করিলেই হইবে?"

ঠাকুর বলিলেনঃ—"ভগবানকে সহজে লাভ করা যায় না। কেহ সর্ব্বদা তাঁর প্রিয় কার্য্য ক'রে তাঁকে লাভ করেন। কেহবা সর্ব্বদা ধ্যান ক'রে তাঁকে প্রাপ্ত হন, কোন কোন ব্যক্তি নিয়ত জপ ক'রে তাঁর দর্শন লাভ করেন। সকলের এক প্রকার নয়। কে যে কোন্‌ ভাবে চ'লে তাঁকে লাভ ক'রতে পারবে, বলা যায় না। সকলকেই যে ধ্যান ধারণা জপ তপ ক'রে তাঁকে লাভ ক'রতে হবে, এমনও কিছু নয়। তাঁর কৃপায়ই তাঁকে লাভ করা যায়। কৃপাই সমস্তের মূল।"

জিজ্ঞাসার অবস্থা,—হিন্দুভাব ও পাশ্চাত্য ভাব।

জিজ্ঞাসা করিলাম:—"পুরাণাদিতে দেখা যায়, শিষ্য গুরুর নিকটে কোন বিষয় প্রশ্ন করিলে, সেই প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে সঙ্গেই শিষ্যের ভিতরে সেই জ্ঞানটিও প্রস্ফুটিত হইত। আমাদের তা হয় না কেন?"

ঠাকুর বলিলেন:—"বিবেক, বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা ও মুমুক্ষুতা এই সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন না হ'লে তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে কারও জিজ্ঞাসা করবার অধিকারই হয় না। এ সকল অবস্থা লাভ ক'রে প্রশ্নটি কর্‌লে, উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও লাভ হয়। তা না হ'লে, মনে যা আসে তাই যদি ভাসা ভাসা ভাবে জিজ্ঞাসা করা যায়, উত্তরটিও সেইরূপ ভাসা ভাসা হ'য়ে থাকে। কোন ফলই হয় না। অন্তরে যথার্থ ব্যাকুলতা না হ'লে, বস্তুর প্রকৃত অভাব জ্ঞান না জন্মালে, প্রশ্ন করা, ছেলেদের পয়সা না নিয়ে বাজারের সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখে, দর জিজ্ঞাসা করার মতই হয়। ওর কোন মূল্যই নাই। অনেক সময়ে প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়া আচার্য্যেরা কোন প্রয়োজনই মনে কর্‌তেন না, এমন কি ব্রহ্মাকে পর্য্যন্ত বলেছিলেন, "তপ!" "তপ!" "তপ!" তপস্যা কর, তপস্যা কর, তপস্যা ক'রলেই সমস্ত বুঝ্‌তে পারবে।"

একজন বলিলেন, "একটা বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসংশয় হইলে তাহা করিতে যেমন উৎসাহ হয়, না বুঝিয়া করিলে সে প্রকার তো হয় না?"

ঠাকুর বলিলেন:—"ঐ সকল পাশ্চাত্যভাব। আগে বুঝ্‌বো পরে কর্‌বো, এ আমাদের দেশের বা সনাতন ধর্ম্মের ভাব নয়। আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তাদের উপদেশ:—'আগে কর, পরে বুঝ'। সকল বিষয়েই কতকগুলি স্বীকার্য্য আছে, তা মেনে নিতেই হয়। যেমন "ক" এর পর "খ", "খ" এর পর "গ", পড়্‌তে হয়। এতে, গোড়া ধরে 'তা কেন'? প্রশ্ন কর্‌লে, শিক্ষা কখনও হয় না।"

আজ হোমের জন্য বিল্বপত্র সংগ্রহ না হওয়ায় ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম:—কোন ফুল দিয়া কি হোম হয় না?

ঠাকুর বলিলেন:—'শাক্তদের হোম অপরাজিতা ফুল দিয়া হয়। আর বৈষ্ণবদের কুন্দ পুষ্প ও শ্বেত করবী দ্বারা ব্যবস্থা আছে।'

ব্রজমায়ীদের স্বাভাবিক ভাব ও ভজন।

১৯ অগ্রহায়ণ।
শুক্রবার।

গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে নানা কথায় ঠাকুর আজ শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজমায়ীদের ভাব ও ভজন সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন ঃ—“নিতান্ত সাধারণ অবস্থার গরীব দুঃখী পাড়াগেঁয়ে ব্রজমায়ীদেরও, ভগবানের প্রতি যেরূপ একটা স্বাভাবিক স্নেহ মমতা,—বাৎসল্যভাব দেখা যায়, বহু সাধন ভজনেও তা লাভ করা দুঃসাধ্য। গোবিন্দজীকে তাঁরা এখনও সেই ভাবেই দেখেন। দলে দলে ব্রজমায়ীরা দধি, দুগ্ধ, মাখনাদি ভাঁড়ে ভাঁড়ে নিয়ে সমস্ত রাস্তা নৃত্য গান কর্‌তে কর্‌তে গোবিন্দজীর মন্দিরে এসে উপস্থিত হন, ঠিক নিজের কোলের ছেলেটীকে মা যেমন আদর করেন, তেমনি তাঁরা গোবিন্দজীকে কত প্রকারে আদর করেন, কত কথা জিজ্ঞাসা করেন, গায়ে হাত বুলায়ে দেন, চুমো খান, নিজের পায়ের ধূলো হাতে নিয়ে গোবিন্দজীর কপালে মাখায়ে দেন, এবং আশীর্ব্বাদ করেন। গোবিন্দজীকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাৎসল্যভাবে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে পড়েন। তাঁকে তাঁরা ঠিক যেন ঘরের ছেলে মনে করেন। এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না।”

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—“ব্রজমায়ীদের ভগবানের প্রতি কি শুধু বাৎসল্য ভাবই ? না অন্যান্য ভাবও হয়।”

ঠাকুর বলিলেন ঃ—“ব্রজমায়ীদের সকলেরই তো আর এক প্রকার ভাব নয়। ভজনও কত প্রকারের। কেহ বা নানা প্রকার বেশভূষা ক'রে, অলঙ্কারাদি প'রে এক এক বার নিজের দিকে তাকাচ্ছেন, নিজেরই রূপ নিজে দেখে ভাবে বিভোর হ'য়ে পড়্‌ছেন। এ অবস্থায় তাঁরা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হ'য়েও অনেক সময় প'ড়ে থাকেন। কেহবা দুঘণ্টা ধ'রে মুখই পুঁচ্‌ছেন, তিলকই কতবার কর্‌ছেন আর পুঁচ্‌ছেন। পছন্দমত হ'য়ে গেলে আয়নাতে একবার নিজের মুখখানি নিজেই দেখে একেবারে অবশাঙ্গ হ'য়ে ঢ'লে পড়েন। তিন চার ঘণ্টা আর সংজ্ঞাই থাকে না। শরীরে কত প্রকার ভাবেরই খেলা হ'তে থাকে। কেহবা একখিলি পান মুখে দিয়ে চার পাঁচ ঘণ্টা ধ'রে তাই চিবাচ্ছেন। চোখের জলে

বুক ভেসে যাচ্ছে। ভাবে ডগমগ। অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সমস্তই এককালে প্রকাশ হ'য়ে পড়্ছে। ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাচ্ছেন। সাধারণ লোকে এ সকল ভাব, এসকল অবস্থা, কি প্রকারে বুঝ্বে! এসকল ভজনইবা কি প্রকারে জান্বে। দেহ দ্বারা ভগবানের ভজন, এযে কত মধুর, তা যিনি করেন তিনিই জানেন। শ্রীবৃন্দাবনে এসব ভাবেই ভগবানের উপাসনা। ঐশ্বর্য্যভাবে উপাসনা বড় দেখা যায় না। স্থানের প্রভাবই এমন চমৎকার যে, একটা সাধন ভজন নিয়ে থাক্‌লেই চিত্তে আপনা আপনি এসকল ভাব ও ভক্তি উদয় হ'য়ে থাকে।"

ভাব কাকে বলে?

২০ অগ্রহায়ণ।
৫ই ডিসেম্বর,
শনিবার।

আজ শনিবার বলিয়া বেলা দুইটা হইতেই ঠাকুরের নিকট বিস্তর লোকের সমাগম আরম্ভ হইল। ব্রাহ্ম-সমাজের গণ্যমান্য ঠাকুরের কতিপয় ব্রাহ্ম-বন্ধু আসিয়া, বিবিধ ধর্ম্ম প্রসঙ্গের পর ঠাকুরকে বলিলেন; 'বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভাবভক্তি দেখিতেছি বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের ভিতরেই প্রবেশ করিতেছে। আর তাতে জ্ঞানের দিক্‌টা যেন দিন দিন নিবিয়া যাইতেছে।'

ঠাকুর বলিলেন:—"বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভাবভক্তি হ'লে জ্ঞানের দিক কখনও নিবে যায় না। নাচা কোঁদা, কান্নাকাটি, মাতামাতি করা এসকলকে তো আর ভাব বলে না। ভাব বড় সহজ জিনিষ নয়।"

একটি বাবু বলিলেন, "মহাশয়! আমরা তো ও সবকেই ভাব বলি, ভাব তবে কি?"

ঠাকুর বলিলেন:—"ভাবতো ঢের পরে! ভাবের অঙ্কুর মাত্র জন্মিলে যে সকল অবস্থা দেখা যাবে, বৈষ্ণব শাস্ত্রে তা এইরূপ ব'লেছেন।

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধসমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্‌বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥"

ভাব জন্মিবার পূর্ব্বেই এসকল তো হওয়া চাই! মুখে 'ভাব ভাব' বল্‌লেই তো হবে না!

১। "ক্ষান্তি" :—সকল বিষয়েই তার ধৈর্য্য ও ক্ষমা থাকবে। নিন্দা অপমান, অত্যাচারাদি, যত দুর্ব্যবহারই তার প্রতি হউক না কেন, কিছুতেই তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারবে না। সর্ব্বদা ক্ষমাশীল হবে।

২। "অব্যর্থ কালত্বং" :—সে কখনও বৃথা কালক্ষেপ ক'রবে না। সর্ব্বদাই আত্মার কল্যাণকর কিছু না কিছু অনুষ্ঠান নিয়ে সময় অতিবাহিত করবে।

৩। "বিরক্তি" :—সকল বিষয়েতেই তার বৈরাগ্য, বিষয়ে অনাসক্ত ভাব জন্মিবে।

৪। "মানশূন্যতা" :—গর্ব্ব অভিমানাদি কিছুই তার থাকবে না।

৫। "আশাবন্ধসমুৎকণ্ঠা" :—ভগবৎ কৃপালাভ এবং নিজের অভিলষণীয় বস্তু প্রাপ্তি বিষয়ে একটা খুব দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে। ইষ্টবস্তু লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই একটা ব্যস্ততা থাকবে।

৬। "নামগানে সদারুচিঃ" :—ভগবানের নাম কীর্ত্তনে সর্ব্বদাই অভিলাষ হবে, আনন্দ হবে।

৭। "আসক্তি স্তদ্‌গুণাখ্যানে" :- ভগবানের গুণকীর্ত্তনে সর্ব্বদাই সে অনুরক্ত থাকবে।

৮। "প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে" :—ভগবানের বসতি স্থলে,—কেহ কেহ বলেন বিগ্রহ প্রতিমা ও তীর্থাদিতে,আবার কেহ কেহ বলেন সমস্ত চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, সর্ব্বভূতে, তার প্রীতি ও ভালবাসা হবে।

"ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে"। ভাবের অঙ্কুর মাত্র যার জন্মেছে, এসকল লক্ষণ পূর্ব্বেই তার হবে। ভাব কি একটা তামাসার কথা? চক্ষের একটু জল পড়লেই ভাব হ'লো!

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠারুচি স্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

সর্ব্বপ্রথমেই শ্রদ্ধা। শাস্ত্রে ও সদাচারে বিশ্বাস। শাস্ত্র সদাচারে বিশ্বাস জন্মিলেই সাধু সঙ্গের অধিকার হয়। শাস্ত্র সদাচারের অনুসরণ ক'রে, সাধুরা কিরূপ জীবন লাভ ক'রেছেন, কি প্রকার শান্তিতে, আরামে, আনন্দে দিন যাপন করছেন, এ সমস্ত দেখে শুনে সাধুদের মত জীবন লাভ করতে একটা আকাঙ্ক্ষা হয়, আগ্রহ হয়। এ প্রকার হ'লেই তখন ভজন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করতে করতে সমস্ত অনর্থের নিবৃত্তি হ'য়ে যায়। অন্তরে কোন প্রকার অনিষ্ট-কর, প্রতিকূল অবস্থাই আর থাকে না, ভজনেতে ক'রে সমস্ত নষ্ট হ'য়ে যায় এসব হ'য়ে গেলে তারপর ভাব। এই ভাবের পরে ভক্তি—তারপর প্রেম, ভাব বৃক্ষ, ভক্তি পুষ্প, প্রেম সুপক্ক ফল। এসকল বহুদূরের কথা।"

প্রশ্ন ঃ—অশ্রু কম্প পুলকাদি যে হয়, তাহা কি ভাব নয়?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"ওসব ভিতরের একটা অবস্থার বিকাশ বটে, কিন্তু অশ্রু কম্প হ'লেই তার এসব ভাব হ'য়েছে, এরূপ যে মনে ক'রতে হবে, তার কোন অর্থ নাই। কোন্ ভাব উপস্থিত হ'লে, চ'খের জল ঐ সময় কোন্ দিক দিয়ে কি ভাবে পড়বে, কোন্ ভাবের চ'খের জলের স্বাদ কি প্রকার হবে, তা পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন ক'রে, শাস্ত্র কর্ত্তারা ভক্তির দর্শনশাস্ত্রে মীমাংসা ক'রে গেছেন। অভ্যা-সের দ্বারাওতো অনেকে অশ্রু কম্প পুলকাদি আয়ত্ত ক'রে থাকেন।"

গুরুর প্রয়োজনীয়তা ও মহাপুরুষের লক্ষণ।

প্রশ্ন ঃ—মশায়! অনেকে বলেন, গুরু করণ না হ'লে ধর্ম্মলাভ করা যায় না। এ বিষয়ে আপনার মত কি?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"মতামতের কথা আমি কিছু জানি না। ব'লতেও পারি না। তবে আমি একথা নিশ্চয়রূপে জেনেছি, যে গুরু ব্যতীত ধর্ম্ম কখনও লাভ হ'তে পারে না। সামান্য একটা কিছু জানতে হ'লে, সামান্য একটু শিক্ষালাভ ক'রতে হ'লে, গুরুর প্রয়োজন হয়; গুরুব্যতীত হবার যো নাই। আর সর্ব্বাপেক্ষা যে বিষয়টি দুর্ব্বোধ, গুরু ব্যতীত অনায়াসে তা লাভ হবে, এ কখনও হয় না।"

প্রশ্ন ঃ—"পশু, পক্ষী, মনুষ্য—সকলেরই তো কার্য্য দেখিয়া শিক্ষালাভ হইতেছে, সাধারণ ভাবে সকলেইতো গুরু,—তবে বিশেষভাবে একজন মানুষকে ধরা কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"বিশেষভাবে একটি মানুষকেই ধর্‌তে হবে। একটি বিশেষ ব্যক্তিতে গুরুত্ব স্থাপন কর্‌তে পারলেই প্রকৃত গুরুলাভ হয়। তখন সমস্ত পদার্থই গুরুময় হ'য়ে যায়। এরূপটি হ'লে সাধারণ গুরুভাব আর থাকে না।"

প্রশ্ন ঃ—"কিরূপ অবস্থার লোককে গুরু করিতে হয় ?"

ঠাকুর ঃ—"যাঁতে ভগবানের চিৎশক্তির বিলাস হয়, যাঁতে তাঁর জ্ঞান শক্তির প্রকাশ হয়,তিনিই গুরু। গুরু অন্য কেহ হ'তে পারে না। মহাপুরুষেরাই 'গুরু'।"

প্রশ্ন ঃ—"আমাদের তো অন্তর্দৃষ্টি নাই, বাহিরের কি কি লক্ষণ দ্বারা আমরা মহাপুরুষদের বুঝিতে পারিব ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"সাধারণতঃ এই পাঁচটি লক্ষণ দ্বারা মহাপুরুষদের চেনা যায়।

প্রথমতঃ—মহাপুরুষেরা কখনও আত্ম-প্রশংসা করেন না। কার্য্যদ্বারা বা অন্য কোন প্রকারেও নিজকে বড় ব'লে জানান্ না।

দ্বিতীয়তঃ—মহাপুরুষেরা কখনও পরনিন্দা ক'রেন্ না।

তৃতীয়তঃ—মহাপুরুষেরা কখনও বৃথা সময় নষ্ট ক'রেন্ না। আত্মার কল্যাণকর কোন একটা অনুষ্ঠানে নিয়ত নিযুক্ত থাকেন।

চতুর্থতঃ—মহাপুরুষেরা সর্ব্বজীবে দয়া করেন। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এমন কি বৃক্ষ লতার পর্য্যন্ত দুঃখে সহানুভূতি করেন—অন্যের সমস্ত অবস্থা নিজের ব'লে অনুভব করেন। কারোই একটা উদ্বেগের কারণ হন্ না।

পঞ্চমতঃ—মহাপুরুষেরা সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট থাকেন। কখনও কোন কারণে চঞ্চল হন্ না।"

মহর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বান।

এ সকল কথা শেষ হইতে হইতেই, ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শমূর্ত্তি প্রাতঃস্মরণীয় ধার্ম্মিকপ্রবর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদেশানুসারে তাঁহার অনুগত সেবক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শাস্ত্রী মহাশয় ঠাকুরের কুশলাদি প্রশ্ন করিয়া বলিলেন,—"মহর্ষি অসুস্থ, কাণে ভাল শোনেন না, দৃষ্টিশক্তিও খুব কমিয়া গিয়াছে, আপনি কলিকাতায় আছেন শুনিয়া আপনাকে দেখিতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমাকে আপনার নিকটে পাঠাইয়াছেন। তাঁর কতকগুলি কথা আপনাকে তিনি বলিতে ইচ্ছা করেন।" শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা শেষ হইতে না হইতেই—ঠাকুর মহর্ষিকে উদ্দেশ করিয়া করযোড়ে নমস্কার করিতে করিতে বলিলেনঃ—"**আমার পরম সৌভাগ্য যে তিনি আমাকে স্মরণ ক'রেছেন। আমি তাঁকে দর্শন কর্‌তে যাব। কখন গেলে তাঁর দর্শনের সুবিধা হবে?**"

শাস্ত্রী মহাশয় বেলা তিনটা হইতে পাঁচটার মধ্যে সময় নির্দ্দেশ করিলেন। ঠাকুরও ঐ সময়েই তথায় উপস্থিত হইবেন বলিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় সন্ধ্যার সময় চলিয়া গেলেন। আমাদেরও সন্ধ্যাকীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

মহর্ষির সহিত ঠাকুরের সাক্ষাৎকার—মহর্ষির ভাব ও উপদেশ।

২১শে অগ্রহায়ণ।
রবিবার।
৬ই ডিসেম্বর।

আজ গুরুভ্রাতারা ঠাকুরের সঙ্গে মহর্ষিকে দর্শন করিতে যাইবেন, সকলেরই মনে কত আনন্দ! আমি প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ ভাবে ঠাকুরের নিকট নিজ আসনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—"আমার ভাগ্যে বুঝি মহর্ষির দর্শন ঘটিবে না! যে সময়ে সকলে মহর্ষির নিকট যাইবেন, আমার তখন আহারের সময়। একদিন উপবাস করিয়া থাকিতে আমি কোন কষ্টই মনে করি না, কিন্তু আহারতো আমার শুধু আহার নয়! উহা ঠাকুরের আদেশমত আমার সাধনপ্রণালীর অন্তর্গত একটি বিশেষ নিয়ম। এই নিয়ম ভঙ্গ করিলে ঠাকুর কি অসন্তুষ্ট হইবেন না। ঠাকুরকে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও আমার সাহস হয় না। এখন কি করি!" এই প্রকার ভাবিয়া ঠাকুরের নিকট চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

ঠাকুরের নিয়মিত পাঠ শেষ হইলে, এগারটার সময় আমাকে নিজ হইতেই বলিলেন :— "কি। আজ তুমি কি কর্‌বে ? রান্না না ক'রে এক মুটো প্রসাদ পেয়ে নিলে হয় না ?"

আমি শুনিয়া খুব আনন্দিত হইয়া বলিলাম, "আমি কখনও মহর্ষিকে দর্শন করি নাই, যে'তে বড় ইচ্ছা হয়।"

ঠাকুর :—"তা হ'লে প্রসাদই দুটা পেয়ে নিও।"

আমার সুবিধামত ব্যবস্থা ঠাকুর নিজ হইতেই করিলেন দেখিয়া আনন্দে আমার কান্না আসিল। যথা সময়ে প্রসাদ পাইয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলাম।

আজ রবিবার, স্কুল, কলেজ, আদালতাদি বন্ধ বলিয়া অনেক গুরুভ্রাতারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেলা দুটার পর তের চৌদ্দজন গুরুভ্রাতা ঠাকুরের সঙ্গে চলিলেন। প্রায় তিনটার সময় আমরা পার্কষ্ট্রীটে মহর্ষির ভবনে পঁহুছিলাম। দেখিলাম, মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, সম্মুখের হল ঘরে রহিয়াছেন। আমাদিগকে দেখিয়াই খুব আদর করিয়া ঘরের ভিতরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। এবং মহর্ষিকে সশিষ্যে ঠাকুরের আগমন সংবাদ পাঠাইলেন। মহর্ষি ঐ সময় মগ্নাবস্থায় ছিলেন বলিয়া, আট দশ মিনিট কাল নীচের ঘরেই আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইল। বাহ্যস্ফূর্ত্তি হওয়া মাত্রই মহর্ষি সকলকে উপরে যাইতে সংবাদ দিলেন, ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমরা সকলেই যাইয়া মহর্ষির নিকটে উপস্থিত হইলাম।

দেখিলাম, প্রকাণ্ড হল ঘরের মধ্যস্থলে একখানা ইজি-চেয়ারে মহর্ষি অর্দ্ধ শয়ান অবস্থায় রহিয়াছেন। দক্ষিণে ও বামে দুখানা চেয়ার রহিয়াছে এবং তাহারই নিকটে দুখানা লম্বা বেঞ্চ এমন ভাবে রাখা হইয়াছে যে, তাহাতে বসিয়া সকলেই মহর্ষিকে দর্শন করিতে পারেন। ঠাকুর দুই বেঞ্চের মধ্যস্থলে যাইয়া নমস্কার করিয়া মহর্ষির চরণদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় পবিত্রমূর্ত্তি বৃদ্ধ মহর্ষির শুভ্র মুখমণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিল, তিনি করপুট বক্ষঃস্থলে স্থাপন পূর্ব্বক মস্তক ঘন ঘন কম্পিত করিয়া গদগদ স্বরে "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়, গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ, গোবিন্দায় নমোনমঃ, গোবিন্দায় নমোনমঃ।" পুনঃ পুনঃ বলিতে বলিতে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন, গণ্ডস্থল ভাসিয়া তাঁহার অশ্রুধারা বর্ষণ হইতে লাগিল। ঠাকুরও ভাবাবেশে যেন অবশাঙ্গ হইয়াই মহর্ষির বামভাগস্থিত চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ঠাকুর ও মহর্ষি উভয়েই কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আমরাও সকলে ঐ সময়ে মহর্ষিকে ভূমিতে

পড়িয়া প্রণাম করিলাম এবং উভয় পার্শ্বস্থ লম্বা বেঞ্চে বসিয়া পড়িলাম। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় মহর্ষির দক্ষিণ দিকের চেয়ারে বসিয়াছিলেন। আমাদিগকে দেখিয়া মহর্ষি তাঁহাকে বলিলেন, 'ইঁহাদের দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে, ইঁহারা কে?' শাস্ত্রী মহাশয় মহর্ষির কাণের কাছে মুখ রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ইহারা সকলেই গোঁসাইর শিষ্য।"

মহর্ষি বলিলেন, "মানুষ যখন একটা উৎকৃষ্ট খাবার বস্তু পায়, শুধু নিজে না খাইয়া অন্যান্যকেও উহা দিতে ইচ্ছা করে, ইনিও সেইরূপ নিজে যাহা ভোগ করিতেছেন, শিষ্য-দিগকেও তাহা দিতেছেন ; ইহাতে ওঁর বিন্দুমাত্রও স্বার্থ নাই, শিষ্যদের কল্যাণই আকাঙ্খা করেন। ইনিই ধন্য, ইনিই যথার্থ শিষ্যদের সন্তাপহারক। ইঁহার দর্শনে প্রাচীন ঋষিদের ভাবই প্রাণে জাগ্রত হয়।" এ সকল কথার পর ঠাকুরের কুশল প্রশ্ন করিয়া বোলপুরের শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বলিলেন, "বোলপুরে একটি আশ্রম হইয়াছে। শীঘ্রই উহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য হইবে। সশিষ্যে তুমি ঐ উৎসবে যোগদান করিলে বড়ই আনন্দিত হইব। ঐ আশ্রমটির প্রয়োজন এবং নিয়মপ্রণালী কিরূপ হওয়া তুমি ভাল মনে কর, জানিতে ইচ্ছা হয়।"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"ভারতবর্ষের প্রায় সকল দেশেই বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আশ্রম আছে। তাই সাধু সন্ন্যাসীরা ঐ সকল দেশে যাতায়াতে কোনও অসু-বিধা বোধ করেন না। কিন্তু বঙ্গদেশে ঐ প্রকার কোন ধর্ম্মাশ্রম নাই বল্‌লেই হয়। যে দুই একটি আছে—তাহাও সম্প্রদায় বিশেষের। সকল ধর্ম্মার্থিগণ একটা স্থানে আশ্রয় পেয়ে, আপন আপন ভজন সাধন অবাধে করতে পারেন, এরূপ একটি স্থানের বড়ই প্রয়োজন মনে হয়। শান্তিনিকেতন যদি সাধু সন্ন্যাসী ফকির দরবেশাদি, সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভগবদুপাসকগণের শান্তির সাধারণ স্থান হয়, তবে বড়ই কল্যাণ হয়। দেশের একটা যথার্থ মঙ্গল হয়। অসাম্প্রদায়িক ভাবের আশ্রম কোথাও দেখা যায় না। দেশে এটির বড়ই অভাব।"

মহর্ষি ঠাকুরের কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, "সাধু! সাধু!! বাস্তবিক যাহাদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেম, তাহাদের কথায় অন্তরকে স্পর্শ করে, প্রাণ ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। যথার্থ সাধুর কথা এই রূপই হয়। না হ'লে কথা ভাসা ভাসা হ'য়ে যায়।

তুমি যে রকম বলিলে তাই হওয়া ঠিক, ইহা সত্য। কিন্তু শান্তিনিকেতনের ভার যাঁহাদের উপর রহিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে মতের অনৈক্যে গোলমাল চলিতেছে। তোমার এই অসাধারণ উদার ভাব, কখনও তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারিবেন না। আমার অন্তরের কথা আমি কাহাকেও বলি না, কেহ উহা বুঝে না। তুমি বুঝিবে তাই তোমাকে আজ প্রাণের কথা বলিয়া ঠাণ্ডা হইব।" এই বলিয়া মহর্ষি নিজ জীবনের কথার সঙ্গে হাফেজের কবিতা মধ্যে মধ্যে আওড়াইয়া, তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া মহর্ষি চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইতে লাগিল। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"ভগবান্‌কে যেমন ভাবে পাইতে আকাঙ্ক্ষা, তেমন ভাবে পাইতেছি না। সময় সময় তিনি দয়া করিয়া দর্শন দিয়া বিদ্যুতের মত অদৃশ্য হইয়া যান, যতক্ষণ আবার সেই প্রেমময়ের উজ্জ্বল রূপ দর্শন না পাই, উন্মত্তের মত থাকি, প্রাণ আমার ধড়্‌ফড়্‌ করে, সময় যে কি ভাবে কাটাই, তিনিই জানেন। তিনি দয়া করিয়া দর্শন না দিলে, কি আর করিব! জ্ঞানের দ্বারা কখনো তাঁকে লাভ করা যায় না, জ্ঞান একটা কথার কথা মাত্র। যথার্থ প্রেম ভক্তিই তাঁহাকে লাভ করিবার একমাত্র উপায়। তাহাতো আর চেষ্টাসাধ্য নয়। তাঁরই দয়ায় হয়; "পুরুষকার" অর্থশূন্য কথা। তাঁর চরণে নির্ভরই সার। শ্বেত অশ্বমেধের ঘোড়া করিয়া তিনি আমাকে গ্রহণ করিবেন বলিয়াছেন। তাঁর এই বাক্যই ভরসা করিয়া তাঁর দয়ার দিকে চাহিয়া পড়িয়া আছি।" এই বলিয়া মহর্ষি বালকের মত ক্রন্দন করিতে করিতে একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর, "জয় গুরু, জয় গুরু," বলিতে লাগিলেন। একটু পরে চোখ্‌মুখ মুছিয়া, মহর্ষি ঠাকুরকে বলিতে লাগিলেন, "যে ক্ষেত্রে ভগবানের কৃপা অবতীর্ণ হয়, পূর্ব্ব হইতেই তার লক্ষণ দেখা যায়। জন্ম, সঙ্গ, শিক্ষা ও সাধন, এই চারিটি একসঙ্গে না থাকিলে প্রকৃত সত্য বস্তু, ষোল আনা ধর্ম্ম, লাভ হয় না। তোমাতে এই চারিটিই উপযুক্ত রূপে রহিয়াছে। বিশুদ্ধ অদ্বৈত প্রভুর বংশে তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করিয়াছ, তাঁর কৃপায় প্রকৃত সৎশিক্ষা, সদুপদেশ পাইয়াছ। তারপর, মনুষ্য-চেষ্টায় সাধন ভজনও যতটা সম্ভব, তাহাও পূর্ণ মাত্রায় তুমি করিয়াছ, সর্ব্বোপরি ভগবানের কৃপা, তাহাও তোমার প্রতি যথেষ্ট রহিয়াছে। তুমিই ধন্য।" এই বলিয়া মহর্ষি সংস্কৃত একটি শ্লোক পড়িলেন—

"কুলং পবিত্রং, জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতীচ তেন।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরস্তু তেষাং, যেষাং কুলে বৈষ্ণবনামধেয়ঃ॥"

তুমি যাহাই কর, যখন যেরূপ ভাবে চল, ভগবান্‌ তাহাই অতি সুন্দর দেখিতেছেন।"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"আপনিইতো আমাকে হাতে ধ'রে মানুষ ক'রেছেন। আমার সবইতো আপনা হ'তে। আপনিইতো আমার গুরু!"

ঠাকুরের কথা শেষ না হইতেই মহর্ষি একটু হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, তা ঠিকই ব'লেছ, গুরুত বটেই! তবে সে যে পাঠশালার ছেলেদের গুরু মশায়ের মত! ক, খ, শিখিতে হইলে প্রথম যেমন ছেলেদের গুরুমশায়ের নিকটে শিখিতে হয়। পরে ঐ ছেলেরাই বিশ্ব বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পাইয়া ঐ গুরুমশায়েরও গুরুর উপযুক্ত হয়। এখন পাঠশালার গুরুমশায়কে গুরু বলিলে যেমন হয়, তোমার বলাও ঠিক সেইরূপই হইতেছে।" ঠাকুর চুপ করিয়া রহিলেন। মহর্ষি এই প্রকার নানা কথা তুলিয়া ঠাকুরের প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তখন গাত্রোত্থান করিয়া মহর্ষির চরণদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া বলিলেন ঃ—

"আমি আপনার বালক, আমাকে আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।"

মহর্ষি প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন—"আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারি না, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি। তোমার জয় হউক।"

আমরাও সকলে একে একে মহর্ষির চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করতঃ বাসায় ফিরিতে প্রস্তুত হইলাম। মহর্ষি খুব হৃষ্টান্তঃকরণে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "তোমাদের মঙ্গল হইবে, গোঁসাইকে তোমরা কখনও ছাড়িও না, ইনি তোমাদের সকলকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যাইবেন।"

মহর্ষির নিকট হইতে বাহির হইবার পরেই গুরুভ্রাতা শ্রীচরণ বাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনেছি সদ্‌গুরুর কৃপা না হ'লে এরকম অবস্থা খোলে না। মহর্ষির এ অবস্থা কিরূপে হ'ল?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"মহর্ষির উপর সদ্‌গুরুর কৃপা হয় নাই, কে বল্‌লে?"

শ্রীবৃন্দাবনে মহাপ্রভু। মহর্ষির প্রতি গুরুকৃপা।

সগর্ভ ও বিগর্ভ সমাধি।

আমরা ঠাকুরের সঙ্গে, সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গুরু, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাসায় পঁহুছিলাম। নবীনবাবু অতি আগ্রহের সহিত আমাদিগকে বসাইয়া, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনিলাম আপনার সহিত নাকি মহা-

প্রভুর শ্রীবৃন্দাবনে সাক্ষাৎ হইয়াছিল? তিনি কি বলিয়াছিলেন, অনুগ্রহ করিয়া বলিলে বিশেষ সুখী হইব।"

ঠাকুর বলিলেনঃ—"হাঁ, তাঁর দর্শন পেয়ে প্রথম আমার বাক্যস্ফুরণ হ'ল না, চরণতলে প'ড়ে কেবল কাঁদ্‌তে লাগ্‌লাম। কিছুক্ষণ পরে মনের আবেগ একটু শিথিল হ'লে, বল্‌লাম,—'ঠাকুর বড় ঘুরেছি'। তিনি ব'ল্‌লেন, 'তোদের কুলে-রইত এই ধরম।' আমি বল্‌লাম,—'দেব, দয়া ক'রে পুনরায় প্রকাশ হ'য়ে, কলির মলিন জীব সকলকে উদ্ধার করুন।' তিনি বল্‌লেন,—'প্রকাশ হ'লে কে আর আমাকে এখন বিশ্বাস কর্‌বে। সে সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে।' এইরূপ আরও কত কি ব'ললেন্।" ঠাকুর তৎপরে নবীন বাবুকে বলিলেনঃ—"আমার যেন মনে হয়, তাঁকে সে ভাবে দরদ কর্‌বার তেমন কেহ ছিল না; থাক্‌লে আরও কিছুদিন তিনি থাক্‌তেন।"

নবীন বাবুর সহিত ঠাকুরের আরও মহাপ্রভু সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। সন্ধ্যার পর আমরা বাসায় পঁহুছিলাম।

রাত্রিতে খুব সংকীর্ত্তন হইল, মহর্ষি সম্বন্ধে আজ অনেক কথাবার্ত্তা হইল। নগেন্দ্রবাবুর প্রশ্নে ঠাকুর বলেন, "মহর্ষি যখন হিমালয়েতে সাধন ক'রতেন, তখন একদিন একটী হিমালয়পর্ব্বতনিবাসী মহাপুরুষ দৃষ্টিদ্বারা মহর্ষির ভিতরে শক্তিসঞ্চার ক'রে-ছিলেন। মহাপুরুষের কৃপার পর হ'তেই, মহর্ষির অবস্থা খুলে গেছে, ভগবদ্-ধ্যানে মহর্ষির সমাধি হয়।"

প্রশ্নঃ—"ভগবৎ ধ্যান ব্যতীতও সমাধি হয় কি?"

ঠাকুরঃ—"সমাধি দুই প্রকার। সগর্ভ ও বিগর্ভ। বায়ুরোধ পূর্ব্বক শরীর স্থির রে'খে যে সমাধি হয়, সে বিগর্ভ সমাধি; তাতে কোন উপকারই হয় না। বাজিকরেরাও কুম্ভক ক'রে ঐ প্রকার সমাধি করে। ধর্ম্ম কর্ম্মের সহিত ওর কোনও সম্বন্ধই নাই। যোগবাশিষ্টে ইহার দৃষ্টান্ত আছে। একদিন বশিষ্ঠ-দেব রামচন্দ্রকে নিয়ে একটী নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হ'য়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে একটী পাকা কুঠরী পেলেন; উহার ভিতরে প্রবেশ ক'রে রামচন্দ্রকে দেখালেন একটী লোক শূন্যে অবস্থান ক'রছে। বশিষ্ঠদেব তার চৈতন্য সঞ্চার কর্‌বা মাত্রই

সে তিনপাক ঘু'রে, তানা-না-না-না ক'রে হাত পেতে,—'মহারাজ! রুপিয়া দেও' প্রার্থনা কর্‌ল। বহুকাল পূর্ব্বে সে অর্থ প্রত্যাশায়, কুম্ভক যোগে সমাধিস্থ হ'য়ে শূন্যে কি প্রকারে অবস্থান কর্‌তে হয়, তাই দেখাচ্ছিল। কোনো প্রকারে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটায়, তার কুম্ভক আর ছুটল না। রাজার রাজত্ব গেল, বাড়ী অরণ্য হ'য়ে গেল, কিন্তু তার ঐ সমাধি আর ভাঙ্গল না। বশিষ্ঠদেব তার জ্ঞান সঞ্চার কর্‌বা মাত্রই পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে সে সেই রাজাকে অনুমান ক'রে শ্রীরাম চন্দ্রের নিকট "রুপিয়া দেও" প্রার্থনা কর্‌ল। মুদ্রা ক'রে, কুম্ভক ক'রে, হঠযোগের নানা প্রকার প্রণালী ক'রে যে সমাধি হয় তা কিছুই নয়। ভগবৎ চিন্তার সহিত যে সমাধি তা-ই প্রকৃত সমাধি।

যাঁরা ভগবানের সঙ্গে যোগ আকাঙ্ক্ষা করেন, সকল প্রকার ঐশ্বর্য্য বা শক্তিকেই তাঁরা নিতান্ত অনর্থ মনে ক'রে ত্যাগ করেন। সমস্ত ঐশ্বর্য্য দাসীর মত সর্ব্বদা তাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলে, কিন্তু তাঁরা একবার ফিরেও সে দিকে চান না। যথার্থ যোগলাভ কর্‌তে হ'লে, বীর্য্য ধারণ কর্‌তে হয়। সত্য কথা না বল্‌লে, বীর্য্য ধারণ হয় না। সত্য কথা ব'ল্‌তে হ'লে, বাক্য সংযম ক'র্‌তে হয়। প্রায় মৌনই হ'তে হয়। আজকাল রাজযোগ বড়ই কঠিন। এতে কৃত কার্য্য হওয়া প্রায় অসম্ভব। ভক্তিযোগই এ সময়ের উপযোগী, ভগবানের কৃপা ব্যতীত কিছুই হবার যো নাই।"

সমস্ত অবতার—পূর্ণভগবান্। আনুসঙ্গিক প্রশ্ন।

২২শে অগ্রহায়ণ।

আজ অবতারাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় ঠাকুর বলিতে লাগিলেন,—"কোন কোন সময়ে বিশেষ কোন প্রয়োজনে, ভগবানের শক্তি ব্যক্তি বিশেষের ভিতর দিয়ে কার্য্য করে দেখা যায়। তাহাই অবতার। ও কার্য্যটি শেষ হ'য়ে গেলেই ঐ ব্যক্তিতে ঐ শক্তি আর থাকে না। তখন আর সে অবতারও

নয়। যেমন 'পরশুরাম' বিশেষ একটা সময়ের জন্য অবতার। আবার যাবজ্জীবন অবতারও থাকে, যেমন 'রামচন্দ্র'। অংশ, কলা, আবির্ভাব, আবেশাদি বহুপ্রকার অবতার আছে। অবতার সর্ব্বদাই পূর্ণ, কারণ ভগবৎশক্তির প্রকাশই অবতার। ভগবান সর্ব্বদাই পূর্ণ। তবে তাঁর অংশ,অংশাংশ ইত্যাদি বল্‌বার তাৎপর্য্য এই যে, কোথাও জ্ঞানের কার্য্য, বীর্য্যের কার্য্য, কোথাও বা ভক্তির কার্য্যই দেখা যায়। ভগবান যে কার্য্যে যতটুকু শক্তি প্রকাশ করা আবশ্যক বুঝেন, তত টুকুই মাত্র করেন,তাই ব'লে অন্যশক্তি তাতে নাই, বলা ঠিক নয়। পূর্ণ মাত্রায়ই আছে, প্রকাশ করেন না মাত্র। এক মুহূর্ত্তের জন্যও যদি কোন ক্ষেত্রে ভগবৎ শক্তির আবেশ হয় তথায় পূর্ণ শক্তিই র'য়েছে বুঝ্‌তে হবে। ভগবান কোথাও অপূর্ণ নন, সর্ব্বত্র সকল অবস্থায়ই পূর্ণ। অবতার সমস্তই পূর্ণ, যতটুকু প্রকাশ ততটুকুই লোকে জানে মাত্র।"

সাকার ধ্যানে ভগবানকে লাভ করা যায়, না নিরাকার ধ্যানে ? কোন্ মত ঠিক জিজ্ঞাসা করায়, ঠাকুর বলিলেন,—"মত একটা কিছু নয়। ও সব মতামতে হয় না। সাকার ধ্যানই কর, আর নিরাকার ধ্যানই কর, যা-ই কর, কিছুতেই ভগবানকে লাভ করা যায় না। তিনি স্বপ্রকাশ, নিজে দয়া ক'রে যখন প্রকাশ হন, তখনই তাঁকে জানা যায়। চিত্তশুদ্ধ না হ'লে তাঁর প্রকাশ ধরা যায় না। সাধন ভজন যাই করনা কেন, আগে চিত্তশুদ্ধিটি চাই, চিত্ত শুদ্ধ না হ'লে ভগবানের প্রকাশ হয় না। প্রথমে চিত্ত শুদ্ধ কর।"

শরীরটিকে নীরোগ ও দীর্ঘকাল স্থায়ী কি উপায়ে রাখা যায় জিজ্ঞাসা করায়, ঠাকুর বলিলেন,—"শরীরটিকে নীরোগ ও দীর্ঘকাল স্থায়ী রাখ্‌তে হ'লে আহারের পরিমাণ ও সময় ঠিক রাখ্‌তে হয়। বীর্য্য ধারণই মূল, কিন্তু ঐ নিয়ম দুটির রক্ষা না হ'লে বীর্য্যধারণও ঠিক মত হয় না। পূর্ব্বে যোগী ঋষিদের সকলেরই এদিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁরা কখনও ঐ নিয়ম দুটির অন্যথা করতেন না।"

"কালীঘাটে কালীদর্শন"—"উদাসী সাধু দর্শন"—স্পর্শ করা বিষয়ে উপদেশ।

২৩শে অগ্রহায়ণ।

আজ ঠাকুর আমাদের সকলকে লইয়া কালীঘাটে কালীদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কালীমন্দিরে লোকের খুব ভিড় ছিল। ঠাকুরকে পাণ্ডারা খুব আগ্রহ ও যত্নের সহিত ভিতরে লইয়া গেলেন,—সঙ্গে মাত্র আমরাই রহিলাম। কোন প্রকার অসুবিধাই হইল না। কালীকে মালা ও ডালী দিয়া নমস্কার করিতে করিতে করযোড়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে ঠাকুর যখন 'মা, মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, তখন ঠাকুরের আধ কান্নাস্বরে আমাদেরও প্রাণ কান্দিয়া উঠিল। কালীর নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া ঠাকুরের আপাদ মস্তক থর্ থর্ কাঁপিতে লাগিল। ঠাকুর এদিকে ওদিকে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন, আমরা অতি সাবধানে ঠাকুরকে বাহিরে লইয়া আসিলাম। দলে দলে লোক আসিয়া ঠাকুরের চরণ ধূলি লইতে লাগিল, লোকের ভিড় ঠেলিয়া ঠাকুরকে লইয়া আমরা রাস্তায় আসিলাম।—একটু চলিয়াই ঠাকুর একটি রকে বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন,—**"জগন্নাথের রূপের সহিত এই কালীর রূপের সাদৃশ্য আছে, মার কত দয়া ? সকলকেই মা দয়া কচ্ছে́ন।"**

কালীর মাহাত্ম্য বলিতে বলিতে ঠাকুর ভাবাবেশে ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময় একটি বৃদ্ধা কাঙ্গালিনী আসিয়া ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "বাবা! আজ আমার জন্ম সার্থক। আর আমার কিছু নাই ; একটি পয়সা মাত্র আছে, এই ই তুমি দয়া ক'রে নেও" এই বলিয়া বুড়ী পয়সাটি ঠাকুরের সম্মুখে রাখিলেন। ঠাকুর খুব আগ্রহের সহিত উহা হাতে লইয়া মস্তকে কিছুক্ষণ ধারণ করিয়া রহিলেন, পরে মহেন্দ্র বাবুর হাতে দিলেন। পাছে না নেন, তাই বলিলেন, **"অজাচিত দান অগ্রাহ্য কর্ত্তে নাই, এই পয়সাটি আপনার কন্যাকে দিবেন।"** মহেন্দ্রবাবু যত্ন করিয়া রাখিলেন।

ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়াই ঠাকুর অকস্মাৎ উঠিয়া পড়িলেন, এবং নিকটবর্ত্তী একটি বটগাছের ধারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় কয়েকটি সন্ন্যাসী আপন আপন আসনে বসিয়া ধুনি তাপিতে ছিলেন। একটি সৌম্যমূর্ত্তি, ভস্মাবৃতাঙ্গ, ভজনানন্দী সন্ন্যাসীকে ঠাকুর নমস্কার করিয়া কয়েকটি টাকা সেবার্থে দিয়া বলিলেন,—**"এজন্যই ভগবান আজ আমাকে এখানে এনেছেন।"**

ঠাকুর আশ্রম হইতে যাত্রা করিবার সময়েই কয়েকটি টাকা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীদের জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল, তাহাদের অযাচক বৃত্তি, দুদিন একেবারে আহার জুটে নাই। সন্ন্যাসীটির প্রভাবে ঐ স্থানটি যেন অন্য প্রকার হইয়া রহিয়াছে। উদাস ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ, ঐ স্থানে পঁহুছিবামাত্রেই আমাদের কারো কারো পরিষ্কার অনুভব হইতে লাগিল। অল্প সময় ওখানে বসিয়াই, ঠাকুর বাসায় যাইবার ইচ্ছা জানাইলেন। দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। জ্বর হইল। অবিলম্বে গাড়ী করিয়া আমরা তাঁহাকে লইয়া বাসায় পঁহুছিলাম। নিয়মিত সন্ধ্যা কীর্ত্তনের পর ঠাকুর সুস্থ হইলেন। অধিক রাত্রিতে কথায় কথায় বলিলেন, "ভাবাবেশে থাক্‌লে অথবা অন্যমনস্ক থাক্‌লে, কখনও তাকে স্পর্শ কর্‌তে নাই। স্পর্শ কর্‌তে হ'লে তিনবার ডেকে তাকে জানায়ে স্পর্শ কর্‌তে হয়। এখনও অনেক স্থলে এই নিয়ম প্রচলিত আছে। হঠাৎ কেহ স্পর্শ কর্‌লে, তার সমস্ত গুলি ভাব দেহে সঞ্চার হয়। শরীরটি আগাগোড়া যেন জ্ব'লে যায়। এই নিয়ম, সাধারণের জানা নাই ব'লে, অনেক সময় অনেক উৎপাতে পড়্‌তে হয়।"

রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের আকাঙ্ক্ষা ও অনুরোধ।

২৪—২৭শে অগ্রহায়ণ।

কলিকাতার সুবিখ্যাত দানশীল বিপুল ধনাধিপতি কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের অনুরোধে, শ্রীযুক্ত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় অদ্য বেলা দুইটার সময় ঠাকুরের নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ—কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় প্রতিমাসে সহস্র সহস্র টাকা ধর্ম্মার্থে দান করিতেছেন। উপযুক্ত পাত্রে অর্থদান করিয়া তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন। আপনার সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা লোক মুখে শুনিয়া, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন। আপনাকে দর্শন করিবার জন্য তাঁর বড়ই আগ্রহ জন্মিয়াছে। আপনার নির্দ্দিষ্ট আয় কিছুই নাই, অথচ অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রসন্তানেরা বাড়ী ঘর ত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মলাভ আকাঙ্ক্ষায় আপনার আশ্রয় লইয়া সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন ; আকাশ বৃত্তির উপরই আপনার সম্পূর্ণ নির্ভর। তাই ঠাকুর মহাশয় আপনার নিকটে আমাকে পাঠাইয়া, এই বিষয় জানাইতে বলিলেন যে, তাঁহার একান্ত আকাঙ্ক্ষা একলক্ষ টাকা আপনাকে তিনি উৎসর্গ করেন, এবং ধর্ম্মার্থে আপনার ইচ্ছামত তাহা ব্যয়িত হয়। আপনার অবসর মত অনুগ্রহ করিয়া একবার যদি তাঁহার বাড়ী গিয়ে তাঁহার

সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহা হইলে তাঁহার অভিপ্রায় আপনাকে জানাইয়া, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঐ টাকা আপনার হাতে অর্পণ করেন। এখানে আগন্তক লোকের সমাগম সংবাদ এবং যাঁহারা সর্ব্বদা আছেন, তাঁহারা কিরূপ অবস্থার লোক আর কি প্রকারে অভাবে থাকিয়াও তাঁহারা সন্তুষ্ট চিত্তে আছেন ইত্যাদি তিনি বিশেষ ভাবে জ্ঞাত আছেন।"

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কথা শুনিয়া,—ঠাকুরের চক্ষে জল আসিল,—মুখটি স্ফীত ও আরক্ত হইয়া উঠিল—ঠাকুর করযোড়ে ভগবানকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন :—"(ঠাকুর মহাশয়কে) বলিবেন,—আমার এখানে যা যথার্থ প্রয়োজন, কড়ায় গণ্ডায় হিসাব ক'রে ভগবান তা প্রতিদিন দিয়ে থাকেন। একটি কাণা কড়িরও অভাব রাখেন না, তাঁরই দ্বারে দীনহীন কাঙ্গাল হ'য়ে তাঁর নাম নিয়ে যেন প'ড়ে থাকতে পারি,এই আশীর্ব্বাদ কর্‌তে বল্‌বেন,তিনি ঐ টাকা ধর্ম্মার্থে যথায় ইচ্ছা, দিতে পারেন। আমি তা গ্রহণ কর্‌লে আমার বিশেষ অনিষ্ট হবে মনে করি। বড় লোকের বাড়ী যেতে আমার ভয় হয়।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় আর এই কথার কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়া, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, পরে চলিয়া গেলেন। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় বহু সাধুকেই মাসিক বৃত্তি প্রদান করিতেছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ও খুব সদ্ভাবে এই কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন।

ছোটদাদার সেবা—ঠাকুরের অশ্রু।

২৪—২৭ অগ্রহায়ণ। আমরা কলিকাতা পঁহুছিতেই দ্বারভাঙ্গা হইতে পত্র আসিল, শান্তিসুধা তথায় অতিশয় পীড়িতা, দাউজীও রক্ত আমাশয় রোগে খুব ভুগিতেছেন। ঠাকুর এই সংবাদ প্রাপ্ত মাত্রেই যোগজীবনকে তথায় পাঠাইয়া শান্তিকে এখানে আনাইয়াছেন। শান্তি কয়দিন বৃন্দাবন বাবুর বাড়ী থাকিয়া এখানে আসিয়াছেন। এখন প্রবল জ্বরে ও পেটের অসুখে শান্তি মরণাপন্না, এখানে সেবা শুশ্রূষা করিবারও কেহই নাই। আমরা সকলেই শান্তির অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু কি করিব! সাংসারিক আরাম আনন্দ, সুখভোগ, বিষময় জ্ঞান করিয়া, শুধু ঠাকুরের অমৃতময় সঙ্গলাভেই আমরা মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি। এখানে রোগীর উৎপাত ঘাড়ে লইয়া বিষ্ঠা মূত্র ঘাঁটিতে ভাল লাগিবে কেন? সুতরাং আমরা অনেকেই রোগী হইতে তফাৎ থাকিয়া রোগীর সেবা শুশ্রূষা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, এই প্রকার

কর্ত্তব্য বুদ্ধির উপদেশই একে অন্যকে দিতেছি মাত্র। এদিকে শান্তির অবস্থাও ক্রমশঃই খারাপ হইয়া পড়িতেছে।

ছোটদাদা কলিকাতা থাকিয়া এম, এ, ও আইন পড়িতেছেন। তাঁহার অবসর বড়ই কম; তথাপি ঠাকুরের সঙ্গলোভ ত্যাগ করিতে না পারিয়া, ঝামাপুকুর হইতে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যও আসিয়া প্রত্যহ ঠাকুরকে দর্শন করিয়া যাইতেছেন। শান্তির অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কান্দিয়া উঠিল, তিনি সকল দিকের প্রয়োজন এমন কি ঠাকুরের সঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া অসামান্য ধৈর্য্য সহকারে প্রায় অর্দ্ধক্ষিপ্তা,উৎকট-পীড়িতা শান্তির সেবায় একটানা নিযুক্ত রহিলেন। সন্তুষ্টচিত্তে বিকারী রোগীর বিষম উৎপাতে স্থির থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন এবং নির্ব্বিকার ভাবে বিষ্ঠা মূত্র বমি দুই হাতে পরিষ্কার করিতেছেন দেখিয়া, গুরুভ্রাতারা সকলেই খুব সন্তুষ্ট হইলেন। ঠাকুর সর্ব্বদাই পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে থাকিয়া শান্তির সমস্ত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া থাকেন। আজ প্রসঙ্গক্রমে ছোটদাদার সেবা-পারিপাট্য বিষয়ে কথা তুলিয়া কান্দিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন :—"যথার্থ মায়ের মত দরদ্ ক'রে, রোগীর প্রাণে যা চায় সেটি বুঝে, সেবা শুশ্রূষা ক'রতে সারদাই পারেন। ওঁর স্পর্শে প্রাণ শীতল হ'য়ে যায়। এক ঘটি জল যে সারদা দেন, তাতেও যেন সমস্তটি প্রাণ ঢেলে দেন। সেবা অনেকেই করেন বটে, কিন্তু এমনটি আর দেখা যায় না।"

ঠাকুর অশ্রুপূর্ণ নয়নে গদ গদ ভাবে ছোটদাদার সেবা কার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন শুনিয়া, আমার নিজ জীবনে ধিক্কার আসিল। ভাবিলাম, হায়, কবে এমন দিন আসিবে যে, ঠাকুর আমার সেবা দেখিয়াও এই প্রকার আনন্দ করিবেন! এত কাল এত সাধন ভজন করিয়া এবং ঠাকুরের সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাঁর যে প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলাম না, দুই পাঁচ দিন একটা রোগীর একটু সেবা করিয়া অনায়াসে ছোটদাদা ঠাকুরের সেই প্রসন্নতা লাভ করিলেন। সকলই অদৃষ্টে করে!

এই সময় ঠাকুর নিজে নিজেই বলিতে লাগিলেন :—"স্বার্থ ও অভিমান নিয়ে যে সেবা সে এক প্রকার। দরদের সেবাই প্রকৃত সেবা। সেটি কি আর চেষ্টায় হয়! যার তার হয়!"

শান্তির সেবাকালে, ঠাকুরের কৃপা বিষয়ে ছোটদাদা তাঁর ডায়েরীতে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"দুহাতে বসি কাচাইতে কাচাইতে (পরিষ্কার করিতে করিতে), ওয়াক দিতে দিতে, গুরুজীর সাহায্য চাহিলাম, গুরুজীর কৃপায়,—তাঁরই নামের গুণে, কিঞ্চিৎ হইল। হায়! হায়! নিজের কিছুই ক্ষমতা নাই। একটু সামান্য সেবা করিতে হইলেও গুরুজীর সাহায্য দরকার * গুরুজীর অতিসুন্দর উজ্জ্বল মূর্ত্তি হৃদিমধ্যে প্রকাশিত হইল, * * * * * *। গুরুজী আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। নিমেষ-শূন্য নয়নে। * * আমি উহা এড়াইতে প্রয়াস পাইলাম।"

ঠাকুরের বিরক্তি।

২৪—২৭ অগ্রহায়ণ। ছোটদাদা ও কুঞ্জবাবু (গুহ) রাত্রিতে ঠাকুরের পদসেবা করিয়া থাকেন। একদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে উঁহারা ঠাকুরের পদসেবায় যাইতে উদ্যোগ করিতেছেন, মহেন্দ্র বাবু উঁহাদের বলিলেন, "আমার মাথাটা টিপে দেও।" উঁহারা ভিতরে ভিতরে একটু বিরক্ত হইয়া ব্যস্ততার সহিত তাড়াতাড়ি মহেন্দ্র বাবুর মাথা টিপিয়া উঠিলেন। মহেন্দ্র বাবু তৃপ্তিলাভ করিলেন না। ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া উঁহারা যেমন ঠাকুরের পদসেবার উদ্যোগ করিলেন, ঠাকুর খুব বিরক্তির সহিত ধমক্ দিয়া বলিলেন ঃ—"যাও, যাও, পা আর টিপ্‌তে হবে না, শুয়ে থাক গিয়ে। স'রে যাও।"

উঁহারা মহেন্দ্র বাবুর নিকট ত্রুটির এই ফল বুঝিয়া লজ্জায় ও ভয়ে নির্ব্বাক্ হইয়া সরিয়া পড়িলেন।

কারও ক্লেশে উদাসীন থাকিয়া, বা কারও প্রয়োজন অগ্রাহ্য করিয়া, ঠাকুরের সেবায় গেলে প্রায় সর্ব্বদাই আমরা এ প্রকার ঠকুরের বিরক্তি ভাব দেখি।

ভিতরে ত্রিভঙ্গ।

অগ্রহায়ণ। ঠাকুর দিবারাত্রি ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া নিয়মপূর্ব্বক থাকাতে,—আমাদেরও দৈনিক কার্য্যগুলি নিয়মিত হইয়া আসিয়াছে। সমস্তটি দিন কি প্রকারে যে চলিয়া যায়, বুঝিতে পারি না। সারাদিনে ঠাকুরের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া একটা কথা বলিবারও কেহ অবসর পায়না। রাত্রিতে আহারের পর ঠাকুর কিছুকালের জন্য শিষ্যবর্গের সঙ্গে তাহাদেরই মত হইয়া গিয়া হাসি গল্পে রাত্রি প্রায় বারোটা পর্য্যন্ত অতিবাহিত করেন। আর আর দিনের মত আজও শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী

গুহ মহাশয় ও ছোট দাদা ঠাকুরের পদ সেবা করিতেছেন। ঠাকুর নানা কথা তুলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলেন। তখন অবসর বুঝিয়া ছোট দাদা ঠাকুরকে বলিলেন, "একদিন স্বপ্নে দেখিলাম, দশভুজা ভগবতী আমার ভিতরে প্রবেশ করিয়া, একেবারে মিলাইয়া গেলেন। তখন একটা অসীম শক্তি অনুভব করিলাম,—ইহা কি সত্য?"

ঠাকুর বলিলেন:—"ওহে বাপু, এসব স্বপ্ন কি আর স্বপ্ন! এক ত্রিভঙ্গ আমার ভিতরে প্রবেশ ক'রে আমাকে ত্রিভুবন ঘুরাচ্ছেন। বা'র হ'তে চেষ্টা ক'রে, তিনিও আর পাচ্ছেন না, (হাত দিয়া উভয় পার্শ্ব দেখাইয়া) এদিকে ওদিকে ঘুরে ঘুরে ঠেকে যাচ্ছেন। আর তোমার ভিতরে দশভঙ্গ, ক্রমে টের পাবে।"

ঠাকুর অন্য এক সময়ে বলিয়াছিলেন: "আমার নামের অর্থ ঘুরে বেড়ান।"

কৃষ্ণের বিজয় অর্থাৎ কৃষ্ণের ঘুরে বেড়ান। ঠাকুরের কথার তাৎপর্য্য ইহাই কিনা জানি না।

স্বপ্ন-বিষয়ে কথা। ঠাকুরের রোগীর জন্য সহানুভূতি ও চিকিৎসা।

২৪—২৭শে অগ্রহায়ণ।

নানা প্রকার স্বপ্ন দেখা বিষয়ে প্রশ্ন করায় ঠাকুর বলিলেন.—"অনেক সময় স্বপ্নেই মানুষের চরিত্রের পরীক্ষা হয়। স্বপ্নে যখন দেখ্‌বে, নানা প্রকার প্রলোভনে প'ড়েও চিত্ত স্থির আছে, কোনও দিকে বিচলিত হচ্ছে না, তখনই ঠিক। আর স্বপ্নে মানসিক একটু চঞ্চলতা হ'লেই বুঝ্‌বে, ভিতরের দুর্ব্বলতা যায় নাই। গুরুসম্পর্কে অথবা দেবতাসম্পর্কে যে সব স্বপ্ন দেখা যায়, তা সত্য ব'লে জান্‌বে। ওর ভিতরে অসংলগ্ন যা কিছু মনে হয়, তারও একটা তাৎপর্য্য থাকে। ভাল স্বপ্ন দেখা, একটা মহা সৌভাগ্যের বিষয়। বহুকাল সাধন ভজন ক'রে যে সব অবস্থা আয়ত্ত করা কঠিন হয়, এক মিনিটের স্বপ্নে তা অনায়াসে লাভ হ'ল দেখা গিয়াছে। আমি যখন ডাক্তারী কর্‌তাম, শক্ত রোগীদের জন্য চিন্তা হ'লে, প্রায়ই পরলোকগত দুর্গাচরণ ডাক্তার স্বপ্নে আমাকে ঔষধের কথা ব'লে যেতেন। রোগীদের তাতে অব্যর্থ উপকার হ'তে দেখেছি।"

এই বলিয়া ঠাকুর যে ভাবে রোগীদের সেবা ও চিকিৎসা করিতেন, বলিতে লাগিলেন। শুনিয়া বিস্মিত হইলাম।—একবার শান্তিপুরে বিষম মড়ক লাগিয়াছিল, তিন চারিবার দাস্ত বমি হইয়াই লোক মরিতে লাগিল, শান্তিপুরে ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়িয়া গেল, সহরের লোক চারিদিকে পলাইতে লাগিল, ঠাকুর আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি ঔষধের বাক্স হাতে লইয়া রোগীদের বাড়ী বাড়ী ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাহারই কোন উপকার হইল না। অবশেষে নিরুপায় দেখিয়া একদিন রাত্রে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং কাতরভাবে ঔষধের জন্য প্রার্থনা করিয়া শয়ন করিলেন। নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নযোগে পরলোকগত দুর্গাচরণ ডাক্তার মহাশয় ঠাকুরকে আসিয়া বলিলেন, "স্যাণ্টোনিনের সহিত এই কয়টী ঔষধ মিলাইয়া দাও, খাইলেই রোগী আরোগ্য লাভ করিবে।" রাত্রি ৩॥ টার সময় এই ব্যবস্থা পাইয়া ঠাকুর অমনি উঠিয়া বসিলেন এবং তৎক্ষণাৎ রোগীদের ঘরে ঘরে যাইয়া ঐ ঔষধ দিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য এই যে, ঐ ঔষধ সেবনের পর আর একটী রোগীরও মৃত্যু হইল না।

ঠাকুরের শান্তিপুরে অবস্থান কালে একদিন তিনি গঙ্গার অপর পারে একটী মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসার্থে আহূত হন। রোগীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ও তাহার সংসারের দুরবস্থা দেখিয়া তিনি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। রোগীকে ঔষধ দিয়া পরদিন সকালে আবার ঔষধ আনিতে তাহার বাড়ীর লোকদিগকে বলিয়া আসিলেন। কিন্তু ঐ দিন বিষম দুর্য্যোগ উপস্থিত হইল। সকালবেলা হইতেই খুব বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঠাকুর রোগীর বাড়ী হইতে কেহ ঔষধ লইতে আসিবে মনে করিয়া, উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা অবসান হইল, এদিকে ঝড় বৃষ্টি আরও ভীষণাকার ধারণ করিয়া সহরটীকে লণ্ড ভণ্ড করিতে লাগিল। তখন তিনি রোগীর ক্লেশের অবস্থা মনে করিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং ঔষধের শিশিটি হাতে লইয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাতীরে পার হইবার নৌকা নাই দেখিয়া, তিনি পরিধেয় বস্ত্রে ঔষধের শিশিটি জড়াইয়া মাথায় বাঁধিয়া লইলেন ও ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সেই সময়ের প্রশস্ত ও ভয়ঙ্কর প্রবল গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিতে কাটিতে অপর পারে কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া উঠিলেন এবং তথা হইতে দুর্গম অজ্ঞাত পথে ঘুরিতে ঘুরিতে রোগীর বাড়ীতে গিয়া পঁহুছিলেন। বাড়ীর সকলে ঐ অবস্থায় ঐ সময়ে ঠাকুরকে দেখিয়া অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই দুর্য্যোগে ঘর হ'তে বাহির হওয়া দুষ্কর, আপনি এই রাত্রিতে এতদূরে কি প্রকারে আসিলেন?" ঠাকুর তখন রাস্তার সমস্ত বিবরণ তাহাদিগকে বলিয়া

রোগীকে ঔষধ প্রদান করিলেন এবং সেই রাত্রি তথায়ই অবস্থান করিয়া, রোগীর অবস্থা একটু ভাল হইলে পরদিন প্রাতে চলিয়া আসিলেন।

নবীন বাবুর সেবা কার্য্য।*

২৪—২৭ শে অগ্রহায়ণ।

গুরুভ্রাতা শ্রদ্ধেয় ডাক্তার নবীন বাবুর স্ত্রী বহুকাল যাবৎ উন্মাদগ্রস্তা। তাহার উপর নানা প্রকার রোগের পীড়নে, বিষম শঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আছেন। অনেক সময়েই তাহাকে বান্ধিয়া রাখিতে হয়। নবীন বাবু নিজে প্রতিদিন অত্যন্ত যত্নের সহিত তাহাকে বাহ্য, প্রস্রাব, স্নান আহারাদি করাইয়া থাকেন। একটি দিনের জন্যও ঝি বা অন্য কাহারও উপর নির্ভর করেন না। ঠাকুর উঁহার আন্তরিক দরদ ও অক্লান্ত সেবা বিষয়ে প্রশংসা করিয়া বলিলেন :—"আজ কাল এ ভাবের সেবা প্রায় দেখা যায় না।"

প্রত্যহ প্রাতে ও মধ্যাহ্নে নবীন বাবুর বাড়ীতে গুরুভ্রাতাদের সমাগম হইতেছে। যে ভাবে তিনি স্ত্রীর আবদার রক্ষা করিয়া এবং সর্ব্বদা তাহার প্রয়োজনের উপর দৃষ্টি রাখিয়া গুরুভ্রাতাদিগকে আদর যত্ন করিতেছেন, তাহার আর তুলনা নাই। আড়ম্বরশূন্য সদনুষ্ঠানে তাঁহার আগ্রহ ও অধ্যবসায় দেখিয়া অবাক্ হইতেছি।

নিয়মিত আহ্নিক সমাপনান্তে নির্জ্জন ও অবসর বুঝিয়া ফুল চন্দন তুলসী লইয়া প্রতিদিন তিনি ঠাকুরকে পূজা করিতে আসেন। ঠাকুরের সম্মুখে একটু সময় বসিয়াই অশ্রুকম্প পুলকাদিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়েন, এবং ঠাকুরের চরণে তুলসী চন্দনাদি পূজোপহার অর্পণ করিবার উদ্যোগমাত্রই—ঠাকুর "তুলসী পায়ে দিতে নাই, উহা আমার মাথায় দিন" বলিয়া মাথা পাতিয়া গ্রহণ করেন, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাকে আমরা আসন হইতে উঠাইতে পারি না।

---

* শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র ঘোষ।—ইনি এক সময় ভারপ্রাপ্ত সিভিল মেডিকেল অফিসার ছিলেন। চাকুরি করিতে হইলে আপন ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অনুকূলে স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করা বড়ই দুষ্কর বুঝিয়া ইনি চাকরিটি পরিত্যাগ করিলেন। এই সময় ইনি একজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন। তৎকালে ইঁহার সুযশ ব্রাহ্ম সমাজে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর, ক্রমে ক্রমে নবীন বাবুর মতের ও অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, সেই সময় হইতে ইনি যথার্থ বৈষ্ণব আচারে থাকিয়া একটানা সাধন ভজনে দিন রাত অতিবাহিত করিতেছেন। জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বাগুতি গ্রামে ইঁহার নিবাস।

গুরুভ্রাতা বৃন্দাবনবাবু একদিন সকালে রাত্রিবাস কাপড়ে কিছু খাবার আনিয়া ঠাকুরকে দিতে উদ্যোগ করিতেছেন, নবীন বাবু বলিলেন,—'ও কি! নোংরা কাপড়ে খাবার আনিয়া ঠাকুরকে দিতে যাচ্ছেন!' বৃন্দাবন বাবু একটু লজ্জিত হইয়া থামিয়া গেলেন। পরে কথা-প্রসঙ্গে বৃন্দাবন বাবু ঐ বিষয় ঠাকুরকে বলাতে ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন:—"ডাক্তার-বাবু তাঁর ভাব মত তো ঠিকই ব'লেছেন। কিন্তু তুমি তোমার ভাব মত কাজ ক'র্‌লে না কেন? তিনিতো তোমাকে ঠকিয়ে দিয়েছেন।"

বৃন্দাবন বাবু বলিলেন:—"কি জানি মশায়! আপনি যদি না খান!"

ঠাকুর বলিলেন:—"আমি না খেলেও, তুমি ছাড়্‌বে কেন? আমার গাল টিপে খাইয়ে দিবে।"

ভক্তের সেবা-সাহসে ঠাকুরের দুঃখ।

২৪—২৭ শে অগ্রহায়ণ।

বিদেশ হইতে সপরিবারে গুরুভ্রাতারা আসিয়া আশ্রমটি পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। দীক্ষাপ্রার্থী বহু স্ত্রীলোক পুরুষও দূরদেশ হইতে আসিয়াছেন। পঞ্চাশ, ষাট জন লোক সর্ব্বদাই আশ্রমে রহিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় নবীন বাবু এবং চন্দ্রমণি দিদি অকাতরে গোপনে খরচ চালাইয়া যাইতেছিলেন। ঠাকুর মগ্নাবস্থায় থাকিয়া একদিন হঠাৎ কান্দিয়া উঠিয়া বলিলেন:—"ওরা আমাকে তাড়া'লে, এখানে আর থাক্‌তে দিলে না।" কিছুক্ষণ পরে গুরুভ্রাতারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কারা আপনাকে তাড়া'লে?"

ঠাকুর বলিলেন:—"নবীন বাবু, আর নেড়া।"

শুনিয়া চন্দ্রমণি কান্দিয়া বলিলেন,—"বাবা! আমারা কিসে আপনাকে তাড়ালাম?"

ঠাকুর বলিলেন:—"তাড়ালে নাতো কি! তোমরা যে রকম কর্‌ছো, আর কিছু দিন আমি এখানে থা'কলে, তোমরা যে একেবারে রাস্তায় দাঁড়াবে।"

উঁহারা বলিলেন,—"আমাদের কি বাবা! আপনার টাকা, আপনারই প্রয়োজনে লাগিতেছে। আমরা মাত্র উহা হাতে ক'রে দিয়ে ধন্য হ'য়ে যাচ্ছি। এতেও আপনি বাধা দিবেন!" অতিরিক্ত সাহসে চন্দ্রমণি ও নবীন বাবুর ঋণগ্রস্ত হইবার উপক্রম দেখিয়া, ঠাকুর এই ভাবে তাঁহাদের চেষ্টায় বাধা দিলেন।

ভক্তের ভাবে ঠাকুরের আগ্রহ ও সমাদর ।

২৪—২৭ শে অগ্রহায়ণ ।

একদিন একটি খুব গরীব গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে কিছু খাওয়াইবার আকাঙ্ক্ষায় মাত্র দুই তিন আনা পয়সা লইয়া প্রাতে সাতটা হইতে বেলা প্রায় দেড়টা পর্য্যন্ত কলিকাতা সহর ঘুরিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার পছন্দ মত খাবার দুই তিন পয়সার এক এক স্থানে খরিদ করিয়া বেলা দুটার সময় অনাহারে শ্রান্ত শরীরে শ্যামবাজার বাসায় পঁহুছিলেন। কিন্তু ঠাকুর উহা গ্রহণ করিবেন কিনা সংশয়ে ও ত্রাসে তাঁহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। তিনি নীচে (রাস্তায়) সিঁড়ির নিকটে পঁহুছিবা মাত্রই ঠাকুর অকস্মাৎ আসন হইতে উঠিয়া ছল্ ছল্ চক্ষে ছুটিয়া উপরে সিঁড়ির দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন এবং কাঁদ কাঁদ স্বরে পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া গুরুভ্রাতাটিকে বলিলেন,—**"ওহে! তুমি ও কি এনেছ? আন, শীঘ্র আন, আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে।"** ঠাকুরের সস্নেহ আহ্বান শুনিয়া গুরুভ্রাতাটি কাঁদিয়া ফেলিলেন। ঠাকুরের হাতে খাবার দিয়াই পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। ঠাকুরও ছল ছল চক্ষে, অতি আগ্রহের সহিত তাহা প্রায় সমস্তই খাইয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে উহা গুরুভ্রাতাটির হাতে দিয়া, খাদ্যের প্রশংসা করিতে করিতে এবং চোখ মুছিতে মুছিতে আসনে যাইয়া বসিলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত ঠাকুর কিছু আহার করেন না; অসময়ে কিছু খাবার আসিলে, ঠাকুর কিঞ্চিৎ মাত্র গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট সমস্ত আমাদের বিলাইয়া দেন। কিন্তু এই গুরুভ্রাতাটির অসাধারণ আগ্রহ অনুরাগ বুঝিয়াই বোধ হয়, ঠাকুর নিয়ম ভুলিয়া গিয়া অসময়ে প্রায় সমস্ত খাদ্য নিজেই খাইলেন।

* ডাক্তার হরকান্ত বাবুর দীক্ষা।

২৮ অগ্রহায়ণ।

কিছুদিন দীক্ষার খুব হুড়াহুড়ি পড়িয়াছে। কাহারো দীক্ষা হইলেই বড় দাদার কথা আমার মনে পড়ে। এ পর্য্যন্ত তাঁহার দীক্ষা না হওয়ায় বড়ই মনঃকষ্টে আছি। এবার দাদা আসিলেই ঠাকুরের দয়া হইবে ভাবিয়া দাদাকে পুনঃ পুনঃ

---

* ডাক্তার ৺ হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সহোদর। খ্যাতনামা মিঃ কে, জি, গুপ্ত, ডাক্তার পি, কে, রায় প্রভৃতি ইঁহার সমপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। প্রথম বয়সে, কেশববাবুর প্রথম উদ্যমের সময় ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত আস্থাবান ছিলেন; গোঁসায়ের সহিত ঐ সময় হইতেই আলাপ। বহুকাল পশ্চিমা-

জেদ্ করিয়া আসিতে লিখিলাম। ঠাকুরের কৃপার উপর ভরসা থাকায় অনুমতিরও অপেক্ষা করিলাম না। দাদা ফয়জাবাদ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর দাদাকে দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

২৮ শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ত্রয়োদশী তিথিতে দাদার আকাঙ্ক্ষা মত নির্জ্জন গৃহে লইয়া গিয়া ঠাকুর তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন।

দীক্ষাকালে বিশেষ কিছু অনুভব হইল কিনা জিজ্ঞাসা করাতে দাদা বলিলেন,—"আমি প্রাণায়াম করিতে পারিলাম না। কয়েকবার নাম স্মরণ করিতেই কেমন যেন হইয়া গেলাম। মহাদেব আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন 'বেটারি' হইতে তড়িৎ প্রবাহের ন্যায়—অকস্মাৎ সর্ব্বাঙ্গে আমার আনন্দ ছড়াইয়া পড়িল। গোঁসাই দুইহাতে আমার দুই বাহু ধরিয়া ফেলিলেন। গোঁসাইকে 'মহাদেব' রূপে দেখিলাম, ঐ সময়ে আমার যেন তন্দ্রাবেশ হইল; আর কিছুই জানি না।" দাদার কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। সাধন গ্রহণের পর দাদা, ঠাকুরের নিকটে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—

ঋলে ফয়জাবাদ, লক্ষ্ণৌ, মথুরা, কাশী প্রভৃতি স্থানে বিশেষ সুখ্যাতির সহিত সরকারী এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ও সিবিল মেডিকেল অফিসার স্বরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। ইঁহার চাকরীর সময়ে নানা তীর্থে অনেক মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহাদের কৃপায় ইঁহার সনাতন ধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। তৎপরে ঠাকুরের নিকট দীক্ষা লাভ করেন। পেন্সন গ্রহণের পর জীবনের শেষভাগে বিষয়ের সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সাধন ভজন লইয়া ৺পুরীধামে নিজ গুরুর সমাধিস্থানে বাস করিতেছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঠাকুরের কৃপা বিশেষভাবে ইনি প্রত্যক্ষ করেন। পুরীধামে সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া ইনি বঙ্গোপসগারের পূর্ব্বপারের মনোরম দৃশ্য সকল দর্শন করিতেন। বহুদূরে থাকিয়াও গঙ্গার কুলু কুলু ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন, অনেক অলৌকিক ঘটনা ইঁহার প্রত্যক্ষ হইত। মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে ইনি মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে আহ্বান করিয়া তাঁহার মৃত্যুর সময় নির্দ্দেশপূর্ব্বক শব বহন করিবার জন্য বিমান প্রস্তুত করাইলেন। দেহত্যাগের দিন প্রাতঃকালে সহধর্ম্মিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ ঠাকুর আমাকে বলিলেন "তোমার কর্ম্ম শেষ হ'য়ে গেছে, তবে ইচ্ছা ক'রলে আরও কিছু-কাল তুমি থাকৃতে পার অথবা যদি ইচ্ছা হয় এখনই আমার নিকটে আসতে পার"। "এতকালতো আমি সাধ্যমত তোমাদেরই সেবা শুশ্রূষা করিয়াছি, এখন ঠাকুর আমাকে দয়া ক'রে ডাকৃছেন আমি আর থাকৃতে পারি না। তোমরা সকলে আমাকে আশীর্ব্বাদ কর"। এই বলিয়া তিনি নিজ প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের শ্রীমুর্ত্তিতে তুলসী চন্দন দিয়া একটু বার্লি নিবেদন করিয়া দিলেন। পরে নমস্কার করিয়া ঐ প্রসাদ পাইয়া নিজ বিছানায় শয়ন করিলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি সজ্ঞানে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ আশ্রয় করিলেন।

"দীক্ষাতো দিলেন,—কোন্ প্রকার আসনে বসিয়া জপ করিতে হইবে, তাহাতো ঠাকুর বলিলেন না!" ঠাকুর ধ্যানস্থ ছিলেন দাদার মুখের দিকে তাকাইয়া ক্রমে ক্রমে তিন প্রকার আসন করিয়া দেখাইয়া পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন। দাদা মনে মনে খুব আনন্দিত হইলেন। (দাদার নিজ লেখা হইতে উদ্ধৃত)।

হর কান্ত বাবুর স্বপ্ন।

২৯শে অগ্রহায়ণ।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে ঠাকুর, দাদার সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিলেন। দাদার স্বপ্নবৃত্তান্ত বড়ই অদ্ভুত! ঠাকুর এবং গুরুভ্রাতারা অনেকে দু একটি স্বপ্ন শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় ঠাকুরও দাদাকে বলিতে উৎসাহ দিলেন। দাদাও তাঁহার লেখা দুই তিনটি স্বপ্ন বলিতে লাগিলেন (১) "একদিন দেখিলাম ভয়ঙ্কর তরঙ্গ-যুক্ত—কাল জল পরিপূর্ণ খরস্রোতা একটি প্রকাণ্ড নদীর মধ্যস্থলে আপনি দাঁড়াইয়া আছেন; অনেক চেষ্টায় হাবু ডুবু খাইয়া দলে দলে লোক আপনার নিকট যেমনি যাইয়া পঁহুছিতেছে, আপনি তাহাদের প্রত্যেককে দুহাতে ধরিয়া নদীতে ডুবাইয়া ছাড়িয়া দিতে-ছেন। তাহাদের শরীর অমনি সাদা কাঁচের মত পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে এবং তাহারা সকলে একই আকৃতি লাভ করিয়া অনায়াসে নদী পার হইয়া চলিয়া যাইতেছে।"

(২) দাদা আবার বলিলেন,—"আর একদিন দেখিলাম—একটি মেম ডিস্ হাতে খাবার লইয়া, আমার নারায়ণকে ভোগ দিতে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন। এই প্রকার দেখিলাম কেন?"

ঠাকুর বলিলেন,—"**লক্ষ্মী এখন সাহেবদেরই ঘরে। তাই ওরূপ দেখেছেন। যেখানে স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা নাই,—লক্ষ্মী সেখানে থাকেন না। এদেশে দ্রৌপ-দীর উপর যে অত্যাচার অপমান হ'য়েছিল আজ পর্য্যন্ত তার ষোল আনা প্রায়-শ্চিত্ত হয় নাই।**"

মাধোদাস বাবাজীর সমাধিতে অন্তর্দ্ধান ও ঠাকুরের কথা ।

২৯শে অগ্রহায়ণ ।

অযোধ্যার নানকসাহী সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা মাধোদাস বাবাজীর, কি অবস্থায় দেহত্যাগ হইল ঠাকুর জিজ্ঞাসা করায় দাদা বলিলেন,—

"বাবাজী প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ভজন কুটিরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিতেন, এবং সারারাত্রি আসনে সমাধিস্থ থাকিতেন। যে রাত্রিতে তিনি দেহত্যাগ করেন,—সেই রাত্রিতে শিষ্যদিগকে বাহির দিক হইতে দরজা বন্ধ করিতে বলিলেন। ঐ দিন মধ্যাহ্নে বাবাজী আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। একটু অবসর মত যাইব ভাবিয়া ঐ দিন আমি গেলাম না। শেষ রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম,—বাবাজীর দেহটি সোণার হইয়া গিয়াছে। তিনি হাসিতে হাসিতে আমার নিকটে আসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—'বাবা' তোহারা ভালা হোগা, আনন্দ কর্। আভি হাম্ চলে যাতে।" এই বলিয়া অঙ্গচ্ছটায় চারিদিক আলোকিত করিয়া শূন্যমার্গে অনন্ত আকাশে অদৃশ্য হইলেন। স্বপ্ন দেখিয়াই আমি জাগিয়া উঠিলাম ; বুক আমার দুর্ দুর্ করিতে লাগিল ; বাবাজীর ঐ রূপটি পুনঃ পুনঃ মনে জাগিয়া আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। আমি, একটু ফরসা হইতেই, বাবাজীর খবর জানিতে লোক পাঠাইলাম ; কিছুক্ষণ পরেই লোক আসিয়া বলিল, প্রত্যুষে নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাবাজী আসন ত্যাগ না করায় শিষ্যদের মনে সন্দেহ জন্মিল। পরে সকলে জানিলেন,—ঐ রাত্রিতেই বাবাজী নিজ আসনে সমাধির অবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে বাবাজী তাঁর প্রিয়শিষ্য নারায়ণ দাসকে রাম্ভ পালীতে উপস্থিত হইতে সংবাদ দিয়াছিলেন। এখন ঐ নারায়ণ দাসই, বাবাজীর গদিতে আছেন। নারায়ণ দাসেরও খুব সুখ্যাতি শুনিতে পাই।"

মাধোদাস বাবাজীর কথা প্রসঙ্গে এক সময় ঠাকুর বলিলেন ঃ—**"বাবাজী বড়ই দয়াল ছিলেন। আমাকে বড়ই কৃপা কর্তেন। আমাকে নিয়ে এক পাত্রে তিনি আহার করেছিলেন। 'গ্রন্থসাহেব' তিনিই আমাকে পাঠ কর্তে বলেন। তাঁরই কথামত প্রতিদিন আমি তাহা পাঠ কর্ছি। নারায়ণ দাস ঐ গদিতে থাকায় ভালই হইয়াছে। নারায়ণ দাসের প্রতি বাবাজীর অসাধারণ কৃপা ছিল।"**

সাধু নারায়ণ দাসের অদ্ভুত জন্ম বৃত্তান্ত।

২৯শে অগ্রহায়ণ। মাধোদাস বাবাজীর কৃপায় নারায়ণ দাসের অলৌকিক জন্ম সংঘটিত হয়, তদ্‌বৃত্তান্ত শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।—বাবাজীর আশ্রম যখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, প্রত্যহ একটি বিধবা স্ত্রী আসিয়া দুবেলা ঝাড়ু দিয়া যাইত। স্ত্রীলোকটির সংসারে আর কেহই ছিল না, বড়ই গরীব ছিল। তার ঝড়ে বৃষ্টিতে, শীতে, গ্রীষ্মে, অবোধে সেবা দেখিয়া, বাবাজী বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং একদিন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা শীঘ্রই তোমার গর্ভ হইবে, এবং একটি সাধু সুপুত্র জন্ম গ্রহণ করিবেন।" স্ত্রীলোকটি বলিলেন, "বাবা! আমি যে বিধবা! আর অতিশয় দরিদ্র,—পুত্র হইলে আমার দশা কি হইবে?"

বাবাজী শুনিয়া বলিলেন,—"সব গুরুজীর ইচ্ছা। আমি প্রসন্ন হইয়া যাহা বলিয়াছি, তাহাতো আর অন্যথা হইবার যো নাই। তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না। ভালই হইবে। ছেলেটি পাঁচ বৎসরের হইলে আমাকে দিও, আমি চেলা করিয়া রাখিব।" বাবাজীর কথামত বিধবাটির পুত্র হইলে, পাঁচ বৎসর পরে ঐ ছেলেটিকে আনিয়া, মা, বাবাজীর চরণে অর্পণ করিলেন। ছেলেটির তের চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাবাজী উহাকে সঙ্গে সঙ্গেই রাখিয়াছিলেন। পরে সমস্ত তীর্থ পর্য্যটনে পাঠাইয়া দিলেন। সেই সময় হইতে নারায়ণ দাস, গুরুজীর অন্য আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত, এতকাল তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। বাবাজীর সহিত আর দেখা হয় নাই।

যখন আমি ফয়জাবাদে ছিলাম অবসর পাইলেই দাদার সঙ্গে রামুপালিতে বাবাজীকে দর্শন করিতে যাইতাম। আশ্রমটি ঠিক যেন মুনি ঋষিদের তপোবন। ওখানে পঁহুছিবা মাত্রই চিত্তটি প্রফুল্ল হইয়া উঠে। ভজনের একটা আশ্চর্য্য শক্তি ও গাম্ভীর্য্য, আশ্রমে উপস্থিত হওয়া মাত্রই অনুভূত হয়। শুনিয়াছি বাবাজীর অসাধারণ ঐশ্বর্য্য প্রভাবেই আশ্রমের ভিতর দিয়া সমস্ত বন্দবস্ত সত্বেও রেলপথ করা বন্ধ হইয়াছিল। বাবাজীকে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের লোকেই অসাধারণ সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া সম্মান করিতেন। অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও তিনি দীনহীন কাঙ্গাল ছিলেন। ধীর, শান্ত, আনন্দময় বাবাজীর পবিত্র মূর্ত্তি স্মরণে চিত্ত প্রফুল্ল হয়।

পৌষ

ঠাকুরের পূজা আরতি—মহাভাব।

১লা পৌষ। আজ গুরুভ্রাতা রাম দয়াল বাবু ফুল, চন্দন, মালা, ধুনুচি, পঞ্চপ্রদীপাদি পূজোপকরণ ও আরতির সামগ্রী সকল লইয়া বেলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময়ে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর ঐ সময়ে স্থির ভাবে আসনে বসিয়াছিলেন, রামদয়াল বাবুর অভিপ্রায় বুঝিয়াই বোধ হয় চোখ বুঝিলেন এবং সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। রাম দয়াল বাবু সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে বসিলেন এবং করযোড়ে ঠাকুরের পানে চাহিয়া রহিলেন। দর দর ধারে অশ্রুজল বর্ষণে গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। গদ গদ ভাবে পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিয়া ঠাকুরের চরণ যুগলে তিনি অর্পণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাঙ্গ তুলসী চন্দনে সাজাইয়া গলায় ও মস্তকে মালা পরাইয়া দিলেন।

ভাগ্যবান গুরুভ্রাতারাও ঐ সময়ে চতুর্দ্দিক হইতে উল্লসিত প্রাণে জয়ধ্বনি করিতে করিতে অঞ্জলি ভরিয়া পুষ্প ঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রামদয়াল বাবু পঞ্চ প্রদীপাদি দ্বারা যথারীতি ঠাকুরের আরতি আরম্ভ করিলেন। পুনঃ পুনঃ শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। খোল, করতাল, কাঁসর তালে তালে বাজিয়া উঠিল। স্ত্রীলোকেরা মুহুর্ম্মুহুঃ হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন।

গুরুভ্রাতারা সকলে ভাব-বিহ্বল অন্তরে নির্ণিমেষ নয়নে ক্ষণকাল ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়াই অস্থির হইয়া পড়িলেন। ঐ সময়ে কেহ, 'জয় নৃসিংহ', 'জয় নৃসিংহ' বলিতে বলিতে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কেহ বা 'জয় রাম,' 'জয় রাম' বলিতে বলিতে ঠাকুরের সম্মুখে মল্লবেশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, সজোরে বাহু আস্ফোটন করিতে লাগিলেন। কেহ, 'ঐ কিরে' 'ঐ কিরে' বলিতে বলিতে কম্পিত কলেবরে ঠাকুরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দাঁড়ান অবস্থায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া রহিলেন; আবার কেহ কেহ বা হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া 'ঐ দ্যাখ,' 'ঐ দ্যাখ,' বলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরের দিকে ক্ষণমাত্র দৃষ্টি করিয়াই এক এক জনের এক এক প্রকার ভাবের আবির্ভাব হইল।

ঠাকুরকে এক এক জন এক এক প্রকার দেখিয়া কেহ কম্পিত কেহ স্তম্ভিত হইলেন, আবার কেহ কেহ বা হুঙ্কার গর্জ্জন ও ভয়ঙ্কর আস্ফালন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া

পড়িলেন। সঞ্চারী ভাবের মহাতরঙ্গে আজ প্রায় সকলেই চৈতন্যহারা হইলেন। ধন্য গুরুদেব! ধন্য গুরুদেব !!

এক ঘণ্টাকাল এই ভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে সকলেই নিদ্রোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন। ঠাকুরের বামপাশে নিজ আসনে দাঁড়াইয়া, গুরুভ্রাতাদের বিচিত্র ভাবের অদ্ভুত বিকাশ দেখিয়া, পুলকিত ও বিস্মিত হইতে লাগিলাম। আজই ঠাকুরের প্রথম পূজা আরতি হইল। ধন্য গুরুপ্রাণ গুরুভ্রাতৃগণ! তোমাদের এই অসাধারণ গুরুপ্রেমের নিদর্শন চিরকাল স্মৃতিতে রাখিয়া আমার অবশিষ্ট জীবনও যেন ধন্য হইয়া যায়, এই আশীর্ব্বাদ করিও। মধ্যাহ্নে নানা প্রকার সুখাদ্য দ্রব্যে শতাধিক লোকের ভোজন হইল। সারাদিন আজ অনেকে ভাবাবেশেই রহিলেন। সন্ধ্যা কীর্ত্তনে আবার ভাবের প্রবল তরঙ্গে মহা ঢলা ঢলি ব্যাপার হইল। অধিক রাত্রিতে আহারান্তে সকলে বিশ্রাম করিলেন।

"আসন নেড়না, ফোঁস কর্ব্বে।"

২রা পৌষ। গত কল্য ঠাকুরের পূজা আরতি কালে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে যে সকল পত্র, পুষ্প, দূর্ব্বা, চন্দনাদির বর্ষণ হইয়াছিল, অনবসর হেতু সে সকল আসন হইতে তুলিয়া নিতে সুবিধা পাই নাই। মধ্যাহ্নে শৌচে যাইবার সময় কোন কোন দিন ঠাকুর নিজ হইতেই তাঁহার আসন রোদ্রে দিয়া, পাতিয়া রাখিতে বলিয়া যা'ন, আমিও সেইরূপ করি। আজ শৌচে যাইবার সময়ে আসন অপরিষ্কার থাকিল, অথচ উহা তুলিতে বা ঝাড়িয়া রাখিতে বলিলেন না দেখিয়া ভাবিলাম, বুঝি ঠাকুর বলিতে ভুলিয়া গেলেন। তাই আসনটি রৌদ্রে দিতে মনস্থ করিয়া যেমন উহা গুটাইতে একটু সম্মুখের দিকে টানিলাম, অমনি মনে হইল যেন সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের শরীরেও টান পড়িল, কারণ তিনি তন্মুহূর্ত্তেই পাইখানা হইতে উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, **"ওহে? আসন নে'ড় না, থেমে যাও, থেমে যাও! ফোঁস্ করবে।"**

আমি শুনিয়াই একেবারে চমকিয়া গেলাম। আসনের উপরের অংশ ঝাড়িয়া সরিয়া পড়িলাম। ঠাকুর যখন শ্রীবৃন্দাবনে দাউজীর মন্দিরে ছিলেন, তখন ঠাকুরের আসন-ঘরে নিয়ত সাপ থাকিত জানি, গেণ্ডারিয়াতেও ঠাকুরের সাধন কুটীরে আসনের ধারে সর্ব্বদা একটি জাত সাপ অবস্থান করে; জানিনা ইহার ভিতরে কি রহস্য আছে। দুটি পাকা দেয়ালের অন্তরালে পাইখানার ভিতরে থাকিয়া--আসনটি টানার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর তৎক্ষণাৎ

আমাকে বাধা দিলেন,—ইহাতেও চমকিয়া গেলাম। ঠাকুর আসিলেন পরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কলিকাতা সহরে তেতালার উপরে আসনের নীচে সাপ কোথা হইতে আসিল ?"

ঠাকুর বলিলেন :—"বাস্তু-সাপ প্রায় সকল পুরাণ বাড়ীতেইতো আছে, কলিকাতাই কি, আর অন্যত্রই বা কি ? কিছুকালের জন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন ক'রে বস্‌লেই, নিকটবর্ত্তী বাস্তু-সাপ আসনের নীচে এসে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করে।"

আমি বলিলাম,—"আসনের নীচে কি সর্ব্বদাই সাপ থাকে ?"

ঠাকুর বলিলেন :—"এ সব স্থানে সর্ব্বদা থাক্‌বার সুবিধা পাবে কেন ? আসনের নীচে থাকার সুযোগ না ঘট্‌লে, ঐ ঘরে অন্য যে কোনও স্থানে থাক্‌তে পারে। নিকটে নিকটে থাকবারই ওদের চেষ্টা।"

আমি :—"আসন তো প্রায়ই রৌদ্রে দিতে হয়। কখন কি বিপদ ঘটে ভয় হয় ?"

ঠাকুর :—"বিপদের আশঙ্কা কিছু নাই। বিশেষ উপদ্রব না হ'লে ওরা কোন অনিষ্টই করে না। তবে অকস্মাৎ আঘাত পেলে ফোঁস্ কর্‌তে পারে।"

আমি :—"কখন আসনের নীচে সাপ থাকিবে তাহা কিরূপে বুঝিব ?"

ঠাকুর :—"আসন কখনও নাড়া চাড়া কর্‌তে নাই। আমি যখন বল্‌ব তখনই তুলে রৌদ্রে দিও, —না হ'লে শুধু উপর উপর পরিষ্কার ক'রে রেখো।"

যোগজীবনের পত্নীর গর্ভস্থ পুত্রের মৃত্যু বিবরণ এবং তদীয় জননীর ভবিষ্যৎ।

শান্তিসুধার রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইতেই গেণ্ডারিয়া হইতে খবর আসিল, যোগজীবনের স্ত্রী কিছুদিন হয় গর্ভ নাশের ফলে দারুণ জ্বর-বিকারে ভুগিতেছেন। গুরুভ্রাতা, ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্ন চন্দ্র মজুমদার মহাশয়, খুব যত্ন সহকারে চিকিৎসা করিতেছেন। কিন্তু রোগীর অবস্থা বড়ই আশঙ্কাজনক, গেণ্ডারিয়াস্থ গুরুভ্রাতা—ভগ্নীরা সকলেই উঁহাকে নিয়া ব্যতিব্যস্ত। ঠাকুর এই সংবাদ পাইয়াই, যোগজীবনকে ঢাকা যাইতে বলিলেন।

ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়িয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া, যোগজীবন কাঁদিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর তখন যোগজীবনকে ধীরভাবে বুঝাইয়া বলিলেন :—"স্ত্রীর প্রতি যা একটুকু কর্ত্তব্য আছে এ সময়ে যে'য়ে শেষ ক'রে নে। আর তোকে, স্ত্রী নিয়ে ঘর ক'র্‌তে হবে না। খুব শীঘ্রই বউমা দেহ রাখ্‌বেন। এবার তাঁর আর নিস্কৃতি নাই। তা'হলেও যে কটা দিন আছেন, সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসার কোন প্রকার ত্রুটি না হয়। চিকিৎসাতে দৈহিক ভোগের প্রায়শ্চিত্ত হয়। অবিলম্বে ঢাকা যেয়ে এ সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত কর্। আমিও শীঘ্রই যাচ্ছি।"

আজন্ম উদাস—প্রকৃতি যোগজীবন, স্ত্রী লইয়া ঘর করিতে হইবে না শুনিয়া, আনন্দে যেন লাফাইয়া উঠিলেন, এবং অদ্যই রাত্রির গাড়ীতে গেণ্ডারিয়া রওয়ানা হইতে প্রস্তুত হইলেন। অবসর মত গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যোগজীবনের স্ত্রীর পুত্র, গর্ভেই নষ্ট হইল কেন? রোগ কি মারাত্মক?"

ঠাকুর বলিলেন :—"একজন উন্নত অবস্থার যোগী, কর্ম্মবিপাকে প'ড়ে একটি গুরুতর অপরাধ ক'রে ফেলেন। তাতে অভিশাপ হ'ল, সাতবার গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। তাই জীবিত অবস্থায় কখনও ইনি ভূমিষ্ঠ হন্ না। আরও তিনবার ওঁকে গর্ভবাস ক'রে, পূর্ব্বাবস্থা লাভ ক'র্‌তে হবে, যে-সে ক্ষেত্রে ইনি প্রবেশ করেন না। প্রসূতিও ইঁহার ভূমিষ্ঠ হবার পরই, দেহত্যাগ করেন।"

যোগজীবনের স্ত্রীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বড়ই দুঃখ হইল! আহা! প্রথম গর্ভের উপসর্গে ও অবসন্নতায় নিতান্ত রুগ্নদেহ লইয়া, প্রতিকূল আচরণেও উপযুক্ত দয়া এবং সদ্ব্যবহারের অভাবেও ভগ্নোৎসাহ না হইয়া, যে ভাবে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট চিত্তে অম্লান বদনে, সহিষ্ণুতা সহকারে তিনি আশ্রমস্থ ও পরিবারস্থ সকলের সেবা কার্য্য চালাইয়াছেন, তাহা বড় সহজ নয়। সাধারণ ধৈর্য্যের পরিচয় নয়। এবার গেণ্ডারিয়াতে যাইয়া আবার কি তাঁর সেই দীনভাবাপন্না সরলতা মাখা মূর্ত্তি দেখিতে পাইব? ঠাকুরের কথায় মনে হইল, খুব শীঘ্রই তাঁহার দেহ-ত্যাগ হইবে এবং দেহত্যাগের পূর্ব্বে ঠাকুরেরও তথায় উপস্থিত থাকিতে হইবে। আমরা সকলেই যোগজীবনের স্ত্রীর কখন কি সংবাদ আসে এই উৎকণ্ঠায় দিন কাটাইতে লাগিলাম। ঠাকুর কখন গেণ্ডারিয়া চলিয়া যান নিশ্চয় নাই।

আহার বিষয়ে অনুশাসন,—জাতিবিচার।

৩ পৌষ। অপরাহ্নে তিনটার পর উনন ধরাইয়া রান্না এবং আহার শেষ করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া পড়ে। সুতরাং ঐ সময়ে ঠাকুরের অনেক কথা শুনিতে পাই না। এজন্য আজ সহজে আহারের ব্যাপার চুকাইব মনে করিয়া, সরকারী পাকের পরেই সেই জলন্ত উনুনে ভাতে-সিদ্ধ-ভাত রান্না করিলাম। পরে ঐ ঘরের এক কোণে উহা রাখিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া বসিয়া রহিলাম। "নির্দ্দিষ্ট সময়ে পবিত্র ভাবে স্বপাক আহার করিতে হইবে," আমার আহার বিষয়ে ঠাকুরের উপদেশের ইহাই সার মর্ম্ম, মতলবে ঠেকিয়া মনকে এই প্রকার বুঝাইয়া সাড়ে তিনটার পরই আহার করিতে গেলাম। আহার করিতে প্রস্তুত হইয়া সম্মুখে অন্ন নিয়া বসিয়াছি, এমন সময়ে একটি কায়স্থ গুরুভগ্নী, পীড়িতা শান্তিসুধার পথ্য প্রস্তুত করিতে রান্না ঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিয়াই আমার মাথা গরম হইয়া গেল। তাঁহাকে খুব ধমক্ দিয়া বলিলাম,—"আমি নির্জ্জনে আহার করি, তুমি তা জান না? তুমি ঘরে প্রবেশ করিলে! আজ আমার অন্ন নষ্ট হইল। আজ আমি আর আহার করিব না।" এই বলিয়া আসন হইতে উঠিয়া পড়িলাম। গুরুভগ্নীটি নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। ঠাকুর ঠিক সেই সময়েই খুব উচ্চৈঃস্বরে আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইতেই ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন:—"কি হ'য়েছে?"

আমি বলিলাম,—"আমি আহার করিতে বসিয়াছি, শূদ্রা একটি গুরুভগিনী সেই সময়ে ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন।"

ঠাকুর বলিলেন:—"আচ্ছা, যাও সেই অন্নই যেয়ে খেয়ে নেও।"

ঐ সময়ে ঠাকুর আমাকে আর কিছুই বলিলেন না। আহারান্তে ঠাকুরের নিকট যাইয়া বসা মাত্রেই ঠাকুর আমাকে বলিতে লাগিলেন:—"মেজাজটি একটু ঠাণ্ডা রেখে চল্‌তে চেষ্টা ক'রো। মেজাজ উত্তপ্ত হ'লে সাধন ভজনের সমস্ত ফল নষ্ট হ'য়ে যায়। আহারের সময়ে কায়স্থ ঘরে প্রবেশ কর্‌লেই সমস্ত খাবার নষ্ট হ'য়ে যাবে, এ তোমাকে কে ব'লেছে? আর কায়স্থ ব্রাহ্মণ বুঝাও বড় সহজ নয়। শূদ্র কায়স্থের মধ্যেও অনেক ব্রাহ্মণ আছেন। যাঁরা সত্ত্বগুনী তাঁরাই ব্রাহ্মণ। রজস্তমো গুনীদের স্পর্শেই আহার্য্য দূষিত হয়। সত্ত্বগুনী কায়স্থদের প্রতি তোমাদের যদি ঐ প্রকার ভাব হয়, তাহ'লে ঠিক হবে না। নিতান্ত

সংকীর্ণ হ'য়ে পড়্‌বে। গুণ দ্বারাই জাতি বিচার, এসব বিচার ক'রে না চল্‌লে, মানুষ বড়ই ভ্রমে প'ড়ে যায়।"

"অন্যের পাক করা অন্ন খাবে না, এই তোমার নিয়ম। সকলের আহার শেষ হ'য়ে গেলে, নির্দ্দিষ্ট একটা সময়ে রান্না হ'লেই নিবেদন ক'রে খেয়ে নিবে। পাক ক'রে রেখে দিয়ে কিছুক্ষণ পরে আহার করা ঠিক নয়। ঢেলে রাখলে মানুষের দৃষ্টি হ'তে রক্ষা করা যায় বটে, কিন্তু পক্ক অন্নে শুধু মানুষের দৃষ্টিইতো পড়ে না! ভূত প্রেত অপদেবতাদির দৃষ্টি এবং কুকুর বিড়ালাদির স্পর্শও তো যখন তখনই হ'তে পারে। সুতরাং পাকটি যেমনি হবে, অমনি নিবেদন ক'রে আহার ক'রবে। সর্ব্বদা বিচার ক'রে না চ'লে অনেক সময়ে গোলে পড়্‌তে হয়। অপরাধী হ'তে হয়।"

অবিচারে ভালমন্দ বুঝার সঙ্কেত।

প্রশ্ন:—প্রতি কার্য্যে বিচার কর্‌তে গেলে কায কি আর করা যায়। বিচারের তো অন্ত নাই! এমন অবস্থা কি হয় না, যে বিচার না কর্‌লেও ভাল মন্দ বুঝতে পারা যায়?

ঠাকুর বলিলেন:—"হাঁ খুব হয়। আমাদের অন্তরে প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রতিকার্য্য সম্বন্ধে এটি ভাল এটি মন্দ, এই প্রকার শব্দ আপনা আপনি উঠ্‌ছে। যাঁরা নিয়ম মত সর্ব্বদা প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে লক্ষ্য রেখে নাম করেন, দমে দমে কুম্ভক করেন, তাঁদের দেহ শুদ্ধ হ'য়ে যায়, তাঁরাই ঐ ধ্বনি শুন্‌তে পান। এরূপ অবস্থা লাভ হ'লে, তাঁদের আর বিচার কখনও কর্‌তে হয় না। তাঁদের আর কোন ভয় বা সংশয়ও থাকে না। কিন্তু যাঁদের সেরূপ অবস্থা নয়, তাঁদের প্রতি কার্য্যে বিচার না কর্‌লে চল্‌বে কেন? এসকল বলিয়া ঠাকুর নীরব হইলেন।"

বীর্য্যধারণাদি শারীরিক তপস্যার প্রয়োজনীয়তা।

আমি একটু পরেই জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আহার-শুদ্ধি, দেহ-শুদ্ধি এবং বীর্য্যধারণ এসমস্তই তো শারীরিক তপস্যা?"

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন :—"তা বটে! কিন্তু এসব ঠিক না হ'লে তো সহজে ধর্ম্মলাভ হয় না। ধর্ম্মলাভের সর্ব্বপ্রধান উপায়ই শরীর। সর্ব্বাগ্রে এই শরীরটিকে রক্ষা কর্‌তে হয়। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন ইত্যাদি আহারে যে দেহের পুষ্টি সে নিতান্তই অসার। বীর্য্যধারণেই যথার্থ দেহ রক্ষা হয়। আহারটি খুব পবিত্র ভাবে না হ'লে বীর্য্য ধারণ হয় না। শরীর সুস্থ ও পবিত্র না হ'লে, সাধন কর্‌বে কি নিয়ে?"

শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"পবিত্র আহার, পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি, বাক্য সংযমাদি বীর্য্যধারণের যে সকল নিয়ম বলিয়া দিয়াছেন, প্রাণপণে করিয়া যাইতেছি। কিন্তু বীর্য্যধারণ তো কিছুতেই হইতেছে না! কি করিলে স্বপ্নদোষের হাত হ'তে রক্ষা পাই বলিয়া দিন।"

ঠাকুর বলিলেন :—"দুটিঘণ্টা খুব স্থির হ'য়ে ব'সে নাম ক'রো দেখি, কেমন স্বপ্নদোষ হয়।"

নামে সিদ্ধিই প্রকৃত সিদ্ধি।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'যে সব নিয়ম দিয়াছেন, সেভাবে চলিলে কতকালে সিদ্ধ হইব?'

ঠাকুর বলিলেন :—"সিদ্ধি কি? কতকগুলি শক্তি লাভ করাই কি সিদ্ধি মনে কর? ষড়ৈশ্বর্য্য অতি তুচ্ছ বিষয়। কখনও ওতে আশক্তি রেখো না। যেরূপ অধ্যবসায়ের সহিত সাধন ভজন ও চেষ্টা কর্‌ছ, ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য ঐ রূপটি কর্‌লে একটি বছরেই ঢের ঐশ্বর্য্য আয়ত্ত কর্‌তে পার। মাত্র একটি বৎসর বীর্য্য ধারণ ক'রে যদি সত্য-বাক্য, সত্য-চিন্তা ও সত্য-ব্যবহার কর্‌তে পার, অনেক ঐশ্বর্য্য শক্তি লাভ হবে। কিন্তু তাকে সিদ্ধি বলে না। যখন দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি প্রতিক্ষণে আপনা আপনি ভগবানের নাম কর্‌বে, তখনই যথার্থ সিদ্ধিলাভ হ'য়েছে জানবে। কোন একটি বিষয়ে লোভ বা আসক্তি থাকতে সে অবস্থা কখনও লাভ হয় না। সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লোভ অনাসক্ত হ'লেই হয়। এই অবস্থা হ'লেই প্রকৃত পক্ষে নামে রুচি জন্মে। নামে সিদ্ধিই প্রকৃত সিদ্ধি।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমার চমক্ লাগিল, আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—"অসৎ বিষয়ে লোভই তো ক্ষতিকর ?"

লোভ সর্ব্বত্রই সমান ক্ষতিকর।

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"বিষয় সমস্তই অসৎ। লোভ যে কোন বিষয়ে হউক না কেন—অনিষ্টকর জান্‌বে। রাস্তায় একটি স্ত্রীলোক দেখে তাঁর প্রতি লোভ করাতে যে ক্ষতি, বাজারে মিঠায়ের দোকানে একটি রসগোল্লা দেখে তাতে লোভ করায়ও ধর্ম্মলাভ বিষয়ে ঠিক সেইরূপ ক্ষতি। সামাজিক ইষ্টানিষ্টের কথা স্বতন্ত্র।"

এই সময় মনিবাবু, অচিন্ত্যবাবু, মহেন্দ্রবাবু, প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা রহস্য করিয়া হাসিতে হাসিতে ঠাকুরকে বলিলেন,—"মশায়! ওসব আমাদের দ্বারা হবে না। ধর্ম্মলাভ হউক আর নাই হউক!—পৌত্রিক সম্পত্তি (গুরুকৃপা) কিছুতো পাবই।"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"ধর্ম্মলাভ সকলেরই হবে, বঞ্চিত কেহই হবেন না। তবে দুদিন আগে আর পরে। সকলেই যে সকল নিয়ম প্রতিপালন ক'রে চল্‌তে পারবে তা নয়। অন্ততঃ নিয়মগুলি প্রতিপালনের একটু ইচ্ছা যদি থাকে তা হ'লেও যথেষ্ট।"

একথা বলামাত্রেই সকলে একবারে হাসিয়া উঠিলেন। মনে হইল, "এযে বজ্র-আঁটুনি ফস্কা গেরো।"

গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ বিষয়ে কতিপয় প্রশ্নোত্তর।

শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ সামন্ত মহাশয় ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ— আপনি যা ব'লে দিয়েছেন সেই মত যারা চলে আর যারা সেই মত চলে না, এই দু'য়ের মধ্যে তফাৎ কি ?

ঠাকুর উত্তরে বলিলেন ঃ—"উপদেশ মত যাঁরা চলেন তাঁদের সঙ্গে যে একটা যোগ রয়েছে, এ তাঁরা পরিষ্কার বুঝ্‌তে পারেন, আর যাঁরা উপদেশ মত চলেন না, তাঁদের মাঝে কিছুদিন, ইহা চাপা প'ড়ে যায়।"

উনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—সাধনের সময়ে যাকে যা ব'লে দিয়েছেন, সেই রকম

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ ঠাকুরতা।

শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।
(সেবায়েৎ জটিয়াবাবার সমাধি পুরী।)

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত।

সে চ'লতে না পার্‌লে অথবা তার বিপরীত আচরণ ক'রলে তার কি হবে? আর এসব কারণে কাকেও ত্যাগ করা হয় কিনা?

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"কাহাকেও একেবারে ত্যাগ করা হয় না; এই জিনিষ যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের ইহা কখনও নষ্ট হয় না। সময়ে সকলেরই সব ঠিক হ'য়ে যায়।"

পরে দেবেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'যাহারা সাধন লইয়া গিয়াছেন, জীবনে আর কখনও দেখা হয় নাই, তাঁহাদিগের সকলকে আপনি চিনেন কিনা?'

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"সকলের সঙ্গেই অন্তরের একটা যোগ রয়েছে।"

দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন—'অন্তরের যোগের কথা বল্‌ছিনা, বাহ্যিক তাদের চিনেন কিনা?'

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"হাঁ চিনি।"

তখন দেবেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'তবে, আপনি নূতন কেউ এলে "ইনি কোথা থেকে এলেন, ইনি কে", ইত্যাদি বলেন কেন?'

ইহাতে ঠাকুর কোন উত্তর না দিয়া কেবল একটু হাসিলেন। দেবেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইহাদের প্রত্যেকের খোঁজ রাখেন কিনা?'

ঠাকুর ঃ—"হাঁ।"

দেবেন্দ্র বাবু ঃ—তাঁহাদিগের বিষয়ে মনোযোগ দিয়ে আপনার জান্‌তে হয় কি? (অর্থাৎ পূর্ব্বে ঋষি মুনিরা যেমন কোন বিষয় জান্‌তে হ'লে ধ্যানস্থ হ'য়ে জান্‌তেন, সেইরূপ কিনা?)

ঠাকুর ঃ—"মনোযোগ দিয়ে জান্‌তে হয় না। প্রত্যেকের জীবনের ভাল মন্দ, যাহা কিছু বর্ত্তমানে ঘট্‌ছে তাহা চোখে পড়ে।"

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঠাকুর সাহেব-বাড়ীর দোকানের আয়নার কথা বলিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় ঠাকুরকে প্রশ্ন করেন—'গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে না পারিলে কিরূপ হয়?'

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"গুরুর আজ্ঞা কি কেহ প্রতিপালন কর্‌তে পারে।"

মনোরঞ্জন বাবু ঃ—সামান্য সামান্য আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারে তো—যেমন মাংস না খাওয়া ইত্যাদি।—

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"তাও পারে না।" একটু থামিয়া,—"যিনি গুরুর আজ্ঞা পালন করেন, তিনি তো করেনই, যাঁর প্রতিপালন কর্‌বার ইচ্ছা আছে, দুর্ব্বলতা

বশতঃ পারেন না, তিনিও গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করেন। এই সাধন যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা যদি গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন নাও করেন, এমন কি বিরুদ্ধেও চলেন, সময়ে তাঁরাও ফল পাবেন ; ইহা নিশ্চয়।"

লোভে হতাশ,—উপদেশ।

৬ই পৌষ। সকল বেলা সাধন করিতে করিতে বিষম একটা জ্বালা প্রাণে আসিয়া পড়িল—মনে হইল আজ ছয় বৎসর হইল দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি, এ সময়টা যথাসাধ্য নিয়ম নিষ্ঠায় থাকিয়া সাধন ভজনও করিয়া আসিতেছি, কিন্তু জীবনের উন্নতি কিছুইতো দেখিতেছি না। ছেলে বেলা হইতে যে সকল কু-অভ্যাস স্বভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার একটিওতো এতকালে বিন্দুমাত্র শিথিল হইল না ? এ সকল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্থির হইব কবে ! আর ভগবদুপাসনাই বা করিব কবে! দিন তো এ সকল উৎপাত শান্তির নিমিত্ত লড়াই করিতে করিতেই শেষ হ'য়ে গেল ! ঠাকুরের অপরিসীম কৃপাগুণে দুরন্ত কাম রিপুর উত্তেজনার প্রায় নিবৃত্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু লোভের ভয়ঙ্কর উদ্দীপনায় দিনরাত জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছি। ঠাকুরের আদেশ অনুসারে দিবসান্তে একবেলা স্বপাক ভাতে-সিদ্ধ-ভাত মাত্র আহার করিতেছি, তাহাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতেছে বটে কিন্তু নানা প্রকার সুখাদ্য মিষ্টান্ন, ঘৃতান্ন প্রভৃতি প্রতিদিন ঠাকুর আবার আমাকেই পরিবেশন করিতে আদেশ করায়, বিষম লোভাগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন দেখিতেছি। সে সকল সুস্বাদ সামগ্রী প্রত্যহ নাড়া চাড়া করিতেছি, এখন ভজন সাধনে জলাঞ্জলি দিয়া তাহারই রসাস্বাদন কল্পনায় সারাদিন জিহ্বা চুষিয়া কাটাইতেছি। সকলের অজ্ঞাতসারে চুরি করিয়া ঐ সকল বস্তু খাইতে সময়ে সময়ে প্রবল ইচ্ছা পর্য্যন্ত হইতেছে ; কখনো কখনো আবার এমনই জ্বালা হইতে থাকে যে, ঠাকুরের সঙ্গও ভাল লাগেনা, মনে হয় ঠাকুরের সঙ্গে থাকিলে যদি এ সকল লোভের বস্তু সর্ব্বদা নাড়া চাড়া করিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়াই মরিতে হয়, এমন সঙ্গে আর লাভ কি ! ক্ষতিইতো হইতেছে বরং তফাৎ হইয়া যাই। হায় ! হায় !! ভগবানের পূজা করিয়া কৃতার্থ হইব প্রত্যাশায়, বাড়ী ঘর, আত্মীয় স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম, শেষ কালে আমার এই দশা ! এখন লোভের বশীভূত হইয়া চুরির প্রবৃত্তি ! দুর্লভ ঠাকুরের সঙ্গ লাভেও বিরক্তি !!

প্রাণের জ্বালা অসহ্য বোধ হওয়াতে,ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম,—"আমি আর সহ্য করিতে

পারি না, চেষ্টা করিতে আমি কোন ত্রুটি করিতেছি কিনা তাহাতো আপনি দেখিতেছেন; এখন আর কি করিব।”

ঠাকুর বলিলেন:—“ওর জন্য তুমি এত ব্যস্ত হ’চ্ছ কেন? একবারেই কি সব হয়! ক্রমে ক্রমে সবই হবে। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা ক’রে অকৃতকার্য্য হ’লে, তাঁর উপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে ব’সে ব’সে তাঁরই নাম ক’রো। ধীরে ধীরে সমস্ত উৎপাতই কেটে যাবে। নিজের কোন ক্ষমতা নাই বুঝ্‌লে তাঁর উপর নির্ভর না ক’রে আর উপায় কি? মনটিকে খোলসা ক’রে ফেল। নিজের দুরবস্থা পরিস্কার বুঝে সরল ভাবে একবার তাঁর দিকে তাকায়ে যদি বল্‌তে পার, ‘প্রভো। আমি আর পার্‌লাম না, আমাকে রক্ষা কর,’ তিনি রক্ষা কর্‌বেন। এ ভিন্ন আর উপায় নাই।”

মনে মনে ভাবিলাম,—‘নিজের চেষ্টায় কখনও পারিব না ইহা যথার্থ বুঝিলে আর অনুতাপ হইবে কেন! এখন তো বুঝি আমিই সমস্ত করিব, তবে সাহায্যও চাই।’

দীক্ষাস্থলে বিচিত্র ভাব।

৪ঠা পৌষ।

ঠাকুরের শ্যামবাজারের বাসায় আসিবার পর বরিশাল, ফরিদপুর, বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার বহু স্ত্রীলোক পুরুষ এবং কলিকাতা নিবাসী অনেক ভদ্র মহিলারা আসিয়া ঠাকুরের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। দু পাঁচ দিন অন্তরই লোকের দীক্ষা হইতেছে। এই দীক্ষা সময়ে যে সকল অলৌকিক ব্যাপার দেখিতেছি তাহা ব্যক্ত করিবার যো নাই,—একই সময়ে বহুলোকের দীক্ষা কালেও—এক এক জনের ভিতরে এক এক প্রকার দর্শন ও অনুভূতি, তাহাতে এক এক প্রকার ভাব ও উচ্ছ্বাস, আনন্দ ও আবেশ দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি। মহাপুরুষ ও পরলোক গত আত্মাদের একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে আবির্ভাব হেতু, কেহ জ্ঞাত কেহ বা অজ্ঞাত বিবিধ প্রকার ভাষায়, আনন্দ উল্লাস পূর্ব্বক স্তবস্তুতি করিতেছেন। আবার কেহ কেহবা আত্ম-পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক ক্লেশসূচক বিলাপ করিতে করিতে কাতর ভাবে দীক্ষা প্রার্থনা জানাইতেছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়া যাইতেছি। ঠাকুর এই সকল পরলোকগত জীবদের কাহাকে স্তবস্তুতি বা নমস্কার দ্বারা, কাহাকেও বা ভর্ৎসনা ও তাড়না দ্বারা বিদায় দিয়া থাকেন। এই সাধনে প্রকৃতিভেদে কেহ কেহ উপদেশ ও দীক্ষা মাত্র, নাম শ্রবণান্তে প্রাণায়াম করিয়া সহস্র অম-

স্থায়ই অবস্থান করেন, দীক্ষা কালে বিশেষ কিছুই অনুভব করেন না। কেহ কেহ মন্ত্রলাভ করিয়া দুই চারিবার প্রাণায়াম করিয়াই ভাবাবেশে অভিভূত হইয়া পড়েন। আবার কেহ কেহবা নামটি কাণে প্রবেশ করা মাত্রই, একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়েন। দুই তিন ঘণ্টা কাল বাহ্যজ্ঞান ও থাকে না। অজ্ঞাতসারে প্রাণায়ামাদি আপনা আপনি চলিতে থাকে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে মহা সাত্বিক ভাবের বিকার প্রকাশিত হইয়া পড়ে। একই সময়ে দীক্ষা স্থলে বহুলোকের ভিতরে বিচিত্র ভাবের ও অবস্থার সমাবেশ দেখিয়া, দিন দিন একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইতেছি, কিসে যে কি হয়, কিছুই বুঝিতেছি না।

এই দীক্ষা গ্রহণই ত্রিবেণী—স্নান।

৫—১৮ পৌষ।

৪ঠা পৌষ শুক্রবার বেলা দশটার সময়ে বরিশাল, বানরীপাড়া ও ঢাকা জেলার কতকগুলি লোকের দীক্ষা হয়। কুঞ্জ বিহারী গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের মাতা, ভগ্নী, ও স্ত্রী প্রভৃতির দীক্ষাও এই তারিখে হইল। একটি প্রেতাত্মা কুঞ্জবাবুর শালী শ্রীমতী বসন্ত কুমারীর কলিকাতা আসিবার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া দীক্ষা গ্রহণ মানসে তথায়ই উহাকে আশ্রয় করিয়াছিল। দীক্ষা কালে এই প্রেতের কান্না কাটি চীৎকার ও কাতরোক্তি শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছি। কুঞ্জবাবুর স্ত্রী শ্রীমতী কুসুমকুমারী দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ মাত্র চৈতন্যশূন্যা হইলেন, সারাদিন তিনি নেশাখোরের মত ভাবে ঢুলু ঢুলু অবস্থায় রহিলেন। কুঞ্জবাবুর মা দীক্ষান্তে অবসর মত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—"আমি যে আপনার নিকট হইতে মন্ত্র নিলাম, ইহাতো দেশে যাইয়া বলিতে পারিব না; কি বলিব?" সকলে ঐ কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "গোঁসাই কি আপনাকে মিথ্যা কথা বলিতে শিখাইয়া দিবেন?"

ঠাকুর বলিলেন:—"তোমরা এঁদের অবস্থা জান না। এঁদের খুব বড় সমাজ, সমাজে সম্মানও এঁদের খুব, এ সব কথা সেখানে ইনি বল্‌তে পারবেন না।"

তারপর কুঞ্জবাবুর মাকে বলিতে লাগিলেন:—"আপনি বল্‌বেন যে ত্রিবেণীতে স্নান ক'রে এসেছি, শাস্ত্রে ইহাকে ত্রিবেণী স্নান ব'লেছেন। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নাই গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, ইহাদের মিলন স্থান কুণ্ডলিনীকে ত্রিবেণী বলে। কুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগানই ত্রিবেণী স্নান।"

ঠাকুরের এ কথার পরই কুঞ্জবাবুর মাকে ঘটনাতে পড়িয়া ত্রিবেণীতে যাইয়া স্নান করিয়া আসিতে হইল। কুঞ্জবাবুর মা ঠাকুরকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন; "আমি পূর্ব্বে কুলগুরুর নিকটে যে পূজা নিয়াছিলাম, তাহা কি ছাড়িয়া দিব?"

ঠাকুর বলিলেন:—"তা কেন? পূর্ব্বে যে পূজা নিয়েছিলেন তাও কর্‌বেন।"

কুলগুরু প্রদত্ত সাধনও করিতে হইবে কি না? ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অনেকেই অনেক দিন এরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন।

ঠাকুর বহুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন:—"কোনও প্রয়োজন নাই, এই সাধন কর্‌-লেই হবে।"

কোন কোন ব্যক্তিকে বলিয়াছেন:—"ইচ্ছা হ'লে কর্‌বে।"

আবার এখন পরিস্কার করিয়া বলিতেছেন:—"হঁা, তাও কর্‌বে, ইচ্ছা ক'রে ওসব কিছু ছাড়্‌তে নাই।"

অবস্থা ভেদে ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজন অনুসারে এ প্রকার ব্যবস্থা, না, অন্য কোন কারণে "আদেশের এরূপ পরিবর্ত্তন" জানিনা।

দীক্ষা বিনিময়ে দান ও তাহা গ্রহণে অপরাধ।

দীক্ষা গ্রহণের পরে গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত পরেশ নাথ বাবু ঠাকুরকে একখানা মলিদা দিলেন। ঠাকুর উহা একটি শীতবস্ত্রশূন্য কাঙ্গালকে দিয়া দিলেন। ইহাতে সকলেই বিশেষতঃ পরেশবাবু অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। রাত্রিকালে গল্পচ্ছলে মনিবাবু ঠাকুরকে বলিলেন,:—একখানা বস্ত্র যদি জামাইকে ব্যবহার করিতে দেওয়া যায়, আর তাহা তিনি ব্যবহার না করিয়া অন্যকে দিয়া ফেলেন, তা হ'লে মনে বড় কষ্ট হয়।

ঠাকুর বলিলেন:—"দান একবারে কর্‌তে হয়। ওখানি যদি তার নিজস্ব হ'ল, তবে তিনি দিবেন না কেন! গুরুর মন্ত্রের বিনিময়ে কোন দান প্রতিদান নাই, সে অমূল্য। তবে যদি কেহ অন্য সময়ে বৃদ্ধপিতা জ্ঞানে বা অন্য অভি-ভাবক জ্ঞানে কিংবা পথের অন্ধকে দানের ন্যায় দয়া ক'রে দান করেন, তবে গুরু লইতে পারেন, নতুবা গুরু ও শিষ্য উভয়েই অপরাধী হন। অতএব অন্য-ভাবে গুরুকে কেহ কিছু দিওনা।"

অন্য সময়ে দীক্ষাকালে একটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরকে কয়েকটি টাকা দেওয়াতে ঠাকুর তাহাকে বলেন ঃ—"আমি সামান্যজীব, আমাতে সব দোষই সম্ভব, আমার কোন ব্যবহারে যদি এমন কিছু প্রকাশ হ'য়ে থাকে যে, আমি যাচ্ঞা কর্‌ছি, তা হ'লে আমার ত্রুটি হ'য়েছে, আমাকে ক্ষমা করুণ। অর্থের প্রত্যাশায় আমি দীক্ষা দেই না। দীক্ষার বিনিময়ে টাকা যিনি দেন ও নেন উভয়েই নরকগ্রস্থ হন।"

দেব-দেবীর অনুরোধ,—পূজাটি লোপ না হয়।

৫—১৮ পৌষ।

এবার এখানে আসার পর কিছুদিন হয় দীক্ষা সময়ে ঠাকুর সকলকেই একটি নূতন উপদেশ দিতেছেন, দীক্ষার প্রারম্ভেই তিনি বলেন, "যার যেটি দেশগত, সমাজগত বা কুলক্রমাগত রীতি নীতি, আচার পদ্ধতি র'য়েছে, যথাসাধ্য তা বজায় রেখে, এই সাধন পথে চল্‌তে চেষ্টা কর্‌বে।"

এই উপদেশটি নূতন দেওয়া হইতেছে কেন, জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় ঠাকুর বলিলেন ঃ—"একদিন দেখ্‌লাম হিমালয় পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গটি অগ্নিময় হ'য়ে গেছে। সেই অগ্নির ভিতর হ'তে কালী, দুর্গা, মহাদেব ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেব-দেবীগণ বা'র হ'য়ে এসে বল্‌লেন, 'দেখ! আমাদের পূজার লোপ না হয় এই ক'রো।' আমি বল্‌লাম, 'কেন, আমাদ্বারা কি লোপ হ'চ্ছে? তাঁরা বল্‌লেন তুমি যাদের সাধন দিচ্ছ, তারা যদি আমাদের অগ্রাহ্য করে, তাহ'লেই ক্রমে পূজাদি সব লোপ হ'য়ে আস্‌বে। তদবধি দীক্ষার সময় ঐ উপদেশটি দেওয়া হ'চ্ছে।"

একটি গুরুভ্রাতা প্রশ্ন করিলেন,—বিষ্ণু, শিব, এঁদের আবার পূজা পাইতে এত আগ্রহ কেন?

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"এঁরাওতো ত্রিগুণেরই মধ্যে।"

প্রশ্ন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের পূজায় কি ভগবানের পূজা হয় না?

ঠাকুর ঃ—"হাঁ খুব হয়। ভগবদ্বুদ্ধিতে কর্‌লেই হয়। ভগবান, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবরূপে যেমন মায়িক সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা হ'য়ে আছেন, সেইরূপ অপ্রাকৃত

বৈকুণ্ঠ, শিবলোকাদি ধামেও তাঁর ঐ প্রকার সচ্চিদানন্দ রূপ আছে। ভগবানই এক এক রূপে ভক্তের নিকট লীলা কর্‌ছেন।"

মহাত্মা মণিবাবার দৃষ্টি শক্তি।

৫—১৮ পৌষ।

ঠাকুর যখন ফয়জাবাদে দাদার নিকটে কয়েক দিন ছিলেন সেই সময়ে একদিন মণিবাবার সহিত সাক্ষাৎ করেন। মণিবাবা ঠাকুরকে খুব সমাদরে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আপ্‌ কৃপা কর্‌কে হামারা আসন পর্‌ রহিয়ে, হাম আভি দেহ ছোড়্‌ দে'তে"। ঠাকুর এই মহাত্মার সহিত দাদাকে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিলেন। দাদা দু দিন মাত্র কলিকাতায় থাকিয়া চাকরী স্থলে চলিয়া গিয়াছেন এবং সম্প্রতি মণিবাবাকে দর্শন করিয়া পত্র লিখিয়াছেন ঃ—"গোঁসাইর আদেশ মত মণিবাবার দর্শনে গিয়াছিলাম। পূর্ব্বেও কখন কখন মণিবাবার নিকটে আমি যাইতাম; তিনি আর দশটি লোকের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমার প্রতিও প্রায় সেই রূপই করিতেন। কিন্তু এবার আমি বাবাজীর আশ্রমে প্রবেশ করা মাত্রই বাবাজী আমাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন, এবং খুব উল্লসিত ভাবে দুইহাত বিস্তার করিয়া আমাকে আসিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন ঃ—'আহ্বা হা! বহুত্‌ জনম্‌ জনম্‌ তপস্যা কর্‌কে আভি সদ্‌গুরুকা কৃপা লাভ কিয়া হ্যায়। সব পূরণ হো গিয়া, ধন্য হো গিয়া! ধন্য হো গিয়া!!' এই বলিয়া তিনি আমাকে খুব আদর করিয়া নিজের আসনের সম্মুখে নিয়া বসাইলেন, ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। আমি অবাক্‌ হইলাম। গোঁসাইর নিকট আমার দীক্ষা গ্রহণ বিবরণ বাবাজীর জানিবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। তাঁর এই দৃষ্টি শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। বাবাজীর আশীর্ব্বাদ পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল।"

চরণামৃত গ্রহণে প্রেতাত্মার উদ্ধার।

৫—১৮ পৌষ।

অত্যন্ত দুষ্কার্য্যকারী ব্যক্তিদিগের আত্মা, পরলোকে অবস্থান কালে, দুঃসহ যন্ত্রণায় ছট্‌ ফট্‌ করিয়া শান্তির জন্য কত প্রকার উপায়ই অবলম্বন করে, বলা যায় না। কেহ গয়াতে পিণ্ডলাভ আকাঙ্ক্ষায় বংশধরদিগের প্রতি নানা প্রকার উৎপাত আরম্ভ করে; কেহ বা মহদাশ্রয়লাভ করিলে সমস্ত ক্লেশের উপশম হইবে মনে করিয়া, মহাপুরুষদিগের নিকট সুবিধা পাইলেই ছুটাছুটি করে; আবার কোন কোন

আত্মা সদ্‌গুরুর কৃপার একটুকু ছিটা ফোঁটা লাভ হইলেই একেবারে কৃতার্থ হইয়া যাইবে নিশ্চয় করিয়া, তাহারই জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইতেছি।

গভীর রাত্রিতে কয়েকটি ভক্ত গুরুভ্রাতার নিকটে প্রেতাত্মাদের কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিলেন:- "আজ শ্রীবৃন্দাবনে গিয়েছিলাম, যমুনাতীরে কয়েকটি প্রেতাত্মা আমাকে খুব কাতর ভাবে বল্‌লে। 'শত বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় আমাদের ক্লেশ হ'চ্ছে, আমাদের এই ক্লেশ হ'তে, দীক্ষা দিয়ে উদ্ধার করুণ।' আমি বল্‌লাম, 'আমি কিছুই জানিনা। আমার গুরুদেবের হুকুম বিনা কিছুই আমার কর্‌বার উপায় নাই'। তারা বল্‌লে, 'আপনি যমুনায় স্নান করুন।' পরে আমি যমুনায় স্নান ক'রে উঠলাম, ভিজা গায়ের জল, বেয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। প্রেতেরা খুব আগ্রহ ক'রে উহা চেটে খেতে লাগ্‌ল, তখন দেখ্‌লাম তাদের শরীর জ্যোতির্ম্ময় হ'য়ে গেল, এবং দিব্যরথ এসে তাদের নিয়ে গেল।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া কয়েকটি গুরুভ্রাতা ভাবিলেন, চরণামৃত গ্রহণ করিয়া প্রেতাত্মারা যদি উদ্ধার হইল, তবে আমরাও একবার উহা খাইয়া রাখি না কেন? পরদিন সকালে গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয়, ঠাকুরের শৌচান্তে জোর করিয়া চরণামৃত নিয়া আসিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পরিষ্কার কলের জলের চরণামৃত, শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয়, দেবেন্দ্র সামন্ত, মহেন্দ্র বাবু প্রভৃতি যাঁহারা পান করিলেন সকলেই পবিত্র মনোমোহন এক প্রকার সদ্ গন্ধ পাইয়া অবাক্ হইলেন। ঠাকুর গন্ধ বস্তু কিছু ব্যবহার করেন না ইহা আমরা জানি।

পাগলী ঠাকুর মা ও ঠাকুর, ঠাকুরের জন্মবিবরনাদি শ্রবণ।

৫—১৮ পৌষ। শ্যামবাজারে আসিয়া অবধি আশ্রমস্থ লোকের আহারাদির ব্যবস্থা অতিথি অভ্যাগতের আদর অভ্যর্থনা এবং নবাগত দীক্ষাপ্রার্থী স্ত্রীলোক পুরুষের থাকার বন্দোবস্ত ধীর প্রকৃতি কার্য্যদক্ষ গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের উপর বিশেষ ভাবে ন্যস্ত রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র মোহন মজুমদার মহাশয় এবং ডাক্তার নবীন চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও এ সকল কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। চন্দ্রমণি, অনার মা, শারদা পিসি এবং আগন্তুক গুরুভগ্নীদের দ্বারা এত কাল সুচারু রূপে পাক কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া

আসিতেছিল। পরে পাগলী ঠাকুর-মা আসা অবধি সমস্ত উলট্ পালট্ হইয়া গিয়াছে। তিনি আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে রান্না ঘরে ঢুকিলেন। গুরুভগ্নীদের রান্না কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া বলিলেন, আরে একি ? তোরা এখানে কেন। গোঁসাই বাড়ী রান্নাঘরে শূদ্র! তোরা তো এঁটো মুক্ত ক'রবি, আর বাসন মলবি। যতদিন বিজয়ের একটা বিয়ে না দিব, রান্না আমিই ক'রবো। তোরা এ ঘর থেকে বে'র হ।" ঠাকুর মা এই বলিয়া উহাদের কুটনা—বাটনা সমস্ত ফেলিয়া দিলেন এবং নিজহাতে খোসা সহিতে তরকারী কুটিয়া আধসিদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ডালও ঐ প্রকারে রাঁধিলেন, আধোয়া চাউল ফুটাইয়া পিণ্ড করিলেন। প্রথম দিন সকলেই ঠাকুর-মার রান্না দেখিয়া খুব আমোদ করিয়া খাইলেন। ঠাকুর-মাও প্রত্যহই ঐ প্রকার রান্না করিতে লাগিলেন। একদিন চন্দ্রমণি দিদি, ডাল চাউল ধুইয়া রাখিতেই ঠাকুর-মা তাহাকে ঝাঁটা মারিয়া বলিলেন, 'ঠাকুরের ভোগের জিনিস শূদ্র হ'য়ে ছুঁইলি, বড়ই আস্পর্দ্ধা দেখছি ?"—ঠাকুরমার রান্না খেয়ে টে'কা সকলের শক্ত হইয়া উঠিল। একদিন সকলেরই পাতে ডাল, ভাত, তরকারী পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া ঠাকুর-মা ছুটিয়া ছেলের নিকট যাইয়া বলিলেন, 'ওরে বিজয়! বল্ দেখিনি, কেমন রেন্ধেছি ?" ঠাকুর অমনি একমুখ হাসিয়া বলিলেনঃ—"কেন মা! তাকি আর জিজ্ঞাসা কর্ত্তে হয়! ঠিক যেন জগন্নাথের ভোগ। ওঁরা সব কেমন খাচ্ছেন ?" ঠাকুর-মা বলিলেন, 'ওরা খাবে কি!, ওদের কি ভক্তি আছে! আমরা হ'লেম শান্তিপুরে গোঁসাই, আমাদের হাতে দেবতারা খান, বুঝলে! আমরা বাপু তেল ঘি ও দেই না, আর বাটনা কুটনারও ধার ধারিনা,—যা তা সাদা জলে সিদ্ধ ক'রে দি, দ্যাখ্ দেখিনি তারই কত স্বাদ ?"

ঠাকুরঃ—"জগন্নাথের রান্না সাদা জলেই তো হয়।"

গুরুভ্রাতারা তামাসা করিয়া বলিলেন, 'ঠাকুর মা! হেলায় শ্রদ্ধায় কোন প্রকারে এই প্রসাদ এক গ্রাস তল্ করতে পারলেই যে হ'লো। একবারে নিশ্চিন্তি। সারাদিনে আর কিছু না খেলেও চলে।' ইহা শুনিয়া ঠাকুর-মা খুব খুসি! সময় সময় কিন্তু ঠাকুরমার রান্না খুব সুস্বাদও হয়। কেন যে হয়, বুঝি না।

লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জিনিস পত্রও প্রচুর পরিমাণে আসিতেছে। কিন্তু ঠাকুর-মা একদিনের জিনিস অন্যদিনের জন্য রাখেন না। প্রতিদিনই ভাণ্ডার উজাড় করিয়া ফেলেন। প্রচুর পরিমাণে রান্না করিয়া রাস্তা হইতে কাঙ্গাল দুঃখীদের ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইতেছেন। অধিক রান্না করিতে নিষেধ করিলে ঠাকুর-মা ধমক্ দিয়া

বলেন, তোরা মানুষ না পশু? মানুষকে না দিয়া কি কখন মানুষে খায়; সেতো শিয়াল কুকুরেই করে? ভগবান এক মুঠো দয়া ক'রে দিলে, তাহ'তে একগ্রাসও অন্যকে দিতে হয়। ভগবানের দান, যার প্রয়োজন তারই জন্য, সকলেরই জন্য, পুঁজি করিবার জন্য নয়। এক্‌বেলার কোন জিনিস অন্য বেলা থাকেনা দেখিয়া, বৃন্দাবন বাবু একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তিনি ঠাকুর-মাকে একটু হিসাব করিয়া চলিতে বলায়, ঠাকুর-মা তাঁকে বলিলেন,—"গিন্নি! আমরা গোঁসাই বাড়ীর বউ, আজকের যা এ'লো তা হ'লো, কালকের গোবিন্দ আছেন।"

ঠাকুরের জন্য মাত্র একসের দুধ রোজ করা আছে, ঠাকুর-মা ঐ দুধ আহারের সময় সকলকে একহাতা করিয়া বিলাইয়া দেন। ঠাকুরকেও ভাগ মত এক হাতাই দেন। সকলে এজন্য বিরক্ত, কিন্তু ঠাকুর-মা কারো কথা গ্রাহ্য করেন না। একটি গুরুভগ্নী এক সের দুধ গোপনে পৃথক রাখিয়া ঠাকুরকে দিতেছেন।

একদিন ঝি, তাড়া তাড়ি কায সারিয়া বাড়ী যাইতে ব্যস্ত। ঠাকুর-মা তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এত শীঘ্র যেতে ব্যস্ত হচ্ছিস্ যে?" ঝি বলিল, "মা! আমার ছেলেটির অসুখ, আজ তাকে একটু দুধ মাত্র খে'তে দেব। তারই যোগাড়ে যাব।"

ঠাকুর-মা শুনিয়া বলিলেন, "আচ্ছা দাঁড়া।" এই বলিয়া গুরুভগ্নীটির ঘর হইতে ঠাকুরের দুধ আনিয়া ঝিয়ের হাতে দিয়া বলিলেন, "এই নিয়ে যা। ছেলে রোগা, কোথায় আবার তালাস কর্‌তে যাবি, যদি না পা'স।" এই ব্যাপার লইয়া ঠাকুর-মার সঙ্গে কোন কোন গুরুভ্রাতা-ভগ্নীদের ঝগ্‌ড়া হইল। সকলে ঠাকুর-মাকে বলিলেন, "ঠাকুর-মা! দুধ একটু না খেলে তোমার ছেলের যে অসুখ হয়, কষ্ট হয়, জান?"

ঠাকুর-মা বলিলেন, "যাঃ, সব জানি। অসুখ হ'লে ঝিয়ের ছেলের কি কষ্ট হয় না? বিজয়ের তোরা দশজন আছিস্, দরকার হ'লে দশ দিকে ছুটাছুটি কর্‌বি। ঝিয়ের ছেলের জন্য কে আর কর্‌তে যাবি?" ঠাকুর-মা খুব গালাগালি দিয়াও সকলকে জব্দ করিতে না পারিয়া, ছুটিয়া ঠাকুরের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ঠাকুরকে খুব ধমক্ দিয়া বলিলেন, "বিজয়। তোর সঙ্গে সর্ব্বদা থেকেও এদের এরূপ বুদ্ধি হ'লো কেন?" ঠাকুরের চক্ষে জল আসিল, তিনি মাকে ঠাণ্ডা করিয়া সকলকে বলিলেন,—"মার প্রাণে যেরূপ দয়া, তার এক আনাও আমার নাই। ছেলেবেলা দেখেছি, ঝিয়ের ছেলেটিকে মা আমাদের সঙ্গে বসায়ে প্রত্যহ খাওয়াতেন। আমাদের মতন

আসন, তারও ছিল। থালা, বাটি, গ্লাস, মা তাকে আমাদেরই মত কিনে দিয়েছিলেন। কোন প্রকার পৃথক মনে কর্‌তেন না। সে আমাদের সমবয়স্ক ছিল ব'লে ধুতি, চাদর, জামা, জুতো, মা যেমন আমাদের দিতেন তাকেও দিতেন।"

আমাদের ভাণ্ডার ঘরে ঠাকুরের সেবা হয়। ঠাকুরের আহারান্তে আমরা সকলে প্রসাদ বাটিয়া লই। ঝি পরে অবসর মত শূন্য বাসনগুলি লইয়া যায়। ঠাকুর-মা এক দিন হঠাৎ ঐ ঘরে প্রবেশ করিয়া, বাসন পড়িয়া আছে দেখিয়া, একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন। ঠাকুরকে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে বিজয়! একি অনাচার! এঁটো বাসন ভাঁড়ারে! ইন্দুর, বিড়াল, কত কি এ ঘরে আসে, এ ঘরের জিনিস, কি ক'রে ঠাকুরের ভোগে লাগ্‌বে?" এই বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। ঠাকুর শুনিয়া অমনি মার স্বরের উপর আরও স্বর চড়াইয়া বলিলেনঃ—"রাম! রাম! এক্ষনই, এক্ষনই ও সব ফেলে দেও! ও সব কি আর রাখ্‌তে আছে? রাম, রাম!! এঁটোটা যদি সঙ্গে সঙ্গে কেহ তুলে নিতে না পার, তবে কা'ল থেকে আমিই নিব।" ঠাকুর-মা অমনি সমস্ত জিনিস রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন, এবং ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর বলিলেনঃ—"মা পঞ্চমে চড়্‌লে, আমাকেও সেই তালে সপ্তমে চড়্‌তে হয়, না হ'লে কি রক্ষা আছে! মাকে ঐ ভাবে ঠাণ্ডা না কর্‌লে, মা আজ একটা কাণ্ডই ক'রে ফেল্‌তেন। পাগলকে অনেক সময় তার বাগে চ'লে, ঠাণ্ডা রাখ্‌তে হয়, নাহ'লে তারও অনিষ্ট করা হয়।"

ভোর কীর্ত্তন শেষ হইলেই গঙ্গাস্নানে যাওয়ার সময় ঠাকুর-মা একবার ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান। ঠাকুর নিবিষ্ট ভাবে চোখ বুঝিয়া থাকিলেও, ঠাকুর-মা, ঠাকুরকে খুব স্নেহের সহিত ডাকিয়া বলেন, "ওরে বিজয়;—নে, প্রণাম কর্। এখন ওঠ্‌না, ভোর হ'য়েছে দেখচিস্ না?" ঠাকুর অমনি ঠাকুর-মাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি মাথায় নেন, এবং কচি খোঁকাটীর মত মার পানে একদৃষ্টে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকেন, এই সময়ে ঠাকুরের চাহনি আর একরকম হইয়া যায়। উহা দেখিয়া আমরা সকলেই অবাক্ হইয়া বসিয়া থাকি। একদিন বৃন্দাবন বাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মশায়, আপনি ঠাকুর-মার দিকে ও ভাবে চেয়ে থাকেন কেন? আপনার ও রকম চাউনি দেখে, আমাদের ভিতরে যেন কেমন একটা হয়।"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"মা যখন এসে দাঁড়ান, মা'র প্রতি লোমকূপে ব্রহ্মজ্যোতি ফুটে বেরুচ্ছে, আমি দেখ্‌তে পাই।"

ঠাকুর-মাকে একদিন জিজ্ঞাসা করা হইল ;—'ঠাকুর-মা! আমাদের ঠাকুরের জন্ম কথা কিছু বলুন না! লোকের মুখেত কত রকমই শুনি।' ঠাকুর-মা বলিলেন,—'লোকের মুখে আর কি শুনিস্! লোকে তা কি জানে। সাধারণ লোকের জন্ম যে ভাবে হয়, ওর জন্মতো আর সে ভাবে হয় নাই। তা বল্‌লে বিশ্বাস কর্ত্তে পার্‌বি কেন? সে সময় ওর বাবা ব্রহ্মচর্য্য কর্‌তেন, শান্তিপুর হ'তে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কর্‌তে কর্‌তে শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছিলেন, কত ক'রে! বুকেতে, হাতেতে, হাঁটুতে ছালা বেঁধে। ওরকম এখন কেউ করুক দেখিনি! তিনি জগন্নাথের দর্শন পেয়ে যা প্রার্থনা কর্‌লেন, তা-ই হ'লো। ভক্তের আকাঙ্ক্ষাতো ভগবান অপূর্ণ রাখেন না। বিজয় যখন আমার পেটে ছিল, উদয়াস্ত সূর্য্যের প্রতি রশ্মিতে আমি রাধাকৃষ্ণ দর্শন পেতাম।'

ঠাকুর-মা কখন কখন আমাদিগকে পরিহাস করিয়া বলেন ঃ—'যাঃ, তোরাতো কচু-বুনের শিষ্য।' একটি গুরুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন 'ঠাকুর-মা, আপনি কি আর স্থান পেয়ে ছিলেন না? ছেলে হ'লো কচু বনে?' ঠাকুরমা বলিলেন ঃ—"আরে! তখন যে শীকারপুরের বাড়ী বরকান্দাজ এসে ঘেরাও কর্‌লে, বাড়ী ছেড়ে সকলে পালাল, ঝড়, বৃষ্টি, তুফান, যাবো কোথা! আমি গিয়ে বাড়ীর ধারে কচুবনে বস্‌লাম। কতক্ষণ পরে দেখি, বিজয় হ'য়েছে। প্রসব বেদনাতো হয় নাই, আগে বুঝ্‌বো কি ক'রে! তাইতো ওকে সকলে কচুবুনে বলে, আর ওর বাবাকে পাড়ার লোকে খড়ি ধোয়া গোঁসাই বল্‌তো।"

প্রশ্ন ঃ—কেন! তাঁকে খড়িধোয়া গোঁসাই বল্‌তো কেন? ঠাকুর-মা বলিলেন ;—"আরে! তিনি যে ভারি আচারী ছিলেন, জানিস্? নিজে রান্না ক'রে হবিষ্যান্ন কর্‌তেন, রান্নার সময়ে প্রতিদিন প্রত্যেকখানা খড়ি, জলে ধুয়ে নিতেন। এজন্য সকলে তাঁকে খড়ি-ধোয়া গোঁসাই ব'লে ডাক্‌তো, ওরূপ লোককি আর এখন হয়! কত ভক্ত ছিলেন। তিনি যখন ভাগবৎ পাঠ করুতেন, তিন চার ঘণ্টা জ্ঞান থাক্‌তো না, গায়ের সাদা পাতলা চাদর খানা, ঘামের মত রক্তে ভিজে যেতো; লাল হ'য়ে যেতো।"

ঠাকুর-মাকে জিজ্ঞাসা করা হইল ;—'ঠাকুর-মা, আপনি নাকি আতুর ঘরে ঠাকুরকে বিষ খাঁওয়াইয়া ছিলেন?' ঠাকুর-মা বলিলেন ;—'রাম! রাম! তোরা কি, বল্‌দেখিনি! তা কি আবার কেউ করে! ছেলের ঠাণ্ডা লেগেছিল। মুসব্বর যে লাগাতে হয় তাত

আমি জানিনা, আমি মুসব্বর ভেবে, দু আনা আন্দাজ আফিং গুলে খাইয়েছিলাম, কালো হ'য়ে গিয়েছিল, তাতে আর ছেলের কি হ'লো ? ভগবানই দয়া ক'রে রক্ষা করলেন।'

একদিন ঠাকুর-মা ঠাকুরকে বলিলেন :—"বিজয়, তুই আর সবতীর্থে যা'স্ শ্রীক্ষেত্রে যাস্না,"ঠাকুর-মার একথা বলার তাৎপর্য্য কি জিজ্ঞাসা করায়, বলিলেন :—'ও যে শ্রীক্ষেত্র হ'তেই এসেছে শ্রীক্ষেত্রে একবার গেলে আর কি ওকে, আন্‌তে পার্‌বি ? ওর স্থানে একবার ও গেলে, আর ফিরে আস্‌বেনা, সেখানেই থেকে যাবে।'

ঠাকুর-মা ঠাকুরের সম্বন্ধে এই প্রকার অনেক কথা অনেক সময়ে বলেন, সে সকল কথার অর্থ কিছুই বুঝিনা। মাথা গরম অবস্থায় ঠাকুর-মা, যা-তা বলেন বলিয়াই মনে হয়। এ সকল কথা যথার্থ কিনা জানিবার জন্য মধ্যে মধ্যে ডায়েরিতে লিখিয়া রাখিতেছি, অবসর মত ঠাকুরকে এ সব বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা রহিল।

প্রসাদ কাকে বলে। কার্য্যাকার্য্য বুঝা শক্ত।

৫—১৮ পৌষ। প্রতিদিন প্রসাদ লইয়া আমাদের মধ্যে বিষম হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। গুরুভ্রাতাদের মধ্যে ঝগড়াও সময়ে সময়ে হইয়া থাকে।

ঠাকুর ইহা জানিয়া বলিলেন :—"ভুক্তাবশিষ্টকে প্রসাদ বলেনা। উহা উচ্ছিষ্ট, এঁটো। প্রসন্ন ভাবই প্রসাদ। প্রসাদ, ভাবেতে হয়। কৃপাই প্রসাদ, দয়াই প্রসাদ। গুরু যে সকল নিয়ম ক'রে দেন, তা ঠিক মত রক্ষা ক'রে চল্লেই যথার্থ গুরুর প্রসাদ পাওয়া যায়।"

কোন ব্যক্তির কার্য্যা কার্য্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া গুরুভ্রাতারা ঠাকুরকে জ্ঞাত করায়।

ঠাকুর বলিলেন :—"যাঁরা অন্তর্দর্শী, তাঁরা বাইরের কার্য্যাকার্য্যের একটা মূল্যই দেন না। তাঁরা অন্তরের ভাবই দেখেন। কার কোন্ কার্য্যে উপকার হয়, তাও বুঝা বড় কঠিন। অনেক রোগী আছে,কুপথ্য ক'রে উৎকট রোগ হ'তে আরোগ্য লাভ করে। যে সমস্ত কার্য্যকে সংসারের লোকে নিতান্ত জঘন্য মনে করে, হয়ত তা অনুষ্ঠান ক'রে কারো জীবনের বিশেষ কল্যাণ হয়। কিসে কি হয়, তা বুঝা সহজ নয়। যেই যা করুন না কেন, পরিণামে কল্যাণই হয়। নিজের কর্ত্তব্যে স্থির থেকে, অন্যের কার্য্য দেখে যে'তে হয় মাত্র। তাহ'লেই রক্ষা। লোকের দোষ গুণের আলোচনাতে অনিষ্টই হয়।"

ঠাকুর কিছুকাল পরে আবার বলিলেন ঃ—"কারো অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে যদি হঠাৎ একটা অন্যায় কার্য্য হ'য়ে পড়ে, তা হ'লে সে জন্য অপরাধী হ'তে হয় না। জেনে শুনে অন্যায় কার্য্য কর্‌লেই অপরাধ। ভাল কর্‌তে গিয়ে যদি একটা অনিষ্টও ক'রে ফেলে, তাতে অপরাধ হয়না।"

রাসলীলা ও গুরুশিষ্য সম্বন্ধ।

৫—১৮ পৌষ। শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনার প্রতি সঙ্কোচ ভাব যায়না কেন?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—(পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত) "নিজেকে যেমন পাপী ভাবেন, আমাকেও সেইরূপ মনে কর্‌বেন। নন্দ ও যশোদা গোপালকে যেরূপ দেখ্‌তেন, আমাকে সেই ভাবে দেখ্‌বেন।"

এই কথার পর ঠাকুর একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন ঃ—"শ্রীমতীর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখালে তিনি গর্ব্বিতা হন, ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ পলায়ন কর্‌লেন। পরে সখীগণ ও শ্রীমতী একত্র হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্য ক্রন্দন কর্‌তে লাগ্‌লেন। তখন আবার শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হ'য়ে রাসলীলা কর্‌লেন। সখীরা শ্রীকৃষ্ণের বামে শ্রীমতীকে দেখে আনন্দে বিহ্বল হ'লেন, শ্রীমতীও শ্রীকৃষ্ণের বামে সখী-গণকে দেখে আনন্দিতা হ'লেন। গুরুশিষ্য-সম্বন্ধও এই প্রকার। গুরু শিষ্যকে, তুচ্ছ জ্ঞান কর্‌লে, ভগবান গুরুকে পরিত্যাগ করেন। গুরু শিষ্য একত্র হ'য়ে ক্রন্দন কর্‌লে, ভগবান প্রকাশিত হ'য়ে রাসলীলা করেন। তখন শিষ্য গুরুকে কৃষ্ণের বামে দর্শন ক'রে সুখী হন,—গুরুও শিষ্যকে ভগবানের বামে দর্শন ক'রে সুখী হন।"

ভোর কীর্ত্তন,—শিষ্য পদে লুটা লুটি।

৫—১৮ পৌষ। শেষ রাত্রে প্রায় চারিটার সময়ে নিত্যই ঠাকুরের আসনের সম্মুখে ধুপ ধূনা চন্দন গুগ্‌গুলাদি জ্বালিয়া দেওয়া হয়। ঘরটি সুগন্ধি ধূমে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। ঠাকুর করতাল বাজাইয়া,

"হরি বল্‌ব, আর মদনমোহন হেরিব গো।
যাব ব্রজেন্দ্রপুর—হব গোপীকার নূপুর,
গোপীর রাঙ্গাপায়ে রুণু ঝুনু বাজিব গো।
তোরাসব ব্রজবাসী—পুরাও এ অভিলাষি—
আমি নিতই নিতই শ্যামের বাঁশী শুনিব গো।"

গাইতে গাইতে অতি সুস্বরে 'হরি ওঁ' 'হরি ওঁ' বলিতে থাকেন। এবং কান্দিতে কান্দিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়েন।

ঐ সময়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যবাবু ভাবাবিষ্ট হইয়া গাহিতে থাকেন ঃ—

"কানাই! একি ভাই, র'লি প্রভাতে অচৈতন্য!
উঠ্‌ল ভানু ও নীল তনু! যায়না ধেনু কানু ভিন্ন!
অঞ্জন আঁখি যুগলে, গুঞ্জাহার পররে গলে,
কদম্ব মঞ্জরী দিয়ে, সাজাও যুগল কর্ণ।
পর ধড়া, মোহন চূড়া, ব্রজের চূড়া রূপ লাবণ্য।
একদিন বনে, রাখালগণে, বিষ ভোজনে জীবন শূন্য।
তুই যাইছিলি, জীবন দিলি, তোর তুলনা নাই আর অন্য।"

কখনও বা ঃ—"শ্রীঅঙ্গ ত্রিভঙ্গ কেন, কেন বা বাঁকা নয়ন।
ওলো সখি কহ দেখি, ইহার কি বিবরণ।
শ্যাম চঞ্চল নয়নে চায়, কোথা থাকে কোথা যায়,
কে বুঝিবে অভিপ্রায় ইহার কেমন।
সরল বাঁশের অংশ, বংশীকুল অবতংস,
কুল ধর্ম্ম ক'রে ধ্বংস—সে করে মন হরণ।
শ্যাম অতনু সতনু করে, সতনুর মন হরে,
শিখী পাখীর পাখা শিরে, সে করে মনোহরণ।"

ঠাকুর কোন কোন দিন ঃ—

"আমার মন পাগ্‌লারে, হর্‌দমে গুরুজীর নাম লইও।
আরে দমে দমে লইওরে নাম, কামাই নাহি দিও।"

ইত্যাদি গাহিতে গাহিতে 'গুরু ওঁ' 'গুরু ওঁ' বলিতে থাকেন এবং তাঁহার কণ্ঠ রোধ

হইয়া যায়। তখন ঢাকা ও বানরী পাড়ার শশিবাবু প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা খোল করতাল সংযোগে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন ঃ—

"আমি গৌর প্রেমে হ'য়েছি পাগল (ঔষধে আর মানে না)
চল্ স্বজনী যাইগো নদীয়ায়।
নগরেতে হেঁটে যেতে পাড়ার লোকে মন্দ কয়,
(আমি) পরের মন্দ পুষ্প চন্দন, অলঙ্কার প'রেছি গায়।
সাপের বিষ ঝাড়িলে নামে, প্রেমের বিষ উজান ধায়,
(ওলো) গৌরাঙ্গ ভুজঙ্গ হ'য়ে, দংশিয়াছে আমার গায়॥"

ভাব বিহ্বল অন্তরে মহা উৎসাহের সহিত উঁহারা কীর্ত্তন করিতে থাকিলে, অবশিষ্ট গুরুভ্রাতারা সকলেই আনন্দে বিভোর হইয়া আপন আপন আসনে নিস্পন্দ অবস্থায় অবস্থান করিতে থাকেন। কখনো কখনো ঠাকুর ভাবাবেশে অধীর হইয়া বিস্তৃত ঘরের মেজেতে গড়াইতে গড়াইতে শিষ্যদের পদতলে যাইয়া লুটাইতে থাকেন ; এবং শিষ্যদের চরণ মস্তকে বারংবার জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে, "আমাকে দয়া করুন, আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন," বলিতে বলিতে সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পড়েন।

আহা! তখন ঠাকুরের জটাভারমণ্ডিত মস্তক নগণ্য শিষ্য পদতলে লুণ্ঠিত দেখিয়া প্রাণে যে কি অবস্থা হয়, বলিতে পারি না। ধন্য দয়াল ঠাকুর! আমাদের মত অবাধ্য, কলহপ্রিয়, দুর্বিনীত, দাম্ভিকপ্রকৃতি, নিজ আশ্রিত জনের চরণ তলে কাতর হইয়া লুটাপুটি করে, এ জগতে এমন আর কে আছে ?

পাপের মুল কিসে যায় ধর্ম্ম কি ?

৫—১৮ পৌষ। আজ একটু অবসর পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"পাপের মুল কি চেষ্টাদ্বারা নষ্ট করা যায় না ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"পাপের মূলচ্ছেদ মানুষে সহজে কর্‌তে পারে না,—এবিষয়ে মানুষেরশক্তি একেবারে নাই বল্‌লেও হয়। প্রায়শ্চিত্ত, ব্রত-নিয়মাদি দ্বারা মানুষ পাপমুক্ত হয় বটে, কিন্তু তা সাময়িক, কুঞ্জরস্নানবৎ। অন্তরে সংস্কার অবস্থায় পাপ থেকে যায়, একটা তেমন কারণ পেলেই আবার প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। একমাত্র ভগবানের দর্শন লাভ হ'লে তাঁরই কৃপায় পাপের মুল নষ্ট হ'য়ে যায়।"

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

ইহা শুনিয়া বলিলাম ঃ—"তাহা হইলে আর আমাদের করিবার কি আছে! এমনি পড়িয়া থাকি, তাঁর কৃপা যদি কখনও হয় হইবে।"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"তা বল্‌লে চল্‌বে কেন! যতদিন পর্য্যন্ত চেষ্টা থাক্‌বে, কার্য্য না ক'রে কি নিস্তার আছে! কার্য্য কর্‌তেই হবে। নানাদিকে নানা প্রকার চেষ্টা ক'রেও যখন মানুষ নিজকে একেবারে অপদার্থ, অকর্ম্মণ্য ব'লে বুঝতে পারে, তখনই সে ঠিক স্থানে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু তা পরিষ্কার রূপে না বুঝা পর্য্যন্ত সে মনে করে, চেষ্টা কর্‌লেই কৃতকার্য্য হ'তাম। সুতরাং ভগবানের শক্তির উপর যথার্থ নির্ভরটি হয় না। এজন্য পুনঃ পুনঃ নিস্ফল হ'লেও অত্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক চেষ্টা কর্‌তে হয়, না হ'লে হয় না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"ধর্ম্মলাভ কর্‌তে হ'লে প্রথমে কি কি বিষয়ে চেষ্টা কর্‌তে হয়?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"বলাতো যাচ্ছে কত, কিন্তু কর কই! ধর্ম্মার্থীদের প্রথমেই শৌচ, সত্য, ক্ষমা ও শান্তি এই চারিটি অভ্যাস কর্‌তে হয়?"

প্রশ্ন ঃ—"শৌচ কি শরীরটি শুদ্ধ রাখা?"

ঠাকুর ঃ—"হাঁ তাই! গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে শারীরিক শৌচ, উর্দ্ধরেতাঃ হওয়া, আর গৃহীর পক্ষে শুধু ঋতুগামী হওয়া। আন্তরিক শৌচ-'সরলতা'। যথার্থ সরল হ'লেই অন্তর শুদ্ধ হয়।

২। 'সত্য'—সত্য বাক্য, সত্য ব্যবহার ও সত্য চিন্তা। অসত্যের কোন প্রকার সংশ্রব না রাখা।

৩। 'ক্ষমা'—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা কারো হ'তেই উদ্বেগগ্রস্ত না হওয়া এবং কারও উদ্বেগের কারণ না হওয়া। এ বিষয়ে মনোযোগ রাখ্‌তে হয়।

৪। 'শান্তি'—চিত্তের অবস্থা সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সন্তুষ্ট রাখা, এক প্রকার রাখা, কোন কিছুতে উপেক্ষা অপেক্ষা না রাখা। এ সব নিয়ম ধ'রে চেষ্টা কর না?"

আমি এসকল শুনিয়া ভাবিলাম, "মন্দ নয়! সিদ্ধ হইলে যে সকল অবস্থা লাভ হয় বলিয়া এতকাল মনে করিয়া আসিতেছি, ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে তাহাই প্রথম আরম্ভ, ঠাকুর বলিলেন; সুতরাং ধর্ম্মলাভ, আমার পক্ষে হাতে চাঁদ ধরার মত কল্পনা মাত্র। যাহা কখনও হইবে না, তাহা লইয়া চেষ্টা করিতেছি মাত্র।"

ঠাকুরকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"তবে প্রকৃত ধর্ম্ম কি ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম বস্তু। বাহিরের বেশ ভূষা, বাহিরের কায কর্ম্ম, এ সকল কিছুই ধর্ম্ম নয়। তবে এখন নিজে ভাল হওয়া এবং অন্যের ভাল করা, ইহাই ধর্ম্ম মনে কর্‌তে হবে। নির্জ্জন অন্ধকারে একাকী ব'সে আত্মানুসন্ধান ক'রে দেখ্‌বে, নিজের ভিতরে কোন দোষ আছে কিনা। নিজের কাছে নিজে ভাল হ'লেই ভাল। মিথ্যাকথা, কু-দৃষ্টিপাত, হিংসা বিদ্বেষাদি যা যা দোষ ব'লে জান, তা আগে ত্যাগ কর। তারপরে ত্রিতাপ অতীত হ'লে ধর্ম্ম কি বুঝ্‌বে। তাপমুক্ত না হ'লে প্রকৃত ধর্ম্মের খোঁজই পাবার যো নাই। ভগবানই ধর্ম্ম।"

মহাপ্রভুর পুরাণ চিত্রপট।

৫—১৮ পৌষ।

একদিন আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামদয়াল বাবু একখানি চিত্রপট আনিয়া ঠাকুরের সম্মুখে রাখিলেন। ছোটদাদা (সারদা বাবু) কোন প্রয়োজনে ব্যস্ত হইয়া ঐ স্থান দিয়া চলায়, পাছে তাঁহার বস্ত্রাদি ঐ পটে লাগিয়া যায়, এই আশঙ্কায় খুব ত্রস্ত হইয়া ঠাকুর চিত্রপট খানি হাতে তুলিয়া নিলেন এবং এক দৃষ্টে উহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া,উহা মস্তকে ধরিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কান্দিতে লাগিলেন। কিছুকালের জন্য ঠাকুর বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হইয়া রহিলেন, পরে ভাব সংবরণ করিয়া চোখ মুখ পুছিয়া বলিলেনঃ—"মহাপ্রভুর ঐ সময়ের আকৃতি ঠিক এই প্রকারই ছিল। বিরহোন্মাদে জীর্ণশীর্ণ কলেবরের এবং ভাবাবেশে নৃত্যের এইরূপ অবিকল চিত্র আর দেখি নাই।"

"চিত্রপটে মহাপ্রভুর চক্ষুদিয়া পিচকারীর মত বেগে অশ্রুজল পড়িতেছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"একি আবার কখনও হয়!" ঠাকুর একটু তেজের সহিত বলিলেন ঃ—"নিশ্চয়

হয়। চিত্রকর যেমন যেমনটি দেখেছিলেন, ঠিক তেমনটিই এঁকেছেন। তিনি প্রভুরই আকৃতি ও নৃত্যের অবস্থা অবিকল দিয়েছেন। এক সময়ে যা সত্য সত্য ঘটে, অন্য সময়ে তা অসম্ভব মনে হয়। প্রার্থনা সময়ে কেশব বাবুর চোখ্ দিয়ে রক্তের ধারা কখনো কখনো পড়্ত। যারা দেখে নাই, কখনও কি বিশ্বাস করুতে পেরেছে? এতো সে দিনের কথা।"

প্রশ্নঃ—"মহাপ্রভুর সময়ে তো ফটো তোলার প্রণালী ছিল না, অবিকল রূপ কি প্রকারে হইবে?"*

ঠাকুর বলিলেনঃ—"কেন, ধ্যানেতে ক'রে! তখনকার চিত্রকরদের এমন শক্তি ছিল, যা আঁকবেন মনে কর্তেন, এমন একাগ্র হ'য়ে তা দেখ্তেন যে, ঐ চিত্র

---

* শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অন্তলীলার শেষ ভাগে, যখন তাঁহার শরীর অতিশয় শীর্ণ হইয়াছিল, তখন তদানীন্তন দিল্লীর বাদসাহ (সের্ সাহ) তাঁহার বিবরণ লোক পরম্পরায় শ্রবণ করিয়া, তাঁহার আলেখ্য তুলিবার জন্য কতিপয় সুনিপুন শিল্পীকে পুরুষোত্তমে পাঠাইয়া ছিলেন। তাঁহারা তথায় পঁহুছিয়াই দেখিলেন মহাপ্রভু সংকীর্ত্তনে মত্ত হইয়া উদ্দণ্ড নিত্য করিতেছেন, পিচকারীর জলের মত তাঁহার অশ্রুধারা বেগে অবিশ্রান্ত বর্ষণ হইতেছে, আজানুলম্বিত ভুজ, সুবিশাল বক্ষঃ, চারিহস্ত দীর্ঘ সুন্দর কলেবর, একেবারে অস্থি সার হইয়া গিয়াছে। চিত্রকরেরা ঐ দৃশ্যটি অতি সতর্কতার সহিত অবিকল অঙ্কিত করিয়া বাদসাহকে আনিয়া দিলেন। সেই সময় হইতে দিল্লীর রাজধানীতে উহা অতি যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছিল। পরে দিল্লী অবরোধের সময় উহা ভরতপুরের মহারাজার হস্তগত হয়। ভরতপুরের মহারাজা একবার শ্রীবৃন্দাবনে বাসকালে, অনেক সময় লালাবাবুর কুঞ্জে শ্রীগুরুদাস বাবাজীকে দর্শন করিতে যাইতেন। বাবাজী তাঁহার নিকট মহাপ্রভুর লীলা কথা বলিতেন। ঐ সকল কথা শুনিয়া একদিন মহারাজা বলিলেন প্রভো! আপনি যেরূপ বলেন, ঐ প্রকার একখানি চিত্রপট আমার রাজধানীতে আছে। বাবাজী উহা দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করাতে মহারাজা উহা আনাইয়া বাবাজীকে দেন। পটের দিকে দৃষ্টি করিয়া কান্দিতে কান্দিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই সময়ে ঐ পট দেখিয়া, চিত্রকর দ্বারা অনুরূপ প্রতিকৃতি লওয়া হয়। সেই প্রতিকৃতিই এই চিত্রপট।

ঠাকুর এই চিত্রপট খানি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ছিলেন, এবং এইটি যাহাতে লোপ না হয় সে জন্য ফটো রাখিতে বলিয়া ছিলেন। এ কারণে পুরুষোত্তম ধামে, ঠাকুরের (জটিয়া বাবার) সমাধি মন্দিরের সেবায়ত (ছোট দাদা) শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যত্ন পূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া, আমাদের ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত 'জগন্নাথ দেব' ও 'রাধাকৃষ্ণ' পটের সহিত সমাধি মন্দিরে রাখিয়া নিয়মিত রূপে উহা পূজা করিতেছেন।

তাঁদের চক্ষে যেন ছাপ্ প'ড়ে যেত। কিছুদিন তাই তাঁরা ধ্যান কর্‌তেন এবং সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত ক'রে নিয়ে, পরে সেইরূপ আঁক্‌তেন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"তাতে কি অবিকল রূপ হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"একেবারে ঠিক কি আর হয়! তবে প্রায় ঠিকই হয়। এখনও কৃষ্ণনগরের কুমারদের মধ্যে কারো কারো এ শক্তি অনেকটা আছে। যার ইচ্ছা হয় যেয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে পার।"

ঠাকুর এই চিত্রপট খানি অত্যন্ত জীর্ণ দেখিয়া, ইহার একখানা ফটো রাখিবার অভিপ্রায় জানাইলেন।

অদ্ভুত সংকীর্ত্তন-যাই যাই !

এখানে যতই দিন যাইতেছে, লোকসংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। সহরের গুরুভ্রাতা ভগ্নীরা প্রতিদিনই দলে দলে আসিতেছেন। প্রত্যহই শতাধিক পাতা পড়িতেছে। 'কেনারাম' নামে প্রসিদ্ধ রসুয়ে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রতিসপ্তাহেই দুই তিন দিন, দেড়শত দুইশত লোকের লুচি, মিষ্টান্ন, ঘৃতান্ন প্রভৃতির বিপুল আয়োজনে মহাঘটার সহিত ভোজনোৎসব হইতেছে। কোথা হইতে কোন দিন কি ভাবে এ সমস্ত সামগ্রী জুটিতেছে, অনেক অনুসন্ধানেও আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা। পরিচিত অপরিচিত বহুলোকের সমাগমে এবং সংকীর্ত্তন মহোৎসবে আশ্রমটি দিনরাত যেন ঝম্ ঝম্ করিতেছে।

আশ্রমে সন্ধ্যাকীর্ত্তন যে কি অদ্ভুত ব্যাপার তাহা ব্যক্ত করিবার যো নাই। বেলা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সংকীর্ত্তনের আনন্দ স্মরণ করিয়া দলে দলে শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, বণিক্ ও নানা শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা প্রতিদিনই আসিয়া আশ্রমটি পরিপূর্ণ করিয়া ফেলেন। সন্ধ্যা হইলে ঠাকুর নিজে করতাল বাজাইয়া "হরিসে লাগি রহরে ভাই। তেরা বনত বনত বনি যাই" এবং "প্রভুজী এ্যায়সা নাম তোহার। পতিত পবিত্র লীয়ে কর আপনার।" কখনবা "গগনমে থালে রবি চন্দ্রদীপক বনি, তারকামণ্ডল চমকে মতিরে" এসকল গান করিয়া আসনে স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন। তৎপরে গুরুভ্রাতারা সকলে হরি সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন। কোন কোন দিন প্রসিদ্ধ গায়ক মুকুন্দ ঘোষ বা রামতারণ ঘোষ অথবা বৈষ্ণব চরণ কুণ্ডু মহাশয় স্ব স্ব দলে মিলিত হইয়া মহা উৎসাহের সহিত মহাজন পদাবলী বা নামগান করিয়া থাকেন। এই সংকীর্ত্তনে নিত্যই ঠাকুরের নব নব অবস্থার

অদ্ভুত বিকাস এবং ভক্তমণ্ডলীর চমৎকার ভাবোচ্ছ্বাসের মনোমোহন চিত্র প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। যে সকল ভাগ্যবান্ পুরুষ একদিনের জন্যও উহা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন। এ জীবনে আর কখনও এদৃশ্য ভুলিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ !

গতকল্য সন্ধ্যার পর মহাসমারোহের কীর্ত্তনে তিন চারিটি খোল করতাল একতালে বাজিয়া উঠিলে, বহুলোকে যখন এক তানে সমস্বরে উচ্চ সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, ঠাকুর ক্ষণকাল আসনে স্থিরভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া দক্ষিণে বামে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। দর্শকমণ্ডলী একবার ঠাকুরের পানে, আরবার ভক্তগণের দিকে, উল্লসিত প্রাণে তাকাইতে লাগিল। ঠাকুর,হস্তদ্বয় সম্মুখের দিকে উত্তোলন করিয়া,"জয় শচীনন্দন" "জয় শচীনন্দন" বলিতে বলিতে আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত লোকই একবারে দাঁড়াইয়া উঠিল। ঠাকুর, উচ্চ উচ্চ লম্ফ প্রদান করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। গুরুভ্রাতৃগণ ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া বিবিধ প্রকার নৃত্য ও হরিধ্বনিতে আশ্রমটিকে কাঁপাইয়া তুলিল। জানিনা কি দেখিলাম !—ঠাকুরের প্রকাণ্ড শরীরটি ক্রমে ক্রমে খর্ব্বাকৃতি হইয়া গেল-"ঐরে, ঐরে" বলিতে বলিতে বালকের মত মুষ্টিবদ্ধ-হস্তদ্বয় সম্মুখে ও পশ্চাতে ঘন ঘন আন্দোলিত করিয়া, বিস্তৃত হল ঘরের এদিকে সেদিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিলেন। মৃদঙ্গ করতালের তালি, ঘন ঘন পড়িতে লাগিল—সংকীর্ত্তনের ধ্বনি চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল। মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি হুঙ্কার গর্জ্জনে মিলিত হইয়া, আশ্চর্য্য চমকে সকলকে দিশাহারা করিল। এ আবার কি অদ্ভুত দৃশ্য ! ঠাকুর, "ধর" "ধর" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বহু জনতার ভিতরে অপ্রতিহত গতিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই অকস্মাৎ এক-স্থানে দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং করপুট বক্ষঃস্থলে স্থাপন পূর্ব্বক নতশিরে বারংবার নমস্কার করিতে লাগিলেন। তৎপরে দক্ষিণ হস্ত পুনঃ পুনঃ উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক,—'জয়রাধে' 'জয়-রাধে' বলিতে বলিতে নিস্পন্দ নয়নে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিলেন। শরীরটি স্থির অথচ বাহু বক্ষঃস্থলাদি প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুলকিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সম্মুখের ও উভয় পার্শ্বের লম্বিত জটাভার থর থর কম্পিত হইয়া মস্তকো-পরি খাড়া হইয়া উঠিল, এবং উহা সর্পফণার ন্যায় অগ্রভাগ বিস্তার করিয়া সর্‌সর্ কাঁপিতে লাগিল। ঐ সময়ে মস্তক হইতে চন্দ্ররশ্মির ন্যায় উজ্জ্বল ছটা, এবং নেত্রদ্বয় হইতে জ্যোতি-র্ম্ময় স্ফুলিঙ্গরাশি বিদ্যুতের মত ছুটিয়া পড়িতেছে দেখিয়া, অনেক গুরুভ্রাতা-ভগ্নী বিস্ময়-সূচক চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর ঊর্দ্ধদিকে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, "ঐ দেখ ! আমাকে সকলে নিতে এসেছেন—আমি যাই, আমি যাই" বলিতে

বলিতে শ্রীঅঙ্গ হেলাইয়া দিলেন। 'ঠাকুর দেহ ছাড়িলেন,''ঠাকুর দেহ ছাড়িলেন,'চারিদিকে কান্নার শব্দ উঠিল। বহুলোকের উপর লম্ফ দিয়া আমরা চারি পাঁচজনে যাইয়া ঠাকুরকে জড়াইয়া ধরিলাম। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু উন্মত্তের মত হইয়া, "দোহাই পরমহংসজী! দোহাই পরমহংসজী!! কখনই যে'তে দিবনা,কখনই যে'তে দিবনা," বলিতে বলিতে মস্তক ও হস্তদ্বয়, ঘন ঘন নাড়াদিয়া ভয়ঙ্কর হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। ভিতরে বাহিরে স্ত্রীলোক পুরুষের ভীষণ কান্নার রোল উঠিল। ঠাকুর অচৈতন্য হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর, 'জয়গুরু!' 'জয়গুরু!' বলিতে বলিতে উঠিয়া বসিলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ! আগন্তুক ভদ্রলোক সকল ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব আবাসে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এঁরা সব কে এসে আপনাকে টানা টানি কর্চ্ছিলেন? আমাদের তো মনে হ'লো, বুঝি এবার আপনি চ'লে গেলেন।"

ঠাকুর বলিলেন:—"গতিক তাই বটে! গৌরশিরোমণি মশায়, যোগজীবনের মা, শ্রীবৃন্দাবনের সখীগণ এবং আরও অনেকে এসেছিলেন। ঐ সময়ে * পরম হংসজী হঠাৎ উপস্থিত হ'য়ে বাধা দিলেন। গুরুজীর ইচ্ছা না হ'লে কারো চেষ্টাতেতো কিছু হবার যো নাই?"

প্রশ্ন:—"গৌরশিরোমণি মহাশয় কি এ শক্তি লাভ ক'রেছিলেন?"

ঠাকুর:—"এ শক্তি লাভ না করলে রাসমণ্ডলে প্রবেশ করবেন কিরূপে?"

প্রশ্ন:—"রাসমণ্ডলে প্রবেশ কালে নাকি সখী দেহ লাভ হয়?"

ঠাকুর:—"হাঁ, পুরুষের ওখানে প্রবেশাধিকার নাই।"

গতকল্যকার ভাবোন্মাদের মধ্যে যে অবস্থায়ই থাকিনা কেন, আমার দৃষ্টি কিন্তু ঠাকুরের দিকেই ছিল। স্মৃতিতে যতটুকু জাগরূক আছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। সমস্ত অবস্থা ও ভাবের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রাখিতে পারিলাম কিনা, জানিনা।

সংকীর্ত্তনে গুরুভ্রাতাদের নানা প্রকার ভাবোচ্ছ্বাস দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, সাধন ভজন কোন গুরুভ্রাতা হইতে যে কম করিতেছি তা নয় সকলেই তো বিষয় কার্য্যে

* মানস সরোবর বাসী ৺শ্রীশ্রী ব্রহ্মানন্দ স্বামী পরমহংস, যিনি গয়া আকাশ গঙ্গা পাহাড়ে প্রভুজীকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন এবং যাঁহার নির্দ্দেশে তিনি ৺ কাশীধামে শ্রীশ্রীহরিহরানন্দ স্বামী সরস্বতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বা বাঙ্গে গল্পে দিন কাটাইতেছেন। আমিতো প্রায় সারাদিনই নাম করি। তবে আমার এরূপ শুষ্কতা কেন! এ সব অবস্থা সাধনসাপেক্ষ হইলে, আমারইতো সকলের আগে হইবার কথা! আর কৃপা সাপেক্ষ হইলে, অযোগ্যে কৃপা হইল, যোগ্যে হইল না, ভগবানের এই অবিচারই বা কেন?

ঠাকুর সম্বন্ধে নগেন্দ্র বাবুর কথা।

পৌষ মাসের মাঝামাঝি খবর আসিল, যোগজীবনের স্ত্রী শ্রীমতী বসন্ত কুমারী দেবীর অবস্থা অতিশয় খারাপ। কিছুকাল যাবৎ অবিরাম জ্বরে ভুগিয়া এখন তিনি একরূপ মৃত্যু শয্যায় আছেন। গেণ্ডারিয়ার সকলেই তাঁহাকে লইয়া অস্থির। ঠাকুর এই সংবাদ পাইয়াই ঢাকা যাইতে ইচ্ছা জানাইলেন। আমরাও সকলে পৌষ মাসের মধ্যভাগে ঠাকুরের সঙ্গে ঢাকা যাইতে প্রস্তুত হইলাম।

ঢাকা যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু ঠাকুরের সঙ্গে কিছুক্ষণ নির্জ্জনে আলাপ করিলেন। কি বলিলেন, কিছুই তখন জানিনা। পরে এক সময় ছোট দাদা ও কুঞ্জ গুহ মহাশয়ের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে নগেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"গোঁসাই মনের কথা বলিতে পারেন শুনিয়াছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করিতাম না। গোঁসাইকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'গোঁসাই! বলুনতো আমি কোন্ চক্রে?' গোঁসাই অমনি ষট্‌চক্রের মধ্যে ঠিক সেই চক্রের নাম লইয়া বলিলেন,—'**আপনি* চক্রে ঘুরিতেছেন।**' গোঁসাইর নিকট আমার দীক্ষার আকাঙ্ক্ষা জানাইলে তিনি বলিলেন— "**আপনাকে আমি বন্ধু ভাবে দেখি, আপনার আর প্রয়োজন নাই।**"

নগেন্দ্রবাবু এই দুইটি গুরুভ্রাতার নিকট এবং আরও কারও কারও সহিত ঠাকুরের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "গোঁসাই যে দিন কলিকাতা আসিলেন, সেইদিন শূন্যপথে তিনি আমাকে দর্শন দিয়াছিলেন। তাহাতেই আমি পরিষ্কার বুঝিয়াছিলাম, গোঁসাই আসিতেছেন। আমিও প্রস্তুত ছিলাম। গোঁসাই ষ্টেশন হইতে সোজা আমার বাসায়ই ঐ দিন রাত্রে আসিয়া উঠিলেন।"

ঠাকুরের ঢাকা যাত্রা—গুরুভ্রাতাদের অবস্থা।

রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকার সময়ে ট্রেন ছাড়িবার কাল নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও ঠাকুরের তাড়াতে আমরা ছয়টার সময়েই বাসা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। ঠাকুর ট্রেন যোগে যখনই কোন স্থানে যা'ন, দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে ষ্টেশনে গিয়া বসিয়া থাকেন, ইহা ছেলে বেলা হইতে ঠাকুরের একটি অব্যর্থ নিয়ম। আমরা বহুপূর্ব্বে ষ্টেশনে যাইতে ঠাকুরের ব্যস্ততা দেখিয়া অনেক সময় বিরক্ত হইয়া পড়ি।

ঠাকুর কথায় কথায় বলিলেন,—"অনর্থক বাসায় সময় কাটায়ে, পরে অস্থির হ'য়ে ছুটাছুটি করার চেয়ে, বরং দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে ষ্টেশনে গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ব'সে থাকা ভাল। আমি কোথাও যে'তে হ'লে ওরূপই করি। জীবনে আমি কখনও ট্রেন মিস্ করি নাই।"

সন্ধ্যার একটু পরেই গুরুভ্রাতারা সকলে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। আজ আনন্দের হাট ভাঙ্গিল গুরুভ্রাতাদের কাহারও মনে শান্তি নাই! সকলেরই মুখ মলিন, এবং চিত্ত স্ফূর্ত্তিহীন। ঠাকুর যতক্ষণ ষ্টেশনে ছিলেন, সকলেই ঠাকুরকে ঘিরিয়া নির্ব্বাক অবস্থায় বসিয়া রহিলেন। গাড়ী ছাড়িবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে সকলে ঠাকুরকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরও ছল্ ছল্ চক্ষে স্নেহমাখা দৃষ্টিতে সকলের দিকে চাহিয়া করযোড়ে মস্তক অবনত করিয়া প্রতি নমস্কার করিতে লাগিলেন। এ সময়ে গুরুভ্রাতারা আর কেহই স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহাদের কাতর প্রাণ আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কেহ কেহ দাড়ান অবস্থায় থাকিয়া, কেহ কেহ বা অবসন্ন দেহে বসিয়া পড়িয়া, উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন, আবার কোনও গুরুভ্রাতা প্লাট্‌ফর্ম্মে পড়িয়া গিয়া, হাত পা আছড়াইতে লাগিলেন। উহাঁদের ঐ সকল অবস্থা দেখিয়া আমাদেরও প্রাণ কান্দিয়া উঠিল। গাড়ীর ভিতরে বাহিরে কান্নার রোল পড়িয়া গেল, এমন সময়ে গাড়ীও ছাড়িয়া দিল। আহা! মাসাধিক কাল ঠাকুরের নিত্য-সঙ্গী গুরুভ্রাতা নবীন বাবু, অচিন্ত্য বাবু, মণিবাবু, বৃন্দাবন বাবু, দেবেন্দ্র সামন্ত, কুঞ্জ গুহ, শ্রীচরণ বাবু, মহেন্দ্র বাবু, ছোট দাদা ও মনোরঞ্জন গুহ প্রভৃতির অনুরাগ-বিহ্বল বিষণ্ণ মূর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে দুঃখিত মনে আমরা গোয়ালন্দ চলিলাম। মনে হইতে লাগিল 'হায় অদৃষ্ট! এ সকল গুরুভ্রাতাদের অনুরাগের কণিকা মাত্র পাইয়া ঠাকুরকে স্মরণ

করিতে করিতে ক্ষণকালের জন্যও যদি আমি এইরূপ কান্দিতে পারিতাম, এ জীবন ধন্য হইয়া যাইত।'

পদ্মার জল হাওয়া, সাহেবের পরিহাস।

আমরা সমস্ত রাত্রি গাড়ীতে থাকিয়া সকাল বেলা গোয়ালন্দ ষ্টীমারে উঠিলাম। এক খানা বড় কম্বল বিছাইয়া সকলে ঠাকুরের চতুর্দ্দিকে বসিয়া পড়িলাম। ঠাকুর পদ্মানদী দেখিয়া বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। থাকিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন :— "গঙ্গার প্রবল ধারাটিই এই পদ্মায় মিলে প্রবাহিত হ'চ্ছে। পদ্মার হাওয়াতে শরীরের জড়তা নষ্ট করে, প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সতেজ ক'রে তুলে। জলের অসাধারণ গুণ! আধফুটা চা'ল বা কাঁচা চিড়ে আধ সের খেয়েও, পদ্মার এক ঘটি জল খেলে, তা অনায়াসে হজম হ'য়ে যায়। পদ্মাতীর-বাসী মাঝিরা যেরূপ সবল সুস্থ এরূপ প্রায় দেখা যায় না। পদ্মানদীর বিস্তৃতি দেখ্‌লে চিত্তটি যেন প্রশান্ত হ'য়ে পড়ে।"

ঠাকুর পদ্মার জল হাওয়ার গুণ কিছুক্ষণ বলিয়া চুপ করিলেন। এ স্থলে সুন্দর একটি ঘটনা লিখিতেছি।—মধ্যাহ্ন কালে ঠাকুর শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসিয়া আছেন, ভাবের প্রগাঢ়তায় বারংবার ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছেন, আবার মাথা তুলিতেছেন; অবিরল ধারে অশ্রু বর্ষনে গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। গুরুভ্রাতারাও নির্ব্বাক আপন আপন ইষ্ট স্মরণে স্থির। দূর হইতে একটি উচ্চ কর্ম্মচারী সাহেব ঠাকুরকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া মাতাল অনুমানে ঠাকুরের সম্মুখীন হইয়া পরিহাসচ্ছলে বলিলেন, "ক্যা জী? দারু পিয়া? কেৎনা পিয়া? আরে তোম্ ক্যায়সা দারু পিয়া?" সাহেব দু তিন বার ঐ প্রকার বলাতে ঠাকুর মাথা তুলিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন :— "হাঁ, দারুপিয়া! বহুত পিয়া। তোমরা যীশুখ্রীষ্ট যো দারু পিতে থে, হাম্‌তো আভি ওহি দারু পিয়া।"

সাহেব শুনিয়া একটু চমকিয়া কয়েক সেকেণ্ড ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে লজ্জিত ভাবে একটু হাসিয়া মাথার টুপি তুলিয়া, দু'হাতে ঠাকুরকে সেলাম দিতে দিতে স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

রাত্রিতে আমরা গোলাইগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়া গেণ্ডারিয়া আশ্রমে পঁহুছিলাম। আশ্রম লোকে পরিপূর্ণ, ঠাকুরকে পাইয়া সকলেরই মহা আনন্দ!

শ্রীযুক্ত যোগজীবন গোস্বামীর স্ত্রী—বসন্তকুমারীর দেহত্যাগ।

২৫ শে পৌষ শুক্রবার।

ঠাকুর গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আসিয়াছেন। আশ্রমস্থ এবং সহর নিবাসী গুরুভ্রাতা ভগ্নিদের পাইয়া আমাদের যেমনই একটা আনন্দ ও উৎসাহ প্রাণে জাগিয়াছে, যোগজীবনের স্ত্রীর মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া তেমনি আবার একটা আতঙ্ক ও বিমর্ষভাব সকলের ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। গুরুভ্রাতা ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্ন চন্দ্র মজুমদার মহাশয় দিবারাত্র বিশেষ সতর্কতার সহিত চিকিৎসা করিয়াও একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর, আশ্রমে এ সময়ে উপস্থিত হওয়াতে কাহারও কাহারও প্রাণে একটু ভরসা জন্মিয়াছিল, বুঝি এ যাত্রা বসন্তকুমারী রক্ষা পাইবেন; কিন্তু দেখিতে দেখিতে উঁহার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া পড়াতে সকলেই একেবারে হতাশ হইলেন।

বসন্ত কুমারীর সেবার বন্দোবস্ত করার জন্যই ঠাকুর, যোগজীবনকে গেণ্ডারিয়া পাঠাইয়া ছিলেন, কিন্তু সেবাকার্য্যে নিতান্ত অপটু বলিয়াই হউক অথবা আজন্ম উদাস প্রকৃতি বলিয়াই হউক, তিনি স্বয়ং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপস্থিত থাকিয়া যথা নিয়মে সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার যাতনা লাঘবের তেমন সহায়তা করিতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার আগমন ও উপস্থিতিই বসন্তকে যে আনন্দ ও সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছে ইহাই পরম কারুণিক গুরুদেবের ব্যবস্থা ও আদেশেরই ফল মনে হয়।

২৩ পৌষ বধূর বিকারের মত অবস্থা ও শ্বাসের ক্রিয়া চলিতে লাগিল, ঠাকুরকে উহা জ্ঞাত করায় ঠাকুর বলিলেন, :—**"দৈহিক সামান্য যাহা একটু ভোগ আছে, প্রাণায়ামে তাহাই পরিষ্কার হ'য়ে যাচ্ছে।"**

২৫শা তারিখে বসন্তকুমারী ঠাকুরকে দর্শন করিতে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। ঠাকুর উহার শয্যাপার্শ্বে যাইয়া দাড়াইলেন। বসন্তকুমারী কৃতাঞ্জলি হইয়া কান্দিতে কান্দিতে ঠাকুরকে বলিলেন, 'বাবা, আর কত দুঃখ দিবে বাবা?'

ঠাকুর অশ্রুসিক্ত নেত্রে বলিলেন :—**"মা! তোমার ক্লেশের অবসান হ'ল ব'লে।"**

ঐ দিন ডাক্তারবাবু একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ঠাকুরকে গিয়া বলিলেন,—'তিনদিন

যাবৎ বসন্তের ভয়ঙ্কর শ্বাস চলিয়াছে, এ অবস্থায় আর কতকাল থাকিবে? এই অবস্থাতো আর দেখা যায় না।'

ঠাকুর বলিলেনঃ—"আর বিলম্ব নাই, সময় প্রায় হ'য়ে এলো, তবে সাংসারিক ব্যাপারে বুড়ঠাকরুণ হ'তে সময় সময় গালিগালাজ খাওয়াতে বুড় ঠাকরুণের উপর এখনও উহার একটা বিরক্তিভাব আছে, সেটুকু গেলেই সব পরিষ্কার হ'য়ে যায়।"

ডাক্তার বাবু বলিলেনঃ—'তা আর হবে কিরূপে?'

ঠাকুর বলিলেন,ঃ—"বুড়ঠাকরুণ যেয়ে ওকে একটু প্রসন্ন কর্‌লেই হয়। এজন্য আর ব্যস্ত হ'তে হবে না, এখনই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

ইহার পর রোগীর অবস্থা নিতান্তই খারাপ হইয়া পড়িল দেখিয়া দিদীমা অস্থির হইয়া পড়িলেন, বউ এবার চলিলেন বুঝিয়া দিদীমা কান্দিতে কান্দিতে বধূর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং প্রাণের আবেগে বলিতে লাগিলেন, 'বউ! আমি যদি কিছু অন্যায় ক'রে থাকি, কষ্ট দিয়ে থাকি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।' বসন্তকুমারী দিদীমার আকুল-ভাবে কান্না ও এইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া ছল্‌ছল্ চক্ষে বাহুদ্বারা দিদীমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া খুব বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন, 'দিদীমা! আপনিত কোনও অপরাধই করেন নাই!' এই ঘটনার পরে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে, পুণ্যশীলা ভাগ্যবতী বসন্তকুমারী অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, জ্যেষ্ঠ সহোদর জগদ্বন্ধু বাবুর সমক্ষে, আশ্রমস্থ সমস্ত গুরুভ্রাতা-ভগ্নীদিগকে কান্দাইয়া স্বামীর পদান্তিকে, গুরুর আশ্রমে দেহরক্ষা করিলেন।

মাঘ।

যোগজীবনের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ ও পারলৌকিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর।

৫ মাঘ সোমবার। বসন্তকুমারীর অচিরে দেহত্যাগ ঘটিবে অনুমান করিয়াই, আমি ঠাকুরের নিকটে হোমের ঘৃত ও আহারের চাউলের অভাব হইয়াছে জানাইয়া, অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বাড়ী গেলাম। সাতদিন পরে আবার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম বহু গুরুভ্রাতা সমবেত হইয়া হরিধ্বনিসহকারে বসন্তকুমারীর পবিত্র কলেবর শ্যামপুর শ্মশানঘাটে নিয়াছিলেন। ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুসারে যোগজীবনই উহার মুখাগ্নি করিয়াছিলেন। দেহের অগ্নি সংস্কার কালে অকস্মাৎ একটি গোলাকৃতি জ্যোতিঃপিণ্ড চিতা হইতে উত্থিত হইয়া, নক্ষত্র বেগে ঊর্দ্ধদিকে অনন্ত আকাশে মিলাইয়া গিয়াছিল। শ্মশান—বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ উহা দেখিয়া ছিলেন।

গেণ্ডারিয়া পঁহুছিবার পরদিনই সকালে চা সেবার পর ঠাকুর আমাকে বলিলেন,—"তুমি যোগজীবনকে শ্রাদ্ধের মন্ত্র গুলি পড়াইতে পারিবে?"

আমি বলিলাম,—"শ্রাদ্ধমন্ত্র আমি জানিনা।"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"পুস্তক দেখে পড়াবে, ওতে আর জানা না জানা কি?"

আমি—"শ্রাদ্ধমন্ত্র পড়ার সময়ে তো কতপ্রকার প্রক্রিয়া করে দেখেছি, সে সবতো আমার কিছুই জানা নাই। আর সংস্কৃতও আমি ভাল জানিনা, শ্রাদ্ধমন্ত্র আমাকে পড়াতে হ'লে, এখন থেকে পুস্তক দেখে অভ্যাস ক'রে রাখ্‌তে হয়, নাহ'লে শুদ্ধমত পড়াতে পারবনা।"

ঠাকুর আমাকে আর কিছুই বলিলেন না। একাদশ দিবসে ঠাকুর নিজেই শ্রাদ্ধপদ্ধতি দেখিয়া যোগজীবনকে শ্রাদ্ধমন্ত্র পড়াইলেন, এবং শাস্ত্রীয় ব্যাবস্থা মত শ্রাদ্ধকার্য্য করাইলেন। শ্রাদ্ধের পর ঠাকুর কথায় কথায় বলিলেন,—"বসন্ত শ্রাদ্ধস্থলে উপস্থিত থেকে হাত-পেতে পিণ্ড গ্রহণ কর্‌লেন। সূক্ষ্ম দেহটি পরিত্যাগ ক'রে, দুর্লভ কারণ দেহ লাভ কর্‌লেন।"

সময় মত জিজ্ঞাসা করিলাম,—"জীবের কি প্রকার অবস্থাতে দেহত্যাগের পরেই আবার দেহ আশ্রয় কর্‌তে হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন,—"বিষয়েতে যাঁদের অতিশয় বাসনা রয়েছে, ভোগ ইচ্ছা যাঁদের অত্যন্ত প্রবল, তাঁরাই দেহত্যাগ মাত্রে অপর দেহ আশ্রয় করেন।"

প্রশ্ন—"পিতৃলোকে কাহারা যা'ন ?"

ঠাকুর ঃ—"বিষয় উপস্থিত হ'লে যাঁরা ভোগ করেন, কিন্তু তা লাভের জন্য তেমন প্রবল স্পৃহা রাখেন না, সাধারণতঃ তাঁরাই পিতৃলোকে গমন করেন।"

প্রশ্ন—"বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মলোকে এবং তারও অতীত লোকে জীব কি অবস্থা হ'লে যায় ?"

ঠাকুর—"যাঁরা ধর্ম্মমাত্র লক্ষ্য রেখে, কোনও প্রকার সদনুষ্ঠানে জীবন অতিবাহিত করেন, কর্ম্মানুসারে, বাসনানুযায়ী এক এক প্রকার লোক তাঁদের লাভ হয়। আর সমস্ত বাসনার মূল পর্য্যন্ত যাঁদের নষ্ট হ'য়ে যায়, একমাত্র ভগবানই লক্ষ্য থাকেন, তাঁদেরই ব্রহ্মলোকের অতীত স্থানে গতি হয়। শুধু বাসনা হেতু জীবের ভিন্ন ভিন্ন লোকে গতি হয়।"

ইহা ব্যতীত লোকান্তর প্রাপ্তির অন্য কোনও হেতু আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিব মনে করা মাত্র, ঠাকুর নিজ হইতেই বলিতে লাগিলেন,—"এ সকল বিষয়ে আরও অনেক মীমাংসা আছে, কিন্তু সকলের কাছে সকল অবস্থার কথা বল্‌তে নাই। যে যে অবস্থার লোক, যার যেদিক্ দিয়ে বুঝ্‌বার অধিকার, তাকে সেইরূপই বল্‌তে হয়, নইলে সে তা ধর্‌তে পারেনা, বল্‌লে উপকার না হ'য়ে বরং অনিষ্টই হয়। এসব শুনে কিছু লাভ নাই, কাজ ক'রে যেতে হয়।"

আশ্রমে অশান্তি।

৯ মাঘ
শুক্রবার।

ঠাকুরের নিকটে সর্ব্বদা থাকিতে পারিলে সহস্র অসুবিধাকেও অসুবিধা মনে করিনা, এ প্রকার আস্ফালন আমরা অনেকেই যখন তখন পরস্পরের নিকটে করিয়া আসিতেছি। এবার গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আসা অবধি আমাদের সেই অভিমান,

ভগবান্ পদে পদে চূর্ণ করিতেছেন। কয়েকদিন যাবৎ ঠাকুরের বর্ত্তমানেও, আশ্রমে বিষম অশান্তি চলিতেছে। গুরুভ্রাতারা সকলেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন ; কি করি, কোথায় যাই, সকলেরই ভিতরে এরূপ একটা উদ্বেগের আন্দোলন হইতেছে।

আশ্রমে একটি মাত্র চাকর, সে বাহিরের কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত। রসুয়ে ব্রাহ্মণ আশ্রমে কোন কালেই ছিলনা, এখনও নাই। শান্তিসুধা রোগে অকর্ম্মণ্যা, একাকী দিদীমা রোগে শোকে জর্জ্জরিত হইয়াও, এই বৃদ্ধাবস্থায় আশ্রমস্থ সকলের এবং অতিথি অভ্যাগত লোকদের রান্না, পরিবেশন, এবং বাসন মাজা প্রভৃতি কার্য্য করিয়া একেবারে হয়রান হইয়া পড়িলেন। সুতরাং নিজের অসমর্থতা জানাইয়া প্রতিদিনই তিনি গুরুভ্রাতাদিগকে এ সকল কার্য্যভার লইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। গুরুভ্রাতারা এতকাল এসকল সেবা গুরুপরিবার হইতে অবাধে স্বচ্ছন্দে ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, একারণেই এখন দিদীমার এ সকল আপত্তি বা গালাগালিতে কেহ কর্ণপাতই করিলেন না। এদিকে অর্থেরও অতিরিক্ত অনটন উপস্থিত হইল। শুধু ভাতের সঙ্গে ডাল বা তরকারী ব্যতীত আহারের আর কোনও ব্যবস্থাই রহিল না। প্রতিদিন একই প্রকার, অতএব অধিকতর অরুচিকর খাদ্য খাইয়া এবং বিরক্তির সহিত প্রদত্ত আহারের সঙ্গে গালাগালি ভোগ করিয়া, গুরুভ্রাতারা অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। দিদীমার কোনও কার্য্যে কেহ কোনও প্রকার সাহায্য বা অর্থকৃচ্ছ্রতায় সহানুভূতি না করিয়া বরং তীব্রভাষায় দিদীমার অর্থলোভ, সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা বশতঃই এখানে এ সমস্ত অসুবিধা ভোগ হইতেছে, এই প্রকার আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই অশান্তির সহিত ঝগড়া বিবাদ ক্রমে ক্রমে এতই বৃদ্ধি হইল যে, অবশেষে গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ আহারের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইলেন, কেহ কেহ অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের বাড়ীতে আহারের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন ; আবার কোন কোন গুরুভ্রাতা আশ্রম ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িলেন। দিদীমার দোষালোচনাই সকলের ভজন সাধন হইয়া উঠিল।

পবিত্র আশ্রমে সামান্য আহার ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবহার লইয়া,পরস্পরের ভিতরে মনোবাদ ও সময়ে সময়ে তুমুল ঝগড়া বিবাদ চলিল দেখিয়া ভাবিলাম, 'এ আবার কি! ঠাকুরের পরম শান্তিপ্রদ সঙ্গ লাভই যাহাদের এস্থানে থাকিবার একমাত্র উদ্দেশ্য, তুচ্ছ আহার ব্যবহার লইয়াও তাহাদের চিত্ত এত উত্তপ্ত হয়! ঠাকুর আমাকে স্বপাক আহারের আদেশ করিয়া বড়ই সুখে রাখিয়াছেন। আমি এই সকল গোলমাল হইতে তফাৎ থাকিয়া বেশ আনন্দে আছি।' গুরুভ্রাতাদের অবস্থা দেখিয়া আমি দিনদিন গর্ব্বিত হইতে লাগিলাম।

এ সময়ে কিছুদিনের মধ্যেই আশ্রমের গরম হাওয়াতে আমাকেও ফাঁফর করিয়া তুলিল। আমিও "পরিত্রাহি" ডাক ছাড়িতে লাগিলাম।

আমার চাউলের অভাব হইলেই বাড়ী হইতে লইয়া আসি। দিবসান্তে একবার মাত্র ভাতে-সিদ্ধ ভাত বা খিঁচুড়ী, আহার করি। দক্ষিণের চৌচালা ঘরে বিকাল বেলা বহু লোকের আড্ডা হয় বলিয়া, ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায় রান্না করিতে লাগিলাম। ঠাকুরের আদেশমত পর্দ্দা খাটাইয়া নির্জ্জনে আমাকে আহার করিতে হয়। ভাণ্ডার ঘরের বারান্দায় আহারের ব্যবস্থা করাতে, ভাণ্ডারের তরীতরকারী, ডা'ল, লবণ, প্রভৃতি চুরি করি বলিয়া মিথ্যা অপবাদ আমার নামে রটনা হইল।

আহারের সময়ে কি আহার করি, তাহাও আড়ে থাকিয়া কেহ কেহ অনুসন্ধান নিতে লাগিলেন। আমি এ সকল দেখিয়া শুনিয়া জ্বলিয়া যাইতে লাগিলাম। অবিলম্বে দক্ষিণের চৌচালার বারান্দায় রান্না করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু তাহাতেও অপবাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম না। দু'মুটো চাউল সিদ্ধ করিতে দুই তিন খানা কাষ্ঠই যথেষ্ট। এই কাষ্ঠ আমি অবসর মত বৃক্ষের শুষ্ক ডাল ভাঙ্গিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখি। যদি কখনও আমার কাষ্ঠ না থাকে, আশ্রম হইতে প্রয়োজন-মত উহা গ্রহণ করি। তাহা লইয়াও নানা কথা উঠিল। আমি এ সকল উৎপাত দেখিয়া আশ্রমের কোন বস্তুতেই হাত দিব না সংকল্প করিলাম। সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া এত অশান্তি আশ্রমে ঘটিতেছে, অথচ ঠাকুর নির্ব্বাক্‌ ও উদাসীন রহিয়াছেন দেখিয়া ঠাকুরের উপর বড়ই বিরক্তি ও রাগ হইল। জানিনা কতকাল এসকল স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতা নিবন্ধন হিংসা, বিদ্বেষ, জ্বালা, যন্ত্রণা, আমাদের ভিতরে বর্ত্তমান থাকিবে। ঠাকুর সকলকে নিজ প্রকৃতি মত চলিতে দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, ইহারইবা তাৎপর্য্য কি ?

সময় মত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মায়িক বিষয়ের সম্বন্ধ হেতু কত কাল জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—**"আরে বাপু! কত জ্ঞানী, কত যোগী, কত বিজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা, মায়ার চক্রে প'ড়ে, একেবারে অস্থির হ'য়ে যান। কোন্ সময়ে, কার ভিতরে, কোন্ ছিদ্র দিয়ে পাপ প্রবেশ করে বলা যায় না। এ জন্য সর্ব্বদা কেবল ভগবানকে নিয়ে থাক্‌তে হয়। সৎসঙ্গে, সদালাপে, সদনুষ্ঠানে, সচ্চিন্তায় প্রাতঃকাল হ'তে নিদ্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত কাটায়ে দিতে হয়। আর মনে মনে সর্ব্বদা প্রার্থনা করতে হয়,—'ঠাকুর! আমাকে তোমার ক'রে নেও!**

তোমাকে ছেড়ে আর কিছুই যেন আমি চাই না।' দিবা রাত্রি এই ভাবে কাটায়ে দিতে পার্‌লে, ভগবানের দয়াতে মায়া মোহ হ'তে ক্রমে ক্রমে রক্ষা পাওয়া যায়। তাঁর কৃপা ব্যতীত কিছুতেই কিছু হবার যো নাই, তাঁর বিন্দু মাত্র কৃপা হ'লে মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্তই সম্ভব হয়।"

বসন্তের দেহত্যাগের পর যোগজীবন ভাবিলেন, এবার সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইলাম। এখন সর্ব্বদা নিরুদ্বেগে ঠাকুরের সঙ্গে পরমানন্দে থাকিতে পারিব। যোগজীবনের স্ত্রীর জন্য সকলের বিমর্ষভাব হইলেও যোগজীবনের বিন্দুমাত্র তাহা দেখিলাম না, গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে কথায় বার্ত্তায়, আর সংসার করিতে হইবে না বলিয়া, আনন্দ প্রকাশ করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। একদিন ঠাকুর শৌচে যাইবার সময়ে যোগিজীবনকে সম্মুখে দেখিয়া হঠাৎ বলিলেন, :—"যোগজীবন, নিশ্চয় জেনে রাখিস্, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও, বড় জোর সাময়িক একটা আনন্দের ঢেউ প্রাণে তুলে দিতে পারেন, প্রারব্ধের ভোগ নষ্ট ক'রে দিতে পারেন না, সে শুধু একজনারই হাতে।"

দিদীমা কয়েক দিন পরেই যোগজীবনের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। গুরুভ্রাতারও কেহ কেহ ঠাকুরের নিকটে এ বিষয়ে কথা তুলিলেন।

ঠাকুর বলিলেন :—"আমি ওকে আর বিবাহ কর্‌তে বলি না, তবে ওর তেমন ইচ্ছা হ'লে কর্‌বে ; বিবাহ আর করা ঠিক নয়।"

দিদীমা ঠাকুরের অভিপ্রায় বুঝিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন, গুরুভ্রাতা-ভগ্নীরাও অনেকে যোগজীবনের আর বিবাহ হইবে না, গুরুবংশ লোপ হইবে ভাবিয়া, অতিশয় দুঃখিত হইলেন। কিন্তু আশা কেহ একেবারে ছাড়িলেন না, মনে করিলেন, ঠাকুর এখন নিষেধ করিলেন, আবার হয়ত কখনও বা বিবাহের অনুমতি দিতেও পারেন।

ঠাকুরের এ সময়ে দৈনন্দিন কার্য্য।

১১ই মাঘ
রবিবার।

ঠাকুর গেণ্ডারিয়া আসিয়াছেন প্রচারিত হইলে সহর হইতে দলে দলে লোক আশ্রমে আসিতে লাগিল। সকাল বেলা ঠাকুরের কথাবার্ত্তা বলিবার অবসর হয় না। সুতরাং বিকাল বেলাই লোকের ভিড় হইতেছে। ঠাকুর প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে আসন ত্যাগ করিয়া কুয়াতলায় যান। শৌচান্তে

শ্রীযুক্ত যোগজীবন গোস্বামী।

দি —শ্রী মুক্তকেশী

শ্রীযুক্ত ন্দ্র শ্রী ান্তিসু দেবী

উর্জ্জ

আসনে না যাইয়া খড়ম পায়ে ও দণ্ড হাতে লইয়া আশ্রমের দক্ষিণ দিকে পা-চালি করিতে থাকেন। বৃক্ষ লতার নিকটে নিকটে যাইয়া উহাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। কোন কোনটিকে কতই যেন স্নেহভাবে স্পর্শ করেন। চারা গাছের বৃদ্ধি এবং দূর হইতে লতার বৃক্ষাবলম্বনের কৌশল ও চেষ্টা দেখিয়া, আনন্দ করিতে থাকেন। উহাদেরও আপন আপন প্রয়োজন মত চলিবার জন্য দৃষ্টিশক্তি আছে, সুখ দুঃখ, অনুভব ও বিচার বুদ্ধি, মনুষ্য অপেক্ষা কম নয়, তাহার প্রমাণ দেখাইতে থাকেন। সবুজ গাছে লাল ফুল, এক ফুলের নানা রং, শৃঙ্খলাবদ্ধ পাঁপ্‌ড়ি দেখিতে দেখিতে সময়ে সময়ে ভাবে ডুবিয়া যান। বেড়াইবার ছলে মা-ঠাকুরুণের মন্দিরটিকে পরিক্রমা করিয়া, কুঞ্জবাবুর বাড়ীর দক্ষিণদিকে পুকুরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ঘাসের উপরে যাইয়া দাঁড়ান। পুকুরের দক্ষিণ পারের ভয়ঙ্কর জঙ্গলের দিকে কিছুক্ষণ স্থির ভাবে চাহিয়া থাকেন। ঐ সময়ে, মশার কামড়ে অস্থির হইয়াই যেন, ঠাকুর সজোরে পা তোলা ফেলা করিতে আরম্ভ করেন। পরে পাখীদের খাওয়ার কয়েক মুটো চাউল দেওয়া হইলে, আপন আসনে আসিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন।

ইতিমধ্যে কুঞ্জ ঘোষ মহাশয় নিজবাড়ী হইতে চা প্রস্তুত করিয়া লইয়া আসেন। এতকাল ঠাকুরকে নারিকেলের মালায় চা সেবা করিতে দেখিয়াছি, এবার কুঞ্জবাবু ঠাকুরের চা সেবার জন্য একটি এনামেলের বাটি লইয়া আসিয়াছেন। ঠাকুর তাহাতেই চা সেবা করিতে-ছেন। চা সেবার পর কুঞ্জবাবু চরিতামৃত পাঠ করেন। পরে ঠাকুর নিজেই গ্রন্থসাহেব পাঠ করিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ দেখিতে আরম্ভ করেন। অনেক সময়েই গ্রন্থ হাতে থাকে মাত্র, ঠাকুর ধ্যান-মগ্ন অবস্থায় বেলা ১১টা পর্য্যন্ত কাটাইয়া দেন। এগারটার পর আসন ত্যাগ করিয়া শৌচে যান। মস্তক মাত্র বাদ দিয়া সর্ব্বাঙ্গ জলে ধুইয়া ফেলেন। পরে আসনে আসিয়া, তিলক-সেবার পরে, ঔষধ সেবন করেন। আহার প্রায় ১২টার সময়ে হয়। আহারান্তে আসন আমতলায় লইয়া যাই, ঠাকুর ধুনি সম্মুখে রাখিয়া নির্নিমেষ নয়নে একটানা প্রায় তিন ঘণ্টা কাল পূর্ব্বমুখে কোনও বৃক্ষের দিকে চাহিয়া থাকেন। ঠাকুরের শরীর নির্ব্বাত-প্রদীপের ন্যায় স্থিরভাবেই থাকে, অবিরলধারে অশ্রু বর্ষণে গাত্রের বস্ত্র ভিজিয়া যায়, চক্ষু দুটি নক্ষত্রের মত জ্বলিতে থাকে। কখনো কখনো শরীরের বর্ণও অন্যপ্রকার হইয়া যায়। আমি ঐ সময়ে প্রায় দুইঘণ্টা কাল মহাভারত পাঠ করিয়া নাম করিতে থাকি, এবং সময়ে সময়ে ঠাকুরের মগ্নাবস্থায় শ্রীঅঙ্গের বিচিত্র রূপান্তর দেখিয়া, হৃষ্ট ও স্তম্ভিত হইয়া পড়ি।

বিকালে সহরের লোক আসিয়া উপস্থিত হইলে, ঠাকুর সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করেন, আমি আহারের চেষ্টায় চলিয়া যাই। সন্ধ্যার সময়ে প্রত্যহই খুব উল্লাসের-

সহিত হরিসংকীর্ত্তন হয়। সংকীর্ত্তন পূবের ঘরেই হইয়া থাকে। রাত্রি প্রায় নয়টার সময়ে গুরু-ভ্রাতারা স্ব স্ব আবাসে চলিয়া যান। ঠাকুর জলযোগ করিয়া নিজ আসনে বসিয়া থাকেন।

ঠাকুরের হাসি ও ঝগড়ার শান্তি।

১২ই মাঘ। এবার গেণ্ডারিয়াতে ভয়ঙ্কর শীত। ঠাকুরের ঘরের বেড়া স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রাত্রিতে অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগে। চারি পাঁচটি গুরুভ্রাতা ঠাকুরের ঘরে রাত্রিতে থাকেন, তাঁহাদের ভাল শীতবস্ত্র নাই, ঠাকুর এজন্য রাত্রিতে ধুনি রাখিতে বলিয়াছেন। অর্থাভাব বশতঃ আশ্রমে রান্নার কাষ্ঠই সব সময়ে থাকে না, ধুনির কাষ্ঠ আর কোথা হইতে জুটিবে? অধিক রাত্রিতে মহেন্দ্রবাবু, শ্রীধর প্রভৃতি গুরুভ্রাতারা ধুনির কাষ্ঠের অনুসন্ধানে আশ্রমসংলগ্ন গুরুভ্রাতাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে থাকেন। সকলে একটু নিস্তব্ধ হইলেই তাঁহারা অবিচারে কাহারও দরজার জন্য রক্ষিত চৌকাঠের কাঠ, কাহারও বা রান্না ঘরে লাগাইবার খুঁটি, কোন বাড়ীর মাচাং প্রস্তুত করিবার ভাল তক্তা আনিয়া ধুনিতে চাপাইতে থাকেন। সকাল বেলা গৃহস্থের লক্ষ্য পড়িলেই উহা লইয়া ঝগড়া আরম্ভ হয়। আমি অতি কষ্টে রান্নার জন্য কিছু কাষ্ঠ ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলাম। উঁহাদের ভয়ে গুরুভ্রাতা রাধারমণ বাবুর গোয়ালঘরে তাহা রাখিয়া দেই। রাত্রিতে অন্ধকার গোয়ালঘরে প্রবেশ করিলে গরুর গুঁতা খাইয়া উঁহারা ভাগিয়া পড়িবে, আমার ইহাই মতলব ছিল। কিন্তু জানি না গুরুভ্রাতারা তাহাও কিরূপে, কখন কৌশলক্রমে আনিয়া, আমার এক মাসের জ্বালানী কাঠ, এক রাত্রিতেই সাবাড় করিয়া ফেলিয়াছেন। ভোরবেলা উঠিয়া প্রত্যহই কাষ্ঠ আছে কিনা একবার অনুসন্ধান করি। আজ গোয়ালে ঢুকিয়া দেখি কাঠ নাই, আমার মাথায় যেন বজ্র পড়িল। অমনি উত্তেজিত অবস্থায় ঠাকুরের সম্মুখেই উপস্থিত হইয়া কাষ্ঠ সম্বন্ধে গুরুভ্রাতাদের জিজ্ঞাসা করিলাম। গুরু ভ্রাতারা কেহ কেহ বলিলেন, "ঠাকুরের ধুনিতে তোমার কাঠ লাগিয়াছে, ইহাতো তোমার সৌভাগ্য! এজন্য এতরাগ ক'চ্ছ কেন?" আমি বলিলাম, "ঠাকুরের ভাণ্ডার হ'তে রান্নার জন্য একটি দিন আমি একখানা কাঠ নিলে, দশ দিন আমাকে চোর বলিয়া প্রচার করা হয়, আর এ বেলা বুঝি চুরি হয় না?" ঠাকুর চুপ করিয়া স্থির ভাবে থাকিয়া আমাদের ঝগড়া শুনিতে লাগিলেন, পরে ঝগড়ার মাত্রা যখন খুব বৃদ্ধি হইয়া পড়িল, ক্রমে আরো অধিক গড়াইতে পারে এরূপ লোকের আশঙ্কা হইল, ঠাকুর তখন একবার আমাদের পানে তাকাইয়া খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আশ্চর্য্য দেখিলাম,—হাসির সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলেরই ভিতরে শান্তি, সকলেরই মুখে হাসি এবং আনন্দের একটা ঢেউ সকলেরই প্রাণে উঠিয়া পড়িল?

শ্রীধরের বৈরাগ্যে বিষম উৎপাত ; ঠাকুরের উপদেশ।

১৩ মাঘ, মঙ্গলবার। আশ্রমের দক্ষিণের চৌচালা ঘরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে আমার আসন, এই ঘরে, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে শ্রীধর থাকেন। ঘরের অবশিষ্ট স্থানে ঢালা বিছানা করিয়া অন্যান্য গুরুভ্রাতারা রাত্রে শয়ন করেন। শ্রীধরের ও আমার আসনের মধ্যস্থানে দরজা। বসন্তের দেহত্যাগের পর শ্রীধরের মহা বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, এক এক দিন উহার এক এক প্রকার বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যের ধাক্কায় আমাদের প্রাণ অস্থির। একদিন শ্রীধর নিজ আসন গুটাইয়া সাড়ে ছয় ফুট দীর্ঘ, সাড়ে তিন ফুট প্রস্থ ভূমিতে ত্রস্ত হইয়া কোদালি মারিতে লাগিলেন। প্রায় ১ফুট গর্ত্ত করিয়া ঘরের মেজেতে মাটি স্তূপাকার করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীধরের এই অবস্থায় কারও কিছু বলিবার সাধ্য নাই। কি জানি যদি কোদালিই ঘাড়ে বসাইয়া দেন! দিদীমা খবর পাইয়া অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া পড়িলেন, এবং শ্রীধরকে, আসিয়া বলিলেন,—"পাগল! একি ক'রছ? মেজেতে গর্ত্ত ক'রে ঘরটিকে শেষ কর্‌লে? এ পাগলামী কেন?" শ্রীধর বৃথা বাক্য ব্যয়ে কালক্ষেপ না করিয়া খুব মনোযোগের সহিত ধমাধম্ ঘরের মেজেতে কোদাল্ মারিতে লাগিলেন। দিদী-মার কথা কোনও গ্রাহ্যেই আনিলেন না। দিদীমাও খুব চীৎকার করিয়া ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীধর স্বর বিকৃত করিয়া দিদীমাকে বলিলেন, "যা'ন যা'ন।" আপনি গিয়ে ভাণ্ডার দেখুন। ঘর শেষ কর্‌লে! ঘর শেষ কর্‌লে!! আমার যখন দফা শেষ হবে, তখন কি আপনি তার ব্যবস্থা কর্ত্তে আসবেন।" শ্রীধর এই বলিয়া হাতের কোদাল বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন, এবং একটি কলসী লইয়া পুকুরের দিকে ছুটিলেন ; পরে কলসী কলসী জল আনিয়া ঘরের মেজেতে মাটির উপর ঢালিতে লাগিলেন, জলে কাদায় সমস্তটি ঘর একাকার হইল। আমার আসনের ধারে জল আসিতেছে দেখিয়া আমি আসন হইতে লাফাইয়া উঠিলাম এবং খুব ধমক্ দিয়া শ্রীধরকে বলিলাম, "শ্রীধর! সাবধান! এক ফোঁটা জল আমার হোমকুণ্ডে পড়্‌লে বা আসনে লাগ্‌লে, আজ তোমাকে খুনই কর্‌ব।" শ্রীধর তখন বেগতিক দেখিয়া অমনি খুব ব্যস্ততার সহিত জলের ধারা অন্যদিকে টানিয়া নিয়া নরম স্বরে বলিলেন, "ভাই! আর একটুকু থাম্ না! তারপর খুন কর্‌লে আর দুঃখ নাই।" আমি বিরক্ত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম এবং ঠাকুরের নিকটে গিয়া বসিয়া রহিলাম। অবসর মত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেহ অত্যাচার করিলে তাহাকে শাসন করা কি অন্যায়?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"মানুষের সহিত ব্যবহার, প্রকৃতি বুঝে কর্‌তে হয়। যদি কেহ নিজ প্রকৃতি মত চলাতে কারও কিছু অনিষ্ট হ'য়ে পড়ে, কিন্তু অন্যের অনিষ্ট করা তার অভিপ্রায় না থাকে, তাহ'লে শান্তভাবে তাকে তা বুঝায়ে দিতে হয়। যতটা সম্ভব তার ভাবে মিশে, তার পরিবর্ত্তনের চেষ্টা কর্‌তে হয়। আর যদি দেখা যায়, সত্য সত্যই কোন প্রকার দুরভিসন্ধিতে মতলব ক'রে কেই একটা অত্যাচার কর্‌ছে, তা হ'লে তাকে শাসন কর্‌তে হয়। অনেক সময়ে সদভিপ্রায়ে মানুষ কাজ করে, অথচ তাতে কারও অনিষ্ট হ'য়ে পড়ে, কিন্তু তাতে তাকে দোষী বলা যায় না। ভুল ভ্রান্তিতো লোকের হ'য়েই থাকে। সময় হ'লে সে নিজেই তা আবার বুঝ্‌তে পারে। সমস্ত কার্য্যেই খুব ধৈর্য্য অবলম্বন কর্‌তে হয়। ধৈর্য্যের অভাবেইতো যত বিরোধ।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া ভাবিলাম, 'বাঃ এ মন্দনয়। একজনে কেবল অত্যাচার করুক, আর একজনে কল্পনা করিয়া তার শুভ উদ্দেশ্য ভাবিয়া ঐ অত্যাচারে কেবল ধৈর্য্য ধ'রে থাকুক! এ উপদেশ মন্দনয়! শ্রীধরের নাম উল্লেখ না করিলেও, ঠাকুর উহাকেই লক্ষ্য করিয়া এ সব উপদেশ আমাকে দিলেন বুঝিলাম; কিন্তু শ্রীধরের মাথা গরমের অবস্থায় কাণ্ডজ্ঞানশূন্য যে সকল উদ্বেগজনক কর্ম্মকে সকলেই পাগলামি ভিন্ন কিছুই বলে না, তাহাতে ঠাকুর উহার কি শুভ উদ্দেশ্য দেখিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীধর সমস্ত দিন জলকাদা ঘাঁটিয়া আসন পরিমিত গর্ত্তের চতুর্দ্দিকে উচ্চ বেদী প্রস্তুত করিলেন। পরে কতকগুলি তুলসী গাছ আনিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিয়া উহার উপর পুঁতিলেন। তৎপরে গর্ত্তের ভিতরে চাটাই বিছাইয়া, তাহার উপর কম্বল আসন পাতিলেন। অনন্তর একটি একতারা লইয়া ভজন করিতে আরম্ভ করিলেন,—'শেষের সে দিন মন কররে স্মরণ, ভবধাম যবে ছাড়িবে।' শ্রীধরের ভজন শেষ না হইতেই, সহরের গুরুভ্রাতারা সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রায় অর্দ্ধেক ঘর শ্রীধরের পাগ্‌লামীতে জোড়া দেখিয়া সকলে বলিলেন, "একি! শ্রীধর। এসব কি ক'রেছ?"

শ্রীধর খুব তেজের সহিত উত্তর করিলেন, "একি, দেখ্‌চো না, চোক্ নাই? তুলসীকানন।" গুরুভ্রাতারা বলিলেন, "পাগল, কানন কি তোমার ঘরের ভিতরে? বাইরে গিয়ে তুলসী কাননে ভজন কর না?" শ্রীধর বলিলেন, "এত শীতে পাছে বাইরে যেতে হয়, সেই জন্যই তো এত করা। আমার দেহ ত্যাগ হ'লে, এই তুলসী াননেই হবে ;

তোদের শীতে কোন কষ্টই হবেনা, এই গর্ত্তে আমাকে রেখে এ সব মাটি দিয়েই কবর দিস্।" এই বলিয়া শ্রীধর হাতের একতারা রাখিয়া কম্বলমুড়া দিলেন এবং লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন। শ্রীধর নীরব হইলে গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ হরিধ্বনি দিয়া, শ্রীধর মরিয়াছে বলিতে বলিতে চারিদিকের মাটি ঠেলিয়া উহার গায়ে ফেলিয়া চাপিয়া ধরিলেন। তখন শ্রীধর ধড়্মড়াইয়া উঠিয়া পড়িলেন। সকলের সঙ্গে শ্রীধরেরও হাসি অর্দ্ধঘণ্টা ব্যাপী চলিল। আমি এ সকল দেখিয়া শুনিয়া ঠাকুরের উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিলাম, এবং শ্রীধরের পাগলামীতেও শুভ উদ্দেশ্য থাকে জানিয়া, অবাক্ হইলাম।

শ্রীধর প্রকৃতিস্থ হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই, এ পাগ্লামী কর্ছিলে কেন?"

শ্রীধর বলিলেন—"ভাই, ঠাকুর ব'লেছিলেন আমার শরীরে সন্ন্যাস রোগের বীজ প্রবেশ ক'রেছে, সুতরাং কোন্ মুহূর্ত্তে আমি কি অবস্থায় মর্‌ব কিছুইতো নিশ্চয় নাই। এজন্য তুলসী কানন ক'রেছিলাম, তুলসীর নিকটে যদি মরি, তাহ'লেওতো একটা সদ্গতি হবে, তারপর এখন যে বিষম শীত। যদি সন্ধ্যার সময়ে মরি, তাহ'লে যাঁরা শ্মশানে নিয়া যাবেন তাঁদের কি কম কষ্ট? ইহা ভেবেই মাথায় খেল্‌লে, আমার দেহ নিয়া পাছে কেহ উদ্বেগ ভোগ করে, তাই সে ব্যবস্থা এখনই কর্ত্তে হবে। অমনি অত পরিশ্রম ক'রে ঘরের ভিতরেই কবরের স্থান প্রস্তুত ক'রেছিলাম।" শ্রীধরের মাথা ঠিক হইলে, নিজের পাগ্লামী নিজেই ভাবিয়া অস্থির হইল।

স্বপ্নে ফকির দর্শন।

১৫ই মাঘ, বৃহস্পতিবার।

একদিন স্বপ্নে দেখিলাম, গেণ্ডারিয়া আশ্রমের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে কঠোর সাধক তিনটি মুসলমান ফকির রহিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি দীর্ঘাকৃতি, শীর্ণকলেবর, গৌরবর্ণ অতি তেজস্বী বৃদ্ধ আমাকে বলিলেন,—"দেখ, এই আমি বসিলাম। যে পর্য্যন্ত না সিদ্ধ হইব, এই আসন হইতে উঠিব না, অনাহারে এই আসনেই কলেবর ত্যাগ করিব।" ফকির সাহেব এই বলিয়া বামপদের গুল্‌ফোপরি সোজা হইয়া বসিয়া, দক্ষিণ পদ সম্মুখে বিস্তার পূর্ব্বক, দক্ষিণ হস্তের তর্জনী দ্বারা পদাঙ্গুষ্ঠ আকর্ষণ পূর্ব্বক নাসাগ্রে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। অপর দুইটি ফকির অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক, চেহারা কিঞ্চিৎ স্থূল, স্বভাব ধীর, বর্ণ ঈষৎ গৌর, পুকুরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে নিবিড় অরণ্যের ভিতরে, মাটীর নীচে, আসন করিয়া বসিলেন;—কিছুদিন পরে উঁহাদের খবর লইতে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত ফকির সাহেবকে দেখি, তাঁর আর সে আকৃতি নাই, সর্ব্বাঙ্গ

বাতে ফুলিয়া গিয়াছে এবং তাহা ফাটিয়া রস গড়াইতেছে, উরু ও কোমরের স্থানে স্থানে পচিয়া মাংস খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। ফকির সাহেব অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিয়াও, আসনে স্থিরভাবে উপবিষ্ট আছেন। অপর দুটি ফকিরের কি অবস্থা ঘটিল জানিবার জন্য যেমন জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করিলাম, পায়ে হোঁচট্ লাগিয়া নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ফকিরদের তীব্র তপস্যার চিত্র ভাবিতে ভাবিতে অবশিষ্ট রাত্র অতিবাহিত হইল।

প্রত্যুষে ঠাকুর আর আর দিনের মত পাচারি করিতে করিতে কুঞ্জবাবুর বাড়ীর দক্ষিণে ইক্ষুক্ষেতের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে ঘাসের উপর যাইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং নিত্য যে স্থানে দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎকাল দক্ষিণ মুখে জঙ্গলের দিকে চাহিয়া থাকেন, ঠিক সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া দু-চার বার পা তোলা ফেলা করিয়া নিজ আসন-ঘরে চলিয়া আসিলেন। স্বপ্ন যোগে যে স্থানে ফকির সাহেবকে দেখিয়াছিলাম, ঠিক সেই স্থানে ঠাকুর নিত্য যাইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেন। তাই বিস্মত হইয়া অবসর মত জিজ্ঞাসা করিলাম, "সকাল বেলা পুকুরের কোণে যেস্থানে আপনি যাইয়া দাঁড়ান ঠিক সেইস্থানে একটি ফকিরের আসন রহিয়াছে স্বপ্নে দেখিলাম, স্বপ্নটি কি সত্য ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"স্বপ্নটি সমস্ত পরিষ্কার করিয়া বলনা ?"

আমি স্বপ্ন বৃত্তান্ত আগাগোড়া ঠাকুরকে বলিলাম।

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"স্বপ্নটি সত্য ; ফকির সাহেবের যথার্থ অবস্থাই দেখেছ। **ইনিই কাল কৃষ্ণসর্পের দেহ আশ্রয় ক'রে আমার সাধন কুটীরে আসনের নীচে এসে রয়েছেন। আর পুকুরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে যাঁদের দেখেছ, তাঁদের মধ্যেও একজন সর্প হ'য়ে আছেন—তাঁর বর্ণ দুধের মত সাদা, চক্ষু রক্তবর্ণ, অত্যন্ত উজ্জ্বল, সময়ে সময়ে আমতলায় এসে থাকেন ; লক্ষ্য রাখ্‌লে দেখ্‌তে পাবে।**"

এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিবার পর আর একটি দিনও ঠাকুরকে ঐ স্থানে যাইয়া দাঁড়াইয়া পা তোলা ফেলা করিতে দেখি নাই। ইহার ভিতরে যে কি রহস্য আছে জানি না। স্বপ্নটী শুনিয়া ঠাকুর আমাকে ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতে বলিলেন। গেণ্ডারিয়া আশ্রমটি এক সময়ে মুসলমান ফকিরদের নির্জ্জন ভজন-ভূমি ছিল। বহু সিদ্ধ ফকিরের কবর্ এই আশ্রমে এবং আশ্রম সংলগ্ন শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র গুহ মহাশয়ের বাড়ীতে রহিয়াছে। বাড়ীর পূর্ব্ব দিকে প্রকাণ্ড আমগাছের গোড়ায় একটি মুসলমান মহাত্মার

কবর্ আছে। দয়া করিয়া তিনি সময়ে সময়ে মনোহরা দিদিকে (সতিশবাবুর মাতাকে) দর্শন দেন। ফকির সাহেবের তৃপ্তি বা মর্য্যাদা রক্ষার্থে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে ঐ বৃক্ষ-মূলে ধূপ, ধুনা, প্রদীপাদি দেওয়া হয়।

গুরুভ্রাতাদের প্রতি অশ্রদ্ধা ; ঠাকুরের উপদেশ।

১৯শা মাঘ। আশ্রমস্থ গুরুভ্রাতাদের ঝগড়া কোন্দল ও বহির্ম্মুখ ভাব দেখিয়া, আমি ভিতরে ভিতরে গর্ব্বিত হইতে লাগিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, 'বাড়ীঘরে থাকিলে নানা-প্রকার উদ্বেগ অশান্তি ভূগিয়া যাহাদের দিনপাত করিতে হয়, তাহারাই সুখে সচ্ছন্দে থাকিবার জন্য এখানে আসিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। যথার্থ সাধন ভজন বা ঠাকুরের সঙ্গলাভ করা ইহাদের এখানে থাকিবার উদ্দেশ্য নয় ; তাই সামান্য সামান্য স্বার্থ লইয়া ইঁহারা ঝগড়া বিবাদে সময় কাটাইতেছেন। ঠাকুরের আকর্ষণে এবং ধর্ম্মলাভাকাঙ্ক্ষায় মাত্র আমিই এখানে রহিয়াছি। অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের অপেক্ষা ঠাকুরের আদেশ আমিই অধিক প্রতিপালন করিয়া চলিতেছি এবং ঠাকুরের সঙ্গও আমিই অধিক সময় করিতেছি।' এসব কারণে ঠাকুরের নিকট আর দশটি অপেক্ষা আমি বেশী আদরের হইয়াছি কিনা বুঝিবার অভিপ্রায়ে, কৌশলক্রমে একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করিয়া কেহ বা নিয়ম নিষ্ঠা পূর্ব্বক চলিতেছে ; আবার কেহবা উল্টা বাগে চলিতেছে। কাহারও সামান্য দোষে গুরুতর শাসন, আবার কারও বা গুরুতর অপরাধেও উপেক্ষা প্রদর্শন, এরূপ কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"মানুষের প্রকৃতি দেখে, অবস্থা বুঝে, তাকে চল্‌তে দিতে হয় ও চালাতে হয়। সকলের পক্ষে এক ব্যবস্থা নয়। বালক, বৃদ্ধ, যুবক, তিনটি লোক একই ঘরে জ্বরে পড়্‌লে, আরোগ্যের জন্য একমাত্র কুইনিন্ সক-লের পক্ষে ব্যবস্থা কর্‌লে সব সময়ে চলে না। কারও কুইনিনে উপকার হ'তে পারে, আবার কারও বা মৃত্যুও হ'তে পারে। রোগ এক হ'লেও, রোগের হেতু এবং রোগীর শরীরের অবস্থাদি বুঝে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা কর্‌তে হয়। একই অবস্থা লাভ বা একই দোষ ত্যাগ কর্‌তে হ'লে, এক এক জনার এক এক ভাবে চলা আবশ্যক হ'তে পারে। যার যেটি, সে সেটি নিয়ে থাক্‌বে,

অন্যের কিসে কি হ'চ্ছে তা দেখ্‌বার প্রয়োজন কি? আর দেখেইবা কি বুঝ্‌বে! আমার মত না চল্‌লে কারও কিছু হবে না মনে করা অত্যন্ত ভুল।"

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম :—"সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষামাত্র গ্রহণ করিলেই কি সকলের একই অবস্থা লাভ হইবে?"

ঠাকুর বলিলেন :—হাঁ, তা হ'তেই হবে; কোন একটি ষ্টেসনের টিকেট ক'রে দশটি লোক গাড়ীতে চেপে বস্‌লে, জেগে থাক্ বা ঘুমিয়ে থাক্, ঝগড়া বিবাদ ক'রে, কি তাস পাশা খেলেই চলুক, সকলকে একই স্থানে যেয়ে পৌঁছাতে হবে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম,—তাহ'লে আর আদেশ বা নিয়মাদি প্রতিপালন করায় লাভ কি?"

ঠাকুর :—লাভ খুব আছে। যাবে সকলেই একই স্থানে, তবে কেউ পাল্কিতে ব'সে, আবার কেওবা পাল্কি ঘাড়ে নিয়ে, পথের পার্থক্য এই মাত্র।"

ঠাকুরের প্রথম দুটি প্রশ্নোত্তরে মনে মনে একটু দুঃখিত হইয়া ছিলাম, এবার মনে বেশ স্ফূর্ত্তি আসিল। পাছে শ্রীমুখ হইতে আবার অন্যপ্রকার কিছু বাহির হইয়া পড়ে এই ভয়ে আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া, ধীরে ধীরে আসন গুটাইয়া সরিয়া পড়িলাম।

অভিমানে দুর্দ্দশা; ঠাকুরের অনুশাসন।

২০ হইতে ২১ মাঘ।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি আমার রাশিতে বিষম কুগ্রহ চাপিল। সেই সময় হইতেই গুরুভ্রাতাদের উপর তাচ্ছীল্য ভাব এবং তাহাদের কার্য্য-কলাপে দিন দিন দোষদৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের অবস্থা ভাবিয়া অতিশয় স্ফীত হইয়া উঠিলাম। নীলকণ্ঠবেশ, মালা, তিলক, একাহার, পদাঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টি, নিত্য হোম, পাঠ ও ঠাকুরের সঙ্গে অধিকক্ষণ বাস ইত্যাদি বাহিরের অনুষ্ঠানে আমার অতিরিক্ত নজর পড়িয়া গেল। সারাদিন আমি নাম করিয়া যে অপূর্ব্ব আনন্দ সম্ভোগ করিতাম, এ সময়ে ধীরে ধীরে আমার অজ্ঞাতসারে তাহা একেবারে অন্তর্হিত হইল। আহারান্তে রাত্রি ১১।১২টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাই, এই সময়ের মধ্যেও প্রায় দুই এক দিন অন্তরই স্বপ্নদোষ হইতে লাগিল। নামে অরুচি ও মনে বিরক্তির সঙ্গে সঙ্গে শরীরেও নানাপ্রকার উপাধি উপস্থিত হইল। হস্ত, বাহু, মস্তকাদি যে সকল স্থানে রুদ্রাক্ষ আঁটিয়া ধারণ করি, সে সকল স্থানে জ্বালা অনুভূত হইতে লাগিল, ক্রমশঃ এই জ্বালা বৃদ্ধি পাইয়া, লোম্‌ছা-পোড়ার মত যন্ত্রণা, সর্ব্বদা ভোগ করিতে লাগিলাম। এবং

সেই সকল স্থানে ফোস্কার মত ছাল উঠিতে লাগিল। মাথাটি আগুণ হইয়া গেল। ভিতরের অশান্তি ও শরীরের ক্লেশ অসহ্য হওয়াতে ঠাকুরের নিকট যাইয়া বলিলাম, "কয়েক দিন যাবৎ আমার সপ্তাহে তিন চা'র দিন করিয়া স্বপ্নদোষ হইতেছে, মনে সর্ব্বদা বিরক্তি, শরীরেও বিষম জ্বালা দিনরাত ভুগিতেছি, এরূপ দুর্দ্দশা আমার হইল কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন :—"দুর্দ্দশা আর হ'য়েছে কি ! এখন থেকে খুব সাবধান হ'য়ে না চল্‌লে, আরও কত দুর্দ্দশায় পড়্‌বে। ধর্ম্মটি তামাশার জিনিষ নয়, সকলের পায়ের তলা দিয়ে ধর্ম্মের পথ। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলের পায়ের নীচ দিয়ে ধর্ম্মের সিঁড়িতে উঠ্‌তে হয়। মাথা উঁচু ক'রে কখনও ধর্ম্ম লাভ হয় না। অভিমান বড়ই বিষম জিনিস। জটা, মালা, তিলকাদি ধর্ম্মের বেশভূষা ধারণ ক'রে বিন্দুমাত্রও যদি প্রতিষ্ঠার ভাব মনে আসে, তন্মুহূর্ত্তেই তাহা ত্যাগ করতে হয়। না হ'লে উহাই সর্প হ'য়ে দংশন করে। সর্ব্বদা এ সব বিচার ক'রে চল্‌তে হয়। ভগবানের উদ্দেশ্যে যে বস্তু ধারণ করা হয় না, এবং যাতে শুধু একটা প্রতিষ্ঠার লোভই বৃদ্ধি পায়, তা যাই হোক্ না কেন, কাকবিষ্ঠাবৎ ত্যাগ কর্‌বে। আর যে'টি তাঁর উদ্দেশ্যে রাখা হয়, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হ'লেও তাতে ভ্রুক্ষেপ কর্‌বে না। এ সকল বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত চল্‌তে হয়। ধর্ম্মাভিমান বড়ই ভয়ানক। এত অনিষ্ট আর কিছুতেই হয় না। মদ-খোর, বেশ্যাসক্ত, নিতান্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি নিজের দুরবস্থা বুঝে, নিজেকে নিতান্ত অপদার্থ জঘন্য মনে করে, সে একজন সদনুষ্ঠানী, চরিত্রবান্, ধর্ম্মাভি-মানী ব্যক্তি অপেক্ষাও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য অপরাধের পার কিনারা আছে, কিন্তু ধর্ম্মাভিমানীর পার সহজে নাই। সাধন, ভজন, তপস্যা, কথা বার্ত্তা, বেশ-ভূষা, যে কোনও বিষয়ে ধর্ম্মের অভিমান হয়, প্রতিষ্ঠার ভাব মনে আসে, বিষম রোগ মনে ক'রে তৎক্ষণাৎ তা ত্যাগ কর্‌বে। শরীর মন ঠাণ্ডা না হ'লে রুদ্রাক্ষ ধারণ সহ্য হবে না, গরম হ'য়ে যাবে। এখন যে'য়ে রুদ্রাক্ষ মালা তুলে রাখ, শুধু তুলসীর মালা ধারণ কর।

আহার সম্বন্ধেও কোন প্রকার অনিয়ম অত্যাচার কর্‌লে স্বপ্নদোষ হ'তে রক্ষা পাওয়া যায় না। অশুদ্ধ আহার একবার পেটে গিয়ে রক্তে পরিণত হ'লে,

ক্রমে ক্রমে শরীরের সমস্ত রক্তই দূষিত করে। ঐ রক্ত যতকাল দেহে থাকে, নানা প্রকার বিকার জন্মায়। উহা একেবারে নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, নানা-প্রকার উৎপাত ভোগ কর্‌তে হয়। এক এক প্রকার রসে এক এক প্রকার বিকারের উৎপত্তি করে। রস ত্যাগ না কর্‌লে শরীরটি সহজে নির্ম্মল হয় না। শরীর বিকার শূন্য না হ'লে ভজন সাধনও হয় না। বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক আহার দ্বারাই শরীর শুদ্ধ হয়। আগে শরীরটিকে ঠিক ক'রে নেও। শরীর নিয়াই সব। শরীর ঠিক না হ'লে, কি দিয়ে কি ক'র্ব্বে ?"

ঠাকুরের অনুশাসন বাক্য শুনিয়া, আমি নিজ আসনে চলিয়া আসিলাম। এবং সমস্ত রুদ্রাক্ষের মালা খুলিয়া রাখিলাম। আহারের পবিত্রতা ও মাত্রা ঠিক রাখিবার জন্য ঠাকুরের প্রসাদ মিলাইয়া শুধু ভাতে সিদ্ধ ভাত খাইতে লাগিলাম।

প্রসাদের গুণ ও তাহাতে অবিশ্বাস।

২৮ মাঘ।
বুধবার।

গেণ্ডারিয়া নিবাসী আমাদের শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বক্সি মহাশয়, প্রতিদিনই সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন। ঠাকুরের নিকট কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া, বাড়ী যাওয়ার সময়ে আমার নিকট হইতে প্রসাদ লইয়া যান। ব্রাহ্ম সমাজ ভুক্ত হইলেও প্রসাদে বক্সি দাদার অচলা ভক্তি। দুইটি বা তিনটি অন্ন প্রসাদ মাত্র তাঁহাকে গণিয়া দিয়া থাকি, অধিক দিতে চাহিলেও তিনি নেন্ না। প্রসাদ হাতে পড়া মাত্রেই তিনি থর্ থর্ কাঁপিতে থাকেন। আফিংখোরের মত তাঁর চোখ দুটি বুজিয়া আসে। তিনি ক্ষণমাত্রও না দাঁড়াইয়া দ্রুতপদে বাড়ী চলিয়া যান। অবসর মত নিজ আসনে বসিয়া, ঐ প্রসাদ মুখে রাখিয়া একবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়েন, তিন চার ঘণ্টাকাল সমাধিস্থ থাকেন। আমাদের জেদে পড়িয়া কখনও তিনি দু এক গ্রাস প্রসাদ পাইলে, দু তিন দিনের জন্য তাঁহার পাইখানা বন্ধ হইয়া যায়। ঐ সময়ে নেশাখোরের মত ঢুলু ঢুলু অবস্থায় দিন রাত কাটান। কথায় কথায় আজ তিনি বলিলেন প্রসাদ পাইলে এমনই একটা নেশা হয় যে, অন্য কোন দিকে মন টানিয়া আনিবার ক্ষমতা থাকে না প্রসাদের গুণে মনটিকে নামেতেই নিবিষ্ট করিয়া রাখে, শরীরও অবসন্ন হইয়া পড়ে। বক্সি দাদার অবস্থা, দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইতেছি। ভাবিলাম, এই প্রসাদতো গ্রাসে গ্রাসে প্রত্যহই খাইতেছি। 'আমার এরূপ হয় না কেন ?'

কিছুকাল হয় রুদ্রাক্ষমালা ছাড়িয়া দেওয়াতে মনের উৎসাহ উদ্যম যেন একেবারে নিবিয়া গিয়াছে। শরীরও পূর্ব্বের মত নাই, নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কিছুতেই তো এলোমেলো স্বপ্ন দেখা বন্ধ হইতেছে না! সকল প্রকার নিয়ম নিষ্ঠা করিয়াও যখন কোনও ফল পাইলাম না, তখন বঙ্কি দাদার কথা মনে হইল। ভাবিলাম, শয়নের সময়ে মুখে প্রসাদ রাখিয়া নিদ্রা যাইব। জাগ্রত অবস্থায় শরীর স্বভাবতঃই অস্থির এবং মন চঞ্চল থাকে বলিয়া, প্রসাদের অসাধারণ গুণও অনুভব হয় না, কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় দেহ মন স্থির থাকে; সুতরাং আহারের বা সঙ্গের কোন প্রকার দোষে নিদ্রিতাবস্থায় যদি অকস্মাৎ বিকারের সম্ভাবনা হয়, মহাপ্রসাদ মুখে রাখিলে তাহার গুণে অবশ্যই উহার শান্তি হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া অদ্য একগ্রাস প্রসাদ মুখে রাখিয়া নিদ্রিত হইলাম। রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম ঃ—'ঠাকুর আমাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সকলেই ঠাকুরকে দেখিয়া আনন্দ উৎসাহ করিতে লাগিল। বহুবিধ উৎকৃষ্ট সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া ঠাকুরের ভোগ রান্না হইল। ঠাকুর পরম পরিতোষে সেবা করিলেন। অন্যান্য দিনের মত ভোজনের পাত্র হাতে লইয়া আমি সকলকে প্রসাদ বাঁটিতে লাগিলাম। আমার একটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া ১৫।১৬ বৎসরের যুবতী প্রসাদ পাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আমার হাতে, প্রসাদ পাওয়ার অপেক্ষা না করিয়া, নিজেই ঐ পাত্র হইতে প্রসাদ তুলিয়া নিয়া খাইতে লাগিল। আমি তাহার হাতখানা বাম হাতে আঁটিয়া ধরিয়া, অপর হাতে প্রসাদ তুলিয়া তাড়াতাড়ি খাইতে লাগিলাম। মেয়েটি তখন হাত ছাড়াইতে যেমন চেষ্টা করিল।' তন্মুহূর্ত্তেই আমি জাগিয়া পড়িলাম। দেখিলাম স্বপ্নদোষ হইয়া গিয়াছে। মুখের সেই প্রসাদই খুব ব্যস্ততার সহিত চিবাইয়া খাইতেছি। অবশিষ্ট রাত্রি কান্দিয়া কাটাইলাম। ভাবিলাম 'হায়! একি হইল? বহুকাল যাহাকে ভুলিয়া গিয়াছি, মহাপ্রসাদের গুণে আজ নিদ্রিতাবস্থায় তার স্মৃতি জাগাইয়া আমার এই সর্ব্বনাশ করিল! নির্জ্জিত দোষকে পুনর্জ্জীবিত করাই কি মহাপ্রসাদের গুণ? প্রসাদের গুণ, বোধ হয় অন্ধ-ভক্তদের কল্পনারই একটা পরিণাম মাত্র।'

মধ্যাহ্নে মহাভারত পাঠান্তে অবসর পাইয়া ঠাকুরকে বলিলাম ঃ—স্বপ্নদোষ না হয় সেজন্য শয়নের সময়ে মুখে প্রসাদ রাখিয়াছিলাম। নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে একটি মেয়ের সহিত প্রসাদ লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়া খাওয়াতে, স্বপ্নদোষ হইল। মুখের প্রসাদ চিবাইতে চিবাইতে জাগিয়া পড়িলাম। ঐ মেয়েটিকেতো আমি একমত ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তবে এমন হ'লো কেন?

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"তা ব'ল্লে কি হয়! প্রকৃতিতে যা কিছু দোষ লুকায়ে আছে, তা সমস্তইতো ফুটে বে'র হবে। উহার প্রতি আসক্তি তোমার বহু-কালইতো ছিল। কল্পনাতেও যখন কোন প্রকার কামভাব উহার প্রতি আন্‌তে না পার্‌বে, তখনই বুঝ্‌বে এই প্রবৃত্তি তোমার নষ্ট হ'য়ে গেছে। অষ্টপ্রকার মৈথুনই ত্যাগ কর্‌তে হবে। স্ত্রীলোকের স্পর্শেতে ক'রে, যেমন উত্তেজনা হ'য়ে থাকে, উহাদের স্মরণে, দর্শনে এবং উহাদের সহিত আলাপাদি ক'রেও সেই রূপই হয়। সুতরাং বীর্য্যরক্ষা কর্‌তে হ'লে, ইহার একটিও অবহেলা কর্‌লে চল্‌বে না। একটা বিষয়ে চেষ্টা কর্‌তে হ'লে, ভীষ্মের মত প্রতিজ্ঞা ক'রে লেগে যেতে হয়। না হ'লে কিছুই হবার যো নাই। মাটির দিকে মাথা হেঁট্‌ ক'রে রেখে, আড়ে আড়ে এদিক্‌ সেদিক্‌ তাকা'লে ব্রত রক্ষা হয় না। বরং চোরের মত কপট ব্যবহারই করা হয়। কোন প্রকার অসৎ কল্পনা মনে এলে, চীৎকার ক'রে গান ক'রো অথবা পাঠ ক'রো।"

আমি যে পাত্রে রান্না করি সেই পাত্রেই আহার করিয়া থাকি, অনেক সময় কলাপাতা সংগ্রহ করিতে পারি না, এজন্য বড়ই অসুবিধা বোধ হয়। আজ একটি গুরুভ্রাতা আমাকে একখানা এনামেলের ডিস্‌ আনিয়া দিয়া বলিলেন, 'ইহাতে তুমি আহার করিও, মাজিতে কোন কষ্ট হইবে না।' আমি ঐখানা ঠাকুরের নিকট লইয়া গিয়া ঠাকুরকে দেখাইয়া বলিলাম, 'এই পাত্রে আমি আহার করিতে পারি ?'

ঠাকুর দেখিয়া বলিলেন ঃ—"রাম! রাম!! ওতে কি খেতে আছে! ওসব স্পর্শও কর্‌তে নাই। আমি কয়দিন ওতে চা খেয়েছিলাম, এখন আবার আমার নার-কেলের মালাতেই চা খাচ্চি। ঐ পাত্র শুদ্ধ নয়।"

আমি ডিস্‌খানা লইয়া যিনি দিয়াছিলেন তাঁহাকেই দিয়া দিলাম।

ফাল্গুন।

গেণ্ডারিয়ার সিদ্ধ ফকিরদের আশ্চর্য্য কথা।

৩রা ফাল্গুন,
রবিবার।

মাঘ মাসটি শেষ হইয়া গেল, কিন্তু গেণ্ডারিয়ায় শীত কিছুই কমিতেছে না। রাত্রিতে দুএক ঘণ্টা আসনে বসিলেই শীতে যেন শরীর অবসন্ন করিয়া ফেলে, ধূনি না জ্বালিয়া স্থির থাকিতে পারি না। প্রত্যহই আমি ধূনির কাঠ সংগ্রহ করিয়া রাখি। ফাল্গুন মাস পড়িতেই একদিন আমার ধূনির কাঠ সংগ্রহ ছিল না, নিদ্রা ভঙ্গ হইতেই, বাহিরে যাইয়া ধূনির কাঠ আনিবার সঙ্কল্প করিয়া যেমনই আসন হইতে উঠিলাম, তন্মুহূর্ত্তেই ঠাকুর আমাকে পূবের ঘরে নিজ আসনে থাকিয়া ডাকিয়া বলিলেন ঃ—"**ওহে, এখন বাইরে যেও না, একটু অপেক্ষা কর, বাঘে চ'ড়ে ফকির সাহেব আস্‌ছেন, এখনই চ'লে যাবেন।**"

আমি ঠাকুরের কথা শুনিয়া অমনি আসনে বসিয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, মানুষ কি কখনও বাঘে চ'ড়ে চল্‌তে পারে! পাছে ফকির সাহেব আমাকে দেখিয়া আশ্রমে না আসিয়াই চলিয়া যান, সেই জন্যই বুঝি ঠাকুর আমাকে বাঘের কথা বলিয়া এ সময়ে বাহিরে যাইতে নিষেধ করিলেন। সকাল বেলা উঠিয়া দেখিলাম, আমতলায় ও আশ্রমের দক্ষিণ দিকের উঠানে স্থানে স্থানে পরিষ্কার বাঘের পায়ের চিহ্ন রহিয়াছে। অবসর মত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—ফকিরের সঙ্গে বাঘ কেন ?

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"**অনেক ফকির, তান্ত্রিক সাধনের কোনও প্রণালী ধ'রে সাধন ভজন করেন। ইঁহারা শক্তির উপাসক। সাপ, বাঘ, সঙ্গে রাখা ইঁহাদের প্রয়োজন হয়।**"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—রাত্রিতে ফকির সাহেব আসেন কেন ?

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"**দেখা কর্‌তে।**"

আমি বলিলাম ঃ—আপনিতো আসন ছেড়ে ওঠেন না। দেখা হয় কি প্রকারে ?

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"**তা হয়।**"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—এসব ফকিরদের কি আমরা রাত্রিতে বাইরে থাক্‌লে দেখ্‌তে পারি ?

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"তাঁরা দয়া ক'রে দর্শন দিলেই, পার।"

আজ মহাভারত পাঠের পর বেলা আড়াইটার সময়ে, একটি দীর্ঘাকৃতি বৃদ্ধ মুসলমান ফকির আমতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফকির সাহেব আসা মাত্রেই, ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া খুব সমাদর করিয়া বসাইলেন। ফকির সাহেবকে দেখিয়া মনে হইল বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হইবে, কিন্তু তাঁহার কথায় বার্ত্তায় যাহা বুঝিলাম, তাহাতে অনুমান হয় অনেক বেশী। ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল তিনি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া গেণ্ডারিয়ার নিবিড় জঙ্গলে থাকিয়া সাধন ভজন করিতেছেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে ঠারেঠোরে সাঙ্কেতিক ভাষায় যে সব আলাপ করিলেন তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কথায় কথায় ফকির সাহেব বলিলেন ঃ—বহুকাল আমি জাহাজে চাকরি করিয়াছিলাম। নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার করাই মাত্র আমাদের কাজ ছিল। একবার ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ সমুদ্রে আমরা যাইতে যাইতে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা একটি দেশ দেখিতে পাইলাম, দেশটি খুব বড় বলিয়াই মনে হইল। ক্রমশঃ আমরা সেই দিকে জাহাজ চালাইতে লাগিলাম। হঠাৎ একদিন দুর হইতে একখানা জাহাজ আমাদের দেখিয়া বাঁশী বাজাইয়া আর আগে যাইতে নিষেধ করিল। পরে ঐ জাহাজ খানার সহিত মিলিয়া আমরা আরও কিছু দুর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, বহুস্থানব্যাপী বিস্তৃত ঘূর্ণী জলরাশি ভয়ঙ্কর স্রোতে সাঁ সাঁ শব্দে চলিয়া একটা কেন্দ্রস্থানে যাইয়া পড়িতেছে। ঐ স্রোতে একবার জাহাজ পড়িলে কোন উপায়েই উহা আর রক্ষা করা যাইবে না। ঐ জাহাজের লোকের মুখে শুনিলাম, ঐ স্রোতে পড়িয়া কয়েকখানা জাহাজ ডুবিয়াও গিয়াছে। বোধ হয় সমুদ্রের ভিতরে এমন কোন বস্তু আছে, যাহাতে জাহাজ আকর্ষণ করিয়া ডুবাইয়া ফেলে, অথবা জলেরই এমন গুণ যে, তাহাতে কিছু ভাসিতে পারে না। ঐ পাক জলের বাহিরে থাকিয়া কয়েক দিন আমরা ঘুরাঘুরি করিলাম। তিথি বিশেষে ঐ আবর্ত্ত জলের কেন্দ্রস্থানে, সোনার মত রং, অতি উজ্জ্বল, খুব বড় একটা জালার মত কি যেন দেখা যায়, আবার ডুবিয়া যায়। উহা যে কি, দুরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ঘূর্ণী জলের সীমা অতিক্রম করিয়া ঐ দেশে পঁহুছিবার কোন সুবিধাই আমরা পাইলাম না।

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—আমাদের রামায়ণে যে লঙ্কার কথা আছে, এই দেশই কি সেই লঙ্কা ?

ঠাকুর বলিলেন ঃ "তা হ'তে পারে, এখন যাকে লঙ্কা বলে, সেই সিলোন

লঙ্কা নয়। সমুদ্র পথে জাহাজাদিতে ক'রে লঙ্কায় যাওয়া অসম্ভব। শূন্য পথেও নাকি সহজে যাওয়া যায় না। জলে টেনে নেয়, এরূপ শুনা আছে। লঙ্কার চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণী জলের বিবরণও পাওয়া যায়। লঙ্কা বহুদূরে।"

ফকির সাহেব বলিলেন ঃ—আর একবার আমরা উত্তর মহাসাগরে গিয়াছিলাম, সেখানেও আমরা উত্তর দিকে যাইতে যাইতে বহু বিস্তৃত এক দেশ দেখিতে পাইলাম। বরফ কাটিয়া আমাদের জাহাজ বেশী দূর যাইতে পারিল না। আমাদের বড় সাহেবের সঙ্গে কিছু খাবার লইয়া, একখানা দ্রুতগামী কলের গাড়িতে ঐ দেশের দিকে বরফের উপর দিয়া চলিলাম। ক্রমে আমরা সেই দেশের দক্ষিণ প্রান্তে পঁহুছিলাম। দেখিলাম, সেখানেও মানুষ আছে, তাহাদের আকৃতি সমস্তই আমাদের মত, কিন্তু মুখটি ঠিক ঘোড়ার মত, তাহারা অতি সুন্দর গান করে। স্বর বড়ই মধুর। অন্তরে তাদের বড়ই দয়া,—ব্যবহারে বুঝিলাম।

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"ঐ দেশকে কিম্পুরুষবর্ষ বলে। হয়মুখনর, অশ্বমুখনর ঐ দেশে বাস করেন, পুরাণাদিতে এরূপ বর্ণনা আছে। তাঁহারা অসভ্য নন, খুব ভদ্র।"

রমণার বু'ড় শিবের কৃপা। ঠাকুরের পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতির কথা।

৬ই ফাল্গুন, বুধবার।

ঢাকা সহরের উত্তর দিকে পুরাণ রমণার অধিকাংশ স্থানই ভয়ঙ্কর বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ঐ জঙ্গলে একাকী দিনের বেলায়ও কোনও ব্যক্তি প্রবেশ করিতে সাহস পায় না। বহুকালের পুরাণ বাড়ীর ভগ্নাবশেষ উহার ভিতরে স্থানে স্থানে দেখা যায়। ঠাকুরের সঙ্গে আমরা ঐ জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া একটি মন্দিরে পঁহুছিলাম। মন্দিরে দুই তিন জন নানক-সাহী সন্ন্যাসী আছেন। শুনিলাম, প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে গুরু নানক যখন ঢাকা আসিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই তাঁর এই পদচিহ্ন রহিয়াছে। সাধুরা ঐ নির্জ্জন অরণ্যে থাকিয়া এই পদচিহ্নের সেবা পূজা করিতেছেন। আমাদিগকে তাঁহারা খুব আদর যত্ন করিয়া বসাইলেন এবং কড়া প্রসাদ দিলেন।

ঠাকুর ওখান হইতে বাহির হইয়া রাস্তার কিঞ্চিৎ ব্যবধানে বনের ভিতরে বুড় শিবের মন্দিরে আমাদিগকে লইয়া উপস্থিত হইলেন; এবং বুড় শিবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, মন্দিরের সম্মুখে বহুকালের প্রাচীন বটগাছের তলায়, ঠাকুর বসিয়াই সমাধিস্থ হইয়া

পড়িলেন। গুরুভ্রাতারাও সকলেই স্থির হইয়া বসিয়া ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অকস্মাৎ দু'তিন সেকেণ্ডের ভিতরে একটি অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়া গেল। ভগবান মহেশ্বরের অপরিসীম কৃপার বিস্ময়জনক নিদর্শন পরিষ্কার প্রত্যক্ষ করিয়া, অনেকে একেবারে মুগ্ধ হইয়া রহিলেন। কেহ কেহ 'একি হইল' বলিয়া, ঊর্দ্ধদিকে চঞ্চলদৃষ্টিতে তাকাইতে লাগিলেন। আমরা ঘটনাটি স্মরণ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে, বেলা অবসানে গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—যে স্থানে কোন কালে যাই নাই, কখনও দেখি নাই, সেরূপ কোন কোন স্থানে যেয়েও মনে হয় যেন পূর্ব্বে কখনও সেই স্থান দেখেছি। এরূপ হয় কেন?

উত্তর ঃ—"পূর্ব্বজন্মে যে সকল স্থানের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ থাকে, সেখানে উপস্থিত হ'লে কারো কারো, উহা পরিচিত ব'লে মনে হয়।"

এই বলিয়া ঠাকুর তাঁহার পূর্ব্ব-জন্ম-স্মৃতির বিষয় বলিতে লাগিলেন।—

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"গয়াতে যখন আমি ছিলাম, একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে ফল্গুর অপর পারে রামগয়ায় উপস্থিত হ'লাম। সেখানে একটি মন্দিরে নৃসিংহদেব দর্শন ক'রে, তখনই আমার মনে প'ড়ল, যেন পূর্ব্বে কখনও আমি এই মূর্ত্তি দেখেছি। তার পরেই আমার ক্রমে ক্রমে সমস্ত কথা স্মরণ হ'তে লাগ্‌ল। ঐ স্থানে ফল্গুর পারে পুরাণ বান্ধান ঘাটের উপরে একটি অশ্বত্থ গাছ আছে, সেই গাছের পশ্চিমদিকের একখানা ডালাতে ছুরি দিয়ে "ওঁ রামঃ" এই নামটি বড় ক'রে কেটে লিখে রেখেছিলাম। তাও আমার মনে হ'ল। অমনি আমি উঠে সে গাছটির কাছে উপস্থিত হ'লাম, দেখ্‌লাম আমার সেই লেখা ঐ ডালাতে র'য়েছে। তবে ডালার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরগুলি অনেকটা তফাৎ তফাৎ হ'য়ে প'ড়েছে। তারপরে রামগয়ায় যে স্থানে থেকে সাধন ভজন ক'রেছিলাম এবং সে সময়ে আমার সঙ্গে যে দুটি পরমহংস ছিলেন, সে সমস্তই আমার মনে হ'ল। ক্রমে অনেক কথাই মনে পড়'ল। আমি পাহাড়ের সর্ব্বত্র ঘুরে ঘুরে সেই সমস্ত স্থান ও চিহ্ন দেখে অবাক্ হ'লাম। পূর্ব্ব জন্মের সমস্ত স্মৃতিই আমার সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে জেগে উঠ্‌ল।

বহুতীর্থ দর্শন ও বহুস্থান পর্য্যটন করতে করতে কেহ পূর্ব্ব জন্মের সাধন

ভজনের বা বিশেষ সম্বন্ধের একটা স্থানে উপস্থিত হ'লে, অকস্মাৎ তার পূর্ব্বভাব বা স্মৃতি মুহূর্ত্ত মধ্যে উদয় হ'তে পারে। বহু সাধন ভজনেও এটি সহজে হয় না। কোন্ স্থানের সহিত, কোন্ তীর্থের সহিত, কোন্ বিগ্রহের সহিত, কার জীবনের কি সম্বন্ধ আছে বলা যায় না। সমস্ত যোগাযোগ হ'লে কারো কারো ভাগ্যে তাহা প্রকাশ হয়। সকলেরই যে হবে এমনও নয়।"

প্রশ্ন ঃ—নোংরা অপরিষ্কার একটা স্থানেতে উপস্থিত হ'লেও অনেক সময়ে দেখা যায়, মন সেখানে প্রফুল্ল হ'য়ে ওঠে, চিত্ত যেন আপনা আপনি জমাট্ হ'য়ে পড়ে। আবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর বাগান বাড়ীতে গিয়াও, যেন মন বিরক্তিপূর্ণ হ'য়ে যায়। চিত্ত চঞ্চল হ'য়ে পড়ে। এর কারণ কি ?

উত্তর ঃ—"বিশেষ বিশেষ ভাবে যে যে স্থানে যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হ'য়ে থাকে, সে সকলের একটা ভাব ঐ সকল স্থানে জমাট হ'য়ে থাকে। ওখানে উপস্থিত হ'লেই, সেই সকল ভাবে চিত্তকে স্পর্শ করে। চিত্ত যত নির্ম্মল হয়, ততই এ সকল অনুভবে আসে, নচেৎ হয় না। ভজন সাধন, তপস্যা, দেব দেবীর অধিষ্ঠান, মহাপুরুষদের বাস, বা পরলোকগত পুণ্যাত্মাদের অবস্থান যে সকল স্থানে হয়, সহস্র বৎসর পরেও সেখানে উপস্থিত হ'লে, সেই সকল ভাবে চিত্তকে অভিভূত করে। সে প্রকার আবার যে সব স্থানে বিষম অত্যাচার, অনাচার, দুষ্কার্য্যাদির অনুষ্ঠান হয়, বহুকাল পরে সেখানে গেলেও, সে সকল ভাব চিত্তকে স্পর্শ করে। চিত্ত নির্ম্মল হ'লেই স্থানের প্রভাব বুঝ্তে পারা যায়।"

আদেশ-পালনে অসমর্থতা, ঠাকুরের সহানুভূতি ও উপদেশ।

৮ই ফাল্গুন, শুক্রবার।

স্বভাবে যে সকল দোষ বহুকাল যাবৎ রহিয়াছে এবং যাহা নিতান্ত তুচ্ছ মনে করিয়া, এতকাল একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া বসিয়াছিলাম ; ভাবিয়াছিলাম—'এসব দোষ ছাড়াইতে আর চেষ্টা করিতে হইবে কেন, ইচ্ছামাত্রইতো ত্যাগ করা যায়, এখন তাহা ত্যাগের চেষ্টা করিতে গিয়া দেখিতেছি, একটিও ছাড়াইতে পারিতেছি না। মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখি,—এ সকল দোষের শিকড় স্বভাবের এত নিভৃত স্তরে যাইয়া ঢুকিয়াছে যে, তাহার অন্ত পাওয়া যায় না ; স্বভাবের সেই বিন্দুমাত্র দোষকেই এখন যেন অপার সিন্ধু মনে হইতেছে। নিজের দুর্ব্বলতা বুঝিয়া হতাশ

হইয়া ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম ঃ—সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া স্বভাবের একটি দোষওতো ছাড়াইতে পারিলাম না। এখন কি করিব ?

ঠাকুর খুব স্নেহভাবে সহানুভূতি করিয়া বলিলেন ঃ—"স্বভাবের দোষ কি কেহ ইচ্ছামাত্রেই ত্যাগ করতে পারে ? নিষেধবর্জ্জন, আর বিধির অনুষ্ঠান,—ইহার মধ্যে নিষেধবর্জ্জন অপেক্ষা, বিধির অনুষ্ঠানই সহজ। বিধির অনুষ্ঠান করতে করতে নিষিদ্ধ বিষয়গুলো, আপনা আপনি ধীরে ধীরে ত্যাগ হ'য়ে আসে। নিয়মগুলো প্রতিপালন ক'রে চলতে চেষ্টা কর, দোষ সমস্ত আপনি যাবে।"

আমি বলিলাম ঃ—যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলিতে বলিয়াছেন, তাহাতো ঠিক মত পারিতেছি না।

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"চেষ্টা ক'রে যাও। পার—না পার, সেদিকে লক্ষ্য রেখো না। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহা কি সহজেই লোকে করতে পারে ? এজন্য বারো বৎসর সময় দিয়েছেন। বারো বৎসরের চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে সব ঠিক হ'য়ে আসে। দু-চার বারের চেষ্টায় ফল না পেলে, হাত পা ছেড়ে দিতে নাই ; যতদিনে ঠিক না হয়, ততদিনই চেষ্টা রাখতে হয়।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—যে সকল নিয়ম প্রতিপালন ও নিষেধ-বর্জ্জন করিতে বলিয়া দিয়াছেন, তাহা না পারিলে কি আপনি অপরাধ গ্রহণ করেন ?

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"কিছু না। আমি তো কতই বল্‌বো, সবই কি আর একবারে ঠিক মত করতে পারবে ? তা হ'লে তো সিদ্ধই হ'লে। যতটা পার ক'রে যাও। চেষ্টা ক'রেও যদি না পার, কোন অপরাধই হবে না। ইচ্ছা ক'রে একটা অনিয়ম না করলেই হ'লো। হঠাৎ যা হ'য়ে পড়ে, তা নিজে করলে, মনে কর কেন ? নিজে করলাম ভাবলেই তো অপরাধ। সমস্তই ভগবানের উপর ছেড়ে দিতে হয়। তিনিই সব করছেন, তিনিই সমস্ত করায়ে নিচ্ছেন,—এটি বুঝলেই শান্তি।"

আমি বলিলাম ঃ—একটা দূষণীয় কার্য্য না করিবার জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াও যখন পরাস্ত হইয়া করিয়া ফেলি, তখনও তো অনুতাপ হয়, মনে হয়, 'বুঝি আরও চেষ্টা করিলে উহা না করিয়া পারিতাম।'

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"যথার্থ পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, আমরা কিছুইতো বুঝিনা।

ছোট বেলা হ'তে দেখে শুনে একটা ভাল মন্দের সংস্কার মাত্র দাঁড়ায়ে গেছে। বাস্তবিক তত্ত্ব বুঝা বড়ই কঠিন। লোকের লজ্জায়, লোকের ভয়ে, আমরা কতকগুলি কার্য্য করি না। মনে করি—পাপ। যথার্থই উহা পাপ কিনা, ঠিক বলা যায় না। পাপ পুণ্য সকলেরই একটা একটা স্বরূপ আছে, সেটি দর্শন হ'লেই পাপ কি, পুণ্য কি, লোকে ঠিক বুঝ্তে পারে। কোনও কার্য্যে পাপ বোধ হ'লে তাকি সে আবার কর্তে পারে? এখন যাহা পাপ পুণ্য মনে কর্ছ, সমস্তই একটা সংস্কার মাত্র।"

বারদি নিবাসী জমিদার, ঢাকা জগন্নাথ কলেজের বর্ত্তমান খ্যাতনামা প্রিন্সিপল, আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় নানা কথাপ্রসঙ্গে একদিন ঠাকুরকে বলিলেন:—"আমরা প্রত্যহ রাশি রাশি অপরাধ করিয়া থাকি, তাহার সঙ্গে আরও একটি গুরুতর অপরাধের যোগ করিয়া, আপনি আমাদিগকে আরও বিপন্ন করিলেন।"

ঠাকুর বলিলেন:—"কেন?"

উঃ—"আপনি যে সকল বিধি নিষেধ বিধান করিয়াছেন, তাহা পালন করা সুদুষ্কর। আমাদের অপর অপরাধের উপর গুরুনিদেশ লঙ্ঘন নামে আরও গুরুতর অপরাধের যোগ করিয়াছেন।"

ঠাকুর খুব স্নেহের সহিত কুঞ্জবাবুকে বলিলেন:—"তুমি এসম্বন্ধে কি ভেবেছ?"

কুঞ্জবাবু বলিলেন:—"আমি মনে মনে একটা সমন্বয় করিয়া লইয়াছি, তাহা ঠিক কিনা অপনি জানেন।"

ঠাকুর বলিলেন:—"কি সমন্বয় ক'রেছ?"

উঃ—"আপনার বিধি নিষেধ আপাততঃ সহজ বোধ হইলেও তাহা অতি কঠিন। একটি দিনও যদি তাহা পালন করিয়া উঠিতে পারি তবেত জীবন্মুক্ত হইয়া যাই। আপনি এরূপ আশা ও ইচ্ছা করেন না যে, একদিনে আমরা তাহা পালন করিতে সমর্থ হইব। কতগুলি উচ্চলক্ষ্য আমাদের সমক্ষে ধরিয়া দিয়াছেন। তাহার দিকে চাহিয়া সাবধান ও সচেষ্ট ভাবে চলিলে ক্রমে আমরা সেই লক্ষ্য সাধনে সমর্থ হইয়া ধন্য হইব, ইহাই আপনার অভিপ্রায়। তাহা না হইলে আপনার দ্বারা আমাদের কল্যাণের পরিবর্ত্তে সর্ব্বনাশের পথ প্রস্তত হইয়াছে মনে করিতে হইবে।"

ঠাকুর বলিলেন:—"ঠিক, ঠিক, তুমি ঠিকই বল্ছ।"

সাধুর প্রতি অনাদরে ও উৎপীড়নে বিপত্তি।

১০ই ফাল্গুন, রবিবার। আজ অপরাহ্নে সহর হইতে অনেক লোক আসিয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মবিষয়ে নানাপ্রকার আলাপ আলোচনা হইতে লাগিল।

একটি ভদ্রলোক ঠাকুরকে বলিলেন ঃ—ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী আছেন শুনিতে পাই; তাঁহারা বঙ্গদেশে আসেন না কেন?

ঠাকুর বলিলেন ঃ **"এসম্বন্ধে আমি কোন কোন জমাতের মহান্তদের জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম, তাঁরা বল্লেন, 'বাঙ্গলা দেশে তাঁদের আদর যত্ন নাই, থাক্‌বারও স্থান নাই। এদিকে এলে আহার ও বাসের অসুবিধাতেই তাঁদের ভেগে পড়্‌তে হয়। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই সাধুদের থাক্‌বার বড় বড় ধর্ম্মশালা, সত্রাদি আছে; যতকাল ইচ্ছা সাধুরা তাতে আরামে থাক্‌তে পারেন। স্থানীয় জমিদার, রাজা মহারাজা, প্রভৃতি ধনী লোকেরা তাঁদের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বস্তু দিয়ে সেবা করেন। বাঙ্গলাদেশে সেপ্রকার স্থানও নাই, আর তাঁদের সেবা করে এমন লোকও নাই। বরং গুণ্ডা, চোর, বদমাইস, মনে ক'রে বাঙ্গালীরা তাঁদের অবজ্ঞাই করে।"**

একজনে বলিলেন ঃ—পশ্চিমাঞ্চলের ছোটলোকেরা খাবার না পাইলে, গায়ে ভস্মমেখে, লেংটী প'রে, সাধু হয়। অনেক গুণ্ডা বদ্‌মাইসেরাও সাধুর বেশে ঘুরে। সুবিধা পাইলে তারা সর্ব্বত্রইতো চুরি ডাকাতি করে। ভাল সাধুরা একটু পরিচয় দিলেইতো পারেন।

উত্তর ঃ—**"পরিচয় নিতে জান্‌লে তাঁরাও পরিচয় দেন। অনেকে সাধুদের পরখ্ কর্‌তে গিয়ে বিপন্নও হ'য়ে পড়েন।"**

এই বলিয়া ঠাকুর কিছুদিন পূর্ব্বের একটী ঘটনার উল্লেখ করিলেন। যথা ঃ— 'কিছুকাল পূর্ব্বে গঙ্গাসাগরের পথে একদল সাধু রামপুরহাটে কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। রাস্তার ধারে অনাবৃতমাঠে তাঁহারা ধুনি জ্বালিয়া দিনরাত থাকিতেন, স্থানীয় ভদ্রলোকেরা অপরাহ্নে তাঁহাদের দর্শন করিতে আসিতেন, একটি বাঙ্গালীবাবু—উকিল, প্রত্যহই আসিয়া সাধুদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি সাধুদের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন, স্থূলশরীর দেখিলে তিনি কোনও সাধুর পেটে লাঠি দিয়া

খোঁচা মারিয়া বলিতেন, 'আরে তোম্‌তো হালুয়া মালপোয়াকা সিধ্‌ হো, ক্যাতনা খ্যাতা হ্যায় ?' কোন সাধুর জটাটি ঝাঁকরাইয়া বলিতেন, 'চোরাইমাল ক্যাতনা ইস্‌মে রাখা হ্যায় ? রাত্‌মে চুরি কর্‌তা হ্যায় আউর দিন মে সাধু বন্‌কে বৈঠা হ্যায়।' সাধুরা ঐ বাঙ্গালী বাবুকে দেখিলেই ভয়ে জড়সড় হইতেন। জমাতের ভিতরে একটি সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন, তিনি মহান্তকে বলিলেন, 'মহারাজ, বাঙ্গালী বাবু নিত্‌ আয়কে বড়া অপরাধ কর্‌কে যাতা হ্যায়, উস্‌কো জেরা কৃপা কিজিয়ে।' মহান্ত বলিলেন, 'বাঙ্গালী-লোক সাধুকো নেহি মান্‌তা হ্যায়।' একদিন ঐ বাবু আসিয়া মহান্তকে বলিলেন 'এই সাধু! তোম্‌ গাঁজামেতো খুব দম্‌ মারতা হ্যায়, ইস্‌মেতো খুব কেরামৎ। আউর কুচ্ছ কেরামৎ দেখলানে সেক্‌তা হ্যায় ?' এই সময়ে সেই সিদ্ধপুরুষটি, উকিল বাবুকে ডাকিয়া খুব তেজের সহিত বলিলেন, 'আরে বাঙ্গালি বাবু ? ক্যা ব'ল্‌তা হ্যায় ? সাধুকা আউর কুচ্ছ কেরামৎ দেখোগে ? ভালা ! লেড়্‌কা বালা লেকে ঘর কর্‌তা হ্যায়তো, আচ্ছা চলা যাও ঘর, আব্‌ যায়কে সাধুকা কেরামৎ দেখো।' সাধুর কথা শুনিয়া উকিল বাবু চমকিয়া গেলেন, মুখ তাঁর শুকাইয়া গেল ; তিনি দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে চলিলেন, রাস্তায় দেখিলেন, তাঁর চাকরটি ছুটিয়া আসিতেছে, বাবুকে দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল, 'বাবু, আপনার ছেলেকে সাপে কাটিয়াছে।' বাবু বাড়ী যাইয়া ছেলের মূর্চ্ছা অবস্থা দেখিয়া একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন, তখনই ওঝা, বৈদ্য, ডাক্তারাদি আনাইয়া যত প্রকার চেষ্টা করিবার করিলেন, কিন্তু সমস্তই নিষ্ফল হইল। তখন সাধুরই ইচ্ছাতেই এই প্রকার ঘটিয়াছে বুঝিয়া সস্ত্রীক তিনি ঐ সাধুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অনেক কান্নাকাটি করিয়া সাধুর পায়ে জড়াইয়া ধরিলেন। সাধু বলিলেন,— 'আব্‌ কাহে আয়া, সাধুকা কেরামৎ দেখো না ? আউর তিন রোজ বাদ আয় যাও।' সাধুর কথায় আশ্বাস পাইয়া উকিলবাবু ছেলেটিকে একটি ঘরে রাখিয়া দিলেন, তাহার শরীর ফুলিয়া গেল, তিন দিন পরে তিনি সাধুর পায়ে পড়িয়া ঔষধ চাহিলে, সাধু ধুনি হইতে কিছু ভস্ম লইয়া বাবুটির হাতে দিয়া বলিলেন, 'আপ্‌না হাত্‌সে শওঘয়লা পানি লেকে লেড়্‌কা কা শিরপর ঢাল দেও, আউর এহি ভসম্‌, আচ্ছা কর্‌কে উস্‌কা শরীরমে মল্‌ দেও, আধা ঘণ্টা বাদ্‌ লেড়কা আচ্ছা হো যায়েগা।' সাধু এই বলিয়া তখনই জমাত ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। বাবুটি ঐ প্রকার করাতে ছেলেটি সুস্থ হইয়া উঠিল। সকলে অবাক্‌। বাবুটি পরে সাধুকে ঢের খুঁজিলেন, কিন্তু আর পাইলেন না।'

স্বপ্ন—কর্ম্মের উপদেশ।

১২ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার।

ঠাকুর আমাকে কিছুকাল যাবৎ আশ্রমস্থ সকলের সেবা ও বাহিরের কাজ কর্ম্ম করিতে বলিতেছেন। সকাল বেলা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার নিয়মিত কার্য্য করিয়া প্রায় অবসর পাই না, সময়ে সময়ে নাম করিতে বিরক্তি বোধ হইলেও, বাহিরের কোন কাজ কর্ম্মে বা কাহারও সেবা করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমি ঐ সময়ে কোনও একটি প্রশ্ন তুলিয়া ঠাকুরেরই সঙ্গে গল্প করি। গত রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম,—'একটি মহাত্মা আমাকে আসিয়া বলিলেন, 'গুরু যেমন ব'লেছেন ঠিক সেই মত ক'রে যাও, ওতে কখনও নিরুৎসাহ হ'য়ো না, কর্ম্মটি ত্যাগ কর্‌তে নাই। যতকাল না বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ লাভ হয়, ততকালই কর্ম্ম কর্‌তে হবে, রজস্তমোগুণ যত কাল আছে, কর্ম্ম না ক'রে নিস্তার নাই. আলস্য ক'রে কর্ম্ম না কর্‌লে, পরে ভুগতে হবে। বৈধ কর্ম্ম দ্বারাই রজস্তমোগুণ নষ্ট হ'য়ে যায়।' স্বপ্নের কথা ঠাকুরকে বলাতে, ঠাকুর বলিলেন ঃ—"**সময় দীর্ঘ বোধ হ'লে, বা নাম কর্‌তে বিরক্তি জন্মালে, ব'সে থাক্‌তে নাই, বাইরের কাজই কর্‌তে হয়। ঐ সময়ে জোর ক'রে নাম কর্‌তে গেলে. নামে আরও শুষ্কতা আসে। তাতে অনিষ্ট হয়।**"

আমি বলিলাম ঃ—আমার মনে হয়, বাইরের কাজকর্ম্ম করা অপেক্ষা ঐ সময়ে জোর ক'রে নাম বা পাঠ করাতেই বেশী উপকার হয়।

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"**সে কিছু নয়। বাইরের কাজকর্ম্ম করা আর নাম করা আমি কিন্তু সমানই মনে করি। সমস্তইত কর্ম্ম। লক্ষ্যটি স্থির থাক্‌লেই হ'ল। কর্ম্ম করা নিয়ে কথা, কার কোন্ কর্ম্মে কি বস্তু লাভ হয়, তা কে বল্‌তে পারে? লক্ষ্যটি স্থির রেখে, কাঁথা সেলাই-ই কর, আর নামই কর, একই কথা। জীবনের গতি কোন্ দিকে, তাহা একটা ঠিক না হওয়া পর্য্যন্ত এরূপই কর্‌তে হয়। তোমার এখনও একটা জীবনের দিক্ ঠিক হয় নাই। যখন তাহা ঠিক হ'য়ে যাবে, তখন একধারা কর্ম্ম কর্‌বে। জীবনের গতি ঠিক হ'তে এখনও বহু বিলম্ব। এজীবন কোন্ দিকে, কোন পথ দিয়ে যাবে, বলা যায় না। সকলেরই এক পথ নয় তো। নানাপথে চ'লে মানুষ**

লক্ষ্যবস্তু লাভ করে। ব'সে থাক্‌তে নাই, তা হ'লেই ক্রমে একটায় গিয়ে দাঁড়াবে।"

স্বপ্ন—প্রলয়ের দৃশ্য।

১৫ই ফাল্গুন, শুক্রবার।

গত রাত্রে একটি ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছি। দেখিলাম 'বেলা অবসান-প্রায়, আমি রান্না করিতে বসিয়াছি, অকস্মাৎ ঘরখানা কাঁপিয়া উঠিল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মুহুর্মুহুঃ ভূমিকম্প হইতে লাগিল। বসিয়াও আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। চারিদিকে ভীষণ শব্দ শুনিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। দেখিলাম বিষম ব্যাপার!—

অনন্ত আকাশব্যাপী ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিবায়ু গ্রহ উপগ্রহ সমেত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটিকে চক্রাকারে ঘুরাইতে ঘুরাইতে কোথায় যেন লইয়া যাইতেছে। ধূলিরাশিতে সমস্ত নভোমণ্ডল একেবারে ধূমাকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। অসংখ্য কাক, চিল, বাজ প্রভৃতি পক্ষী সকল ঘূর্ণিবায়ুতে পড়িয়া, আবর্ত্তজলের তৃণের মত, ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর দিকে আসিয়া পড়িতেছে। চটাচট্‌ শব্দে চতুর্দ্দিকে রাশীকৃত শিলাবর্ষণ হইতেছে। মহা দুর্লক্ষণ দেখিয়া, আমি হঠাৎ পশ্চিম আকাশের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম—ঝলমল্‌ করিয়া ঐ দিকে একটি সূর্য্য উঠিল। বিস্মিত হইয়া অমনি আমি আকাশের চারিদিকে তাকাইতে লাগিলাম। দেখি সকলদিকেই একটি একটি করিয়া সূর্য্য উদয় হইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে দশ বারোটি ভয়ঙ্কর প্রখরতেজোবিশিষ্ট সূর্য্যের, এককালে প্রকাশ ও তাহাদের ঘন ঘন কম্পন দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম। সে সময়ে ঐ সকলের সহিত পৃথিবীটি ভয়ঙ্কর সোঁ সোঁ শব্দে নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া নিম্নদিকে কোথায় যেন যাইতে লাগিল। আমি অমনি আসনে বসিয়া গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম ধ্যানে রাখিয়া 'জয়গুরু, জয়গুরু', বলিতে বলিতে মগ্ন হইয়া পড়িলাম। একটু পরেই দেখি সকল দিক্‌ শান্ত হইয়া গিয়াছে, সমস্ত নিস্তব্ধ।' অমনি জাগিয়া পড়িলাম।

ঠাকুর স্বপ্নটি শুনিয়া বলিলেন ঃ—"ভবিষ্যৎ প্রলয়ের দৃশ্যটিই দেখেছ। প্রলয় অনেক প্রকার আছে। যা দেখেছ তা এই সৌর জগতের প্রলয়, ওরূপ একটা সময় শীঘ্রই আস্‌ছে বটে।"

স্বপ্ন,—ঠাকুরের দেহত্যাগের উদ্যোগ।

১৯শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার।

তিন চার দিন হয় স্বপ্নে ভয়ানক প্রলয়ের দৃশ্য দেখিয়াছি, গতকল্য আবার তাহা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়া মন অতিশয় খারাপ হইয়া গিয়াছে। দেখিলাম—'আমরা বহুলোক ঠাকুরের সঙ্গে একটা স্থানে রহিয়াছি। ঠাকুর উত্তর দিকে আসন করিয়া বসিয়া বলিলেন, 'আমার কায শেষ হ'য়ে গেছে। এখন আমি দেহ ত্যাগ কর্‌বো।' পরে আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'শ্রীবৃন্দাবনে আমার কাঁথাখানা ফেলে এসেছিলাম, তাহা কেহ নিয়ে আস্‌তে পার?' আমি অমনি শ্রীবৃন্দাবনে চলিলাম, অল্পক্ষণের মধ্যেই কাঁথাখানা আনিয়া দিলাম। ঐ সময়ে গুরুভ্রাতাভগ্নীরা ঠাকুরকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। আমি ঠাকুরের বামপার্শ্বে একহাত অন্তরে রহিলাম। ঠাকুর সকলেরই প্রতি সস্নেহদৃষ্টি করিয়া এক এক জনকে, এক একটা কিছু দিতে লাগিলেন। আমি সর্ব্বাপেক্ষা ঠাকুরের নিকটে থাকিলেও ঠাকুর আমাকে কিছুই দিলেন না। পরে দেহত্যাগের সময়ে সমাধিস্থ হইয়া পড়িতে পড়িতে হঠাৎ আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন 'কি তোমাকে কিছু দিই নাই?' এই বলিয়া নিজ মস্তকের সম্মুখ হইতে একটি জিনিষ মুটে ধরিয়া তুলিয়া লইয়া, আমার হাতে দিয়া বলিলেন 'আচ্ছা তুমি এটি নেও।' ওটি পাওয়া মাত্রে আমি মাথায় রাখিলাম। ভাবাবেশে উন্মত্তবৎ হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলাম। আর কান্দিতে কান্দিতে গাইতে লাগিলাম—'আমার জানি কি হ'লো গো, গৌরাঙ্গ বলিতে নয়ন ঝরে।' আমি ক্ষণকাল পরে ঐ জিনিষটি মাটিতে ফেলিয়া আসন করিয়া উহার উপরে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম।' আর অমনি জাগিয়া পড়িলাম।

ঠাকুরকে স্বপ্নবৃত্তান্তটি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আমি তো কখনও এসব কল্পনাও করি না। তবে এরূপ দেখিলাম কেন?

ঠাকুর বলিলেন ঃ—**"কেন দেখ্‌লে বলা যায় না। এসব স্বপ্ন লিখে রাখ্‌তে হয়, সমস্ত স্বপ্নই অলীক নয়। একটি স্বপ্ন বিশ বৎসর পরে সত্য হ'য়েছে দেখেছি।"**

আমি বলিলাম—যে বস্তু মাথায় একবার স্পর্শ পে'লে কৃতার্থ হওয়া যায়, তা মাটিতে ফেলে, পে'তে নিয়ে আসন ক'রে বস্‌তে আমার প্রবৃত্তি হ'লো কেন?

ঠাকুর বলিলেন ঃ—**"ওটি হ'চ্চে শক্তি। ভগবানের নাম কর্‌তে হ'লে শক্তির উপরেইতো বস্‌তে হয়।"**

ইহার পর ঠাকুর একটু সময় চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন :—"তোমাদের কয় ভাই-এর ভিতরেই বৈষ্ণব বীজ র'য়েছে। এখন যে যে-ভাবেই থাক, পরে সকলে-রই বৈষ্ণব ভাব দাঁড়াবে।"

ঠাকুর দেহ ছাড়িবেন ভাবিয়া কোথায় দুঃখে অধীর হইব, —তাহা না হইয়া,—ঠাকুর এ জিনিষ আমাকে দিবেন মনে করিয়া গর্ব্ব হইতে লাগিল। হায় দশা! এই তো আমার অবস্থা!

কৃপণতায় অনুশাসন। ঘরখানা উইল কর্‌বে কা'র নামে?

২১ শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার।

আশ্রমের দক্ষিণের ঘরে সকালে সন্ধ্যায় অনেক গুরুভ্রাতারা আসিয়া উপস্থিত হ'ন। এই ঘর খানাই সকলের বসিবার ঘর। সুতরাং আসনে স্থির হইয়া এঘরে বসিবার যো নাই। ঠাকুরকে যাইয়া আজ বলিলাম, 'দক্ষিণের ঘরে সর্ব্বদাই লোকের গোলমাল। ওখানে সাধন করার বড়ই অসুবিধা। সকলেই এসে বাজে গল্প করে, অথচ তাহা বল্‌লে ঝগড়া হয়।'

ঠাকুর বলিলেন :—"ওখানে অসুবিধা হ'লে, অন্যত্রও তো যে'তে পার? গাছ-তলায় এদিকে সেদিকে, আশ্রমে স্থানেরতো আর অভাব নাই। নাম করা নিয়ে কথা, তাতো যেখানে সেখানেই হ'তে পারে। দশটি লোক যেখানে মিলে মিশে একটা আনন্দ করে, সেখানে তাদের বাধা দিয়ে নিজের সুবিধার চেষ্টা কর্‌তে নাই।"

আমি বলিলাম :—আশ্রমের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে, পুকুরের ধারে, আপনি যদি বলেন একখানা ছোটঘর করিয়া নিতে পারি তাহ'লে আর কোন অসুবিধা থাকে না।

ঠাকুর বলিলেন :—"তারপর? কোথাও চ'লে গেলে ঐ ঘরখানা উইল ক'রে যাবে কা'র নামে?"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, মনে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম, 'ঠাকুর একথা আমাকে বলিলেন কেন?'

রাত্রিতে ঠাকুর আমা সম্বন্ধে মহেন্দ্র বাবুকে বলিলেন :—"ওর সাধন ভজনেতে যা একটু হ'চ্ছে, এক কৃপণতা দোষে তা মাটি ক'রে দিচ্ছে। হাতে ওর এক-শত টাকা আছে, অনেক চেষ্টায় জমায়েছে। তা কোন প্রকারে খরচ করায়ে

দিতে পারেন ? কৃপণতাই সঙ্কীর্ণতা কিনা ! ধর্ম্মার্থীদের স্বভাবে একটি মাত্র দোষ থাক্‌লেও, তাতে ক'রে সাধন ভজনের সমস্ত ফল নষ্ট হ'য়ে যায়। এখন হ'তে এবিষয়ে সাবধান না হ'লে, ক্রমে ঘটনায় প'ড়ে, ধাক্কা খে'য়ে খে'য়ে, ঠিক হবে।"

ঠাকুর এ সময় ছোট দাদার উদারতার খুব প্রশংসা করিলেন। 'ঘর খানা উইল ক'রে যাবে কার নামে ?' ঠাকুরের এই কথার তাৎপর্য্য এ সময় আমি বুঝিলাম। ঠাকুরের মুখে ঐ সকল কথা শুনিয়া মাথা আমার বিষম গরম হইয়া গেল। ভাবিলাম প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবে যতকাল উদ্বেগ, অশান্তি ও ক্লেশ বোধ আছে,—ততকাল বিনা আয়াসে অর্থ সঞ্চয় করিয়া ঐ ক্লেশের ও অশান্তির উপশমের ব্যবস্থা রাখা দোষ হইল ! নিয়ত অভাব ভোগ করিয়া মন যদি অশান্তিপূর্ণই রহিল, তাহ'লেই বা সাধন ভজন করিব কিরূপে ? অর্থ সঞ্চয় তো সাধন ভজনেরই সুবিধার জন্য, বিলাসিতার জন্য তো নয় ! ঠাকুর এত বুঝেন, আমার এই শুভ অভিপ্রায়টি বুঝিলেন না !

আমার সঙ্কীর্ণতা। ঠাকুরের উপদেশ ও ভক্ষার ব্যবস্থা।

২২ শে ফাল্গুন, শুক্রবার।

গত কল্য ঠাকুরের মুখে আমার সঙ্কীর্ণতার বিষয় শুনিয়া অবধি, ভয়ানক যাতনা ভোগ করিতেছি। প্রাণ যেন হু হু করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছে। অভাব বশতঃই আমার এই কৃপণতা, অথবা স্বভাবেই আমার সঙ্কীর্ণতা, তাহা পরিষ্কার বুঝিতেছি না। ঠাকুর বলিয়াছেন যে 'ক্রমে ধাক্কা খেয়ে, এদোষ আমার দুর হবে।' কিন্তু ধাক্কাওতো কম খাইতেছি না ! দোষ দুর হইতেছে কই ? কয়দিন হয় সরকারি ভাণ্ডারে 'ঘৃত বাড়ন্ত হইয়াছে' দিদিমা বলাতে, ঠাকুরের সেবায় আধ-ছটাক পরিমাণ ঘৃত প্রত্যহ আমি দিয়া আসিতেছিলাম। পাঁচ ছয়দিন ঐ প্রকার দেওয়ার পর একদিন আমার মনে হইল, 'ভাল ! সরকারি ভাণ্ডারেতো ঘৃত আসিতেছে না, দিদিমাও বেশ সুবিধা বুঝিয়াছেন। ওরা যত কাল ঘৃত না আনিবে, ততকালইতো এই প্রকার ঠাকুর-সেবায় আমাকে ঘৃত দিতে হইবে ! এত কষ্টে আমি ঘৃত সংগ্রহ করি ; এ ভাবে প্রতিদিন দিলে আমার একমাসের হোমের ঘৃততো দশ দিনেই শেষ হইয়া যাইবে।'

এই প্রকার বিচার ও আক্ষেপ আমার মনে আসার পরে, সেই দিনেই ঠাকুর দিদিমাকে ডাকিয়া বলিয়া দিয়াছেন—**"আহারের সময়ে ওর ঘি আমাকে দিবেন না। ঐ ঘি আমার হজম হবে না।"** ঠাকুরের কথা শুনিয়া সকলে মনে করিলেন, হোমের ঘৃত বহু

দিনের সংগ্রহ,—নষ্ট হইয়া গিয়াছে; তাই ঠাকুর ঐ কথা বলিলেন। আমি কিন্তু ঠাকুরের বলার তাৎপর্য্য তখনই বুঝিয়া কয়দিন যাবৎ জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছি। আমার অভিপ্রায়-মত-ইতো ঠাকুর ব্যবস্থা করিয়াছেন, তবে তাতেও এত জ্বালা কেন! ভিতরের ক্লেশ অসহ্য বোধ হওয়াতে ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম, 'আমার সঙ্কীর্ণতা কিসে যাবে বলিয়া দিন। হাতের টাকাগুলি আমি দান ক'রে ফেল্‌বো।'

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন:—"টাকা যা রয়েছে এখনই ব্যয় ক'রে দরকার নাই। এখন থাক্। সাময়িক একটা ভাবে বা উৎসাহে কোন কাযই কর্‌তে নাই। অনেক সময়ে উৎসাহে দান ক'রে, পরে অনুতাপে লোক নরক ভোগ করে। সমস্ত কাযই স্বাভাবিক অবস্থায় ধীর ভাবে কর্‌তে হয়। এখন থেকে আর কিছু সঞ্চয় ক'রো না। দাদারা যাহা মাসে মাসে দেন, পাওয়ামাত্র তৎক্ষণাৎ ব্যয় ক'রে ফে'লো। যে পথে চল্‌ছ তাতে সঞ্চয় কর্‌তে নাই।"

আমি বলিলাম—ব্যয় কি নিজের প্রয়োজনে কর্‌বো, না—অন্যের জন্য ?

ঠাকুর বলিলেন:—"তোমার আবার নিজের প্রয়োজন কি? আজ থেকে আহারের জন্য ভিক্ষা কর্‌বে। অর্থ কারও নিকট চাবে না। ভিক্ষায় দৈনিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ কর্‌বে না। কেহ বেশী দিয়ে গেলে, তা কাকেও দিয়ে দিবে। আহারের কোন বস্তুই সঞ্চয় কর্‌বে না। নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত রান্নাও কর্‌বে না। যে দিন ভিক্ষায় কিছু না জুট্‌বে, ভাণ্ডার হ'তে নিবে। আশ্রমের ভাণ্ডারের সামগ্রীতো ভিক্ষুকদেরই জন্য। এই ভাবে চ'লে যদি তেমন বৈরাগ্য জন্মে, তবেইতো সন্ন্যাস। না হ'লে এখন থেকে যে দিকে জীবনের গতি হবে, সে দিকেই যেতে হবে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই সমস্ত অভ্যাস কর্‌তে হয়। ব্রহ্মচর্য্য ঠিক হ'লেইতো সব হ'লো। এ সকল অভ্যাস এখন না কর্‌লে, আর কর্‌বে কবে?"

জিজ্ঞাসা করিলাম:—ভিক্ষা কয় বাড়ী পর্য্যন্ত কর্‌তে পার্‌বো?

ঠাকুর বলিলেন:—"ভিক্ষা তিন বাড়ী পর্যন্ত কর্‌তে পার্‌বে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম:—কোন্ কোন্ জাতির বাড়ী ভিক্ষা করা যায়?

ঠাকুর বলিলেন :—"চাল ভিক্ষা সকলের বাড়ীই করা যায়। শ্রদ্ধার ভিক্ষান্ন সর্ব্বত্রই পবিত্র। ব্রহ্মচারীদের ভিক্ষাই ব্যবস্থা।"

প্রথম-ভিক্ষা,—ঠাকুরের হাতে। একি চমৎকার !!

ঠাকুর এ সকল কথা বলিয়া নীরব হইলেন পরে, আমি ভাবিতে লাগিলা . 'লোকে বলে প্রথম দিনের ভিক্ষা, যে ভাবে যাহা পাওয়া যায়, সারা জীবনে ভিক্ষা সে ভা..বই, সেই প্রকারের বস্তু লাভ হইয়া থাকে। এজন্য নাকি উপনয়নের সময় ভিক্ষা মা'র হাতেই প্রথমে লইতে হয়। স্নেহভাবে দরদ্‌ করিয়া উৎকৃষ্ট পবিত্র বস্তু ঠাকুর বিনা, কে আর আমাকে দিবে ?' এই মনে করিয়া ঠাকুরকে বলিলাম, 'জীবনে প্রথম ভিক্ষা তাহ'লে আপনার নিকটই আজ কর্‌বো !'

ঠাকুর খুব স্নেহের সহিত আমার দিকে চাহিয়া একমুখ হাসিয়া বলিলেন :—"তা বেশ! আজ আমিই তোমাকে ভিক্ষা দিব, কাল থেকে অন্য বাড়ী যে'ও। এখন ভিক্ষা এ পাড়াতেই ক'রো।"

সকাল বেলা ঠাকুরের আদেশ ও উপদেশ পাইয়া নিজ আসনে আসিলাম। বেলা প্রায় নয়টার সময়ে দেখি, আশ্রমে মহা ঘটা পড়িয়া গেল। একটি অবস্থাপন্ন ভক্ত গুরুভ্রাতা, আজ ঠাকুরের সেবার জন্য প্রচুর সামগ্রী লইয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পলাউ, ছানার ডাল্‌না প্রভৃতি বহু উপাদেয় খাদ্য ঠাকুরের ভোগের জন্য প্রস্তুত হইল। বেলা প্রায় একটার সময়ে ঠাকুরের সেবা হইল। আহারান্তে ঠাকুর নিজ হাতে ভুক্তাবশিষ্ট পলাউ এবং ডাল্‌না প্রভৃতি একটি পাথরের বাটীতে তুলিয়া আমাকে ডাকিয়া উহা দিয়া বলিলেন :—"এই নেও, আজ এই তোমার ভিক্ষা। এখন নিয়ে রেখে দেও, তোমার আহারের সময়েই খেয়ো।"

আমি খুব আনন্দিত মনে উহা লইয়া আসিলাম এবং ঢাকিয়া রাখিয়া ভাবিতে লাগিলাম—'হায় ঠাকুর! পলাউ যদি দিলে, তাহ'লে গরম গরম এখনই খেতে বল্‌লে না কেন ? চার পাঁচ ঘণ্টা পরে ইহাতো জুড়ায়ে একবারে জল হ'য়ে যাবে। প্রথম ভিক্ষায় উৎকৃষ্ট প্রসাদ হাতে ধ'রে দিলেও গরম থাক্‌তে তৃপ্তির সহিত খেতে দিলে না !'

ঠাকুরের সেবার পর নিয়মিত রূপে মহাভারত পাঠ করিয়া স্থির হইয়া আসনে বসিয়া রহিলাম। ঠাকুর আর আর দিনের মত ৫।৹ টার সময় আমাকে বলিলেন :—"যাও, এখন

তুমি আহার কর গিয়ে।" আমি আহার করিতে বসিয়া প্রসাদের বাটীটি স্পর্শ করিয়াই চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম 'তরকারী সহিত সমস্ত পলাউ চমৎকার গরম রহিয়াছে।' ঠিক যেন উহা কেহ উননের উপর হইতে আনিয়া রাখিয়াছে। পাথরের বাটীতে পলাউ প্রসাদ পাঁচ ঘণ্টা পরেও কি প্রকারে এত গরম রহিল, ভাবিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া রহিলাম। কতক্ষণ উহা লইয়া, বসিয়া কান্দিলাম। প্রসাদ পাইতে আজ আমার সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। প্রসাদ পাওয়ার পর গত রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলাম 'সঙ্কল্প মাত্রে পাখীর মত শূন্যমার্গে অনন্ত আকাশে উর্দ্ধদিকে উড়িয়া যাইতেছি।'

অদ্য (২৩শা ফাল্গুন) জীবনে প্রথম বাহিরে ভিক্ষা করিলাম। মনোহরা দিদি, খুব শ্রদ্ধার সহিত চাউল, বুটের ডাল, আলু, কাঁচকলা, বেগুণ, লঙ্কা, সৈন্ধব ও ঘৃত ভিক্ষা দিলেন। আমি নিজের পরিমাণ মত রাখিয়া অবশিষ্ট পাখীদের ছড়াইয়া দিলাম। পক্কান্ন দ্বারা হোম করিয়া, যোগজীবন, শ্রীধর ও পণ্ডিত মহাশয়কে এক এক গ্রাস দিয়া প্রসাদ পাইলাম। ভিক্ষান্নে আমার বড়ই তৃপ্তি বোধ হইল।

২৮ শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার।

এই কয়দিন যাবৎ ঠাকুরের কথা সর্ব্বদাই মনে হইতেছে। হাতের টাকাগুলি ব্যয় না করিয়া ফেলা পর্য্যন্ত বড়ই অশান্তি ভোগ করিতেছি। শ্রীবৃন্দাবনে থাকার কালে মা-ঠাকরুণ, ঠাকুরকে মহাভারত একখানা দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি ঠাকুরকে তাহাই দিব স্থির করিয়া টাকা আনিতে বাড়ী যাইব। ঠাকুরকে বাড়ী যাওয়ার ইচ্ছা জানাইতে ঠাকুর বলিলেন :—"বাড়ী যেয়ে ভিক্ষা ক'রো না। মা'র মনে কষ্ট হবে। বাড়ীতে যখনই য'াবে মা-ঠাকরুণের প্রসাদ পে'ও।"

সমবয়স্ক গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মিত্রকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী চলিলাম। বাড়ী পঁহুছিতে নৌকায় ও স্থলপথে ৫।৬ ঘণ্টা সময় লাগে। এই সময়ের মধ্যে বহুবার ১৫।২০ মিনিট করিয়া রাস্তায় ধূপ ধূনা চন্দন ও গুগ্‌গুলের পরিষ্কার সুগন্ধ পাইয়া উভয়েই আশ্চর্য্য হইতে লাগিলাম। বিস্তৃত ময়দানে চলতি পথে, সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকার সদ্গন্ধ কোথা হইতে কি প্রকারে আসিতেছে কিছুই বুঝিলাম না।

চৈত্র

সেবা ভক্তিতে, বিগ্রহ জাগ্রত হ'ন।

১০ই চৈত্র,
সোমবার।

এবার বাড়ীতে মাতাঠাকুরাণী কথায় কথায় তাঁর গোপাল ঠাকুরের কথা বলিলেন, শুনিয়া অবাক্ হইলাম। মা'র দুটি সুন্দর ছোট ছোট গোপাল ঠাকুর আছেন। তিনি প্রতিদিন তাঁহাদের খুব শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত সেবা পূজা করিয়া থাকেন। একদিন পাড়ার একটি দুষ্ট ছেলে, আমাদের বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতে আসিয়া, ঐ গোপাল ঠাকুর-দুটি দেখিতে পায়; খেলা সাঙ্গ হইলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সন্ধ্যার পরে সে গোপাল দুটি চুরি করিয়া লইয়া যায়। মা তাহা কিছুই জানেন না। শেষ রাত্রিতে গোপাল ঠাকুর স্বপ্নে মা'কে বলিলেন—'ওগো! একবার আমাদের দ্যাখ্। ঐ দুষ্টছেলেটা আমাদের নিয়ে এই বাড়ীতে এনে উত্তরের ঘরে, শিকার উপরে- হাঁড়ির ভিতর নারিকেলের মালায় ক'রে রেখে দিয়েছে। সকাল হ'লেই পুরুত পাঠায়ে আমাদের নিয়ে যা'স্।' মা, শেষ রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়া, অমনি জাগিয়া উঠিলেন, এবং ব্যস্ততার সহিত ঠাকুর-ঘরে গিয়া দেখিলেন—যথার্থই ঠাকুর সিংহাসনে নাই। তিনি অমনি পুরোহিতকে ডাকিয়া আনিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত সমস্ত বলিলেন। পুরোহিত ঠাকুর গ্রামের অপর প্রান্তে সেই বাড়ীতে যাইয়া, একবারে ঐ ঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং শিকার উপর, হাঁড়ির ভিতরে, নারিকেলের মালায় গোপাল দুইটিকে পাইয়া, লইয়া আসিলেন।

ঠাকুরকে এই কথা বলায় ঠাকুর বলিলেন:—"শ্রদ্ধা ক'রে সেবা পূজা করলে, বিগ্রহ জীবন্ত হ'ন। তখন তিনি সেবকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেন; মানুষের মত খাবার চা'ন; কোনও প্রকার অনাচার অত্যাচার হ'লে, ব'লে দেন। এসব কিছুই আশ্চর্য্য নয়। অনেক স্থলেই এসব দেখা যায়। তোমার দাদার শালগ্রামটিও বড় চমৎকার! বেশ জাগ্রত। আমি যখন ফয়-জাবাদে তোমার দাদার বাসায় ছিলাম, একদিন অযোধ্যা থেকে ঠাকুর দর্শন ক'রে বাসায় এসে, বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই, তোমার দাদার ঠাকুর আমাকে বল্লেন—'ওরে, আমাকে কিছু খাবার দে। ওরা আমার পূজা করে কিন্তু

মাতাঠাকুরাণী— শ্রীমতী হরসুন্দরী দেবী।

U. RAY & SONS.

খাবার দেয় না।' আমার সঙ্গে কিছু খাবার এনেছিলাম, তাই ঐ বামন-দেবকে দিলাম। সেই থেকেই তোমার দাদা, ঠাকুরের ভোগ দিচ্ছেন।"

এই বলিয়া ঠাকুর, দাদার শালগ্রামের আরও অনেক কথা বলিলেন। সে সকল বিষয় গত বৎসর, আমি যখন দাদার নিকটে ছিলাম, দাদার মুখে শুনিয়া সেই সময়ের ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিয়াছি; এজন্য এস্থলে আর লিখিলাম না। কোনও একটি বৈষ্ণব পরমহংস অযাচিত ভাবে হঠাৎ একদিন আসিয়া ঐ শালগ্রামটি দাদাকে দিয়া যান। দাদা তাঁকে বলিলেন—আমি এসব মানি না—বিশ্বাস করি না। পরমহংস বলিলেন —'ঘরে এমনি রে'খে দিন, ঠাকুর আমার খুব জাগ্রত, ইনি নিজেই মানায়ে নিবেন।' দাদা, শালগ্রাম সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন থাকিলেও ঠাকুরেরই অসাধারণ কৃপায় শালগ্রামকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ঠাকুর, দাদার কথা তোলাতে সুযোগ পাইয়া বলিলাম—'কয়দিন হয় দাদা, তাঁর ৫।৬ বৎসরের মেয়েটির জাগ্রত অবস্থায়ও যে সকল দর্শনাদি হয়, সে সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে লিখিয়াছেন।' এই বলিয়া আমি বিস্তারিত রূপে দাদার পত্রের বিষয় ঠাকুরকে জানাইলাম।

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"তোমার দাদা ডাক্তার মানুষ। লিখে দাও, মাথা গরম হ'য়েছে, বা কোন রোগ হ'য়েছে মনে করে ওকে ঔষধ-পত্র না খাওয়ান। এ অবস্থায় ঔষধ খাওয়ালে অনিষ্ট হবে। সাধারণে চোখে যা দেখে না, কেহ তা দেখে বল্‌লেই গোল। লোকে মনে করে মাথার কোন রোগ হ'য়েছে। এ অবস্থায় রোগ মনে ক'রে ঔষধাদি খাওয়ালে অনেক সময়ে বিপদ্ ঘটে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—মাথার গোলমালে কি লোকে ওসব দেখে না?

উত্তর ঃ—"তা দেখ্‌বে না কেন, খুব দেখে। এ জন্যই শাস্ত্র পুরাণের বর্ণনার সহিত অক্ষরে অক্ষরে মিলায়ে নিতে হয়। মাথার গোলমালে যা দেখে, তা গোলমালই দেখে। প্রমাণের সহিত তার মিল থাকে না।"

প্রশ্ন ঃ—সাধনের সময়ে আসনে ব'সে, লোকে যে সব বিভীষিকা দেখে—তা কি সত্য?

উত্তর ঃ—"আসনে স্থির থে'কে সাধন কর্‌লেই তা সত্য কি মিথ্যা, ধরা পড়ে।"

কৌশলের দান,—অনুতাপ।

১২ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার।

বাড়ী যাইয়া এবার ৮।১০ দিন ছিলাম। পোষ্টাফিস হইতে টাকা তুলিয়া লইয়া, মাতাঠাকুরাণীকে ২৫৲ টাকা দিয়া গেণ্ডারিয়া আসিয়াছি। ঠাকুরকে একখানা মহাভারত কিনিয়া দেওয়ার অভিপ্রায়ে একটি গুরু ভ্রাতাকে ৪০৲ টাকা দিলাম। নিজের প্রয়োজনে পুস্তক ক্রয় করিয়া ৮।১০ টাকা ব্যয় করিলাম। অবশিষ্ট টাকা ছুদিন আমার হাতেই রাখিয়াছিলাম। কোন কোন গুরুভ্রাতা তাহা জানিতে পারিয়া অভাব ও প্রয়োজন জানাইয়া আমার নিকট কিছু কিছু চাহিতে লাগিল। আমি বিষম ফাঁপরে পড়িয়া গেলাম। ভাবিলাম 'একি উৎপাৎ!' আমি তাড়াতাড়ি ঐ টাকাগুলি লইয়া গিয়া দিদিমার হাতে দিয়া বলিলাম,—'দিদিমা! এই টাকা আপনার ইচ্ছা মত ব্যয় করিবেন, আশ্রমের ভাণ্ডারে ইহা আমি দিলাম।' জানি না,— ঠাকুর কোন্ সূত্রে আমার দানের কৌশল বুঝিয়া আমাকে বলিলেন—"**আশ্রমের ভাণ্ডারের জন্য বুড়-ঠাক্‌রুণের হাতে অতগুলি টাকা দিয়েছ কেন?**"

ঠাকুরের ঈষৎ হাস্য মুখে, ঠাট্টার ভাবে এই প্রশ্নটি শুনা মাত্র আমার মাথায় যেন বজ্র পড়িল, আমি লজ্জায় মাথাটি হেট করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম, ভাবিলাম,— হ'য়েছে? এবার বুঝি সব গুমর ফাঁক!

গত বৎসর শ্রীবৃন্দাবনে দামোদর পূজারিকে যে দান করিয়াছিলাম—তাহা আমার এসময়ে মনে পড়িল, আর ভয়ানক অনুতাপে ও জ্বালায় অস্থির হইতে লাগিলাম। গত বৎসর শ্রীবৃন্দাবনে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইতেই, ঠাকুর আমাকে যমুনায় স্নান করিয়া আসিতে বলিলেন। সঙ্গে আমার এগারটি টাকা ছিল। আন্য স্থানে রাখিয়া গেলে পাছে কেহ জানিতে পারে, এই আশঙ্কায় উহা টেঁকে গুঁজিয়া স্নান করিতে গেলাম। পথ আমার অজ্ঞাত বলিয়া কুঞ্জের মালিক দামোদর পূজারি সঙ্গে চলিলেন। স্নানের সময়ে টাকা সারিয়া রাখিতে দামোদর উহা দেখিয়া ফেলিলেন। আমি মহা শঙ্কটে পড়িয়া গেলাম। ভাবিলাম—ঠাকুরের কোন কিছুর প্রয়োজন জানাইয়া এ-বেটা যখন ইচ্ছা টাকা কয়টা বাহির করিয়া লইবে। নজর যখন উহার পড়িয়াছে, এ টাকা যাওয়ারই মধ্যে। সুতরাং এখনই ভবিষ্যৎ উৎপাত হইতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করা ভাল। মনে মনে এই স্থির করিয়া স্নানের পর দামোদরকে বলিলাম—"পূজারিজী! আপনিইতো আমাদের ঠাকুরের সেবার সমস্ত ভার লইয়া আছেন। এই কয়টা টাকা মাত্র আমার

আছে, আপনি ইহা ঠাকুরের সেবায় লাগাইয়া দিবেন। আর আমি যে দু-তিন মাস আপনার আশ্রয়ে থাকিব—দয়া করিয়া ঠাকুরের প্রসাদ দু'বেলা দুমুটো আমাকে দিবেন। তীর্থে আসিয়া সর্ব্ব প্রথমে ব্রাহ্মণকেইতো দান করিতে হয়, নাহ'লে কিছুইতো সফল হয় না। তাই আমার যাহা কিছু আছে আপনাকেই দান করিলাম, আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।' এই বলিয়া টাকা কয়টি দামোদরের হাতে দিয়া নমস্কার করিলাম। দামোদর হাতে টাকা পাইয়া খুব খুসি হইয়া, অত্যন্ত আদরের সহিত আমার পিঠে দুটি চাপড় মারিয়া বলিলেন—ওঁঃ তোহারা তো ভক্তি বড়া ভারি! ভালা! ভালা!! আরে সব দে দিয়া! রাম! রাম!! আমিও মনে মনে বলিলাম—হাঁ দান ভক্তি আমার যা, মেড়া! তুমি পরে বুঝ্‌বে!

এবারও আশ্রমসেবার জন্য দানটি আমার যে ভাবে হইয়াছে জানিতে পারিয়া ঠাকুর বলিলেন—"যার প্রয়োজন, কোন দিক্ না তাকা'লে দান তাকেই কর্‌তে হয়। দান, দরদ্ ক'রে কর্‌তে হয়। নিজের একটা অভাব হ'লে, তা যেমন পূরণ কর্‌তে ইচ্ছা হয়, অন্যের প্রয়োজনও যদি সেই প্রকার মনে লাগে, তা হ'লেই যথার্থ দান হয়। শ্রদ্ধাশূন্য দান, দেখাদেখি দান, বা উৎপাত শান্তির জন্য যে দান, তাকে দান বলে না। আর প্রতিষ্ঠার জন্য দান, একটা মতলব ক'রে দান, বা অন্য কোন প্রকার স্বার্থের গন্ধ রে'খে যে দান, তা দানই নয়। উহা একটা কৌশল করা মাত্র। ওতে আত্মার কোন কল্যাণই হয় না, বরং অনিষ্ট হয়।"

দুর্দ্দিনে ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি।

১৩ই চৈত্র, শুক্রবার।

গতকল্য একাদশী তিথিতে আর আর বারের মত নিরম্বু উপবাস করিয়াছি। সন্ধ্যার পরে ছয় সাত বৎসরের কয়েকটি বালিকা আসিয়া আমার আসনের পাশে বসিল, এবং গল্প বলিতে পুনঃ পুনঃ জেদ্ করিতে লাগিল। আমি দু-একটি গল্প শুনাইয়াই তাহাদিগকে বিদায় করিলাম। রাত্রে স্বপ্নদোষ হইল। অবশিষ্ট রাত্রি, প্রায় বারোটা হইতে ভোর বেলা পর্য্যন্ত, একবার বাহিরে একবার ঘরে উঠাবসা করিয়া কাটাইলাম। বিষম আক্ষেপ আসিল। মনের ক্লেশে মাথাটি আগুন হইয়া গেল। ঠাকুরের উপরে দারুণ অবিশ্বাস জন্মিল। ভাবিলাম,—'সমস্তই বৃথা! অনর্থক শ্রম করিতেছি।' সামান্য শরীরের একটা দুর্গতি, যে গুরুর ব্যবস্থামত

এতকাল কার্য্য করিয়াও ফিরিল না, তাঁর উপদেশ মত চলিলে, স্বভাবের দোষ, মনের বহির্ম্মুখ দুরবস্থা যে দূর হইবে তাহার প্রমাণ কি? ভগবানকে লাভ করিব প্রত্যাশায় যাঁহার কৃপাই একমাত্র ভরসা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছি, এবং যাঁহার উপদেশই একমাত্র কর্ত্তব্য জানিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছি, সামান্য সামান্য বিষয়েই যদি তাঁর বাক্য মিথ্যা হইল, তাহা হইলে প্রকৃত ধর্ম্মলাভের জন্য তিনি যে সকল উপায় বলিয়া দিতেছেন, তাহা যে সত্য, তারই বা বিশ্বাস কি? চিকিৎসকের ব্যবস্থা মত ঔষধ সেবনে রোগের উপশম না হইলে, তাঁহার হাতযশে রোগীর নির্ভর করা আর অদৃষ্টের দিকে চাহিয়া থাকা, একই কথা। আমি তাহা কিছুতেই পারিব না। কল্যই আমি ঠাকুরকে শেষ সাষ্টাঙ্গ করিব।' এই স্থির করিয়া, সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

অরুণোদয়ে স্নান করিয়া কোনও প্রকারে নিত্যকর্ম্ম সারিয়া নিলাম। নির্জ্জন অবসর বুঝিয়া, ঠাকুরের চা সেবার সময়-সময় কালে তাঁর পশ্চাদ্দিকে, ঘরের বাহিরে উঠানে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গ করিলাম। "হায়! ঠাকুরকে ছাড়িয়া চলিলাম," এ সময়ে মনে হইতেই, আমার কান্না আসিয়া পড়িল, আমি আর চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। এই সময়ে ঠাকুরও আধকান্না স্বরে প্রায় দুই মিনিটকাল "হরি ব'ল্" "হরি ব'ল্" বলিতে লাগিলেন। আমি মাথা তুলিতেই ঠাকুর পশ্চাদ্দিকে আমার পানে মুখ ফিরাইয়া, মমতা-পূর্ণ ছলছল—চক্ষে, খুব স্নেহভাবে ডাকিয়া বলিলেন—"**আহা কাল নিরম্বু ক'রে এখ-নও কিছু খাও নাই? এই নেও, একটু জল খেয়ে এখন ঠাণ্ডা হও গিয়ে।**"

এই বলিয়া ঠাকুর, কিছু মিষ্টি ও একটি বেল, আমার হাতে দিলেন। ঠাকুরের সেই সময়ের কান্না, আধ্‌স্ফুট স্বর ও এক প্রকার চাহনিতে, আমার যেন বুক ফাটিয়া গেল। কেবল এই মনে হইতে লাগিল, 'আহা! এ জগতে এরূপ দরদের চ'ক্ষে, কে আর আমাকে দেখিবে।' আমি কান্দিতে কান্দিতে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। একটু পরে খাবার লইয়া নিজ আসনে আসিয়া বসিলাম।

সকালে জলযোগের পর বেলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময়ে ঠাকুরের নিকটে যাইয়া বসিলাম। ঠাকুর কিছু কালের জন্য পাঠ বন্ধ করিলেন। ঐ সময়ে আমি বলিলাম, 'অনেক সময়ে অনেক কথা আপনাকে বলিব মনে করি, কিন্তু নিকটে আসিলেই সব ভুলিয়া যাই।'

ঠাকুর আমার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন:—"**বলিবে আর কি? বলা কওয়া আর**

কি আছে ? কাজ ক'রে যাও। একটা স্থায়ী অবস্থা হঠাৎইতো মহাত্মারা দেন না। সিংহের দুধ সোণার পাত্রে না রাখ্‌লে টেকে না, নষ্ট হ'য়ে যায়। মহাত্মারা পাত্রটি ঠিক ক'রে নিয়ে বস্তু দেন। অবস্থালাভের জন্য ব্যস্ত হইও না, সে ঠিক সময়েই হবে।"

আমি,—'এক সময়ে হবে, এই আশা পেলেইতো নিশ্চিন্ত থাকি।'

ঠাকুর বলিলেনঃ—"এখন যদি তোমাকে ঐ অবস্থা দেওয়া যায়, তোমার অনিষ্ট করা হবে। ঊৰ্দ্ধরেতা হ'লে, তুমি কারোকেই গণ্য ক'রবে না। ঐ অবস্থা লাভ হ'লে তুমি স্থির থাকতে পারবে না। ঐ ঐশ্বর্য্যেতে ক'রে সমস্ত সংসার তুমি ছারখার করবে, সর্ব্বনাশ কর্‌বে। অভিমানটি নষ্ট হ'লেই ও সব ঐশ্বর্য্যলাভ নিরাপদ। এখন কাজ ক'রে যাও। ওসব দিকে খ্যাল রেখো না। সবদিকে ঠিক হওয়া দু-একদিনের কর্ম্ম নয়।"

ঠাকুর একটুকু থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেনঃ—"ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে স্ত্রী লোকের সহিত কোন প্রকার সংশ্রবই রাখ্‌তে নাই। এ বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হ'তে হয়। তাঁদের দিকে তাকাবে না, তাঁদের সঙ্গে বস্‌বে না, তাঁদের সঙ্গে কোন প্রকার আলাপও করবে না। স্ত্রীজাতি যেই কেন হউন না, অত্যন্ত বৃদ্ধাই হউন, আর যুবতীই হউন অথবা নিতান্ত বালিকা খুকীই হউন, সর্ব্বদা তাঁদের থেকে তফাৎ থাক্‌বে। চুম্বকে যেমন লোহাকে টানে সেই প্রকার স্ত্রীজাতির শরীর এমন কতগুলি উপাদানে গঠিত, যে তাতে পুরুষ শরীরকে আকর্ষণ করে। এটি বস্তুগুণ, এতে পাত্রাপাত্র, সাধু অসাধু বিচার নাই। এজন্য শাস্ত্রকর্ত্তারা, এমন কি মাতা, ভগিনী, দুহিতা সম্বন্ধেও সাবধান থাক্‌তে অনুশাসন ক'রে ব'লেছেন—

'মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥'

মাতা, ভগিনী, দুহিতার সঙ্গেও নির্জ্জনে একাসনে বস্‌বে না, বলবান ইন্দ্রিয়-গ্রাম বিদ্বানকেও আকর্ষণ করে। বিদ্বান বল্‌তে ব্রহ্মবিদ্যাবিদ্, যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান

লাভ হ'য়েছে। যিনি মুক্তপুরুষ তাঁকেও এতে আকর্ষণ করে। কাশীতে দণ্ডীস্বামী এ কথা বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লেন না, তিনি মনে কর্‌লেন 'এ কখনও হয় ?' ব্রহ্ম-বিদ্যা যিনি লাভ ক'রেছেন, সেই বিদ্বানকে কিছুতেই এতে আকর্ষণ কর্‌তে পারে না। তিনি, ব্যাসদেব ভুল লিখেছেন মনে ক'রে, তা কেটে দিয়ে 'নহি কর্ষতি, নহি কর্ষতি, নহি কর্ষতি' লিখে রাখ্‌লেন। তারপর তাঁর যে দুর্দ্দশা ঘটেছিল তাতো শুনেছ।"

অবিশ্বাস, সাধনে অভিমান—অনুশাসন।

মহাভারত পাঠের পর ভিতরে বিষম উদ্বেগ বোধ হইতে লাগিল। ভাবিলাম, ঠাকুরের সম্বন্ধে আমার যে সব অবিশ্বাস সন্দেহ জন্মিয়াছে, বলিয়া ফেলি। আমি চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া ঠাকুরকে বলিলাম, 'মিথ্যাকথা বলা কি শুধু আমাদেরই দোষ, না ভগবানেরও ?'

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"ভগবান কখনও মিথ্যা বলেন না, তাঁর ইচ্ছা, কার্য্য, বাক্য সমস্তই সত্য। সেখানে মিথ্যার কিছুই নাই।"

আমি বলিলাম,—'শ্যামবাজারে আমার প্রতি আদেশ হ'য়েছিল—"দুটি ঘণ্টা স্থির হ'য়ে ব'সে নাম ক'রো, স্বপ্নদোষ হবে না।" আমিতো ঐ সময় থেকে প্রত্যহ অন্ততঃ পাঁচ সাত ঘণ্টা ব'সে নাম কর্‌ছি, কিন্তু স্বপ্নদোষতো নিবারণ হ'ল না। এজন্য আপনার কথায় আমার অবিশ্বাস আসিয়াছে। দেখিতেছি, আমরা মিথ্যা বলি অতীত ও বর্ত্তমান বিষয়ে, আর আপ-নারা বলেন, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে।

ঠাকুর এই কথা শুনিয়া কোনও প্রকার অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ না করিয়া, একভাবেই থাকিয়া বলিলেন ঃ—"তুমি স্থিরমনে দু-ঘণ্টা নাম ক'রে থাক ?"

আমি বলিলাম, 'স্থিরমনে কি ক'রে কর্‌ব ? মনত স্বভাবতঃই অস্থির। আসনে দুঘণ্টারও অধিক সময় একভাবে ব'সে নাম করি।'

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"তাহ'লে আর অন্যের দোষ কি ? দুঘণ্টা কেন, দুমিনিট তুমি স্থির হ'য়ে নাম কর না ? একটিবার কর দেখি, কেমন কথা অন্যথা হয় ? শুধু নাম কর্‌লেইতো হবে না। স্থির হ'য়ে করা চাই। এই নাম অক্ষর নয়, একটা শব্দ নয়। এই নামে ভগবানের অনন্তশক্তি। ভগবানই নাম। নাম করা

আর ভগবানের সঙ্গ করা এক। লক্ষ্য বস্তু ছেড়ে দিয়ে নাম কর্‌লে কি-হবে ? নাম করার সময়ে মনটি নানাদিকে ঘুরে বেড়ায়, নাম ঠিক করা হয় না। নিজের দোষ দেখ না, অন্যেরই দোষে কষ্ট পাচ্ছ মনে কর। নিজের ত্রুটি না দেখে, এরূপ অন্যের প্রতি দোষারোপ কর্‌তে নাই, অপরাধ হয়।"

একটু থেমে আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন ঃ—"তুমি অন্যান্য অপেক্ষা আসনে একটু অধিক সময় ব'সে থাক, এতেই তোমার কতটা অভিমান হ'য়েছে ! দেখ, কি ভয়ানক ! তোমার মত যারা আসনে বসে না, নাম করে না, সর্ব্বদা হাস গল্প ক'রে বেড়ায়, কিছুই করে না দেখ্‌তে পাচ্ছ, তাদের ভিতরেও এমন সব সদ্‌গুণ আছে, যা তোমার নাই। কোন চেষ্টা না ক'রে শুধু বিশ্বাসবলে, কেহ কেহ এমন অবস্থা লাভ কর্‌বে, যা সাধন ভজন ক'রে, বহুকালে তোমার লাভ করা কঠিন হবে। সর্ব্বদা নিজেকে ছোট ভে'বো, কারো অপেক্ষাই কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মনে ক'রো না। অনেকে বহু সাধন ভজন ক'রে, কঠোরতা ক'রে যে অবস্থা বহুকালে লাভ কর্‌তে পারে না, একটি লম্পটের, বদ্‌মায়েসের, ডাকাতের সেই অবস্থা স্বাভাবিকই থাক্‌তে পারে। অভিমান কর্‌বার কি আছে ? একটু সাধন কর ব'লে, অভিমানে পথ দেখ্‌ছ না। এই অভিমান থাক্‌তে একটা অবস্থা তোমাকে দিলে, ঐশ্বর্য্যমত্ত হ'য়ে তুমি কারোকে তৃণতুল্যও জ্ঞান কর্‌বে না। প্রতিকার্য্যে বিচার ক'রে চ'লো, বিচার না কর্‌লে অনেক অনর্থ জন্মে। নিজেকে ছোট ব'লে না জানা পর্য্যন্ত, হাজার সাধন ভজন চেষ্টা তপস্যায়ও কিছুই হবে না।"

১৫ই চৈত্র, রবিবার।

ঠাকুরের প্রতি আমার অবিশ্বাস আসিয়াছে এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি মিথ্যা কথা বলেন, এসকল বিষয় ঠাকুরকে মুখের উপরে বলা অবধি, ভিতর যেন আমার একেবারে শূন্য শ্মশান হইয়া গিয়াছে। দিন-রাত আমার কি ভাবে যাইতেছে, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। অন্তরের অসহ্য যন্ত্রণায় ক্ষিপ্তবৎ হইয়া নিজ শরীরে নিজে নানাস্থানে আঘাৎ করিলাম, চুল ছিঁড়িলাম, মাথা ঠুকিলাম, কান্দিতে কান্দিতে অস্থির হইয়া হাত পা সময়ে সময়ে আছড়াইতে লাগিলাম। আত্মহত্যা করিবারও সময়ে সময় ঝোঁক আসিতে লাগিল। ঠাকুর এই সময়ে পাঠবন্ধ রাখিয়া এক একবার উচ্চৈঃস্বরে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ—**"কাল থে'কে আবার তুমি রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ ক'রো।"**

আজ ঠাকুরের আদেশ মত আবার সেই 'নীলকণ্ঠ-বেশ' ধারণ করিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। বেশের গুণেই হউক অথবা ঠাকুরের কৃপায়ই হউক, ধীরে ধীরে আমার জ্বালা যন্ত্রণা কিছুক্ষণের মধ্যেই নিবৃত্তি হইয়া গেল।

পরিবেশনে ত্রুটি। তীর্থপর্য্যটনের নিয়ম।

১১ই চৈত্র, মঙ্গলবার।

এবার কলিকাতা হইতে আসার পর এ পর্য্যন্ত আশ্রমে বড়ই অর্থ-কৃচ্ছ্রতা চলিতেছে। গুরুভ্রাতারা অনেকে আহারের অসুবিধা ভোগ করিয়া স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা সত্ত্বেও আশ্রমে আহারাদি বিষয়ে ভাল-দিকে কোন প্রকার পরিবর্ত্তনই ঘটে নাই। কিছুদিন ঠাকুরের এবং সমাধিমন্দিরের জন্য পৃথক্ ভাবে ভোগ রান্না করিয়া আশ্রমস্থ গুরুভ্রাতাদের সাধারণ রকম ব্যবস্থায় চলিয়াছিল। ঠাকুর বোধ হয় আমাদের ভিতরের দুরবস্থা আমাদিগকে দেখাইবার জন্যই, তখন ও সব বিষয়ে কিছু বলেন নাই। 'ঠাকুর পূবের ঘরে পৃথক্ আহার করেন, তাঁর পাক স্বতন্ত্র প্রকার হয়' ইহা লইয়া আমাদের মধ্যে কেহ কেহ নানা কথা তুলিলেন। ঠাকুর উহা জ্ঞাত হওয়া মাত্রে সেই দিন হইতেই দক্ষিণের ঘরে সকলের সহিত এক সঙ্গে বসিয়া সাধারণের পাকে আহার করিতেছেন। পরিবেশনের ভার পূর্ব্বাপর আমার হাতেই আছে। আমি গুরুভ্রাতাদের অপেক্ষা ঠাকুরকে ভাল তরকারী অধিক পরিমাণে দিয়া থাকি। ঠাকুর দুই তিন দিন আমাকে ওরূপ দিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি তাহা শুনিয়াও শুনি নাই।

আজ আবার ঠাকুর বলিলেন ঃ—**"একস্থানে দশটি লোক ব'সে আহার কর্‌লে, পরিবেশনে লঘু গুরু কর্‌তে নাই। এক রকমই দিতে হয়। প্রসাদ পাওয়ার প্রত্যাশায় অধিক পরিমাণে দিলে এঁটো বস্তু দেওয়া হয়। খেয়ে আহারে কোন তৃপ্তি হয় না, ক্ষুধাও মিটে না।"**

আজ মহাভারতপাঠের পর ঠাকুর আমাকে তীর্থপর্য্যটনের নিয়ম বলিলেন ঃ—**"তীর্থপর্য্যটন যৌবনে না কর্‌লে আর হ'য়ে উঠে না। যা কিছু করা, এ সময়েই কর্‌তে হয়। পর্য্যটনের সময়ে সর্ব্বদা মাথা হেট ক'রে মাটির দিকে**

দৃষ্টি রে'খে চল্‌তে হয়। প্রতিদিন ৩।৪ ক্রোশ বা বেলা দশটা পর্য্যন্ত চ'লে, একটা স্থানে বিশ্রাম কর্‌তে হয়। সেখানে ভিক্ষা ক'রে স্বপাক আহার কর্‌লেই ভাল। পর্য্যটনের সময়ে ধাতু বস্তু সঙ্গে রাখ্‌তে নাই। অর্থাদি স্পর্শও কর্‌তে নাই। টিকেট কেহ ক'রে দিলে নিতে পার। জলপাত্র, কাঠের করঙ্গ হ'লেই ভাল। কৌপিন, বহির্বাস, একখানা কম্বল ও পাঠের দু-একখানা পুস্তক মাত্র সঙ্গে রাখ্‌তে হয়। কারো সঙ্গে না চ'লে, একাকী চলাতেই বেশী উপকার হয়। আহারের জন্য কোন দেবালয়ে প্রসাদও পাওয়া যায়।"

আমি ভাবিলাম 'এ মন্দ নয়! দেবতা বিগ্রহকে কল্পনা বই কিছুই মনে করি না, এ অবস্থায় আমাকে তীর্থপর্য্যটনের ব্যবস্থা!'

যোগসঙ্কট।

১৯শা চৈত্র। গত রাত্রিতে বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছিলাম। রাত্রি বারোটার সময়ে আর আর দিনের মত, হাত মুখ ধুইয়া আসনে বসিলাম। প্রায় দেড়টার সময়ে নাম করিতে করিতে একটু তন্দ্রাবেশ হইল। ঐ সময়ে ঠাকুরের গলার আওয়াজ পাইয়া জাগিয়া পড়িলাম। তিনি প্রায়ই গভীর রাত্রিতে দুই একটি গানে টান দিয়া দু এক মিনিটের মধ্যেই ভাবাবেশে গোঁ গোঁ করিতে করিতে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া পড়েন। গত রাত্রিতেও—"সেই এক পুরাতনে,পুরুষ নিরঞ্জনে, চিত্ত সমাধান কররে।" ব্রহ্ম-সঙ্গীতের এই গানটির দু-এক পদ গাহিতে গাহিতে সমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরের ঐ গান এবং আশ্চর্য্য গম্ভীর এক প্রকার স্বর শুনিয়া আমার ভিতরে আপনা-আপনি এতই বেগে নাম হইতে লাগিল যে, আমি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। কিছু-ক্ষণ পরে আমার হাত পা মাথা যেন খিচিয়া পেটের ভিতরে টানিয়া নিতে লাগিল। আমি তখন ঐ অস্বাভাবিক ক্রিয়া প্রতি অঙ্গে হইতেছে বুঝিয়াও তাহাতে কোনও প্রকার বাধা দিতে পারিলাম না। শিরা, ধমনি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাংসপেশীগুলি মোচড়াইয়া মনে হইল, যেন আমাকে একেবারে কুষ্মাণ্ডাকৃতি করিয়া ফেলিল। ভিতরে বাহিরে কেবল নামই শুনিতে লাগিলাম। শরীরে একপ্রকার অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব হইতে লাগিল; কিন্তু তাহা নিবারণের কোনও চেষ্টাই আসিল না। কিছুক্ষণ পরে আমার দেহের জ্ঞানও বিলুপ্ত হইল। তখন কি অবস্থায়, কোথায় কি ভাবে ছিলাম ঠাকুরই জানেন

এই অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম,—আমি কিছুই জানি না। পরে ধীরে ধীরে নামের বেগ কমিয়া আসিল, হাত পাও ক্রমে ক্রমে চেষ্টা করিয়া সোজা করিয়া বসিলাম।

ঠাকুরকে মধ্যাহ্নে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—এরূপ কেন হইল ?

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"হাঁ, ও প্রকার হয়। নাম শ্বাসে প্রশ্বাসে হ'লে, যখন ঐ নাম প্রতি শিরায় শিরায় চল্‌তে থাকে, তখন হাত, পা, নাক, কান, চোক, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভিতর দিকে টেনে নেয়। ঐ অবস্থার আরম্ভেই সতর্ক না হ'লে, আর নাম এ সময়ে একেবারে ছে'ড়ে দিলে, বিষম সঙ্কটে পড়্‌তে হয়। ঐ অবস্থায় হাত, পা সমস্ত একেবারে পেটের ভিতরে চ'লেও যেতে পারে। আবার অন্য প্রকারও হয়। নামটি, অস্থি মজ্জা মাংসে, প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যখন হ'তে থাকে, তখন হাত, পা, জানু প্রভৃতি শরীরের সমস্ত সন্ধিস্থলের গ্রন্থিসকল খ'সে যায়, একেবারে আল্লা হ'য়ে পড়ে। হাত পা লম্বা হ'য়ে যায়। তেমন মত হ'লে, হাত পা এমন কি মাথাটি পর্য্যন্ত শরীর হ'তে ছু'টে পড়ে। আবার ধীরে ধীরে ঠিক ঠিক স্থানে এসে লেগে জুড়ে যায়। এসব শুধু কথা নয়, নিজে দেখেছি।"

প্রশ্ন—একই নামে, শরীরের ভিতরে পরস্পর বিরুদ্ধ অবস্থা ঘটায় কেন ?

উঃ—"নাম এক এক ভাবে চ'লে, দেহে এক এক প্রকার অবস্থা করে।"

প্রশ্ন—নাম কর্‌তে কর্‌তে এক এক সময়ে ভয়ানক জ্বালা শরীরে হয় কেন ?

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"এ জ্বালা কি জ্বালা ? নাম যদি কর্‌তে পার তা হ'লে জ্বালা কি টের পা'বে ! প্রাচীন কালে ঋষিদের সময়ে তুষানলের ব্যবস্থা ছিল। দেহশুদ্ধির জন্য কারো কারোকে তাঁরা তুষানলে শুদ্ধ ক'রে নিতেন। এ যুগে তা হবার যো নাই। শরীর সে প্রকার নয়, সে প্রকারের হঠযোগেরও অভ্যাস কেহ করে না। এখন মহাপুরুষেরা কৃপা ক'রে নামাগ্নিতে দেহ শুদ্ধ ক'রে নেন। শ্বাস প্রশ্বাসে যখন নাম হ'তে থাকে, তখন এই জ্বালার আরম্ভ হয়। ক্রমে নামের সঙ্গে সঙ্গে এই জ্বালা এতই বৃদ্ধি হ'য়ে পড়ে যে, মনে হয় শরীরের প্রতি অণু পরমাণু একেবারে দগ্ধ হ'য়ে গেল। এই নামাগ্নির জ্বালায় মানুষ, তখন পাগলের মত ছুটা-ছুটি করে। সন্ন্যাসগ্রহণের পরে পরমহংসজীর আদেশে যখন আমি বিন্ধ্যপর্ব্বতে

ছিলাম, এই জ্বালা আমার হ'য়েছিল। এই জ্বালায় স্থির থাক্‌তে না পেরে সারাদিন আমি গায়ে পাতলা কাদা মাখ্‌তাম। একদিন ঐ জ্বালা বিষম অসহ্য হওয়ায় পর্ব্বতের ভিতরে একটা কুণ্ডে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লাম। ঐ সময়ে একটি সন্ন্যাসী আমাকে তুলে এনে বল্‌লেন—'একি ক'রেছ? এ জলে কখনও নাব্‌তে আছে? এখনই যে পাথর হ'য়ে যেতে! দেখ, তোমার চুল, দাড়ি, গোঁপ সমস্ত একেবারে সাদা হ'য়ে গেছে। এজলের এরকমই গুণ।' সন্ন্যাসী অম্‌নি পাহাড় খুঁজে একটি লতা এনে, তা ছেঁচে কিছুটা রস ক'রে চুলে লাগায়ে দিলেন। যে সব স্থানে ঐ রস দিয়েছিলেন—তা কাল হ'ল। আর যে গুলিতে লাগান হ'লো না—তা এখনও সাদা হ'য়ে আছে। তাই আমার সাম্‌নের এ সব চুল সাদা আর দুপাশে ও পিছনের চুল কাল। গুরুজীর দর্শন পে'য়ে তাঁকে জ্বালার কথা বলায় তিনি বল্‌লেন—'এ জ্বালায়ই এত অস্থির হ'চ্ছ? এখন তুমি জ্বালামুখী চ'লে যাও। সেখানে গিয়ে সাধন কর্‌লে, স্থানের প্রভাবে এই জ্বালা আরো চতুর্গুণ বৃদ্ধি হবে। পরে শীঘ্রই একেবারে নিবৃত্তি হ'য়ে যাবে। আমি অমনি জ্বালামুখী চ'লে গেলাম।"

এই বলিয়া ঠাকুর বিন্ধ্যপর্ব্বতে সাধনসময়ে যে সকল অবস্থা হ'য়েছিল—অনেক বলিলেন। ঠাকুরের মুখে সে সব কথা শুনিয়া পূর্ব্বে একবার ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিয়াছি বলিয়া, এস্থানে আর লিখিলাম না।

প্রকৃতির গলদ, বার্দ্ধক্যে প্রকাশ। উপদেশ।

আমার জীবনের গতি একটা ঠিক হইতে এখনও বহু বিলম্ব। ঠাকুরের মুখে শুনিয়া অবধি মনটি অতিশয় খারাপ হইয়া গিয়াছে। এবার বাড়ী যাইয়া আমার হিতাকাঙ্ক্ষী ঘনিষ্ঠ আত্মীয় একটি বৃদ্ধের মুখে তাঁর জীবনের কথা শুনিয়া নিরত কেবল তাহাই ভাবিতেছি। তিনি আমার ব্রহ্মচর্য্যের কথা শুনিয়া বলিলেন—'আরে বাপু, এখন যাহাই কর না কেন, শেষ পরিণাম যে কি দাঁড়াবে বলা যায় না। যৌবনে ইন্দ্রিয়প্রাবল্য যেমন অধিক হইয়া থাকে, তেমন আবার সৎসঙ্গে থাকিলে ধর্ম্মোৎসাহও খুব বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। প্রকৃতির

গলদ যৌবনে চাপিয়া রাখা যায়, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় উহা প্রায় ফুটিয়া উঠে। যৌবনাবস্থায় ধর্ম্মের দিকে আমার বড়ই ঝোঁক্ ছিল, সন্ধ্যা পূজা, জপতপ নিয়াই প্রায় অনেক সময় কাটাইতাম; চরিত্রের বলও আমার অসাধারণ ছিল। একবার একটি জরুরি মামলায় পড়িয়া বিষম ঝড়-তুফানের পরদিন, আমি পদ্মানদী দিয়া ঢাকা চলিলাম। পূর্ব্ব-রাত্রিতে অনেক নৌকা ডুবি হইয়াছিল। আমি পান্সি নৌকা হইতে দেখিলাম,– ১৭।১৮ বৎসরের একটি পরম সুন্দরী যুবতী উলঙ্গাবস্থায় চড়ার উপরে বসিয়া কাঁদিতেছে। তাহাকে বিপন্না মনে করিয়া অমনি আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। মেয়েটি বলিল -'গত রাত্রিতে এই নদীতে আমাদের নৌকা ডুবে যায়। আমার স্বামী জীবিত আছেন কিনা জানি না। প্রায় মূর্চ্ছাবস্থায় আমি এই চড়ায় আসিয়া পড়ি। আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি, আমাকে রক্ষা করুন।' আমি তাহার কথা শুনিয়া, কান্দিয়া ফেলিলাম। তৎক্ষণাৎ নিজের কাপড়ের অর্দ্ধ-খানা তাহাকে পরিতে দিয়া, নৌকায় লইয়া আসিলাম। আমার কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সে ৩।৪ দিন, পান্সি নৌকায় আমার সঙ্গেই ছিল। পরে তাহার বাড়ীতে তাহাকে পঁহুছাইয়া দিলাম। ঐ সময়ে সঙ্গে আর কেহই ছিল না। তৎকালে মুহূর্ত্তের জন্যও আমার কোন প্রকার বিকার হয় নাই। বয়স তখন আমার ২৭।২৮ বৎসর। আর আজ পর্য্যন্ত জীবনে কখন কোন বিশেষ দুষ্কার্য্যও আমি করি নাই; কিন্তু এখন আমার বয়স প্রায় ৬৭ বৎসর হইল, দাঁত পড়িয়া গিয়াছে, শরীর রুগ্ন, অবসন্ন; এই নিস্তেজ বৃদ্ধাবস্থায়ও আমার এমনই দুরবস্থা ঘটিয়াছে যে, সেই সময়ের কথা মনে করিয়া, আক্ষেপে দিনরাত কাটাইতেছি। কেবলই মনে হয়, হায়, এমন সুযোগ হাতে পাইয়া তখন কেন ছাড়িলাম!' তাই বলি বাপু, বিষম প্রলোভনে পড়িলেও এক সময়ে নিজ নিজ চেষ্টায় ভাল থাকা যায়, কিন্তু মূলে ভাল হওয়া যায় না। প্রকৃতিতে যে সকল দোষ আছে তাহা চাপিয়া রাখা, ঢাকিয়া রাখা সহজ, কিন্তু তার মূল উৎপাটন করা নিজের সাধ্যে নাই। তা শুধু গুরুকৃপায়ই হয়।'

এই গল্পটি ঠাকুরের নিকট বলিলাম। ঠাকুর বলিলেন:—"ভবিষ্যৎ কিছু ভে'বে প্রয়োজন নাই। এখন যা বলা যাচ্ছে ক'রে যাও। এজন্য যৌবনেই সাধন ভজন কর্‌তে হয়। বয়স বেশী হ'লে, মনের উৎসাহ উদ্যম ক্রমে ক্রমে নিবিয়া আসে। শরীর অবসন্ন ও রুগ্ন হ'য়ে পড়ে, তখন সাধন ভজন করা কি সহজ! যৌবনই যথার্থ সাধন ভজন করার কাল। এসময় থেকে খুব চেষ্টা ক'রে,

ধর্ম্মে একটা সংস্কার ও রুচি জন্মায়ে নিতে পার্‌লে, কতকটা রক্ষা পাওয়া যায়। শ্বাসে প্রশ্বাসে নামটি অভ্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নিরাপদ ভূমি লাভ করা যায় না। অদৃষ্টের ভোগ যদি ষোল আনাই ভুগ্‌তে হয়, স্বভাবের দোষ ত্যাগকরা যদি অসম্ভবই হয়, তা হ'লে সাধন ভজন, ব্রত, তপস্যা—এ সকলের আর তাৎপর্য্য কি! ভগবানের বিন্দুমাত্র কৃপা হ'লে লক্ষ লক্ষ জন্মের ভোগ, পলকে নষ্ট হ'য়ে যায়। এ অতি সত্য কথা। তাঁর কৃপাই সার, আর কিছুই কিছু-না। কাতর হ'য়ে তাঁর দিকে তাকালে তিনি নিশ্চয় কৃপা করেন।"

বৃষ্টি সময়ে তর্পণ ; ঠাকুরের কৃপা।

২৩ চৈত্র।

আজ অষ্টমী-স্নানের দিন। ব্রহ্মপুত্রে যাইয়া স্নান-তর্পণ করিব, অনেক দিন হইতে এ প্রকার মনে করিয়া আসিতে ছিলাম, তাহা হইল না। আর আর দিনের মত প্রত্যুষে উঠিয়া বুড়ী-গঙ্গায়ই স্নান করিতে গেলাম। ভয়ানক বৃষ্টি হইতে লাগিল। পিতার মৃত্যু দিনে, আজ এক গণ্ডূষ জল পিতাকে দেওয়া হইবে না মনে করিয়া, অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। তর্পণের জলে বৃষ্টির ফোঁটা পড়িলে ঐ জল রুধির হইয়া যায় শুনিয়াছি। তাই নদীর পারে যাইয়া কিছুক্ষণ বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া রহিলাম, পরে অনুপায় দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ হইয়া ঠাকুরের নিকট খুব কাতর ভাবে প্রার্থনা করিলাম—'ঠাকুর, সারাবৎসর আমি পিতাকে তর্পণের জল দিয়া আসিয়াছি, আর আজ বিশেষ দিনে এক গণ্ডূষ জল তাঁকে দিতে পারিলাম না! ঠাকুর দয়া ক'রে কিছুক্ষণের জন্য এ বৃষ্টি থামায়ে দেও।' বৃষ্টি এক ভাবেই রহিয়াছে দেখিয়া আমি অগত্যা নদীতে নামিলাম, এবং ব্রহ্মপুত্রকে আহ্বান করিয়া এক এক জনার নামে ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া ১৫।২০টি ডুব দিলাম। মাথা তুলিয়া দেখি আর বৃষ্টি নাই, একেবারে থামিয়া গিয়াছে, এক ফোঁটা জলও পড়িতেছে না। আমি দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ ও পিতৃতর্পণ করিয়া শেষ গণ্ডূষ জল দেওয়া মাত্রে—অকস্মাৎ আবার ঝাপ্‌টা হাওয়া আসিয়া মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। আমি ইহা দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইলাম। এসব কি আকস্মিক ঘটনা, না—ঠাকুরের কৃপারই ফল, কিছুই পরিষ্কার বুঝিলাম না। গঙ্গাতীরে চমৎকার সদ্গন্ধ পাইয়া চিত্ত বড়ই প্রফুল্ল হইল।

মধ্যাহ্নে অবসর মত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কখন কখন দিনের বেলা আসনে

বসিয়া কখন বা গভীর রাত্রিতে, আবার রাস্তায় ঘাটে বা বাগানে জঙ্গলে, অকস্মাৎ খুব সদ্গন্ধ কিছুক্ষণের জন্য পাওয়া যায়, একটু পরেই আর থাকে না। অনেক সময়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি সে সব স্থানে ঐ প্রকার গন্ধের কোন হেতুই থাকে না ; এ প্রকার হয় কেন ?

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"এসব গন্ধ পাওয়া ভাল। দেবদেবী, ঋষি মুনি বা মহাপুরুষেরা দয়া ক'রে যে স্থানে আসেন, সে স্থানে তাঁদের কৃপাতেই তাঁদের গায়ের গন্ধ কেহ কেহ পান। এই গন্ধ নানা রকমই পাওয়া যায়। কখনও ধূপ ধূনার গন্ধ, কখনও চন্দন গুগ্‌গুলের গন্ধ, কখনও পদ্ম গন্ধ, কখনও অন্য প্রকার সুগন্ধি ফুলের গন্ধ, মর্ত্তমান কলার গন্ধ, কাঁটালের গন্ধ, আবার ফকির সাহেবদের আগমনে গাঁজার বা লবানের গন্ধ পাওয়া যায়। সে সময়ে তাঁদের চরণ-উদ্দেশে ভক্তি ক'রে প্রণাম করতে হয়। আর স্থির হ'য়ে ব'সে খুব নাম করতে হয়, তাঁদেরও তাতে খুব আনন্দ হয়। ক্রমে তাঁদের আরও কৃপা প্রত্যক্ষ করা যায়।"

সাধকের মাদক ব্যবহার ৷ গাঁজার ধুঁয়ায় দশমহাবিদ্যা।

আজ কথায় কথায় ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—সাধু, ফকির, তান্ত্রিক সাধকেরা, অনেকেই তো মদ্ গাঁজা খান। এই সব খাওয়াতে, তাঁদের সাধনের কি কোন প্রকার সাহায্য করে ? গাঁজাখোর সাধুদের দেখলেইতো গুণ্ডা ব'লে মনে হয়।'

ঠাকুর বলিলেন ঃ—"গুণ্ডারাও অনেকে, সময়ে সময়ে সাধুর বেশ ধ'রে থাকে, তা ঠিক। গয়াতে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে যখন আমি ছিলাম, একদিন গোফার ভিতর থেকে দেখ্‌লাম, কয়েকজন লোক অনেকগুলি জিনিষ পত্র নিয়ে, ঝম্ ঝম্ ক'রে পাহাড়ের উপরে উঠে যাচ্ছে। তাদের দেখেই আমি চিন্‌তে পারলাম। পাহাড়ের নীচেই তারা সাধু সেজে থাক্‌তো। প্রতিদিন সকালে, আমি তাদের গিয়ে সাষ্টাঙ্গ কর্‌তাম। ওদিন সকাল বেলা বাবাজীকে গিয়ে বল্‌লাম, 'বাবাজী, পাহাড়ের নীচে, যারা গায়ে ভস্ম মেখে, তিলক কেটে, মালা প'রে, সাধু সেজে ব'সে থাকে, তারা সাধু নয়। 'গত রাত্রে তাদের আমি কতকগুলি জিনিষ পত্র

নিয়ে পাহাড়ে উঠ্‌তে দেখেছি।' বাবাজী বল্লেন, 'ওরা সাধু নয়, গুণ্ডা। দিনে সাধুর বেশ ধ'রে ব'সে থাকে, আর রাত্রে সহরে গিয়ে চুরি ডাকাতি করে। সে সব চোরাইমাল পাহাড়ের উপরে নিয়ে গিয়ে, একটা গোফাতে রেখে দেয়, তা আমি জানি। তুমি যে ওদের পরিচয় পে'য়েছ, তা ওদের কিছু-তেই জান্‌তে দিও না। বিপদে পড়্‌বে। ওদের সঙ্গে এতকাল যে প্রকার ব্যবহার ক'রে এসেছ, ঠিক তেমনি ক'রো।' আমি বাবাজীর কথা শুনে আর আর দিনের মত তাদের সাষ্টাঙ্গ ক'রে এলাম। তারা লোক দেখ্‌লেই, ধূনির কাছে সাধু সেজে ব'সে থাক্‌তো, আর লোক না থাক্‌লে, গাঁজা খেয়ে গোলমাল কর্‌তো। কোনও সাধুকে গাঁজা খেতে দেখ্‌লেই, আমার সময়ে সময়ে মনে হ'তো ইনিও বুঝি ঐ রকমই একজন। ছেলেবেলা থেকে কারোকে গাঁজা খেতে দেখ্‌লেই আমি তার উপর খুব চ'টে যেতাম।

একদিন বুদ্ধগয়া যে'তে রাস্তার ধারে বট গাছের নীচে, গায়ে ভস্মমাখা, খুব তেজস্বী একটি সাধুকে, ধূনি জ্বেলে ব'সে আছেন দেখ্‌তে পেলাম। আমি তাঁর নিকটে গিয়ে উপস্থিত হ'তেই, তিনি আমাক বস্‌তে আসন দিলেন। পুনঃ পুনঃ তিনি গাঁজা খাচ্ছেন দেখে, আমার বড়ই বিরক্তি বোধ হ'লো। আমি সাধুকে বল্‌লাম, 'এত গাঁজা খেলে কি চিত্ত স্থির রেখে সাধন ভজন করা যায়? আপনি এত গাঁজা খান্ কেন?' সাধু একটু হেসে আমাকে বল্‌লেন, 'বৈঠ বাচ্ছা, গাঁজা কাহে পিতে, দেখোগে? আচ্ছা!' এই ব'লে তিনি তাঁর চেলাটিকে বল্‌লেন, 'আরে! দশচিলুম্ গাঞ্জা একদফে চড়াও।' চেলাটি একবারে দশ কল্কিতে গাঁজা চড়ায়ে, তার উপরে আগুন দিতে লাগ্‌লেন। সাধু একটি একটি ক'রে ঐ কল্কি নিয়ে, এক এক দমে, ফরসা ক'রে ফেলে দিতে লাগ্‌লেন। প্রতিদমেই তিনি ধূঁয়া গিলে, কিছুক্ষণের জন্য কুম্ভক ক'রে চোখ্ বুজে স্থির হ'য়ে থেকে, উহা ছেড়ে দিতে লাগ্‌লেন, আর আমাকে আঙ্গুল দিয়ে সঙ্কেত ক'রে ঐ ধূঁয়ার দিকে দৃষ্টি কর্‌তে বল্‌লেন। আমি ধূঁয়ার দিকে দৃষ্টি ক'রে দেখ্‌লাম, প্রত্যেক দমের ধূঁয়ায়ই, কুম্ভকের পর ছেড়ে দেওয়া মাত্র,

উহাতে দশ-মহাবিদ্যার এক-একটি আকৃতি হ'তে লাগ্‌লো। ক্রমে দশদমের ধূঁয়াতে সাধু আমাকে দশটি মহা-বিদ্যার রূপ দেখালেন। আমি ওখানে কিছু-ক্ষণ ব'সে থেকে, বুদ্ধ গয়ায় চ'লে গেলাম।

শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় অনেক সময় অনাবৃত মাঠে, ময়দানে, জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্ব্বতে, সাধুদের থাক্‌তে হয়। ঐ সকল স্থানে নানা প্রকার জল হাওয়ায় ব্যাধি জন্মাইতে পারে। তাহা নিবারণের জন্য সাধুরা গাঁজা, চরস, কুইচ্‌লা, প্রভৃতি নেশা বস্তু অভ্যাস কর্‌তে বাধ্য হন।

মদ গাঁজা প্রভৃতি নেশা বস্তুর স্বাভাবিক একটা গুণ এই যে, প্রকৃতির যথার্থ অবস্থাটি উহাতে প্রকাশ ক'রে দেয়। অনেক ভাল ভাল তান্ত্রিক সাধু সন্ন্যাসীরাও আত্মপরীক্ষার জন্য স্বভাব যথার্থই অধিকৃত হ'য়েছে কিনা, তাহা পরিষ্কাররূপে জান্‌বার জন্য, ভয়ানক প্রলোভনের বস্তু চোখের সাম্‌নে রেখে ঐ সকল নেশা ক'রে থাকেন। আর তাতে ভিতরের অবস্থা কি প্রকার হয় সে দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য কর্‌তে থাকেন। ভাল সাধুরা নেশার কখনও বশ হন না, প্রয়োজন মত গ্রহণ ক'রে থাকেন মাত্র।"

দয়া ও সহানুভূতিতে সাধারণ নীতি টেকে না।

এবার দু-তিনটি চোর গভীর রাত্রিতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আমাদের আশ্রমে কয় দিনই আসিয়া কোন সুবিধা না পাইয়া অমনি চলিয়া গেল। চোর আশ্রমে প্রবেশ করা মাত্রই ঠাকুর তাহাদের ডাকিয়া বলেন :—"ওহে! আমি যে জেগে।" চোরেরা ঠাকুরের ঐ কথা কয় দিনই শুনিয়া আশ্রমে আসা বন্ধ করিয়াছে। এই ব্যাপার জানিয়া আমাদের কারও কারও মনে এপ্রকার আলোচনা হইতেছে, 'ঠাকুর এরূপ করেন কেন? চোরকেত ধরিয়া শাস্তি দেওয়াই উচিত। পাছে চোরের উপর অত্যাচার হয়, এজন্য তাদের সরিয়া পড়িতে ঠাকুর এপ্রকার নিত্য তাদের সতর্ক করিয়া দিতেছেন মনে হয়।' ঠাকুরের নিকট এই বিষয়ে কথা তোলাতে ঠাকুর বলিলেন :—"যে স্থলে দয়া ও সহানুভূতি হয়, সাধারণ নীতি সেখানে টেকে না। গাজিপুরের পাহ্‌বারী (পয়-আহারী) বাবা প্রায় সর্ব্বদা সমাধিতে থাক্‌তেন, সপ্তাহে দু-তিন দিন মাত্র, কিছুকালের জন্য গোফার

দরজা খুলে রাখ্‌তেন, ঐ সময়ে অনেক বড় বড় লোক তাঁকে দর্শন কর্‌তে যেতেন। অনেকে অনেক মূল্যবান্ বস্তুও বাবাজীকে দিতেন। বাবাজীর গোফাতেই সে সব জিনিষ থাক্‌ত। বাবাজী পোয়াটাক দুধ মাত্র খেতেন। একদিন বাবাজী সকালে গোফা হ'তে বা'র হ'য়ে, গঙ্গায় স্নান কর্‌তে গেলেন, সেই অবসরে একটি চোর বাবাজীর গোফায় প্রবেশ ক'রে যা কিছু ছিল, সমস্ত জড় ক'রে কম্বলে গাঁঠরি বাঁধলে। এই সময়ে বাবাজী স্নান ক'রে উঠলেন, বাবাজীর দৃষ্টি ওদিকে পড়্‌তেই চোর বস্তা ফেলে পালাল। বাবাজী গোফায় এসে আসনে না ব'সে, অমনি ঐ বস্তাটি অনেক ক'রে মাথায় তুলে নিলেন। পরে লাঠি ভর দিয়ে ধীরে ধীরে চল্‌তে লাগলেন। আট দশবার রাস্তায় বিশ্রাম ক'রে, দেড় মাইল দু-মাইল পথ, পাঁচ ছয় ঘণ্টার চেষ্টায় চ'লে, সেই চোরের বাড়ীতে এসে হাঁপিয়ে পড়্‌লেন। বস্তাটি রেখে চোরকে ডেকে ব'ল্‌লেন। 'বাবা! আমি বুড়মানুষ, আমার উপর একটু দয়া তোমার হ'ল না! এতবড় বস্তাটি আমার জন্য বেঁধে রেখে এসেছ। লাঠিভর ক'রে চ'ল্‌তে আমার কষ্ট হয়,—আর এতবড় বোঝাকি আমি—বুড়, এ দু-মাইল পথ নিয়ে আস্‌তে পারি?' চোর তখন বাবাজীর পায়ে জড়িয়ে ধ'রে কান্দতে লাগ্‌লো। বাবাজী ব'ল্‌লেন, 'বাবা! এতে তোমার আর কি অপরাধ হ'য়েছে? অভাবে ক্লেশ পাও, আর আমার ঘরে অনাবশ্যক জিনিষগুলি র'য়েছে, পেলে তোমার উপকার হয়, নিবেনা কেন? তবে—আশা ক'রে বেঁধে রেখে, ফেলে না এলেই হতো। আমি যে বুড় মানুষ!' বাবাজীর এই ব্যবহারে চোরেরও একটা পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল। সাধারণ নীতির বিচারেত এই চোরকে জেল দেওয়াই ঠিক ছিল, লোকে ইহাই ব'ল্‌বে।"

একটু থামিয়া ঠাকুর আবার বলিলেন:—"অনেক দিন হয় প্রচারক অবস্থায়, একদিন আমি একটু বেশী রাত্রিতে মেছোবাজার দিয়ে বাসার দিকে যাচ্ছি, ফুটপাথের উপরে একটি মেয়েকে দাঁড়ান দেখ্‌তে পেলাম। ছেঁড়া খুব ময়লা কাপড় প'রে, সে খুব ব্যস্ততার সহিত রাস্তার একবার এদিকে একবার ওদিকে তাকাচ্ছে। তার শুষ্ক মলিন মুখ ও একপ্রকার কাতর ভাবে চাহনি

দেখে, আমার বুকে এসে লাগ্‌লো। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'মা! এত রাত্রিতে এভাবে তুমি দাঁড়ায়ে কেন?' মেয়েটি বল্‌লে, 'দেখুন তিন চারদিন আমার কিছু রোজগার হয় নাই। দু-দিন আমি কিছু খাই নাই।' তার কথা শুনে আমি কেঁদে ফেল্‌লাম। তাকে বল্‌লাম, 'আরও একটু অপেক্ষা কর, দেখ, আজ ভগবান্ কিছু দেন কি না।' এই ব'লে আমি রাত এগারটা পর্য্যন্ত ঘুরে ঘুরে, কয়েকটি ব্রাহ্মবন্ধু হ'তে পাঁচটি টাকা সংগ্রহ কর্‌লাম। তা দিয়ে আট-আনার খাবার, আড়াই টাকা দিয়ে একখানা ভাল সাড়ি এবং দুই টাকা নগদ নিয়ে মেয়েটির নিকটে উপস্থিত হ'লাম। মেয়েটিকে নমস্কার ক'রে, ওসব তার হাতে দিয়ে বল্‌লাম, 'মা! এই খাবার নিয়ে গিয়ে খাও। আজ ভগবান্ এই তোমাকে দিলেন। আর এই কাপড়খানা প'রে তুমি রাস্তায় দাঁড়িও। কিসে কি হয়, কিছু বুঝি না। এদিন থেকে উপাসনায় ভগবানের কৃপা বিশেষ ভাবে অনুভব কর্‌তে লাগলাম।"

ওয়া-পণ্ডিত ও ঠাকুর।

আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাধারমণ বাবুর পুত্র, পাঁচ সাত বৎসরের বালক, আধপাগ্‌লাটে 'ওয়াপণ্ডিত', ধূলা গায়ে নেংটাবস্থায় দৌড়িয়া আসিয়া তাহাদের বাড়ীর একটি গরুকে ধরিল। ঐ গরুটিকে লইয়া পণ্ডিত, ঠাকুরের বারো চোদ্দ হাত অন্তরে পুকুরের ধারে একটি চারা গাছের সহিত লম্বা দড়িতে বান্ধিয়া রাখিয়া, ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল, 'গোসাই গরু রইলো, দেখো, যেন ছোটে না, আমি আসি।' এই ব'লে পণ্ডিত দুহাতে পেছন চাপড়াইয়া খেলা করিতে দৌড় মারিল। ঠাকুর ঐ সময়ে পাশ ফিরিয়া গরুর দিকে মুখ করিয়া বসিলেন, অন্য কিছু না করিয়া,—ভাবাবেশে মগ্ন না থাকিয়া, একটানা গরুটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। বেলা প্রায় দুইটা হইতে সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত ওয়াপণ্ডিতের আর দেখা নাই। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আশ্রমের ভিতর দিয়া ওয়াপণ্ডিত যাইতেছে জানিতে পারিয়া, ঠাকুর তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,:—"পণ্ডিত! এখন তোমার গরুটি নেবে? আমি যে সেই থেকে তোমার গরু দেখ্‌ছি।" পণ্ডিত দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, 'ও! গরুটা এখানেই আছে? বেশ নিয়ে যাই।' এই বলিয়া গরুটিকে নিয়া গেল। ঠাকুরও আসন হইতে উঠিয়া শৌচে গেলেন।

ঠাকুরের স্বপ্ন ; সাধুতে বিশ্বাস।

গত রাত্রিতে তন্দ্রাবস্থায় বড়ই সুন্দর একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি। দেখিলাম, 'ধর্ম্মলাভের জন্য বহুস্থান ঘুরিয়া ফিরিয়া গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ঠাকুরের সম্মুখে যাইয়া দেখি তাঁর মস্তকে সুন্দর জটা, রং ঈষৎ তাম্রবর্ণ, প্রকাণ্ড শরীর, কড় ধরিয়া সটান অবস্থায় স্থির ভাবে আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া সম্মুখের দিকে তিনি অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। নিজের অসাধারণ সাধন প্রভাবে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে যেন অগ্রাহ্য করিতেছেন। ইঁহার নিকটে আমি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কিছুকাল নানাস্থানে থাকিয়া সাধন ভজন করিলাম। অবশেষে এই ঠাকুরের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি তিনি আর সেই নাই। সেই উগ্রতেজস্বী আকৃতি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এখন তাঁহার রূপ অন্য প্রকার; জটাভার বৃদ্ধি পাইয়া কোমর পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় ঈষৎ শ্যামবর্ণ, স্থূলাকৃতি গোঁসাই, স্থির গম্ভীর শান্তভাবে মাধুর্য্যরসে ডুবিয়া, নিজের অবস্থায় বিভোর হইয়া, যেন ঢুলু ঢুলু করিতেছেন। সেই চিত্ত-মোহন রূপের দিকে তাকাইয়া আমি অবশ হইয়া পড়িলাম। ঠাকুর তখন মাথা তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'কি! তুমি কি চাও, দীক্ষা নিবে? আমি বলিলাম, 'হাঁ, নিব।' ঠাকুর বলিলেন, 'পূর্ব্বে যার নিকটে দীক্ষা নিয়েছিলে তাকে যে ত্যাগ কর্‌তে হবে। আমি বলিলাম, 'আপনাকে দেখে, সেই রূপ যে, আমি ভুলে গেছি।' ঠাকুর আমাকে তখন আবার দীক্ষা দিলেন। নিদ্রা ভঙ্গের পরে এপর্য্যন্ত ঠাকুরের সেই রূপটি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুল হইতেছে না। অন্তরে যেন সেই অপূর্ব্ব রূপের একটা ছাপ পড়িয়া রহিয়াছে। ঠাকুরকে অবসর মত নির্জ্জনে এই বিষয় বলাতে ঠাকুর বলিলেনঃ—"এসব স্বপ্ন লিখে রাখ্‌তে হয়। এক মিনিটের স্বপ্নে একটা জন্মের ভোগও শেষ হ'য়ে যেতে পারে। আমার জীবনের একটা দিক স্বপ্নে পরিষ্কার ক'রে দিয়েছে। পূর্ব্বে আমি কখনও স্বপ্ন সত্য হয় ইহা বিশ্বাস কর্‌তাম না, পরে দেখে দেখে বিশ্বাস কর্‌তে হয়েছে।'

'ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচারক অবস্থায়, বহুকাল পূর্ব্বে আমার একবার হার্টডিজিজ্‌ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল, বেদনা হওয়া মাত্রেই আমি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌তাম, এক মিনিট পূর্ব্বেও বুঝ্‌তে পারতাম না। কখন কোথায় কি অবস্থায় পড়ি, কি মরি, এই আশঙ্কায় আমার দেহ রক্ষার জন্য একটি দ্বারওয়ান নিযুক্ত হ'য়েছিল।

কোথাও বার্ হ'তে পার্তাম না ব'লে, মনে বড়ই আক্ষেপ হ'তো। মনে হ'তো, যদি কাজ কর্ম্মই কিছু কর্তে না পার্লাম, তাহ'লে আর বেঁচে থেকে লাভ কি? এসময়ে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে একটি বাসায় আমি থাক্তাম। শেষ রাত্রিতে স্বপ্ন দেখ্লাম, জগন্নাথের ঘাটে অনেক সাধু এসে র'য়েছেন, তাঁদের মধ্যে একটি সাধু গায়ে ভস্ম, মাথায় জটা,একখানা কম্বল গায়ে দিয়ে ধূনী জ্বেলে ব'সে আছেন। আমাকে হাতনেড়ে ডাক্লেন এবং বল্লেন, 'বাচ্ছা ইঁহা আয় যাও, দাওয়াই লে লেও, বেমার ছুট্ যায়েগা। স্বপ্নটি দেখে জেগে পড়্লাম, প্রাণ বড়ই অস্থির হ'ল, ভাব্লাম একবার গঙ্গাতীরে যেয়ে দেখিনা কেন! আমি অমনি বার হ'য়ে পড়্লাম। গঙ্গাতীরে জগন্নাথের ঘাটে গিয়ে দেখি গঙ্গাসাগরের যাত্রী বিস্তর সাধু ওখানে আড্ডা ক'রে ব'সে আছেন। স্বপ্নে যে স্থানটিতে আমি সাধু দর্শন পেয়েছিলাম, ঠিক সেখানে গিয়ে দেখি সেই সাধুই ধূনী জ্বেলে ব'সে রয়েছেন; আমাকে দেখে খুব স্নেহের সহিত 'বৈঠ বাচ্ছা, বৈঠ,দাওয়াই লেওগে?' এই ব'লে তিনি একটা কৌটা হ'তে অতি সামান্য পরিমাণে একটু ভস্ম আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, 'এহি পায় লেও, মূর্চ্ছা তোমারা আউর কভি নেহি হোগা। হামারা পাশ দাওয়াই আউর হ্যায় নেই, রহেনেসে তোমারা বেমার একদম্ ছুট্ যাতে।' এই ব'লে তিনি আমাকে ধূনী হ'তে কতকগুলি ভস্ম দিয়ে বল্লেন 'কয় রোজ এহি ভসম্ লেকে শরীরমে আচ্ছা কর্কে রগ্ড়াও।' আমি তখন উহা নিয়ে এলাম। প্রতিদিন ঐ ভস্ম কয়দিন ধ'রে গায়ে মাখ্লাম। সেই সময়ে আমার ব্রাহ্মবন্ধু অনেকে আমাকে ভয়ানক কুসংস্কারী ব'লে মনে কর্তে লাগলেন। আমার কিন্তু ঐ সময় হ'তে হার্টডিজিজে আর মূর্চ্ছা হয় নাই। এই ঘটনার পর হ'তে সাধুদের প্রতি আমার একটা খুব শ্রদ্ধা এলো। রাস্তা ঘাটে সাধুবেশ দেখ্লেই আমি ভক্তি ক'রে নমস্কার কর্তাম। ভাল মন্দ কিছুই বিচার কর্তাম না। মনে হ'তো 'কার ভিতরে কি আছে তাতো আমি জানি না। নমস্কার করায় আর দোষ কি? যদি ভাগ্যক্রমে ঐ নমস্কার কোনও মহাপুরুষকে হ'য়ে পড়ে, তা হ'লে বিশেষ কল্যাণওতো হ'তে পারে।"

'একদিন আমি মৃজাপুর ষ্ট্রীট্ দিয়ে যাচ্ছি, দেখ্তে পেলাম একটি দীর্ঘাকৃতি কাঙ্গালবেশ-সাধু, দণ্ডকমণ্ডলু হাতে ছুটে আস্ছেন। দূর হ'তে দেখ্তে পেয়ে আমি তাঁকে নমস্কার কর্ব মনে ক'রে, ফুট্পাতের অপরদিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি নিকটে আস্তেই আমি তাঁকে নমস্কার কর্লাম। চল্তি মুখে তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর্লেন। তখন মনে হলো যেন আধমণ বরফ আমার মাথায় কেহ চাপিয়ে দিলে। সমস্ত শরীরটি আমার ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। আমি সাধুর সঙ্গে যেতে মনস্থ করা মাত্রে সাধু আমার পিঠে একটি চাপড় মেরে বল্লেন, 'চলো, বাচ্ছা চলো,' এই ব'লে খুব দ্রুতপদে যেতে লাগ্লেন। আমিও তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চল্লাম। কি ভাবে, কোন্ দিক্ দিয়ে কোথায় যে গেলাম কিছুই জানি না। একেবারে যেন মিস্মেরাইজড্ হ'য়ে পড়্লাম। কতক্ষণ পরে দেখি, ইডেন গার্ডেনে উপস্থিত হ'য়েছি। সাধু আমাকে একটা গাছের নীচে বসায়ে অনেক উপদেশ দিলেন। গুরু ব্যতীত কিছুই হয় না, তিনি পুনঃ পুনঃ বল্তে লাগ্লেন। আমি তাঁর নিকটে দীক্ষা প্রার্থনা করাতে তিনি আমাকে বল্লেন, না, তা হবে না, তোমার গুরু নির্দ্দিষ্ট রয়েছেন, সময়ে তিনিই তোমাকে খুঁজে নিবেন, ব্যস্ত হ'তে হবে না। তার পর আমি তাঁর অনুসরণ কর্তে ইচ্ছুক হ'য়ে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চল্লাম। হাবড়ার পোলের উপরে চল্তে চল্তে দেখ্লাম হঠাৎ সাধু অদৃশ্য হ'য়ে পড়্লেন। এ ঘটনার পরে সাধুদের প্রতি আমার আরও শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।'

একবার স্বপ্নে দেখ্লাম, 'ভগবানকে লাভ কর্বার জন্য বহুস্থান ঘুরে ঘুরে একটা স্থানে উপস্থিত হওয়া মাত্রেই একখানা সাইনবোর্ড উড়্তে উড়্তে আমার সাম্নে এসে পড়্ল। সাইনবোর্ড খানাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা, "এই পথে চল" লেখার পরেই মুষ্টিবদ্ধ তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করা একখানা হাত ওতে রয়েছে দেখ্তে পেলাম। সাইনবোর্ড খানা শূন্যপথে যেতে লাগ্ল। আমি অন্য কোনও দিকে লক্ষ্য না ক'রে, সেই অঙ্গুলি সঙ্কেত ধ'রে চল্তে লাগ্লাম। হাত খানা আমার আগে আগে চল্লো, আমি কত বন জঙ্গল, পাহাড় পর্ব্বত,

দুর্গমস্থানে, পথে অপথে, চ'লে চ'লে একটা ভয়ঙ্কর নদীর পারে যেয়ে উপস্থিত হ'লাম, নদীর যেন কূল কিনারা নাই, সেখানে পঁহুছে দেখি, আর একখানা সাইনবোর্ড নদীর ঠিক পারেই রয়েছে, তাতে লেখা "বিশ্বাসীদিগের পারে যাইবার ঘাট।' তার পর আরও কত। এসব স্বপ্ন, স্বপ্ন নয়, যথার্থ অবস্থাই কারও কারও স্বপ্নে প্রকাশ হয়।"

মহাত্মা-পুরুষের চামারীবৃত্তি।

ঠাকুর কথায় কথায় আজ বলিলেন :—"একদিন মেছোবাজার ষ্ট্রীট্ দিয়ে যাচ্ছি, আমার জুতা ছিঁড়ে গেল। রাস্তার উপরে একটি চামারকে দেখে, তাকে জুতা সেলাই করতে দিলাম, কিন্তু সে পয়সা চুক্তি কর্‌লে না। জুতা সেলাই হ'য়ে গেল, আমি তাকে পয়সা দিলাম। সেই পয়সা হ'তে সে আমাকে দুটি পয়সা ফিরিয়ে দিলে, এবং তখনই তার যন্ত্রাদি গুটিয়ে নিয়ে চল্‌লো। আমার একটু আশ্চর্য্য বোধ হ'লো, আমি তার পিছনে পিছনে চ'ল্‌লাম। সে গঙ্গাতীরে বাবু-ঘাঠে যে'য়ে তল্‌পি তল্‌পা রাস্তার নীচে একটা ভাঙ্গা খিলানের ভিতর গুঁজে রেখে গঙ্গাস্নান কর্‌লে। পরে তিলক ক'রে সন্ধা তর্পনাদি ক'রে, খিদিরপুরের দিকে চল্‌লো। আমিও তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেতে লাগ্‌লাম। সে একটি বাড়ীতে প্রবেশ কর্‌লে। আমিও ঐ বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হওয়া মাত্রেই, একটি লোক এসে আমাকে অতিথি মনে ক'রে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। যেয়ে দেখি, ঐ চামারটি একজন মহান্ত। তাঁর বিস্তর শিষ্যসেবক আছেন। আখ্‌ড়ায়-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন। খুব ধুমধাম ব্যাপার। আমি দেখে শুনে একে-বারে অবাক্ হ'য়ে গেলাম। মহান্তকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'আপনার এত শিষ্য-সেবক, নিজে মহান্ত, জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিছুরইতো অভাব নাই, তবে আপনি জুতা সেলাই করেন কেন?' মহান্ত বাবাজী আমার প্রশ্ন শুনে কেন্দে ফেল্‌লেন, এবং হাত জোড় ক'রে তাঁর গুরুদেবকে স্মরণ ক'রে পুনঃ পুনঃ নমস্কার কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লেন,—'গুরু আমার বড় দয়াল ছিলেন, একদিন অতিথিকে ভোজন

করাবার পূর্ব্বেই আমি আহার করেছিলাম, তাতে তিনি আমাকে শাসন ক'রে বল্‌লেন, 'আরে, তু কাহে সাধু হুয়া, তু-তো চামার হো।' 'আমার গুরুদেবের সেই বাক্য আমা হ'তে অন্যথা হবে ?' এই জন্য আমি সেই দিন থেকেই চামারী ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ কর্‌ছি। সারাদিন চামারী ক'রে নিজের আহারোপযোগী চার আনা পয়সা মাত্র পেলেই, আমি চ'লে আসি। গুরুদেব শেষ কালে তাঁর গদিতে আমাকেই দয়া ক'রে রেখে গিয়েছেন। কিন্তু তা হ'লেও, সাধ্যমত চামারীবৃত্তি দ্বারা, তাঁরই সেবা ক'রে দিন কাটায়ে দিচ্ছি। আমাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন, যেন শেষদিন পর্য্যন্ত আমি আমার গুরুদেবের সেই বাক্য রক্ষা ক'রে যেতে পারি।

ইঁহাকে দেখার পর আমার মনে হ'ল, এ প্রকার ছদ্মবেশেতে মহাত্মারা যেখানে সেখানে থাক্‌তে পারেন, বাইরের আকার বেশভূষা ও আচার ব্যবহার দেখে যখন তাঁদের চেন্‌বার যো নাই, তখন কার কি অবস্থা কি প্রকারে বুঝ্‌ব! সেই হ'তে আমি রাস্তায় বা'র হলেই দুদিকে স্ত্রীলোক, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, মেথর, চামার, হাড়ী, ডোম, মুটে মজুর, যাকেই রাস্তায় সম্মুখে দুপাশে দেখ্‌তে পাই, মনে মনে নমস্কার ক'রে চলি। এতে ক'রে লোকালয়ে যে সকল মহাত্মা মহাপুরুষেরা সময়ে সময়ে ঐ প্রকার ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ান, সামনে পড়্‌লেই তাঁদেরও ধ'রে নেওয়া যায়।"

কুল-গুরু, গ্রন্থ-গুরু, স্ত্রী-গুরু, সিদ্ধ-গুরু এবং সদ্‌গুরু সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্নোত্তর।

যথার্থ ধর্ম্মলাভের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা, মনের উৎসাহ অনেকের ভিতরে থাকিলেও আজকাল উপযুক্ত গুরুর অভাবে, সে বিষয়ে বড়ই অসুবিধা হইতেছে। যাঁহারা কৌলিক গুরুর কার্য্য করিতেছেন, দেশের দুরবস্থা বশতঃ, সময়ের গুণে, তাঁদের আর সে অবস্থা নাই। বর্ত্তমান শিক্ষার গুণে বা সময়ের প্রভাবে লোকের মতি বুদ্ধিও এখন অন্য প্রকার। সরল বিশ্বাসে কৌলিক গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সকলে তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না, এজন্য অনেকে পুস্তক দেখিয়া যোগাভ্যাসের চেষ্টা করিতেছেন।

কিন্তু তাহাতেওত কেহ কেহ বিপন্ন হইতেছেন, সুতরাং এখন উপায় কি? এ বিষয়ে সংশয় হওয়াতে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কুলগুরু কাহাকে বলে? কৌলিক গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণে আজ কাল লোকে তেমন ফল পায় না কেন? এতে কোনও প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে কি ?

ঠাকুর প্রশ্ন শুনিয়া এই প্রকার বলিতে লাগিলেন ঃ—আজ কাল গুরু করণ বড়ই সমস্যার বিষয় হ'য়ে পড়েছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে যাঁরা গুরু ছিলেন,—সব সিদ্ধ পুরুষই ছিলেন। কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি জাগ্রত হ'লেই তাঁদের কুলগুরু বলা হ'তো। এখন কুলগুরু বল্‌তে লোকে বংশপরম্পরা গুরু বুঝে। এখন যাঁরা গুরুর কার্য্য কর্‌ছেন, অনুসন্ধান নিলে জানা যায়, তাঁদের বংশে কেহ না কেহ সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বেও সিদ্ধ-পুরুষদের বংশে যাঁরা গুরুর কার্য্য কর্‌তেন, সিদ্ধ না হ'লেও তাঁরা বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। জ্যোতিষাদিও তাঁরা ভাল জান্‌তেন। কেহ দীক্ষা প্রার্থী হ'লে গুরুরা তার কোষ্ঠি লইয়া জন্ম লগ্ন ধ'রে গণনা কর্‌তেন। গণনা দ্বারা দীক্ষার্থীর প্রকৃতি সাত্ত্বিক, কি রাজসিক অথবা তামসিক তাহা জেনে নিয়ে, ঐ প্রকৃতির সহিত কোন্ দেবতার বিশেষ সম্বন্ধ তাহা স্থির ক'রে নিতেন। পরে ঐ ব্যক্তির দেহ মন ও প্রকৃতির সহিত চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, এমন কি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনুকূল প্রতিকুল কি প্রকারের যোগাযোগ, তাও নিরূপণ ক'রে নিতেন। তার পর যে সকল অক্ষর স্মরণে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, তার গুণানুযায়ী প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অভিমুখে তাকে অগ্রসর হ'তে সাহায্য কর্‌বে, তা একটি একটি ক'রে গণনা দ্বারা বার্ ক'রে ফেল্‌তেন। পরে সে সকল অক্ষরের সংযোজনায় মন্ত্র উদ্ধার ক'রে শিষ্যকে প্রদান কর্‌তেন; এবং তদনুযায়ী পূজাপদ্ধতিও ব্যবস্থা কর্‌তেন। এই প্রণালীতে দীক্ষা হ'লে গুরুর কোন সাহায্য না পেলেও শিষ্য যদি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যথাবৎ মন্ত্র জপ ও ঐ সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাহ'লে তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের এবং ঐ দেবতার একটা সাহায্য পেয়ে, ইষ্ট বস্তু প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হ'তে পারেন। ঠিক প্রকৃতির অনুযায়ী প্রণালী মত দীক্ষা পেয়ে, সাধক যদি রীতিমত চেষ্টা

করেন, তা'হলে তার একটা ফল হ'তেই হবে। এ জন্য অনেক স্থলে দেখা যায়, গুরু সাধারণ অবস্থায় থাক্‌লেও শিষ্য সিদ্ধিলাভ করেন। বর্ত্তমান সময়ে ঠিক এই প্রণালী ধ'রে দীক্ষা প্রায় হয় না। শাক্ত ঘরে একটি বৈষ্ণব প্রকৃতির লোককে, গুরু এসে বংশ প্রণালী অনুসারে, হয়ত শক্তির উপাসনাই দিলেন, আবার বৈষ্ণব বংশের একটি শাক্ত ভাবের লোককে হয়ত বিষ্ণু মন্ত্রই দিয়া সেই মত নিয়ম পদ্ধতি ব'লে গেলেন। এই প্রকার, প্রকৃতির বিরুদ্ধ পথে চ'লে সাধন ভজন করায়, কোন উপকারই হ'তে দেখা যায় না। তামস-ভাবের একটি লোকের সাত্ত্বিক উপাসনা কর্‌তে হ'লে, তার যেমন, প্রকৃতি মন এমন কি শরীরের পর্য্যন্ত, অনু পরমাণুর প্রলয় ঘটাইয়া, ও সকল, সাত্ত্বিক উপাদানে গঠিত কর্‌তে হয়, না হ'লে সত্ত্বগুণী দেবতার প্রসন্নতা লাভ অসম্ভব। সেই প্রকার সত্ত্বগুণীরও তামস দেবদেবীর উপাসনা করতে হ'লে, ঐ প্রকার কর্‌তে হয়। এসব সহজ নয়। এ জন্যই পনর বৎসর বয়সে কেহ সাধন নিয়া আশী বৎসর পর্য্যন্ত জপ তপ ক'রেও, একটা দেবদেবীর দর্শন বা কৃপা প্রত্যক্ষ বিষয়ে কোন সাক্ষ্য দিতে পারেন না। আবার কেহ বা ছেলে বয়সেই, অল্পদিন সাধন ভজন ক'রে, নিজ উপাস্য দেবতার কৃপা বিষয়ে পরিষ্কার প্রমাণ দিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে যাঁরা গুরুর কাজ করেন, প্রায়ই অন্য কোন বিচার না ক'রে, শুধু বংশের ধারা ধ'রে তাঁরা সাধন দেন বলেই, অনেক অনিষ্ট হ'চ্ছে। কারণ সাধন ভজন ক'রে লোকে ফল না পাওয়াতে মন্ত্রের উপর, ক্রিয়ার উপর এবং দেবদেবীর উপর একটা অবিশ্বাস এসে পড়্‌ছে। তবে কৌলিক গুরুর নিকট বিধিমত দীক্ষা বা গুরুশক্তির কোন সাহায্য না পেলেও অন্য কোন অনিস্টের তেমন সম্ভাবনা নাই। বরং সাধকের শ্রদ্ধা ভক্তি নিষ্ঠা এবং চেষ্টা থাক্‌লে ওতে উপকারই হয়, কিন্তু অজ্ঞাত কুলশীলের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করায় অনেক সময় বিষম বিপদ ঘটে।"

প্রশ্ন—আজকাল অনেক পুস্তকেইতো যোগাভ্যাসের প্রণালী সমস্ত লেখা আছে দেখ্‌তে পাই। সে সব দেখে যোগাভ্যাস করাতে কি তেমন উপকার হয় না ?

উত্তর—"উপকার কি! গ্রন্থাদি দেখে যোগাভ্যাস করতে যাওয়া আরও ভয়ানক; অনেকে ও রকম করতে গিয়ে হার্ণিয়া, কুষ্ঠ, মস্তিষ্কের রোগ, কখন বা অন্য কোন প্রকার উৎকট রোগে প'ড়ে একেবারে সর্ব্বনাশ ক'রে ফেলেন। সাধন ভজনের কোন ক্রিয়াই, কৌশল না জেনে, শুধু পুস্তক দেখে অভ্যাস করতে নাই। প্রায় সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানবিধিই, শাস্ত্রকর্ত্তারা খুব সঙ্কেতে লিখে গিয়েছেন। ওসব ক্রিয়ার অভ্যাস করতে হ'লেই, ক্রিয়াবান্ গুরুর নিকটে গিয়ে সন্ধানটি জানতে হয়, প্রণালী ধ'রে শিক্ষা করতে হয়। না হ'লে হয় না।"

প্রশ্ন ঃ—কোন কোন স্ত্রীলোকও তো গুরু আছেন—তাঁরা দীক্ষা দিচ্ছেন,—শুনতে পাই তাঁরা নাকি সিদ্ধা?

উত্তর ঃ—তা দিন! তবে সিদ্ধাই হউন আর মহাসিদ্ধাই হউন, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করলেও নারী দেহ কখনও আচার্য্য হ'তে পারে না। গুরুর দেহ সর্ব্বদাই পবিত্র; তাঁকে সেবা ক'রে স্পর্শ ক'রে শিষ্য শুদ্ধ হ'ন। শাস্ত্র কর্ত্তারা কোনও কোনও প্রাকৃতিক অনিবার্য্য কারণে, 'স্ত্রীশরীর স্বাভাবিকই অশুচি' ব'লে গেছেন। ব্রাহ্মণীও তো যজ্ঞোপবীত ধারণ করতে পারেন না; এখন যদি কেহ তা'ই করেন, কি করবে? শাস্ত্রের ব্যবস্থা ও অনুশাসন যাঁরা মানেন না, গ্রাহ্য করেন না, তাঁরা যা ইচ্ছা করতে পারেন! তাতে আর কথা কি!"

প্রশ্ন ঃ—মহাপুরুষদের কথামত যদি কেহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য্য করেন?

উত্তর ঃ—"মহাপুরুষদের কথা তো শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় না! তবে শাস্ত্রের সাধারণ ব্যবস্থার সহিত মিল না হ'তে পারে। তা ব'লেই যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ হবে, তা বলা যায় না। 'বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা' এতো শাস্ত্রেই আছে। শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য, ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য, মহাপুরুষ কেন? স্বয়ং ভগবানও যদি করতে বলেন, অভিমান থাকতে, বিচারবুদ্ধি থাকতে তা কেহ করলে, তাকে সেই মত দণ্ডটিও পে'তে হয়। ভগবানের কথাতেইতো ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' ব'লে প্রকারান্তরে মিথ্যা কথাটি বলেছিলেন, তাতে তিনি নিষ্কৃতি পেলেন কই। ভগবানইতো এজন্য তাঁকে আবার নরকও দর্শন

করালেন। এ প্রকার দৃষ্টান্ত আরো ঢের আছে। ভগবানও একটু কম পাত্র নন্ তো! শাস্ত্রকর্ত্তারা সবই দেখায়েছেন।"

এসকল কথার পরে, সিদ্ধ পুরুষের নিকট দীক্ষা গ্রহণে কি প্রকার ইষ্টানিষ্টের সম্ভাবনা, জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর এই প্রকার বলিতে লাগিলেন:—"বিচার শূন্য হ'য়ে 'কেহ সিদ্ধ পুরুষ' শুনা মাত্রেই, তাঁর নিকটে গিয়ে দীক্ষা নেওয়াও ঠিক নয়। সিদ্ধতো কত রকম আছে! ভূত-সিদ্ধ, প্রেত-সিদ্ধ, কোন বিশেষ বিশেষ দেবদেবী-সিদ্ধ, ঐশ্বর্য্য-সিদ্ধ। যাঁর যা সঙ্কল্প, তিনি তা লাভ কর্লেই তো সিদ্ধ হ'লেন। আমি যা চাই, সে বিষয়ে যিনি সিদ্ধ নন্, তিনি আমাকে সেই পথ ব'লে দিতে পার্বেন কেন? ও বিষয়ে সাহায্যই বা কি কর্বেন! যিনি যে বিষয়ে সিদ্ধ, তিনি সেই পথই মাত্র বল্তে পারেন, সিদ্ধ হ'লেইতো আর সর্ব্বজ্ঞ হ'লেন না! আর সিদ্ধ হ'লেই যে তিনি ধার্ম্মিকও হবেন, তাও বলা যায় না। ধর্ম্মের সঙ্গে কোন প্রকার সংস্রব না রেখেও, কতলোক কত বিষয়ে সিদ্ধ হ'চ্ছেন! শুধু যোগাঙ্গ মাত্র অভ্যাস দ্বারা, ঐশ্বর্য্যেতে ক'রে কোন ব্যক্তি চন্দ্রলোকে, সূর্য্যলোকে, নক্ষত্র লোকে, সশরীরে অনায়াসে গতি বিধি কর্তে পারেন, অথচ তিনি নাস্তিক, ইহা কিছুই অসম্ভব নয়। পূর্ব্বে ঋষিপদবাচ্য হ'য়েও কেহ কেহ নাস্তিক ছিলেন। সুতরাং কোন সিদ্ধব্যক্তির নিকটেও সাধন গ্রহণের পূর্ব্বে, তিনি কিসে সিদ্ধ, সেটি বেশ ক'রে জেনে নিতে হয়। সাত্ত্বিক প্রকৃতির একটি লোক সিদ্ধ নাম শুনেই, যদি একজন কাপালিক বা পিশাচ-সিদ্ধের নিকটে গিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করেন, এবং সেই প্রণালী মত, মদ মাংসাদি নিয়ে তামস-সাধন কর্তে থাকেন, তাতে তাঁর আর কি উপকার হবে? প্রকৃতির বিরুদ্ধ সাধন ক'রে সিদ্ধগুরুর সাহায্য সত্ত্বেও উপকার কিছুই হবে না, বরং অনিষ্টই হবে। এজন্য দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে সিদ্ধপুরুষ জেনেও, রীতিমত তাঁর সঙ্গ কিছুকাল কর্তে হয়। ক্রমে তাঁর আচার ব্যবহার, ক্রিয়া-কলাপ, সাধন ভজন দেখে, যদি তাঁর প্রতি চিত্ত তেমন আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে এবং নিজের লক্ষ্য বিষয়ে তাঁকে সিদ্ধ ব'লে জানা যায়, তবেই তাঁর নিকটে দীক্ষা নেওয়া যায়। এ প্রকার হ'লে সিদ্ধ গুরুর

সাহায্যে এবং নিজ প্রকৃতির অনুকূল সাধন-চেষ্টায়, তিনি অচিরে সিদ্ধিলাভ কর্‌তে পারেন।”

ঠাকুর এই প্রকার বলিয়া নীরব হইলেন, পরে আবার জিজ্ঞাসা করা হইল—সদ্‌গুরু কি? তাঁর দীক্ষার বিশেষত্বইবা কি? আর ঐ দীক্ষা লাভ হ'লে কি অবস্থা হয়?

ঠাকুর ভাবাবেশে, থাকিয়া থাকিয়া, এই প্রকার বলিতে লাগিলেন ঃ—“সদ্‌গুরুর নিকটে দীক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের। সেখানে কোন প্রকার কালাকাল, যোগ্যাযোগ্য বিচার নাই, তাহা সম্পূর্ণ কৃপা সাপেক্ষ। এই দীক্ষা যে কোন অবস্থায়, যথায় তথায়, একমাত্র ভগবানের কৃপাতেই হ'য়ে থাকে। ভগবানই ‘সদ্‌গুরু’। ভগবানের পদাশ্রিত, ভগবজ্জন মহাপুরুষেরাই ‘সদ্‌গুরু’। সদ্‌গুরু শিষ্য করেন না;—তিনি গুরু করেন। শিষ্যের ভিতরে তিনি নিজের ইষ্ট দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তাঁরই সেবা পূজা করেন। শিষ্যের দেহ তাঁর দেব-মন্দির। দেবমন্দিরে কোন প্রকার অপচার অনাচার হ'লে, সেবক যেমন তাহা দে'খে লজ্জিত হন, দুঃখিত হন; শিষ্যেরও কোন প্রকার দুর্দ্দশা দেখ্‌লে এই গুরু তেম্‌নি নিজেরই সেবা পূজার ত্রুটি হ'য়েছে মনে ক'রে মলিন হ'য়ে যান। সদ্‌গুরু প্রদত্ত নাম—নাম নয়, অক্ষর নয়, বা একটা শব্দ নয়।—এই নামেই ভগবানের অনন্ত-শক্তি। শিষ্যের ভিতরে এই শক্তিসঞ্চারই সদ্‌গুরুর দীক্ষা। এই দীক্ষা, ভগবানের কৃপায় একবার কারও লাভ হ'লে, তার নিজের আর কিছুই কর্‌বার থাকে না। তার জীবনের সমস্ত কার্য্য, এমন কি প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস পর্য্যন্ত, সেই এক জনারই ইচ্ছাধীন। কুমীরেপোকার আরসোলা ধরার মত সদ্‌গুরু, শক্তিসঞ্চার ক'রে দীক্ষা দিয়ে শিষ্যকে ক্রমে আত্মবৎ ক'রে নেন। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে আছে ঃ—‘দীক্ষা গ্রহণ মাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ।”

সাধন-চেষ্টাই উন্নতির সোপান ; নিরাশায় ভরসা।

জীবনের নানা প্রকার দুরবস্থা ভাবিয়া ধর্ম্মলাভ বিষয়ে একান্ত নিরাশ হইয়া ঠাকুরকে বলিলাম, 'ব্রাহ্ম সমাজে যতদিন ছিলাম, মনে হয় বেশ ছিলাম। তখন কেমন একটা সত্যে অনুরাগ, ধর্ম্মে উৎসাহ, সকলদিকেই উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ছিল। সবদিকেই একটা সুন্দর অবস্থা ভোগ করেছি। এখনত সেরূপ আর জীবনে কিছুই দেখ্‌ছি না। একটা কিছু ধ'রে দু-পাঁচ দিন চেষ্টা করতে না করতেই, হয়রাণ হ'য়ে পড়ি, একটা দোষ দূর করতে গিয়ে, ভিতরের আরও দশটা গলদ বার্ হ'য়ে পড়ে। হাত পা যেন ভেঙ্গে যায়, মনের উৎসাহ নিবে আসে, এরূপ হয় কেন? সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেয়ে আমার উন্নতির পরিণাম কি এই হ'লো?

ঠাকুর বলিলেন :—"এই সাধন যাঁরা পেয়েছেন, প্রায় অনেকেরই এই অবস্থা। আমি সকল বিষয়ে কর্ত্তা, আমার উন্নতি আমিই কর্‌তে পারি,—এই অভিমানটি থাক্‌তে, মানুষ ভগবানের দিকে তাকায় না। এই অভিমানটি নষ্ট কর্‌বার জন্যই, এই প্রকার অবস্থা আসা প্রয়োজন। মানুষ যে কিছুই নয়, মানুষের যে কিছুই কর্‌বার সাধ্য নাই, এটি বেশ ক'রে বুঝ্‌তে হবে। না হ'লে ভগবানের দিকে কেহ দৃষ্টিও করবে না, উন্নতিও হবে না।"

এই বলিয়া ঠাকুর কি[illegible] হইয়া বসিয়া রহিলেন, পরে ভাবাবেশে ঢুলিয়া ঢুলিয়া, বলিতে লাগিলেন।

ঠাকুর বলিলেন :—[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible]নকে পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম করতে ব'লেছেন। এই [illegible] আসবে। নানা প্রকার দুরবস্থায় প'ড়ে, প্রলোভনের সহিত সাধকে সংগ্রাম করতে থাকবে। এই সংগ্রামে সাধক কখনও বা প্রলোভনকে পরাস্ত করবে, আবার কখনও বা প্রলোভনে সাধককে পরাজয় করবে। এই বিষম সংগ্রামে অনেক কাল সাধককে কাটাতে হয়। এ সময়ে একমাত্র গুরুদত্ত নামকেই [illegible] অবলম্বন পূর্ব্বক, রিপুকুলের সহিত প্রাণপনে যুদ্ধ করতে হয়। সংগ্রামের অবস্থা[illegible] এমন ভয়ানক অবস্থা, সাধকজীবনে আর নাই। বারম্বার প্রাণপণ—চেষ্টা ক'[illegible] সাধক যখন নানা প্রকার ভয়ঙ্কর প্রলোভন ও রিপুগণ দ্বারা পুনঃ পুনঃ পরাস্ত

হ'তে থাকে, তখন তার আর ধৈর্য্য থাকে না। 'সাধন ভজনে কিছুই হয় না, সাধন ভজন সমস্তই বৃথা' সাধক এরূপ মনে ক'রে, একেবারে নাস্তিকের মত হ'য়ে পড়ে। যারা দু-চার ধাক্কা খেয়েই একেবারে হাত পা ছেড়ে দিয়ে বসে, তাদের ভোগ শেষ হ'তে, কালবিলম্ব হয়। আর যারা পুনঃ পুনঃ প'ড়েও গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে,—সংগ্রামে নিবৃত্ত হয় না, খুব শীঘ্রই তাদের ভোগ শেষ হ'য়ে যায়। যার যেমন প্রকৃতি, সে সেই মতই সংগ্রাম কর্‌তে পারে। কেহ কম, কেহ বেশি। কিন্তু অবশেষে সকলকেই এই যুদ্ধে পরাস্ত হ'তে হবে। যুদ্ধে প্রতিপদে পরাস্ত হ'য়ে হ'য়ে যখন একেবারে নিস্তেজ হ'য়ে পড়্‌বে, হাড়মুড় ভেঙ্গে একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে, চারিদিক অন্ধকার দেখ্‌বে, তখন সাধক বুঝ্‌বে যে তার ক্ষমতায় আর কিছুই হবার নয়। সে নিতান্তই অসার। একটি সামান্য বিষয়েও তার কিছুই কর্‌বার সামর্থ্য নাই। তখনই সে নিজকে যথার্থ হীন, পতিত, অধম জ্ঞান ক'রে প্রবল শক্তিশালীর দিকে তাকাবে। অন্তরের সহিত তাঁর আশ্রয় নিবে। তাঁরই উপর একান্ত ভাবে নির্ভর ক'রে, যথার্থ কৃপা প্রার্থী হবে। নিজের কোনও ক্ষমতাই নাই, নিজকে অসার হ'তেও অসার জেনে, একান্ত ভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হ'লেই, "ভক্তি যোগ" আরম্ভ হয়, তখন আর সাধকের কোনও প্রকার ইচ্ছা, চেষ্টা, বা স্বাধীনতা থাকে না। সমস্তই ভগবান করেন, পরিষ্কার জেনে, সম্পূর্ণরূপে তাঁরই কৃপার উপর নিজকে ছেড়ে দেয়। ভক্ত নিজকে ভগবানের চরণে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ কর্‌লে, ভগবৎকৃপায়, তখন তার নিকটে নানা তত্ত্ব প্রকাশ হ'তে থাকে। এই সব তত্ত্ব প্রকাশের অবস্থাই "জ্ঞান যোগ" গীতাতে যে কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, ও জ্ঞানযোগের বিষয় ব'লেছেন, তার তাৎপর্য্যই এই। তীব্র তপস্যা, কঠোর বৈরাগ্য, ও প্রাণপন সাধন ভজন ক'রেও যে যথার্থ অবস্থা কিছুই লাভ হয় না; তাঁর কৃপা ব্যতীত যে কিছুই হবে না, এটি পরিষ্কার রূপে বুঝ্‌বার জন্যই সাধন ভজন। নিজের চেষ্টা, সাধ্য সমস্তই অসার। একমাত্র তাঁর কৃপাই সার।"

ঠাকুর কিছুক্ষণ থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, :—"খুব সংগ্রাম কর, এই

শ্রীযুক্ত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী

U. RAY & SONS

সংগ্রাম জীবনে আসাও মহাসৌভাগ্য জান্‌বে। অনেকের জীবনে এই সংগ্রামই আসে না। সংগ্রাম আরম্ভ হ'লেই বুঝ্‌বে, ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হ'লো। এই সাধনের ভিতরে যাঁরা আছেন, সকলকেই এই সংগ্রামে পড়্‌তে হবে। সকলকেই অন্তরের সহিত, সমস্ত রিপুর নিকটে পরাস্ত মান্‌তে হবে। নিজেদের যাহা যথার্থ ভিত্তি, তাতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। নিজের যায়গায় একবার গিয়ে দাঁড়ালেই নিজকে অতিশয় হীন, পতিত, কাঙ্গাল ব'লে মনে হবে। ঐ সময়ে দীনবন্ধু পতিতপাবন, কাঙ্গালের ঠাকুর ব'লে ভগবানকে ডাকা একটা কথার কথা, শিখা কথা হবে না। নিজের দুরবস্থা অনুভব ক'রে ভগবানকে ডাক্‌লে, উহা প্রাণের সহিত ডাকা হবে। তখন ভগবানও দয়া কর্‌বেন। নিরাশ হবার কিছুই নাই।"

১২৯৮ সালের—চৈত্র মাস পর্য্যন্ত।

মহিয়াড়ী সাধারণ পুস্তকালয়

নির্দ্ধারিত দিনের পরিচয় পত্র

বর্গ সংখ্যা   পরিগ্রহণ সংখ্যা..................

এই পুস্তকখানি নিম্নে নির্দ্ধারিত দিনে অথবা তাহার পূর্ব্বে গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে। নতুবা মাসিক ১ টাকা হিসাবে জরিমানা দিতে হইবে।

নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন

এই পুস্তকখানি ব্যক্তিগতভাবে অথবা কোন ক্ষমতা-প্রদত্ত প্রতিনিধির মারফৎ নির্দ্ধারিত দিনে বা তাহার পূর্ব্বে ফেরৎ হইলে অথবা অন্য পাঠকের চাহিদা না থাকিলে পুনঃ ব্যবহারার্থে নিঃসৃত হইতে পারে।